মান্ধাতা

তারাপদ রায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

মান্ধাতা

লেখকের অন্যান্য বই

কাণ্ডজ্ঞান

জ্ঞানগম্যি

দুই মাতালের গল্প ও অন্যান্য

বিদ্যাবুদ্ধি

রস ও রমণী

চারাবাড়ি পোড়াবাড়ি

জলভাত

গল্পসমগ্র

পটললাল ও মিস জুলেখা

উৎসর্গ

৺সুধীর চন্দ্র রায়

মান্ধাতা

এদিকটায় শীত একটু তাড়াতাড়ি এসে যায়। কয়েকদিন আগে কার্তিক শেষ হয়ে অঘ্রাণ শুরু হয়েছে। এর মধ্যেই বাতাস উত্তরমুখী হতে শুরু করেছে। কাছারিঘর আর দালানের মধ্যে বহুদিনের পুরনো বিশাল কাঠচাঁপা গাছটার পাতাগুলো দিনেরাতে একটা একটা করে ঝুরঝুর করে ঠাণ্ডা বাতাসে ঝরে পড়ছে। বাইরের উঠোনে শুকনো পাতার ছড়াছড়ি।

কিন্তু দুয়েকটা উঁচু ডালের মাথায় কয়েকটা সোনার বরণ ফুলের গুচ্ছ এখনো ফুটে রয়েছে। কাঠচাঁপা ফুল শিউলি বা বকুলের মতো নয়। ফুটে উঠেই ঝরে যায় না। অনেকদিন গাছে থাকে।

সারাদিন আকাশ মেঘলা ছিল। এখন সন্ধ্যার পরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। আষাঢ় মাসে ইলসেগুঁড়ি বৃষ্টি যেমন প্রায় তাই। তবে অনেক সময় জোর বৃষ্টিও হয়।

ভূগোল বইয়ে কোথাও তেমন লেখা নেই। কিন্তু প্রত্যেক বছরেই শীত পড়ার মুখে অল্প কয়েকদিনের জন্যে এ অঞ্চলে এ রকম হয়। স্থানীয় লোকেরা বলে পৌষা, শব্দটা বোধহয় পৌষ থেকে এসেছে, যদিও বৃষ্টিটা আসে অঘ্রাণে।

কয়েকদিন মেঘলা হয়ে ছিল। বৃষ্টিটা এল আজ বিকেলের পরেই।

এসব সময়ে বিকেল অবশ্য বোঝা কঠিন। চারটে বাজতে না বাজতেই কেমন ঘন হয়ে আসে বাড়ি-ঘর, গাছ-গাছালির ছায়া। এক সময়ে জোনাকি জ্বলে ওঠে, ঝিঁ ঝিঁ ডাকে, পুকুরের পশ্চিমপারে পুরনো কামারপাড়ার শূন্য ভিটেয় চালতা আর গাব গাছের নিচে নব প্রজন্মের শেয়ালেরা এসে ঘোষণা করে 'শুভ সন্ধ্যা, শুভ সন্ধ্যা।' একটি ছোট দিন এসে নিঃশব্দে মিশে যায় অন্ধকারের দীর্ঘ পারাবারে।

সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টিটা খুব মিহি ছিল, খুব ঝিরি ঝিরি। হঠাৎ ঘণ্টাখানেকের মাথায় দমকা হাওয়ার সঙ্গে জোর বৃষ্টি এল।

দালানের বারান্দার শেষ প্রান্তে বাঁশের দরমার বেড়া দেওয়া রান্নার জায়গায় সৌদামিনী কয়েকটি ময়দার রুটি সেঁকছিল। এ বাজারে ময়দা পাওয়া খুব দায়। তবু সৌদামিনী এদিক-ওদিক থেকে চেয়ে চিন্তে বেশি দাম দিয়ে, জামাইবাবুর নাম করে, ধরাধরি করে দু-চার সের ময়দা সংগ্রহ করে নিয়ে আসে, তাতেই অনেকদিন চলে যায়। জামাইবাবুকে লাল আটার মোটা রুটি দিতে সৌদামিনীর সঙ্কোচ হয়।

জামাইবাবু সন্ধ্যাবেলা একটি কি দু'টি রুটি কোনোরকম মিষ্টি বা চিনি ছাড়া গরম দুধ দিয়ে খান। যেদিন ময়দার রুটি থাকে না, সৌদামিনী নতুন বাজারে, পুরনো বাজারে, ঘুরে এক ছটাক ময়দাও জোগাড় করতে পারে না সেদিন সে খই দিয়ে দুধ দেয় জামাইবাবুকে।

সুবিধের কথা খই এখনো বাজারে মোটামুটি পাওয়া যায়। তা ছাড়া গ্রামের দিকের মক্কেল বাড়ি থেকে, উকিলবাবু সন্ধ্যাবেলা খাবেন বলে এখনো দুয়েক ধামা খই মাঝে মধ্যেই এসে যায়।

সৌদামিনী জানে, উকিলবাবু মানে তার জামাইবাবু, এসব নিয়ে কোনো মাথা ঘামান না।

খাওয়া-দাওয়া নিয়ে তাঁর কোনো বালাই নেই। কি মাছ, কি তরকারি, কি যে খাচ্ছেন ভাল করে খেয়াল পর্যন্ত করেন না। যদি কোনোদিন ভুলেভালে ঝোলে তরকারিতে নুন দিতে সৌদামিনীর ভ্রম হয়ে যায়, জামাইবাবু খেয়ালও করেন না, ভাত খেয়ে উঠে আঁচাতে আঁচতে বলেন, 'সদা, আজ তোর রান্না ভাল হয়নি।' পরে নিজে খাওয়ার সময় সৌদামিনী টের পায় কেন ভাল হয়নি।

দমকা হাওয়ার সঙ্গে জোর বৃষ্টির ঝাপট এসে লাগল সৌদামিনীর রান্নার জায়গার দরমার বেড়ায়। তাড়াতাড়ি উনুন থেকে রুটি ভাজার চাটুটা নামিয়ে দালানের বারান্দা দিয়ে সৌদামিনী একেবারে শেষ প্রান্তে দক্ষিণের ঘরটায় ছুটে গেল।

বিকেলের পর থেকে জামাইবাবু কেমন যেন আধো ঘুম, আধো তন্দ্রায় বড় খাটটায় চোখ বুজে শুয়ে থাকেন। কোনো হুঁশ থাকে না। শিয়রের বড় জানালাটা কিছুতেই বন্ধ করতে দেন না। বৃষ্টি এলে জামা কাপড়, বিছানাপত্র সব ভিজে যায়। সব সময় না হলেও এখন তো হবেই, উত্তুরে হাওয়া ঘুবে ঘুরে বয, কখনো না কখনো ঘর ভেজাবেই।

অঘোবে ঘুমোচ্ছিলেন প্রভাসকুমার।

...বড় ইঁদারার ধারে কামবাঙা গাছটায ফল আর পাতা আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। ফলে পাতায় হলুদ হযে আছে বড় গাছটা। যেন সূর্য ডুবে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরের মেঘলা আকাশ।

...সেজবৌদির তলপি বাহক হয়ে নতুন কোরা লাল রঙের পাঁচহাতি সাজাদপুরী গামছা হাতে ইঁদারার ধাবে প্রভাসকুমার দাঁড়িয়ে। সেজবৌদির এখনো সর্বাঙ্গে গায়েহলুদের আর নববিবাহের সৌরভ লেগে বযেছে।

...সেজবৌদিদের দেশে, সেই কোথাকার বানপুরে, বোধহয় কামরাঙা গাছ নেই। সেজবৌদি জিজ্ঞাসা করছেন, 'নোয়া ঠাকুরপো, এ ফলগুলো খাওয়া যায ?'

খোলা জানলা দিয়ে অল্প হাওয়ার দাপট, বৃষ্টির ঝাপটা এসে লাগছে প্রভাসকুমারের গায়ে।

ঘুমের চটকটা ভেঙে গিয়ে প্রভাসকুমার তন্দ্রার মধ্যে একটু সাব্যস্ত হলেন। রাত যে অনেক হয়ে গেল, এখনো যে প্রতুল ফেবেনি।

প্রতুলকুমার প্রভাসকুমারের পরের ভাই। মাস্টারি কবে কালীহাতিতে। ময়মনসিংহ থেকে আসা রাতের শেষ বাসে ফেবে। তার আসতে আসতে রাত আটটা হয়ে যায়।

প্রভাসকুমার তন্দ্রার মধ্যেই শেষ বাসের আওয়াজ পেলেন। খালধারে বাসস্ট্যাণ্ডে বাস এসে গেছে। শব্দহীন মফঃস্বলের রাতে সে শব্দ সিকি মাইল দূরে এ বাড়ি থেকে স্পষ্ট শোনা যায়।

তাড়াতাড়ি ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন প্রভাসকুমার। 'ভরত, ভরত, লণ্ঠনটা নিয়ে একটু এগিয়ে যা। প্রতুল এসে গেছে। যা বৃষ্টি বাদলার রাত, একটু এগিয়ে নিয়ে আয়।'

ঠিক এই মুহূর্তেই সৌদামিনী ঘরে ঢুকেছে। ঘরে ঢুকে ইলেকট্রিকের আলোটা জ্বালিয়ে দিয়েছে। সত্যিই মাথার কাছে জানলাটা হাট করে খোলা। জামাইবাবুর মাথার সাদা [illegible] চুলে বৃষ্টির ছাঁটের জল গুঁড়ো গুঁড়ো লেগে রয়েছে। বিছানা-বালিশও নিশ্চয় কিছুটা ভিজেছে।

সৌদামিনী তাড়াতাড়ি এগিযে গিয়ে পিছনের জানালটা ভেজিয়ে দিল। আশি বছরের পুরনো দালানের সেকেলে ভারি দরজা-জানলা সব, অবশ্য সাবেকি পিতলের কব্জাটায় আজও মরচে ধরেনি। তবে শক্ত হয়ে আছে। খোলা-বন্ধ করা বেশ কঠিন।

তা ছাড়া জামাইবাবু দরজা-জানলা খুব একটা বন্ধ রাখতে চান না। একটু আলো হাওয়া, খোলামেলা তাঁর পছন্দ। ঘরেও বিশেষ থাকতে চান না, বারান্দায়ই বেশি বসে থাকেন।

উঠোনে কাঠচাঁপা গাছ আছে, গন্ধরাজ লেবুর গাছ আছে, কামিনী ফুলের একটা ঝাড় রয়েছে। বাড়ির পিছনে আগে দুটো শেফালির গাছ ছিল। এখন একা একাই সেখানে বড় একটা শেফালির জঙ্গল তৈরি হয়েছে। পুজো কবে শেষ হয়ে গেছে। এখনো ভোরবেলা শিশিরে ভেজা ফুলের চাদরে গাছের তলা, চারপাশ ছেয়ে থাকে।

এই সব ফুলের ঘ্রাণ জামাইবাবু বুক ভরে টেনে নেন। শুধু ফুল কেন, আমের, জামরুলের, লিচুর গাছে মুকুল আসে। সব গন্ধ আলাদা আলাদা করে টের পান জামাইবাবু। এই তো গত বছরেই চৈত্রমাসের মাঝামাঝি একদিন জামাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'সদা এবার জামরুল গাছে বোল আসে নি? গন্ধ পেলাম না তো?'

সৌদামিনী জানে জামাইবাবুর চোখের জ্যোতি যত কমে গেছে, ঘ্রাণশক্তি ততটা নয়। তবে স্মৃতি এখন খুব দুর্বল। অথচ প্রভাস উকিলের আগে কি প্রখর ছিল স্মরণশক্তি, কত কি খুঁটিনাটি, সাল-তারিখ, নাম-ঠিকানা কোনো কাগজখাতা না খুলেই বলে দিতে পারতেন। সে সব পুরনো কথা এখনো মনের মধ্যে সঠিক গাঁথা আছে। কিন্তু নতুন কিছু মনে রাখতে পারেন না। বোধহয় মনের মধ্যে ছাপ পড়ে না।

এই তো আগের বছর বৈশাখ মাসের বড় ঝড়ে জামরুল গাছের বড় ডালটা উঠোনের পাশে রান্নাঘরের চালে ভেঙে পড়ল। সেই সঙ্গে পুরনো গজারি কাঠের ক্ষয়ে যাওয়া খুঁটি শুদ্ধ রান্না ঘরটাও মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

ভাগ্যিস, ঝড়টা সন্ধ্যার আগে বিকেলের দিকে হয়েছিল। সে সময়টায় সৌদামিনীর রান্নার কাজ থাকে না। না হলে টিনের চাল চাপা পড়ে নির্ঘাৎ মারা পড়ত সে।

পরের দিন ভাঙা রান্নাঘরটা মুহুরিবাবুরা লোক ডেকে এনে কাঠ-খুঁটি-টিন সমেত বেচে দিলেন, জামরুল গাছটার অর্ধেকের বেশি ভেঙে পড়েছিল। সেটাও পুরো কেটে ফেলা হল। জামাইবাবু বারান্দায় বেতের ইজি চেয়ারটায় বসে বসে সব দেখলেন।

সেইদিনই দালানের বারান্দার সীমানায় বেড়া ঘিরে নতুন করে রান্নার জায়গা করা হল। সবই জামাইবাবুকে জিজ্ঞাসা করে, জামাইবাবুর চোখের সামনে।

অথচ বছর ঘুরতে না ঘুরতে চৈত্রমাসে সেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সদা জামরুল গাছে বোল আসেনি।' বারান্দায় গিয়ে সামনে তাকালেই তো দেখা যায় বড় জামরুল গাছটা নেই। আকাশটা ওখানটায় ফাঁকা হয়ে আছে। রান্নাঘরের জায়গাটাও ফাঁকা। ইঁট তোলা এবড়ো খেবড়ো ভিটেটা পড়ে রয়েছে। সেখানে একটা কুমড়ো গাছ একা একাই বিনা যত্নে লকলকিয়ে বেড়ে উঠছে। সেই ভাঙা ভিটেয় সাবা সকাল শালিক পাখিরা দল বেঁধে ঝগড়া করে। একেকদিন দুপুরবেলায় কোথা থেকে একটা গোসাপ এসে হিস হিস কবে শূন্য ভিটেয় থুতু ছিটোয়।

রান্না ঘরটা যখন ভাঙা হয় অনেকক্ষণ সে দিকে স্থির অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন প্রভাস উকিল।...

বহুকাল আগের কথা সব। এত কম মনে পড়ে যে সব বলা যায় না। প্রভাসকুমার চুপচাপ

মনের মধ্যে স্মৃতির রুদ্রাক্ষের মালা জপেন।

কিন্তু সেদিন কেন যেন কথা বলতে ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর। দালানের ভিতরের বারান্দা থেকে একটা গোল সিঁড়ি নেমে গেছে উঠোনে। তার দুপাশে তিনটে কাঁঠাল গাছ। একদিকে দুটো, অন্যদিকে একটা। একেকটা একেক বয়েসের।

কিন্তু কাঁঠাল গাছের পাতা খুব পুরু, কখনো কখনো ছাতার মতো ঘন কালো। গ্রীষ্মের দিনে চমৎকার ছায়া দেয়। পাতার ফাঁক দিয়ে তির তির হাওয়া আসে।

গোল সিঁড়ি থেকে বারান্দায় যাওয়ার পথে অনেকখানি জায়গা। বাড়ির মধ্যের বারান্দাটা পশ্চিমমুখি। শীতের দিনের দুপুর আর গরমের দিনের সকাল খুব চমৎকার।

সেই ঝড়ের পরের দিন রান্নাঘর ভাঙার সকালে গোল সিঁড়ির বারান্দায় স্থির হয়ে বসেছিলেন প্রভাসকুমার, ঠিক নির্লিপ্ত নয়, খুব অসহায় ভাবে রান্নাঘরটা ভাঙা দেখছিলেন।

কাছারিঘরে তখন যত সব মক্কেলের আর জুনিয়র উকিলদের ভিড়। প্রভাসকুমারের জুনিয়রেরা সবাই স্যার বলে। কেউ কেউ পুরনো মক্কেল উকিলবাবুও বলে। এরা সবাই অপেক্ষা করছে কখন স্যার আসবেন।

স্যার কিন্তু গোল সিঁড়ির উপরে ঝিম মেরে বসে আছেন, ঘর ভাঙা দেখছেন। সৌদামিনী এক কাপ চা নিয়ে এল। খাদ্য পানীয় আর কোনো কিছুতেই লোভ বা আকর্ষণ নেই স্যারের, মানে সৌমিনীর জামাইবাবুর।

সন উনিশশো ছাব্বিশ, শহর ময়মনসিংহ, আনন্দমোহন কলেজ। কলেজের গেট থেকে বেরিয়ে একটু দূরে চৌধুরী টি স্টল। চা তখনো প্রায় নিষিদ্ধ পানীয়। সেই থেকে নেশা।

তারপরে কত কাল কেটে গেল, এখনো এক কাপ চায়ের জন্য সময়ে অসময়ে উতলা হয়ে ওঠেন সৌদামিনীর জামাইবাবু।

চা অর্থাৎ শুধুই চা। অনেকটা গরমজলে অল্প একটু চা-পাতা। দুধ নেই, চিনি নেই।

দিনের মধ্যে দশ-বারো বার সৌদামিনী জামাইবাবুকে দুধ চিনি ছাড়া এইরকম হালকা চা জোগান দেয়। জামাইবাবু খুব খুশি হন। প্রত্যেকবারই বলেন, 'সদা, তোর চা করার হাত খুব ভাল। আমি মরে গেলে তুই একটা চায়ের দোকান দিস।'

সেদিন কিন্তু চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে সদার জামাইবাবু কোনো হালকা কথা বলেন নি, পেয়ালায় যথারীতি একটা চুমুক দিয়ে সৌদামিনীকে বললেন, 'সদা, এই যে রান্নাঘরটা পড়ে গেল, এই যেটাতে তুই রান্না করতি, সেটা কিন্তু রান্নাঘর নয়।'

সৌদামিনী অবাক হয়ে বলল, 'এতকাল রান্না করলাম। তবু রান্নাঘর নয়?'

জামাইবাবু কেমন যেন আজকাল হুস হুস হুপ হুপ করে চা খান। তাড়াতাড়ি পেয়ালা নিঃশেষ হয়ে যায়।

সেদিনও তাই হল। দুয়েক চুমুকে পেয়ালা শেষ করেন। তারপর পেয়ালাটা সৌদামিনীকে ফেরত দিতে দিতে বললেন, 'এটা হল হবিষ্যি ঘর।' থেমে থেমে প্রায় আপন মনেই স্বগতোক্তির মতো বলতে লাগলেন তিনি, 'বড়দি যেবার বিধবা হয়ে এলেন, বাবা এই হবিষ্যি ঘরটা বানালেন। ওখানে একটা ছোট কাঠবাদাম গাছ ছিল। সেটা কেটে ঘরটা খুব তাড়াতাড়ি করে তৈরি করা হল।'

আসল রান্নাঘরটা ছিল ঐ দিকে ঐ ইঁদারার ধারে যেখানে এখন গন্ধরাজ লেবুর ঝোপটা রয়েছে। আগে হবিষ্যি রান্না হলে সেটা দালানেই তোলা উনুনে পুজোর ঘরে হত। বড়দি বিধবা

হয়ে আসতে আলাদা হবিষ্যি ঘরের ব্যবস্থা হল। তারপর কত কাল, আমিষ-নিরামিষ, জাত-পাত, হবিষ্যি-জলচল কিছুই আর রইলো না,সেই পুরনো রান্নাঘরটাও একবার আগুনে পুড়ে গেল। তারপর থেকে হবিষ্যি ঘরেই সব রান্না হচ্ছিল।

কিন্তু সৌদামিনী এত সব জানবে কোথা থেকে? সেসব সময়ের দেখা সে পায়নি। সে জন্মেছে অনেক পরে।

আজ যেমন হল। বৃষ্টির জলের জন্য জানলা বন্ধ করতে এসে দেখছে জামাইবাবু বিছানায় উঠে বসে 'ভরত, ভরত' বলে কাকে যেন ডাকছেন।

এরকম হামেশাই হচ্ছে আজকাল। কেমন একটা ঘুম-ঘুম, তন্দ্রা ভাব দেখা দিয়েছে প্রভাসকুমারের। শুয়ে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে-ভাবতে কেমন একটা ঘোর, কেমন একটা আচ্ছন্ন অবস্থা। মনের মধ্যে, চিন্তার মধ্যে দেশ-কাল, অতীত-বর্তমান,মানুষজন সব ছায়া ছায়া কেমন একাকার হয়ে যায়।

সৌদামিনী কি বুঝবে? প্রভাসকুমার নিজেই একেক সময় অবাক হয়ে যান। কিছুই ঠাহর পান না।

সেই কবেকার কথা। ছোটভাই প্রতুল যেত বাসে করে কালীহাতি স্কুলে পড়াতে। ফিরত সন্ধ্যা পার হয়ে। বাস স্ট্যাণ্ডে ময়মনসিংহের লাস্ট বাসটা এসে হর্ন দিয়ে দাঁড়াতো। তারও অনেক আগে টের পাওয়া যেত বাসটা আসছে, মফঃস্বল শহরের সন্ধ্যা অতিক্রান্ত নিস্তব্ধ রাতে অনেক দূর থেকে বাসটা আসার শব্দ শোনা যেত।

তখন ইলেকট্রিক লাইট কোথায়? রাস্তার মোড়ে দুয়েকটা কেরোসিনের আলো জ্বালাতো মিউনিসিপ্যালিটি, সেটাও জ্যোৎস্নারাতে জ্বালানো হত না।

বাসের শব্দ থেমে যাওয়ার পর ভরত যেত কালীবাড়ির মোড় পর্যন্ত লণ্ঠন হাতে। ছোটবাবুকে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্যে।

ভরতকে এখনো, এই চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর পরেও স্পষ্ট মনে আছে। ভরতের বাবা বাহাদুরকেও মনে আছে। ছাপরা জেলার লোক। বাহাদুর বহুকাল এ বাড়িতে ছিল। থুত্তুরে বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। শেষের বার দেশে গিয়ে ভরতকে নিয়ে এসেছিল। ভরতের তখন বড় জোর তের-চোদ্দ বছর বয়েস হবে। রোগা, লম্বা, ন্যাড়া মাথা, গলায় মোটা সুতোর মোটা পৈতে।

বাড়ির মধ্যে মেয়েরা সেবার খুব হাসাহাসি করেছিল ঐ রকম থুত্থুরে বুড়োর এমন অল্প বয়েসী ছেলে দেখে।

পরে ভরত এ বাড়ির এ শহরের জল মাটির সঙ্গে একেবারে মিলেমিশে গিয়েছিল।

এখানে আসার পরে সে শুধু একবার মাত্র দেশে গিয়েছিল। বাহাদুরের অসুখের খবর পেয়ে। ফিরে এল আবার ন্যাড়া মাথা হয়ে। মনে হয় এই তো সেদিনের কথা।...

ইতিমধ্যে সৌদামিনী একটা শুকনো গামছা দিয়ে জামাইবাবুর গা মাথা ভাল করে মুছিয়ে ভেজা গেঞ্জিটা খুলে দিয়েছে। বালিশের ওয়াড় আর চাদরটাও পালটাতে হবে।

আজ সকালবেলা সুন্দর ঝলমলে রোদ উঠেছে। শীতের পরিষ্কার নীল আকাশ। কাল সন্ধ্যাতেই যে বেশ ঝড়জল হয়ে গেছে, সেটা মনেই হয় না। তবে বৃষ্টির জলে গাছের পাতায় জমা ধুলো ময়লা সব ধুয়ে গিয়ে সবুজের আভা বেরোচ্ছে।

কালকের ঝড়বৃষ্টিটা শীতটাকে এবারে এগিয়ে এনেছে। আজ সকালে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।

অনেকদিন আগের একটা খুব পুরোন কাশ্মীরি শাল গায়ে জড়িয়ে পুবের বারান্দায় ইজিচেয়ারে এসে বসেছেন প্রভাসকুমার। এই গরম শালটা বহু স্মৃতি বিজড়িত। এটা প্রভাসকুমারের বিয়ের শাল। ঠিক বিয়ের নয়, তাঁর বিয়ে হয়েছিল গ্রীষ্মকালে জ্যৈষ্ঠ মাসে। ঠোঁটের কোণে একটু মৃদু হাসলেন প্রভাসকুমার। বাংলা তারিখটা স্পষ্ট মনে আছে সতেরোই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, শুক্লা ত্রয়োদশী। বাসি বিয়ের পর বরযাত্রীদের নিয়ে পালকি ঘোড়ার গাড়িতে করে বাড়ি ফেরার পথে এলংজানি খালের ধারে বাবলা বনের মধ্যে বিরাট সোনার বরণ চাঁদ উঠলো আকাশে।

দুটো পালকি ঘোড়ার গাড়ি। কয়েকটা টমটম গাড়ি। সামনের পালকি ঘোড়ার গাড়িটাতে রয়েছেন জ্যাঠামশায়, তিনিই বরকর্তা। পুরুতমশায়, সন্তোষের রাজবাড়ির নায়েবমশায়। আর?

মনে মনে আবার একটু হাসলেন প্রভাসকুমার। আশ্চর্য। সব মনে রয়ে গেছে। সন্তোষের নায়েবমশায় কোনোরকম আয়নার সাহায্য ছাড়াই তাঁর মোটা ভুরুর মধ্যে থেকে পাকা লোমগুলো টেনে টেনে ছিঁড়তেন। চুপচাপ অনেকক্ষণ ধরে বাছতেন, তারপর ঠিক একসময় একটা সাদা লোম ধরে ফেলতেন। না দেখে, শুধু আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে কি করে যে টের পেতেন কোন লোমটা সাদা, কোনটা কালো।

পিছনের পালকি গাড়িটায় সলজ্জ নববধূ স্মৃতিকণা সহ প্রভাসকুমার একদিকের সিটে। সামনের সিটে শরৎদি আর মোনা, নিতবর। শরৎদি শ্বশুরবাড়ির বিশ্বস্ত প্রবীণা পরিচারিকা, নববধূর সঙ্গে আসছে। মোনা ছিলো নিতবর, তখন তার বয়েস বড় জোর চার পাঁচ হবে। ছোট সোলার টোপরে, চন্দনের ফোঁটায়, গরদের পাঞ্জাবিতে খুব মানিয়েছিল তাকে। মোনা মানে মনোরঞ্জন, ছোড়দির প্রথম ছেলে। এত হাজার গুষ্ঠি আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ঐ একা মনোরঞ্জনই এদিকে রয়ে গেছে। চাটগাঁয় সমুদ্রের মাছের ব্যবসা করে। বছরে অন্তত একবার বিজয়ার পরে ঢাকা যাতায়াতের পথে মামাকে প্রণাম করে যায়। ঢাকায় কালাচাঁদের দোকান থেকে হাঁড়ি ভর্তি রসগোল্লা নিয়ে আসে। এ বাড়িতে অত মিষ্টি কে খাবে? তাঁর তো নিজের মিষ্টি খাওয়া বারণ। সদা একা কত খাবে? তবু ভাগ্নের আনা মিষ্টি, সদা একটা রসগোল্লা ভাল করে রস চিপে ফেলে প্লেটে করে জামাইবাবুকে দেয়।

পুবের বারান্দা রোদে ছেয়ে গেছে। কতকালের পুরোনো এই রোদ একই রকম রয়ে গেলো। সত্তর-আশি বছর আগে অঘ্রাণ মাসে থামের ছায়াটা যে রকম কোনাকুনি পড়তো এখনো তাই পড়ে। এখনো একটা বেড়াল অনেকক্ষণ রোদে শুয়ে থেকে ক্রমশ তাপ বাড়লে থামের ছায়ায় সরে গিয়ে শোয়। একই বেড়াল নাকি? বেড়ালটাকে ঠিক কতদিন ধরে দেখছেন ভাবতে চেষ্টা করেন সৌদামিনীর জামাইবাবু।

এবার একটু ঝিমুনি আসে প্রভাসকুমারের। শালটা ইজিচেয়ার থেকে গড়িয়ে বারান্দার মেঝেতে পড়ে যায়।

এলংজানির খালের ধারে চাঁদ উঠলো। বরযাত্রীদের একদল দুপুরের স্টিমারে এলাসিন ঘাট থেকে চারাবাড়ি চলে গেছে। সেখান থেকে টাউন হাঁটা পথ। বাকিরা সঙ্গে রয়েছে এখনো।

এখন দুটো পালকি গাড়ি ছাড়াও কয়েকটা টমটমগাড়িতে আত্মীয়স্বজন রয়েছেন। সবাই

পুরুষমানুষ, তখনো মেয়েদের বরযাত্রী যাওয়ার চল হয়নি।

আর রয়েছে পঞ্চাশ-ষাটটা সাইকেল। গতকাল বিকেলে একশোটা সাইকেলে বরযাত্রীরা এসেছিলো। সে সময়কার মফঃস্বলে সাইকেল চড়ে বরযাত্রী যাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো। তবে এক সঙ্গে একশোটা সাইকেল, যার কোনো কোনোটায় একাধিক সওয়ার। ওটা তখনকার একটা রেকর্ড। যে সব গ্রামের রাস্তা দিয়ে এই সাইকেলবাহিনী গিয়েছিলো, তার চারপাশে বেশ ভিড় হয়ে গিয়েছিলো।

গরম শালটা গা থেকে গড়িয়ে পড়ায় ঘুমের মধ্যেও বেশ একটু শীত বোধ করছিলেন প্রভাসকুমার। তন্দ্রাটা কেটে গেলো। বারান্দার মেঝে থেকে লুটিয়ে পড়া শালটা কুড়িয়ে নিলেন তিনি। যদিও বেশ রোদ উঠেছে, ঠাণ্ডাটাও বেশ। এবছর খুব বৃষ্টি হয়েছে, সারা বর্ষাকাল ধরে, এমন কি গতকাল পর্যন্ত। এবার ঠাণ্ডাটাও খুব পড়বে।

এমনিতেই বেশ শীতকাতুরে প্রভাসকুমার। একটা গলাবন্ধ সোয়েটার সারা শীতকাল গায়ে দিয়ে থাকেন। কার্তিক মাসে লেপ বার করতে নেই, কি সব অমঙ্গল না দোষ হয়। তাই প্রত্যেকবারই আশ্বিন মাসের শেষে কাঠের আলমারি খুলে লেপ বার করে গায়ে একটু ছুঁইয়ে নেন। তারপর থেকে বিছানার একপাশে লেপটা চৈত্রমাস পর্যন্ত থাকে।

শীতকাতুরে হলেও খোলা বারান্দায়, কিংবা ঘরের মধ্যে হলে জানলা দরজা খুলে বিছানায় এলিয়ে শুয়ে থাকতে ভাল লাগে প্রভাসকুমারের। সেই জন্যেই শীতের দিনে ঠাণ্ডার সঙ্গে জোরদার লড়াই করতে হয়।

এই কাশ্মীরী শালটা বেশ গরম। গায়ে জড়িয়ে খুব আরাম। বহুকাল আলমারিতে তোলা ছিল। এখন শীতের দিনে মাঝে মাঝে গায়ে দিতে ভাল লাগে প্রভাসকুমারের।

বিয়ে হয়েছিল জ্যৈষ্ঠ মাসে। সে বছর শীতের তত্ত্বে শালটা এসেছিলো শ্বশুরবাড়ি থেকে। সুন্দর, সূক্ষ্ম কাজ। পাড়ের কাছটা আর ভিতর বরাবর অনেক জায়গা ছিঁড়ে ফেটে গিয়েছে।

নিজের বিয়ের জিনিসপত্র, বাপের বাড়ির বছরের পর বছর পাঠানো তত্ত্ব খুব যত্ন করে তুলে রাখতো স্মৃতিকণা। এই শালটার অনেক জায়গায় তাঁর নিজের হাতে রিপু করা। পরে সৌদামিনীও করেছে। অনেক ছেঁড়া জায়গা সৌদামিনীর হাতে জোড়া দেওয়া। এখন আর সেলাই করা যায় না, সুঁচ বসালেই ফেঁসে যায়। এমনিতেই ফেঁসে যাচ্ছে ক্রমাগতই, আর বেশিদিন গায়ে দেওয়া যাবে না।

ইতিমধ্যে সৌদামিনী এসে এক কাপ চা দিয়ে গেছে। বলে গেছে, 'কাছারি ঘরে অনেক লোক অপেক্ষা করছে।'

পুরনো দিনের বিরাট আটচালা কাছারি ঘর। ওপরে টিনের চাল, ভেতরে কাঠের দোতলা। একতলায় দুপাশে পার্টিশান করা। ঘরের মধ্যে বড় বড় কাঠের তক্তপোষ, তার ওপরে মোটা শতরঞ্চি পাতা।

আব্দুল সমাদ আর নরেন পাল, দুজন জুনিয়ার উকিল সকালে সেরেস্তায় চলে আসে। মুহুরিবাবুরাও এসে যান। মক্কেলরা যারা দূর থেকে আসে, তারা অনেকে আগের দিন রাতের বেলায় কাছারি ঘরের দোতলায় থাকে। কাছের যারা তারা কাজের দিনে মামলার তারিখ মত বেলায় বেলায় এসে যায়।

একটু বেলা বাড়ার পর ধীরে সুস্থে প্রভাসকুমার কাছারি ঘরে যান। আজকাল চোখে কম দেখেন। নথিপত্র ভাল করে পড়তে পারেন না। এই গত বছর পর্যন্ত সময়-সুযোগ পেলেই

বই পড়তেন, হাতের কাছে পাঠযোগ্য বই না থাকলে ল রিপোর্ট নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতেন। কিংবা অনেকদিন আগের একটা ডায়েরি খুলে স্মৃতিকথা লিখতেন। কখনো কখনো পুরনো ছন্দে কবিতাও লিখতেন।

চোখের জ্যোতি ক্রমশ কমে আসছে। বইয়ের অক্ষরগুলো কেমন চলন্ত পিঁপড়ের সারির মতো এঁকে বেঁকে হেঁটে চলে যায়। কেমন অস্পষ্ট, জড়াজড়ি হয়ে যায় পংক্তিগুলো।

সদা এসে একটু আগে কাছারিঘরে যাওয়ার জন্যে তাগাদা দিয়ে গেছে। হাঁটাচলায় কোনো অসুবিধে হয় না, যদিও একটু ঝাপসা, একটু আবছায়া লাগে। বেশ সাবধানেই চলাফেরা করেন প্রভাসকুমার।

বহুদিনের অভ্যাস মতো বাইরের বারান্দা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে বাইরের উঠোনে নামলেন প্রভাসকুমার।

এই উঠোনে প্রত্যেক বছর শীতকালে ব্যাডমিন্টনের কোর্ট কাটা হতো। এককালে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে, ভাইদের সঙ্গে পুরো শীতকালের ছুটির দিনের বিকেলগুলো তিনিও ব্যাডমিন্টন খেলে কাটিয়েছেন। পরে ছেলেরা বড় হয়ে তাদের বন্ধুদের সঙ্গে খেলেছে। এ পাড়ার ছেলেরা, আজকাল মেয়েরাও, স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হতেই শীত শুরু হওয়ার মুখে মুখে দড়ি কোদাল নিয়ে এসে কোর্ট কাটতে লেগে যায়। ছেলেরা মেয়েরা আলাদা আলাদা খেলে, আবার এক সঙ্গেও খেলে।

উঠোনটার দুপাশে সোজসুজি দু'সারি সুপুরি গাছ। গাছগুলো এখন বেশ লম্বা হয়েছে। দালানের ছাদ ছাড়িয়ে গেছে তাদের মাথা। দুয়েকটা গাছ মরেও গেছে বুড়ো হয়ে।

স্মৃতিকণা নিজের হাতে গাছগুলো লাগিয়ে ছিলেন। সন্তোষের রথের মেলা থেকে বর্ষার সময় সুপুরিগাছের চারা কিনে এনে দুপাশে সার দিয়ে লাগিয়েছিলেন।

ছেলেরা তখন ব্যাডমিন্টন খেলা আরম্ভ করেছে। প্রত্যেক বছর কোর্ট কেটে নেট টাঙানোর জন্য বাঁশের খুঁটি পুঁততে হলে খনতা দিয়ে গর্ত খুঁড়ে মোটা বড় বাঁশের খুঁটি লাগাতে হতো, সে ছিলো বেশ হাঙ্গামা।

স্মৃতিকণার বাস্তববুদ্ধি ছিলো প্রখর। ছেলেদের যাতে বছর বছর খুঁটি পোঁতার হাঙ্গামায় না যেতে হয় তাই দুপাশে সুপুরির চারা লাগানো হলো, ওতেই দড়ি দিয়ে নেট বাঁধা হবে। স্মৃতিকণার হিসেব ঠিক ছিলো কিন্তু ছেলেরা বড় হওয়ার আগে গাছগুলো বড় হলো না। গাছগুলো সাব্যস্ত হওয়ার আগেই ছেলেরা ঘরছাড়া হলো, স্কুলের পরীক্ষা পাশ করে তারা কলকাতায় কলেজে পড়তে চলে গেলো।

তারপর আরও দুই প্রজন্ম কেটে গেলো। সুপুরি চারাগুলো এই ফাঁকে উঁচু হয়ে উঠলো। আজ বহুকাল ব্যাডমিন্টন কোর্ট কাটার সঙ্গে সঙ্গে আর নেটের জন্য খুঁটি টাঙাতে হয় না। দুপ্রান্তের দুটো সুপুরি গাছ পোস্টের কাজ করে।

ধীরে ধীরে উঠোন পেরিয়ে কাছারি ঘরের দিকে এগোলেন প্রভাসকুমার। কাছারি ঘরটা দক্ষিণমুখী, সামনে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা, তারপরে পুকুর।

উঠোন পেরিয়ে কাছারি ঘরে ঢুকতে গেলে বাঁদিকে একটু ঘুরতে হয়। সেই বাঁকের মুখে একটা সিমেন্ট বাঁধানো তুলসীবেদী। একটু নিচু হয়ে হাত ছুঁইয়ে প্রতিদিনের এবং বহুকালের অভ্যাসমত তুলসীবেদীটাকে প্রণাম করলেন। সেই কবে জ্ঞান হওয়ার বয়েসে মা তুলসীমন্ত্র শিখিয়েছিলেন, সংস্কৃতমন্ত্রের লাইন দুটো আজও মনে আছে।

তুলসীবেদীটা আছে বটে কিন্তু কোন তুলসী গাছ নেই। এই বেদীটায় কিছুতেই তুলসীগাছ

বাঁচতে চায় না। এমনিতে তুলসীগাছ বাড়ির কোথাও লাগালে একা একাই বেড়ে রীতিমত জঙ্গল করে তোলে। তুলসীর শুকনো বিচি মাটিতে পড়ে তা থেকে আবার চারা জন্মায়, তুলসীর জঙ্গল আরও বাড়ে, আরও বড় হয়। তুলসীর ফল টুনটুনি পাখিদের খুব পছন্দ।

কিন্তু বাঁধানো বেদীর মধ্যে যত্নে তুলসীগাছ বাঁচতে চায় না। বাড়ির মধ্যে আরেকটা তুলসীবেদী রয়েছে। একটা তুলসীর ঝোপও রয়েছে। তবু ওই বেদীটা বানানো হয়েছিল জমিদারি সেরেস্তায় নায়েব-গোমস্তা, দূর গ্রামের ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব মক্কেল যাঁরা আসতেন, ওপরের কাঠের ছাদে রাত্রিবাস করতেন, তাদের পুজো-আহ্নিক, আচমনের জন্য। কাছারি ঘরের বড় কাঠের দেরাজে দুটো তামার কোষাকুষিও ছিলো। এখন বোধহয় আর নেই। থাকার কথাও নয়, একবার রাজাকাররা সেই একাত্তর সালে কাছারি ঘরটা তছনছ করেছিল, সেই সময়েই পুরনো জিনিসপত্র সবই প্রায় গেছে।

সকাল প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। হেমন্ত শেষের সকাল। দিন এখনো আড়মোড়া ভাঙছে। যেন বেলা বাড়েনি, যেন কিছুই করার নেই, কয়েকটা চিল অলসভাবে উড়ছে, পুকুর আর বাড়িটা ঘুরে ঘুরে আকাশে অল্প উঁচুতে ঘুরছে। বহুদিন ধরে এই ঘুরপাক তারা খেয়ে যাচ্ছে।

কিছুদিন আগেও প্রভাসকুমার খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে একটু হেঁটে এসে কাছারি ঘরে ঢুকে যেতেন। অনেক সময় বাড়ির মধ্যে আর চা খেতে ঢুকতেন না। ফেরার পথে খালধারে বাসস্ট্যাণ্ডে খোকা মিঞার টি স্টলে দুটো নারকেলি বিস্কুট দিয়ে চা খেয়ে নিতেন।

সে অবশ্য স্মৃতিকণার মৃত্যুর পর। তার আগে সকালবেলায় রান্নাঘরের বারান্দায় মোড়ায় বসে অলসভাবে নানা কথা বলতে বলতে অন্তত দু'কাপ চা খেয়ে তারপরে কাছারি ঘরে যাওয়ার জন্য উঠতেন।

মাঝে মাঝেই মক্কেলরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে, 'উকিলবাবু, উকিলবাবু' করে তাড়া দিতো। সাত সকালেই কাছারিঘর গমগম করতো মক্কেলের ভিড়ে।

তখন সেই কাক ভোরে, 'উকিলবাবু, উকিলবাবু' ডাক দিয়ে দিন শুরু হতো, তারপর সারাদিনই সাক্ষী, মক্কেল, মুহুরি, নায়েব পরিবেষ্টিত। আদালত থেকে ফেরার সময়ও পিছনে পিছনে লোক আসতো দল বেঁধে, বিকেলে পায়চারি করতে বেরোলেও সঙ্গে কাছারির লোকজন, কাছারির কথাবার্তা, তারপর সারা সন্ধ্যা বড় ডুম লণ্ঠন জ্বালিয়ে, কোন কোন দিন রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটা।

সেই ভিড়টা যে এখনো কমেছে তা নয়। তবে প্রভাসকুমার আজকাল আর সন্ধেবেলা কাছারি ঘরে ঢোকেন না। বিকেলে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে দুধ-রুটি খেয়ে নিয়ে বাইরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে চোখ বুজে অন্ধকারে শুয়ে থাকেন, যতক্ষণ না গভীর ঘুমে চোখ জড়িয়ে যায়। তখন সৌদামিনী এসে হাত ধরে টেনে তুলে বিছানায় শুইয়ে মশারি গুঁজে দিয়ে নিজে শুতে যায়।

বাইরের বারান্দায় ইজিচেয়ারের পাশে একটা হেলানো কাঠের বেঞ্চি আর পিছনে একটা তক্তাপোষ আছে। সন্ধেবেলায় কারো যদি কোন দরকার থাকে, কোন কিছু বলার থাকে বা পরামর্শ চায় সে এসে ঐ তক্তাপোষ বা বেঞ্চিতে চুপ করে বসে থাকে। যখন বোঝে প্রভাসকুমার জেগে আছেন, তন্দ্রার ভাবটা নেই, তখন যা জানার বা বলার সেটা সেরে ফেলে।

এরা সবাই কাজের লোক। তবে আজকাল সকাল বেলায় কাছারি ঘরে যে বড় ভিড়টা হয় সেটা পুরোটা প্রভাসকুমারের সেরেস্তার নয়। খুব পুরনো মক্কেল না হলে প্রভাসকুমার, গত কয়েক বছর ধরে, বিশেষ করে স্মৃতিকণার মৃত্যুর পর থেকে এবং দৃষ্টিশক্তি কমে যেতে নিজের

হাতে আর মামলা রাখেন না।

অন্যান্য সেরেস্তা থেকে এখনকার মামলাগুলো আসে। নথিপত্র তাদেরই। সাধারণত পরামর্শের জন্য আসে। কোন কোন সময়ে মামলার শুনানির দিন প্রভাসকুমারকে আদালতে দাঁড়াতে অনুরোধ করে।

গত একবছর আইনঘটিত জটিল ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া ছাড়া প্রভাসকুমার আদালতে খুব একটা দাঁড়াননি। প্রত্যেকদিন আদালত পর্যন্ত গেছেন কিন্তু বার-লাইব্রেরিতে বসে থেকেছেন।

গত বছরে একবার এক সপ্তাহে পর পর দুদিন প্রভাসকুমার খেয়াল করেন যে কোর্টের মধ্যে শুনানি চলাকালীন তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। এরপর কোর্ট যেতে তিনি সংকোচ বোধ করেন। তার চেয়ে বার লাইব্রেরির চেয়ারে মাথা কাত করে শুয়ে থাকা ভাল। পারতপক্ষে তাঁকে কেউ বিরক্ত করে না। ছোঁড়া উকিলদের একটু অসুবিধে হয়, প্রভাসকুমার বুঝতে পারেন, তারা সামনে থেকে উঠে বারান্দায় গিয়ে সিগারেট খেয়ে আসে।

সহবতপুরে মধু মিঞার ধানের আড়তে এক সন্ধেবেলা ডাকাতি হয়েছিলো। সেই ডাকাতির মামলায় চার আসামিকে পুলিশ ধরেছে নদীর ওপারে মানিকগঞ্জ থেকে। জামিনে খালাসে আছে আসামিরা। এখন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বিচার হচ্ছে, দায়রার আদালতে সোপার্দ করা হবে কিনা, এই রকম জায়গায় মামলাটাকে মেরে দিতে পারলে সবচেয়ে সুবিধে, না হলে পরে দায়রার বিচারের অসুবিধে আছে।

এই আসামিরা হবিবর উকিলের মক্কেল। হবিবরের মুহুরি প্রবোধ দত্ত এদের নিয়ে এসেছে এদের সঙ্গে কথা বলে আনুপূর্বিক শুনে যদি প্রভাসকুমার কোন ফাঁক-ফোঁকর খুঁজে পান।

আগের দিনই হবিবর উকিল বলে রেখেছিলেন। আজ কাছারিঘরে ঢুকে ডাকাতির মামলার চার আসামিকে দিয়ে কাজ শুরু করলেন প্রভাসকুমার। প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে নাম জিজ্ঞাসা করলেন। এটা তাঁর পুরনো রীতি, মক্কেলের নামধাম, কাজকর্ম, বংশপরিচয় জানা থাকলে সুবিধে হয়।

আজকের ডাকাতেরা পর পর নাম বললো, 'সুবল পাল' 'খগেন বসাক' 'আব্দুল খালেক' 'রাম ভদ্র'। আব্দুল খালেককে বাদ দিয়ে বাকি তিনজনকে প্রচণ্ড ধমকালেন প্রভাসকুমার, 'তোমাদের তো সাহস কম নয়, তোমরা হিন্দুর ছেলে হয়ে বাংলাদেশে ডাকাতি কর।'

বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় নিখোঁজ হয় সৌদামিনীর স্বামী হারাধন দাস। উনিশশো একাত্তর সালের জুলাই মাস সেটা।

সে বছর এ রকম অনেক হয়েছিল। মার্চ মাসের শেষে 'জয়বাংলা' যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার অল্পদিন পরে যখন পাকিস্তানি ফৌজ ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র নাগরিকদের ওপরে, নিরীহ মানুষেরা যারা পারল পালিয়ে এলো সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে। কিন্তু তার পরেও শতকরা নব্বুই ভাগ রয়ে গেল পাকিস্তানি বাহিনীর জিম্মায়। এরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, জঙ্গলে, ধানক্ষেতে নিরাপদ

আশ্রয়ের সন্ধানে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজে বেড়াতে লাগল।

যারা নিজেদের বাসায় বা আশেপাশে রয়ে গেল তারা, বিশেষ প্রয়োজন না পড়লে বাড়ি থেকে বেরোত না। তবুও মাঝেমধ্যেই রাতবিরেতে এমনকি দিনের বেলায়ও রাজাকাররা হানা দিত, কখনো তাদের সঙ্গে থাকতো পুলিশ বা পাকবাহিনী।

সে এক ভয়ানক অরাজকতা। সমতল, ছায়া সুনিবিড়, পূর্ব বঙ্গদেশ বর্গী কিংবা হার্মাদ অত্যাচারের পরে এমন দুর্যোগের মধ্যে আর পড়েনি। বর্গী, হার্মাদ আক্রমণ ছিল স্থানীয় বা আংশিক। বিক্ষিপ্তভাবে—সেও বহুকাল আগের কথা। পাকিস্তানিদের ধর্ষণ, লুঠতরাজ অবাধ হয়ে পড়েছিল। কোথায়ও আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু ছিল না। জীবনের কোন দাম ছিল না।

হারাধন দাস দুপুরবেলায় বাড়ির পিছনের পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরছিল। ভরা বর্ষার এই সময়টায় পুকুরে খুব মাছ। কেঁচোর টোপ দিয়ে সে প্রায় অর্ধেক খালুই, কই, মাগুর, শোল এই সব মাছ ধরে ফেলেছিল।

বেলা হয়ে গেছে। এবার পুকুরের ঘাটেই একটা ডুব দিয়ে সে বাড়ি ফিরে দুপুরবেলায় খেতে যাবে।

এমন সময় একটি ছেলে, রজব আলি, তাকে ডাকতে এল। রজব আলি পাড়ারই ছেলে, পাড়ার উত্তর পিঠে শেষ বাড়িটায় থাকে। ভাঙাচোরা বাড়ি, তাও নিজেদের নয়, বেদখল করা। কোথাকার ভৌমিকদের কাছারিবাড়ি ছিল এক সময়, প্রায় খালিই পড়ে থাকতো, এক বুড়ো নায়েববাবু দেখাশোনা করতেন।

গুরুচরণ চক্রবর্তী, এ শহরে সবাই তাকে বহু কাল ধরে গুরুনায়েব বলত। গুরুবাবুর দেশ ছিল মালদায়, মালদার ভৌমিকদেরই কিছু পুরনো তালুক ছিল ধলেশ্বরী-যমুনা বরাবর। পাবনা-সিরাজগঞ্জের উল্টোপারে। এই শহরে থেকে বহুকাল, প্রায় তিরিশ-চল্লিশ বছর, গুরুনায়েব ভৌমিকদের তালুকের বিষয় সম্পত্তি, খাজনা-ইজারা, মামলা-মোকদ্দমা দেখাশোনা করতেন।

গুরুবাবু নিজে স্বপাকে নিরামিষ খেতেন। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের মুহূর্তে, শীত, গ্রীষ্ম নির্বিশেষে বড় পুকুরের বাঁধানো ঘাটের জলে দাঁড়িয়ে পূর্বমুখী হয়ে সূর্যপ্রণাম করতেন, 'ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং।'...

এই অঞ্চলের অনেকগুলো পুকুর ও জলা, ঐ বড় পুকুর সহ ভৌমিকদের দীর্ঘ মেয়াদি ইজারা নেওয়া ছিল, বোধহয় সন্তোষের রাজাদের কাছ থেকে। সেগুলো আবার প্রতি বছর চৈত্র মাসের শেষে বার্ষিক ইজারা দেওয়া হত। ভৌমিকদের তরফ থেকে গুরুনায়েবই সব ব্যবস্থা নিতেন। জেলে, নিকারি, ফড়ে, দালালে সাধারণত ফাঁকা ভৌমিক কাছারিবাড়ি গমগম করত সেই কয়েকদিন। অনেক হাতবদল হত। অনেকে কান্নাকাটি করত। কেউ কেউ গুরুনায়েবের পায়ে ধরত। ভ্রূক্ষেপহীন অবিচল বসে থাকতেন গুরুচরণ।

এভাবেই অনেককাল, অনেক বছর, দিবস অতিক্রান্ত হয়েছিল। এমনকি সাতচল্লিশ সালে দেশভাগের পরেও বেশ কিছু কাল গুরুনায়েব একই ভাবে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু উনিশশো পঞ্চাশের দাঙ্গার সময় ময়মনসিংহ জেলা আদালতে কি একটা মামলার তদ্বির করতে গিয়ে গুরুচরণবাবু দাঙ্গাকারীদের হাতে আক্রান্ত এবং ভীষণ জখম হলেন। সদর হাসপাতালে কিছুদিন চিকিৎসিত হবার পরে তিনি সরাসরি স্বভূমি মালদায় ফিরে গেলেন। হয়ত পরে কখনো ফিরে আসার ইচ্ছে ছিল টাঙ্গাইলের বাসায়, কিন্তু তাঁর আর ফেরা হয় নি।

এরপর বেশ কিছুকাল ভৌমিকদের কাছারি ফাঁকা, তালা বন্ধ পড়ে ছিল। পরে কালের নিয়মে এবং অরাজকতার পরিবেশে বাড়িটি জবর দখল হয়। সে সময় এরকম অনেক হয়েছিল। দেওয়ানি বা ফৌজদারি আইন কিছুই কার্যকর ছিল না।

রজব আলি নামে যে ছেলেটি হারাধন দাসকে পুকুরঘাটে ডাকতে এসেছে, তার বাবা রামজান আলি রাতারাতি কেউকেটা লোক হয়ে উঠেছিল। যেমন তার আস্ফালন, তর্জন, গর্জন, তেমনই সে ন্যায়নীতিহীন ও দুশ্চরিত্র।

রমজান আলি ভৌমিকদের কাছারি বাড়িটি একদিন প্রকাশ্য দিবালোকে সপরিবারে দখল করে বসবাস করতে শুরু করে। রমজান আলির অবশ্য একাধিক পরিবার ছিল, তারা গ্রামের বাড়িতে থাকত। বাড়ি বেদখল করার কিছুদিন আগে রমজান আলি নতুন দার পরিগ্রহ করে। দাড়িতে মেহেদি লাগিয়ে চোখে সুরমা দিয়ে, নীল পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে মধ্য বয়েসে এক বালিকাকে বিয়ে করে শ্বশুর শাশুড়ি, শ্যালক শ্যালিকা নিয়ে বেদখল বাড়িতে বসবাস শুরু করে। পরে অবশ্য সে একটি জাল দলিলও রচনা করেছিল, যার সারমর্ম ছিল গুরুনায়েব এই বসতবাটি তাকে হস্তান্তর করেছেন। এরকম দলিল সে সময় অনেক রচিত হয়েছিল। বহুদিনই হয়ে যাচ্ছে। প্রশাসন, আদালত সব জেনেশুনে চোখ বুজে থাকে। এ বড় ভয়ঙ্কর খেলা।

সেই রমজান আলির ছেলে রজব আলি। রজব ক্লাস এইট থেকে নাইনে উঠতে দুবার পরীক্ষায় ফেল করে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। স্থানীয় ওসমানিয়া সিনেমা হলে টিকিট ব্ল্যাক করত এবং সুযোগ ও সুবিধে মত ছোটখাট ছেনতাই করত।

বাংলাদেশ যুদ্ধের বাজারে রাজপক্ষে সে স্বভাবতই নাম লেখায় এবং অল্পদিনেই সফল রাজাকার ওয়ে ওঠে।

সেই রজব যখন হারাধনকে ডাকতে আসে বলে যে কালীবাড়ির মোড়ে মিলিটারি মেজর সাহেব হারাধনকে তলব করেছে, হারাধনের বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। মিলিটারি কাউকে নিয়ে গেলে সহজে ছাড়ে না। তবে শেষ পর্যন্ত কি হতে পারে সেটা হারাধনের পক্ষে অনুমান করা কঠিন ছিল।

এদিকে কোনো গত্যন্তরও ছিল না। ইচ্ছে করলেই দৌড়ে পালাতে পারত না,কোথায় পালাবে ? কোথাও যাওয়ার ছিলনা। সবাই নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত, কেউই কোথাও সাহায্য করার জন্যে ছিল না। নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ ছিল একমাত্র পথ।

পুকুরঘাটে আর স্নান করা হল না। মাছের খালুই আর ছিপ নিয়ে বাড়ির মধ্যে রাখতে এল হারাধন। তখনো খালুইয়ের মধ্যে জীবন্ত মাছগুলো খলবল করছে।

উঠোনে খালুই আর ছিপটা নামিয়ে, হারাধন তার মাকে দেখতে পেল না। মা হয়ত উকিলবাবুদের বাড়িতে গেছে। যুদ্ধের এই দিনগুলিতে কেমন যেন ভয়ে ভয়ে মা অনেক সময়ে সৌদামিনীকে নিয়ে উকিলবাবুদের বাড়িতে থাকে।

আসলে হারাধনদের এ বাড়িটাও উকিলবাবুদের বাড়ির একটা অংশ। এতক্ষণ যে পচাপুকুরটায় হারাধন মাছ ধরছিল সেটাও এই বাড়ির মধ্যে। ওই পুকুরটার চারপারে ছোটছোট ভিটেঘর। তার একটাতে হারাধনদের বাসা।

ঠিক পুকুর নয়, ডোবাও বলা চলে না। এ অঞ্চলে এসব ছোটখাট জলাশয়কে পাগার বলে। বোধহয় পগার থেকে পাগার কথাটা এসেছে।

পাগারের পূব পারে হারাধনদের ভিটে। ওপারে পশ্চিমের কৃষ্ণছায়া তেঁতুল গাছের নিচে বড় বড় তালগাছের গুঁড়ির পাটাতন ফেলা জলের ধারে, তার ওপরে আছড়িয়ে আছড়িয়ে কাপড় কাচা হয়। বহুকাল আগে এই শহর পত্তনের সময় যে ধোবারা এসেছিলো জীবিকার খোঁজে, তাদেরই প্রাচীনতম আস্তানা ওটা। এখন ধোবারা কেউ নেই। গোলমালের মুহূর্তে সবচেয়ে আগে শহর ছেড়েছে তারা। পুকুরপারের বাড়িঘরগুলোতেও কেউ নেই। দিনের বেলায় কেউ বসবাস

করে না, রাতে কখনো কখনো লুকিয়ে চুরিয়ে এসে থাকে। ভোর হওয়ার আগে কাক না ডাকতেই চলে যায় মিলিটারিদের হাতে ধরা পড়ায় ভয়ে।

হারাধন নিজেদের উঠোনে মা কিংবা সৌদামিনীদের দেখতে না পেয়ে পুকুর পার ধরে উকিলবাবুদের দালানের দিকে এগোল। একটু পিছনে পিছনে রজব আলি সাপের মত ঠাণ্ডা দৃষ্টি দিয়ে হারাধনকে অনুসরণ করছিল।

উকিলবাবুদের বাড়ির গোলাবারান্দায় হারাধন মা এবং সৌদামিনীকে দেখতে পেলো। মা উকিল বাড়ির কাজের লোকের সঙ্গে কথা বলছে। উকিলবাবু মানে প্রভাসকুমার ভিতরের ঘরে খাটে শুয়ে কি একটা বই পড়ছেন। প্রায় সারাদিনই বই পড়েন।

তবে এখন আদালতে আর বিশেষ যান না। যাওয়ার দরকারও খুব একটা পড়ে না। গ্রামাঞ্চল থেকে মক্কেলরা শহরে আসার বিশেষ সাহস পায় না। আদালতও ঠিক মত বসে না। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা আইন আদালতের ওপরে লোকের কেমন ভরসা চলে গেছে।

বারান্দার এক পাশে সৌদামিনী। তক্তপোষের ওপরে বসে আছেন প্রভাসকুমাবের স্ত্রী স্মৃতিকণা, সৌদামিনী এক মনে তাঁর সদ্য পেকে ওঠা দুয়েকটি চুল মাথা থেকে বেছে বেছে তুলছে।

প্রভাসকুমার এবং প্রভাসকুমারের স্ত্রী স্মৃতিকণাকে যথাক্রমে বাবু ও মা বলে হারাধনের মা। বহুকাল ধরে এই গদই প্রচলিত আছে।

কিন্তু গ্রাম সুবাদে ছেলের বৌ সৌদামিনী উকিলবাবুর স্ত্রীকে দিদি বলে ডাকে। সে স্মৃতিকণার বাপের বাড়ির গাঁয়ের পাশের পাড়ার মেয়ে। তাই এই দিদি ডাক। আর সেই সূত্রে প্রভাসকুমার হলেন জামাইবাবু।

উনিশশো সত্তর-একাত্তর সালের মধ্যেই রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘাত প্রতিঘাতে জাতপাত প্রায় লোপ হয়ে এসেছিল পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে। বিশেষ করে মেয়ের বিয়ের ক্ষেত্রে স্বজাতের মধ্যে দূরের কথা স্বধর্মের মধ্যে পাত্র পাওয়া ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠেছিল।

সুতরাং হারাধনরা পদবীতে দাস আর জাতে নমঃশূদ্র হলেও গোয়ালা ঘোষ বাড়ির মেয়ে সৌদামিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ করে তার বিয়ে দেওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেনি। কেউ কোনো প্রশ্নই তোলেনি।

মাত্র ছয়মাস আগে গত শীতের মাঘ মাসে সৌদামিনীর সঙ্গে হারাধনের বিয়ে হয়। ঘটকালিটা নিজেই করেছিলেন স্মৃতিকণা।

শৌখিন ঘটকালিকরা স্মৃতিকণার স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সারা জীবনে কত যে বিয়ে তিনি দিয়েছিলেন। কোথাও অবিবাহিত বিয়ের যুগ্যি ছেলে মেয়ে দেখলে তিনি তার জোড়া খুঁজতে লেগে যেতেন। বহুক্ষেত্রে জুটিয়েও ফেলতেন।

এক্ষেত্রে পাত্র হিসেবে হারাধন মোটেই অযোগ্য হয়নি। শিবনাথ স্কুল থেকে পাশ করে সাদাত কলেজ, এক বছর কলেজে পড়েছিল। পড়তে পড়তেই একটা কাজ জুটে যায়। প্রভাসকুমারই তাঁর এক মক্কেলকে ধরে টাঙ্গাইল বাজারে এক তাঁতের শাড়ির আড়তে কাজটা জোগাড় করে দিয়েছিলেন। পাকিস্তানে গরিব হিন্দুর ছেলে বেশি লেখাপড়া করে কি করবে।

হারাধন ছেলেটিও ভাল। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। এ বাড়ির উঠোনেই বড় হয়েছে। ওর বাপ নিত্যধন দাস শিবনাথ স্কুলে দপ্তরি ছিল। প্রভাসকুমারদের বাড়ির এক পাশে ওই পুকুরধারে একটা চালাঘরে তিনটাকা ভাড়ায় থাকত। সান্নিপাতিক জ্বরে দীর্ঘদিন ভুগে নিত্যধন মারা যায়। তখন হারাধনের তিন বছর বয়েস। নিত্যধনের শ্রাদ্ধের আগের দিন ঘাটের কাজের সময় পুকুরের তালে একটা ইঁটের ওপর বসিয়ে ছোট হারাধনের মাথা ন্যাড়া করে দেয়া হয়েছিল। পুকুরপাড়

ধরে কালীবাড়ির রাস্তা পর্যন্ত ঘুর ঘুর করে হেঁটে বেড়াতো।

আজ সেই কালীবাড়ীর রাস্তার মোড়ে একটা জলপাই সবুজ জিপগাড়িতে পাঠান পাঞ্জাবি, কয়েকজন আর্য জনৈক অনার্যের জন্যে যার নাম হারাধন দাস, সেই হারাধনের জন্য অপেক্ষা করছে।

তারা হারাধনকে চেনে না, কোনোদিন কখনো কোথাও দেখেনি। হারাধন সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না।

কিন্তু হারাধন হল মালাউন। 'মালাউন' শব্দের প্রকৃত অর্থ, অন্তর্নিহিত ঘৃণা, মরুদেশীয় আক্ষেপ ও হাহাকার মিশ্রিত প্রাগৈতিহাসিক শুষ্ক বাতাসে কবে হারিয়ে গেছে।

এদিকে এদের কাছে সরকারি নির্দেশ খোদ এসেছে, ঢাকার সামরিক নেতাদের মারফৎ, মালাউনদের নিশ্চিহ্ন করো তবে ঠাণ্ডা মাথায় ধীরে। প্রথমে সচল সমর্থ কিছু লেখাপড়া জানা লোকজনদের তুলে আনো। কিছু খতম করো। বাড়িঘর, আগুনে পুড়িয়ে দাও। গোলা আড়ত লুটপাট করো। তাদের রমণীদের ধর্ষিত করো। এরপর অবশ্যই দেশ ছেড়ে পালাবে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

হারাধন বারান্দার পাশে মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে তার মা, যার নিজের নাম কবে গৌণ হয়ে গেছে যে এখন হারুর মা নামে পরিচিত, হারাধনকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কি রে মাছধরা শেষ হল? এখনো স্নান করিস নি?'

এমনিতে এই বন্দীপ্রায় খাঁচার ইঁদুরের জীবনে কোনো ব্যস্ততা নেই, কিন্তু খেঁকানোটা হারুর মায়ের অভ্যেস। নতুন বৌ সৌদামিনীকেও হারুর মা কারণে অকারণে সদা সর্বদা খেঁকায়। তা নিয়ে স্মৃতিকণা অনেক সময় হারুর মাকে ধমকিয়ে দেন। কখন একটু বাড়াবাড়ি দেখলে সৌদামিনীকে ডেকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন।

মায়ের কথার কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল হারাধন, সেই সময় সৌদামিনীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল তার। সৌদামিনী স্মৃতিকণার মাথার পাকা চুল তোলা বন্ধ করে মুখ ঘুরিয়ে এদিকে তাকিয়েছে।

সৌদামিনীর এই চাউনিটা হারাধনের খুব ভাল লাগে। আঠারো বছর বয়েসের তুলনায় একটু রোগা, ছোটখাট হলেও, কচি আমপাতার মত উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চোখ দুটো তেমন বড় নয় কিন্তু কেমন যেন একটা মায়া রয়েছে, একটা চোরা হাসি রয়েছে ঠোঁটের সীমায়। সৌদামিনীর দুটি রোগা হাতে দুটো ঢলঢলে লাল শাঁখা, কপালে সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর।

সৌদামিনীর দিকে তাকিয়ে মায়ের উদ্দেশ্যে হারাধন বলল, 'উঠোনে মাছের খালুইটা রেখে এলাম। তাড়াতাড়ি যাও। বেড়ালে খেয়ে নেবে।'

এই বলে সামনের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে হারাধন বলল, 'আমি একটু কালীবাড়ির মোড় থেকে আসছি।'

হারাধন জানে আর দেরি করা উচিত নয়। আর দেরি করলে রজব আলি মিলিটারিকে একেবারে বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে আসবে। আর মিলিটারি সবাইকেই ধরে নিয়ে যায়, তাতো নয়, রাস্তায় কত লোক মিলিটারির সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যায়, তাদেরতো কিছু বলে না। হয়ত তাকেও এখনই ছেড়ে দেবে।

বেড়ার ধারে একটা নারকেল গাছে ঠেস দিয়ে রজব আলি এতক্ষণ হারাধনের দিকে নজর রাখছিলো। এবার সৌদামিনী সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিজেদের উঠোনের দিকে যাওয়ার পথে রজব আলির মুখোমুখি পড়ে গেলো, রজবের তাকানোর ভঙ্গিটা সৌদামিনীর ভাল মনে হয় না।

তাড়াতাড়ি নিজেদের উঠোনে এসে সৌদামিনী দেখল মাছের খালুইটা উলটে পড়ে আছে, বোধহয় চিলে ছোঁ দিয়েছিল। তাজা মাছগুলো উঠোনে লাফাচ্ছে।

শাশুড়ি বৌয়ে মিলে ছড়ানো ছিটানো মাছগুলো আবার খালুইয়ে ভরছে এমন সময় কালীবাড়ির দিক থেকে একটা ছোট ছেলে উঠোনের মধ্যে ছুটে এসে বলল, 'এই মাত্র মিলিটারিরা হারুদাকে জিপে তুলে নিয়ে গেল।'

হারুর মাব আর মাছ কুড়োনো হলো না। উঠোনে খালুইটা উবুর হয়ে পড়ে রইলো। দুই একটা কই-জিয়ল কানে হেঁটে পিছনের বাগানের মধ্যে জলে ফিরে গেলো। বাকিগুলো কাকে-চিলে নিয়ে গেলো। উকিলবাবুদের বাড়ির মাথামোটা হলো বেড়ালটা এমনিতে দিনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে পুকুরের চার পাশের বাড়িগুলোর উঠোনগুলো পাক দিয়ে যায়। কিন্তু আজ কেন যেন টহলে বেবোয়নি। হয়ত একটু আগেই ঘুরে গেছে। এখন এলে দুয়েকটা তাজা মাছ সেও পেতো।

হারুকে যে মিলিটারি জিপে তুলে নিয়ে গেছে এই খবরটা কানে কানে ফিস-ফিসানি হয়ে পুবো পাডার মধ্যে বেশ কিছুক্ষণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। সবাই ভীত, কেমন একটা থমথমে ভাব।

কিন্তু কারো কিছু করার ছিলো না। কি করার আছে তাও কারোর জানা ছিলো না।

পুলিশ ব্যারাকের পিছনে সম্প্রতি পরিত্যক্ত হাইস্কুলে নদীর ধাব ঘেঁষে মিলিটারিদের ছাউনি পড়েছে। সার্চলাইট লাগিয়ে উঁচু কাঁটাতারের বেড়া বেঁধে রাইফেলধারী শাস্ত্রী দিয়ে ঘেরা ছাউনি। দিনরাত সেখানে জেনারেটর ভটভট করে চলে, কড়া বাতি জ্বলে।

সে অতি নিষিদ্ধ এলাকা। সাধারণ খুব বিপদে বা দরকাবে না পড়লে সেদিকে বিশেষ কেউ মাডায় না। কখনো ছুটছাট দুচারজন রাজাকার বা দালাল জাতীয় লোককে ঢুকতে বা বেরোতে দেখা যায়।

কেউ জানে না ছাউনির মধ্যে যাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের কি হচ্ছে। তবে সেই হতভাগ্যেরা কেউ ফিরে আসছে না। হয়তো বন্দি হয়ে আছে, হয়তো গুলি করে মেরে পিছনের নদীব জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হয়তো শেষেরটাই সত্যি। এখন ভরা বর্ষায় ছোট নদী ফুলে ফেঁপে উঠেছে। কাছাকাছি গ্রামের ঘাটে প্রায়ই দেখা যায় মড়া ভেসে যাচ্ছে। তাবপর একটু দূরে বাঁকের মুখে বড় চড়াটায় গিয়ে আটকিয়ে যায়। শকুনে-শেয়ালে ঠুকরিয়ে খায়। যত রাজ্যের শেয়াল নদী সাঁতরিয়ে গিয়ে ঐ চড়াটায় বাসা বেঁধেছে নলখাগড়ার বনে।

মাঝে মধ্যে বৃষ্টিভেজা এলোমেলো বাতাসে একটা পচা গন্ধও ভেসে আসে ওই দিকটা থেকে, এই চুপচাপ ফিসফাস আতঙ্কগ্রস্ত শহরের মধ্যে।

প্রভাসকুমারের কাছে স্মৃতিকণা হারুর খবরটা পৌঁছিয়ে দিলেন, 'ওগো, হারুকে যে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গেলো।'

যে বইটা পড়ছিলেন সেটা আলতো করে ভাঁজ করে বালিশের পাশে রেখে চোখ বুজে শুয়ে রইলেন প্রভাসকুমার। আজকাল তাঁর সব সময়েই কেমন ক্লান্ত, নির্জীব লাগে। এই রকম একটা ঘটনাতেও তিনি কোনো রকম উদ্বেগ বা উত্তেজনা যেন আপাতত অনুভব করলেন না।

গত তিন-চার মাসে প্রভাসকুমারের বয়েস যেন এক ধাপে দশ বছর এগিয়ে গেছে। এই তাঁর জন্মশহর। এই শহরে তাঁদের তিন পুরুষের বসবাস, সেই শহর যখন পত্তন হয়েছে সেই সময় থেকে।

এই শহরের সমস্ত বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, গাছপালা সব তাঁর সম্পূর্ণ চেনা। পাকিস্তান হওয়ার

পরে গত পঁচিশ বছরে শহরের চেহারা অনেকটা পালটিয়েছে। অনেক পুরনো পরিবার শহর ছেড়ে চলে গিয়েছে। পশ্চিম বাংলা, বিশেষ করে আসাম থেকে অনেক নতুন মুসলমান পরিবার উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে। গ্রাম থেকেও নতুন লোকেরা এসেছে। তবে তার মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু পরিবার, পঞ্চাশের দাঙ্গার পরে নিরাপত্তার খোঁজে শহরে এসে আস্তানা করেছে। এরা প্রায় সকলেই সাহা-বসাক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়।

গত আড়াই দশকে এদের প্রায় সকলের সঙ্গে পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হয়েছে প্রভাসকুমারের। এই শান্ত, নিস্তরঙ্গ মফঃস্বল শহরের প্রাচীন ব্যবহারজীবী পরিবারের শেষতম মানুষটিকে, নিরীহ নির্বিবাদী প্রভাসকুমারকে নতুন-পুরনো সবাই প্রায় মান্য করে। এই ক্ষুদ্র জনপদের বাজার-ঘাট, ইস্কুল, কলেজ, ক্লাব-লাইব্রেরি, মিউনিসিপ্যালিটির পত্তন ও উৎপত্তির মূলে প্রভাসকুমারের পরিবারের একটা ভূমিকা ছিলো—সেটা বুঝতে নতুন লোকেদের দেরি হতো না।

তাছাড়া বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাসকুমার উকিল হিসেবে তাঁর দক্ষতা ও বৃৎপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। এটা ছিলো তাঁর উত্তরাধিকার। তাঁর বাপ-ঠাকুর্দাও অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে এই শহরে বহুকাল ধরে ওকালতি করে গেছেন। তালুকদারি রক্তের সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষা এবং ব্রাহ্মণ্য কৌলিন্যবোধ তাঁদের তেজ ও প্রতিপত্তির উৎস ছিলো। প্রভাসকুমারের কিন্তু দাপট নেই।

সেদিক থেকে প্রভাসকুমার ব্যতিক্রম। তাঁর কোনো অহঙ্কার, অভিমান বা দাপট ছিলো না। বাপঠাকুরদার কাছে তিনি শিক্ষা ও বুদ্ধি পেয়েছিলেন, কিন্তু নরম মন পেয়েছিলেন ঠাকুমার কাছ থেকে। ঠাকুমা গায়ে একটা মশা বসে কামড়ালে পর্যন্ত সেটাকে মারতেন না, ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতেন।

ঠাকুমার নাম ছিল রণরঙ্গিনী দেবী। সেও এক পরিহাস। এমন নরম ফুলের মত কোমল মহিলার নাম কিনা রণরঙ্গিনী।

রণরঙ্গিনী অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হয়েছিলেন, বড় হয়েছিলেন মাতুলালয়ে। মৈত্রবংশীয় সেই মাতুলেরা ছিলেন অতিমাত্রায় শাক্ত, উত্তরবঙ্গের এক ডাকাতকালীর সেবায়েত।

রণরঙ্গিনীর মাতামহের গায়ের রং ছিলো রক্ত কষায়। যতটুকু লাল হলে রং ফর্সা হয় তার থেকে অনেক বেশি লাল। উচ্চতা অবশ্যই সাড়ে তিন হাত। সে আমলে সকলের উচ্চতাই ছিলো সাড়ে তিন হাত, যে যার হাতের সাড়ে তিন হাত।

কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। উচ্চতা অনুযায়ী প্রত্যেকের হাত আলাদা আলাদা রকম লম্বা। রণরঙ্গিনীর মাতামহ খড়গকুমার দীর্ঘদেহী মানুষ ছিলেন, তাঁর একেকটা হাত ছিল আট গিরে লম্বা।

আট গিরে মানে কুড়ি ইঞ্চি। একালের হিসেবে ঐ সাড়ে তিন হাত দাঁড়ায় সত্তর ইঞ্চি। প্রায় সাত ফুট।

এটা প্রায় অবিশ্বাস্য। কিন্তু খড়গকুমার অতিশয় দীর্ঘদেহী ছিলেন সেটা মেনে নেয়া যায়।

সে যা হোক রণরঙ্গিনী দেবীর স্বভাবে মাতুলালয়ের শৌর্য, বীর্য বা শ্বশুরালয়ের দাপুটে ভাব

কিছুই ছিলো না। আত্মীয় স্বজন, চেনা শোনা সকলের জন্যে অহেতুক দুশ্চিন্তা করে তিনি সব সময়ে উদ্বেগাকুল হয়ে থাকতেন। কেউ বাড়ি ফিরতে দেরি করলে, কেউ চোখের আড়াল হলে, কারো অসুখ-বিসুখ হলে রণরঙ্গিনী ভাবনাচিন্তায় অস্থির হয়ে পড়তেন।

ঠিক এই উদ্বেগী স্বভাবটা প্রভাসকুমারের নেই। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পিতামহীর চরিত্রের অন্য একটা দিক পেয়েছেন, সেটা মায়ামমতার দিক। বাড়ির গরু-বাছুর, কুকুর বিড়াল থেকে কাজের লোক ঝি চাকর রণরঙ্গিনী সকলকে ভাল রাখার চেষ্টা করতেন। চেনা অচেনা কারো সঙ্গেই কখনো এমন কোনো ব্যবহার করতেন না যাতে সে মনে আঘাত পায়, সামান্যতম দুঃখিত হয়।

তাঁর স্বভাবের এই দুর্বলতার সুযোগে অনেকে অনেক সময় রণরঙ্গিনী দেবীকে ঠকিয়েছে।

পিতামহীর ভাল মানুষীর অনেক গল্প ছোটবেলায় প্রভাসকুমার বাড়িতে শুনেছেন।

একবার নাকি বাড়িতে জানালার গরাদ খুলে চোর ঢুকেছিলো। সে বহুদিন আগেকার কথা। এই পুরনো হয়ে যাওয়া ঝুরঝুরে দালানটা তখনো তৈরি হয়নি। বাইরের বড় কাঠের কাছারি ঘরটাই ছিলো তখন প্রধান শোয়ার ঘর। কাঠের দোতলা ঘরের নিচে উপরে অনেকগুলো কুঠরিতে অনেক লোক শুতো, একে একান্নবর্তী প্রাচীন পরিবার, তাছাড়া আসেজন-বসেজন রয়েছে।

এই রকম বড় কাঠের ঘরই রেয়াজ ছিলো তখন অবস্থাপন্ন সংসারে। জল ঘেরা মধ্য বাংলায় তখন দালান-কোঠার চল হয়নি। করোগেটেড টিন চালু হলে টিনের ঘর খুব জনপ্রিয় হয়েছিলো এই বৃষ্টিজলের দেশে। কিন্তু দালানবাড়ি, ইঁট-পাথুরে চুনের, কাঠের কড়ি বরগার ইমারত সে শুধু রাজা জমিদার, মন্দির-মসজিদের জন্যে। পুরো মহকুমার দালান, ইমারত সবশুদ্ধ সম্ভবত পঁচিশটিও ছিলো না।

কাঠের দোতলা ঘরে কাঠের জানলার গরাদ সরিয়ে, ভেঙে বা কেটে চোর ঢুকেছিলো এক শেষ রাতে। খুব দুঃসাহসী চোর নিশ্চয়, কিংবা তার খুব টানাটানি চলছিলো। না হলে, এত লোকের একটা ঘরে খুব বোকা, শিক্ষানবিশি চোরেও ঢুকবে না।

প্রভাসকুমারের বাবার এক বায়ুরোগগ্রস্ত পিসেমশাই জগন্নাথ ভট্টাচার্য তখন ঐ বাড়িতেই থাকতেন। তাঁর সারারাত ঘুম হতো না কোনো এক কল্পিত অসুখের ভয়ে। জগন্নাথবাবু রাত ভোর বিছানায় হাঁটু মুড়ে বসে দুহাত দিয়ে কপালের রগ টিপে ধরে ঝিমোতেন। আর মাঝে মধ্যে দরজা খুলে বাইরে বেরোতেন হুঁকো খাওয়ার জন্যে। সেই সময়ে সেই গভীর রাতে রাস্তা দিয়ে কেউ গেলে কিংবা পুকুরঘাটে কেউ নামলে তার সঙ্গে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গল্পগুজব করার চেষ্টা করতেন।

এ রকম লোক বাড়িতে থাকলে সাধারণত, সে বাড়িতে চোর আসে না। এ লোকটা নতুন চোর ছিলো বোধহয় কিংবা বাইরের এলাকার মানুষ। কিছু না বুঝেই, খোঁজখবর না করেই চুরি করতে এসেছিলো।

ভট্টাচার্যমশায় যখন সামনের দরজা খুলে হুঁকো হাতে বেরোতে যাচ্ছেন ঠিক সেই সময়েই দরজার পাশের জানলার কাঠের গরাদ প্রায় নিঃশব্দে সরিয়ে সুড়ুৎ করে সে ঘরে ঢোকে। ভট্টাচার্যমশায় প্রথমে ব্যাপারটা ঠাহর করে উঠতে পারেননি কিন্তু তার আগেই চোর তাঁকে দেখতে পেয়েছে এবং খোলা দরজা পেয়ে দৌড়ে পালিয়েছে।

ভট্টাচার্যমশায়ও সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠেছেন, 'চোর, চোর।' সেই চিৎকারে ঘরশুদ্ধ লোক জেগে উঠে সবাই মিলে তারস্বরে চেঁচাতে থাকে, 'চোর, চোর।' চেঁচাননি শুধু প্রভাসকুমারর

পিতামহী রণরঙ্গিনী। চিৎকার চেঁচামেচি থেমে যাওয়ার পরে যখন সামনের দরজাটা আর সদ্য গরাদ খোলা জানলাটা শক্ত করে বন্ধ করে সবাই আবার শুয়ে পড়েছে, তখন রণরঙ্গিনী দেবীর আন্তরিক অনুযোগ শোনা গেল, 'তোমরা যে সবাই মিলে অমন চোর-চোর করে চেঁচালি, ওই লোকটা এতে মনে কষ্ট পেলো না।'

পিতামহীর মত ঠিক এতটা অস্বাভাবিক কিংবা বাস্তববোধহীন প্রভাসকুমার নিশ্চয় নন। কিন্তু তাঁর এক ধরনের সারল্য ও সততা আছে যেটা তাঁর সামনে এলেই, তাঁর সঙ্গে কথা বললেই সবাই টের পায়।

আজ হারুকে মিলিটারির জিপে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ বালিশ আঁকড়িয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকলেন প্রভাসকুমার, নিতান্ত অসহায়ের মতো।

তারপর ধীরে ধীরে বিছানায় উঠে বসে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে থেকে পাশের ঘরে গিয়ে আনলা থেকে কাছারির পোষাক তুলে নিলেন।

অনেকদিন আদালতে যাননি, এই বর্ষাকালে জামাকাপড় স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে আছে। সেই কোটপ্যান্টই পরে নিলেন প্রভাসকুমার, দেয়ালের হুক থেকে বহুকালের পুরনো কালো সিল্কের শামলা কাঁধে ফেলে বারান্দায় জুতোর র‍্যাকের সামনে জলচৌকিতে বসলেন।

বারান্দায় সিঁড়ির ধার ঘেঁষে গালে হাত দিয়ে চোখ বুজে বসেছিলেন স্মৃতিকণা। শব্দ হতে চোখ খুলে দেখেন কাছারির পোষাক পরে স্বামী জুতো পায়ে দিচ্ছেন।

স্মৃতিকণা উঠে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওকি, তুমি কোথায় যাচ্ছো?'

প্রভাসকুমার বললেন, 'আমি একবার মিলিটারি ব্যারাকে মেজর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাবো।'

স্মৃতিকণা বললেন, 'কেন?'

প্রভাসকুমার বললেন, 'হারুর খোঁজ নেয়ার জন্যে।'

স্মৃতিকণা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হারুর খোঁজ তুমি আনতে পারবে? হারুকে ছাড়িয়ে আনতে পারবে?'

প্রভাসকুমার ইতস্তত করতে লাগলেন।

স্মৃতিকণা বললেন, 'মিলিটারিরা তোমাকে মান্য করবে? তোমার কথা বুঝতে পারবে?' তারপর একটু থেমে বললেন, 'তুমি গেলে হারুর বিপদ আরো বেশি হতে পারে। মিলিটারি ছাউনির মধ্যে পেলে তোমাকেও ছেড়ে দেবে না।'

স্মৃতিকণার কথাগুলোর মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি ছিলো।

তাছাড়া সে ছিলো ঘোর অরাজকতার দিন। অসহায়তার, কাপুরুষতার কাল।

প্রভাসকুমার অতি সহজেই নিরস্ত হলেন। কোটপ্যান্ট-পরা অবস্থাতেই আবার বিছানায় গিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে পড়লেন।

এদিকে আবার বারান্দায় সিঁড়ির পাশে আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে স্মৃতিকণা মনের মধ্যে কিসের একটা দংশন অনুভব করতে লাগলেন, ভাবতে লাগলেন, আমি কি কোনো অন্যায় করলাম।

রাত তখন কত হবে?

নিশ্চয় মধ্যরাত পেরিয়ে যায়নি। সৌদামিনী কিছুই মনে করতে পারে না।

হারুর মা হয়তো অনুমানে বলতে পারতো, কিন্তু সেও অনেককাল বেঁচে নেই।

একটু আগে পুকুরপারে শেয়ালের ডাক শেষ হয়ে গেছে। আজ বর্ষার আকাশে মেঘ নেই, বৃষ্টিও নেই। বাতাসে কোনো গোলমাল নেই, শান্তভাবে বইছে।

কয়েকদিন আগে আষাঢ় পূর্ণিমা গেচে, এখনো চাঁদের আকাব প্রায় গোল, ঔজ্জ্বল্য অনেক বেশি। সুপুরি গাছের সারির মধ্যে দিয়ে ঝলমলে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে উঠোনে।

হারু এখনো ফেরেনি।

মাটির দাওয়ায় দু প্রান্তে খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে ক্লান্ত, ক্ষুধাত, তন্দ্রাতুর দুই রমণী। হারুর মা ও হারুর স্ত্রী, সৌদামিনী।

এমন সময় শ্বাপদের মতো নিঃশব্দে বাগানের পাশ দিয়ে রজব আলি উঠোনে এলো। হারুর মার দিকে না তাকিয়ে সোজা দাওয়ায় উঠে সৌদামিনীকে হাত ধরে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বিছানায় তুললো।

হারুব মা নিঃশব্দে ভুতগ্রস্তেব মতো দাওযায বসে। তাব কিছু কবাব নেই।

ঘরের দরজা হাট কবে খোলা। জ্যোৎস্নার আলো বিছানা পর্যন্ত ছুঁযেছে। স্পষ্ট অস্পষ্ট সব দেখা যাচ্ছে। নিথর, নিস্পন্দ সৌদামিনী কোনো ছটফট করলো না। টুঁ শব্দটি কবলো না।

হারুর মা কি ভেবেছিলো, ওর পরে নিশ্চয় হারু ফিবে আসবে। সৌদামিনীও কি তাই ভেবেছিলো ?

এসব কথা এত কাল পরে সৌদামিনীর আর মনে নেই। বিশ বাইশ বছবের কথা। একটা অস্ফুট হাহাকারের শব্দ মনের অতলে কখনো কখনো সৌদামিনীকে আন্দোলিত করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে সামলিয়ে নেয়, সে পুবনো কিছুই মনে রাখতে চায় না।

কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো সব কিছু ভোলা যায না। হাককে সৌদামিনী ভুলতে পারে নি। নব যুবতীব প্রিয় সমাগমেব স্মৃতি অবলুপ্ত হবার নয। তবু সত্যি কথাটা এই হারুকে আর পরিষ্কার মনে পড়েনা, কেমন আবছা আবছা মনে পড়ে।

বলা বাহুল্য হারু আব ফিরে আসে নি। হারুক কি হয়েছিলো সেটাও ভালো করে জানা যায নি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ রকম অবস্থায যা পরিণতি হয়েছিলো হাকর ক্ষেত্রেও সম্ভবত তার ব্যতিক্রম হয নি।

এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাসকুমার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, না এখানে আর থাকা যাবে না। সেই সাতচল্লিশ সাল থেকে চেনাশোনা, আত্মীয় পরিচিত কতজনই তো দেশ ছেড়ে, জন্মভিটে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু প্রভাসকুমার রয়ে গেছেন। তা সবটাই যে মাটির টানে, সাতপুরুষের ভিটের মায়ায়, তা হয়তো নয়।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব বোধ সেই সঙ্গে নতুন করে ঘর গৃহস্থালী সংসার বানানো। নতুন করে জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিয়েছিলো। স্বভাবকুনো প্রভাসকুমার দেশভাগের পর কলকাতায় দুচারবার গিয়ে ঘুরে এসেছেন, মাঝে মধ্যে মনস্থিরও করেছেন।

আর নয়, আর থাকা যাবে না। এবার এদিকে চলে আসবো। কিন্তু সেই পর্যন্তই, উদ্বাস্তু হওয়া আর হয়ে ওঠে নি। প্রভাসকুমারের একটা সুবিধে ছিলো, তাদের কোনো মেয়ে ছিলো না, তা হলে হযতো দেশে থাকতে পারতেন না আর তাছাড়া স্মৃতিকণারও দেশ ছাড়ায় খুব একটা সায় ছিলো না। ভালোয়-মন্দয় কেটে যাচ্ছিল দিন। শুধু ছেলেরা কাছে নেই বলে স্মৃতিকণার পক্ষে একেক সময় খুব খালি খালি লাগতো।

প্রভাসকুমারের দুই ছেলে ইপিন আর বিপিন এখানকার স্কুলের পড়া শেষ করে কলকাতায় কলেজে পড়তে চলে গেলো। প্রভাসকুমারও একদা তাই করেছিলেন। প্রভাসকুমারের পিতা-পিতামহও একদা তাই করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা লেখাপড়ার শেষে আইন পাশ করে এখানেই ফিরে এসে পারিবারিক সেবেস্তায় বসেছেন, স্থানীয় আদালতে ওকালতি করেছেন।

ছেলেরা তা করেনি, লেখাপড়া শেষ করে দেশে ফিরে আসেনি। আসার কথাও নয়। তারা আইনের ব্যবসাতেও যায় নি। দুজনেই চাকরি যোগাড় করেছে, একজন ব্যাঙ্কে। একজনের সরকারি কাজ।

দুজনে আলাদা আলাদা বাসায় থাকে। একজন দক্ষিণ কলকাতায়, অন্যজন শ্রীরামপুবে। বিপিন শ্রীরামপুরেই একটা বড় ব্যাঙ্কেব শাখা অফিসে আছে। ইপিন একটা কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসে কলকাতাতেই।

ইপিন বড় ছেলে, তার বিয়ে প্রভাসকুমার সম্বন্ধ করেই দিয়েছিলেন, পালটি ঘরে। সে বিয়েতে কলকাতায় গিয়ে বেশ ধুমধাম করা হয়েছিলো। যাদবপুরে, দমদমে, রানাঘাটে পুরনো বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন যারা দেশভাগের পর ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো তাদের সকলের ঠিকানা যোগাড় কবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। অনেকেই এসেছিলো। এদের মধ্যে অনেক আপনজনের সঙ্গে পনেবো-বিশ বছর পরে দেখা হয়েছিল।

বিপিনের বেলায় কিন্তু তেমন হয়ে ওঠে নি। বিপিন নিজে থেকে বিয়ে করেছিলো। ভালোবাসার বিয়ে।

বিপিনের কোনো ছেলে হয় নি' এক মেয়ে।

ইপিনের দুই ছেলে। যমজ। এ বাড়িতে তিন চার পুরুষ পরপর যমজ হওয়ার রীতি আছে। প্রভাসকুমারের বাবার দুই কাকা ছিলেন যমজ।

অবশ্য ছোটবেলায় ইপিন বিপিনকেও সবাই যমজ বলত। দুই পিঠোপিঠি ভাই প্রায় একই রকম দেখতে। বাইবের লোকেরা, কাছারিঘবের লোকেরা মোটেই বুঝে উঠতে পারতো না, কে ছোট, কে বড়। দু ভাই একই ক্লাসে পড়তো, একই বছরে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলো।

কিন্তু ছোটবেলা থেকেই ইপিন আব বিপিনের মধ্যে খুব রেষারেষি ছিলো। মাঝে মধ্যেই ঝগড়াঝাঁটি, মাবপিট হতো।

প্রভাসকুমাবেব মনে আছে স্মৃতিকণার টান ছিলো বড় ছেলে ইপিনের প্রতি। কিন্তু একটু খেয়ালি, খোলামেলা বিপিনকে বেশি স্নেহ করতেন প্রভাসকুমার।

কলকাতার কলেজে পড়তে গিয়ে ইপিন প্রভাসকুমারের পিসির বাড়িতে থেকে বিজ্ঞান নিয়ে ভর্তি হলো, তখনকার আই, এস, সি তে।

বিপিন কারো বাড়িতে থাকলো না। বৌবাজার এলাকায় ময়মনসিংহ জেলার লোকেদের একটা পুরানো মেস ছিলো। এককালে নাকি যাদুকুর পি. সি. সরকারও সেই মেসে থেকেছেন। সেই মেসে থেকে বিপিন আই. কম অর্থাৎ বাণিজ্য নিয়ে পড়তে লাগলো।

তখন দুই দেশের মধ্যে সদ্য পাশপোর্ট ভিসা চালু হয়েছে। পুজোব আর গরমের ছুটির সময়,

বছরে দুবার দুভাই বাড়িতে আসতো। তখনো ভাঙা দেশের এপারে ওপারে যাতায়াত, যোগাযোগ ছিলো। পুরনো লোকজনও শহরে অনেকেই ছিলো।

ধীরে ধীরে কেমন সব বদলিয়ে গেলো। আগে যমুনার ওপারে সিরাজগঞ্জ ঘাট রেলস্টেশনে কলকাতা থেকে আসার পথে নেমে স্টিমার নিতে হতো। তারপর চারাবাড়ি ঘাটে নেমে ঘোড়ার গাড়িতে বাসা পর্যন্ত।

তখনো রিক্সা পর্যন্ত হয় নি। ঘোড়ার গাড়িতেই যাতায়াত করতে হতো।

যাত্রীর অভাবে ধীরে ধীরে একদিন স্টিমার বন্ধ হয়ে গেল। ঝলমলে, কলরবমুখরিত স্টিমার স্টেশনগুলো প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেলো। স্টিমারের জায়গায় এলো লঞ্চ, তারপরে গয়নার নৌকো।

গরমের ছুটির পরে বাড়ি থেকে ফেরার সময় এবং পুজোর ছুটিতে বাড়ি আসার সময় দু সময়তেই ধলেশ্বরী, যমুনা উতলা, প্রমত্তা। তাছাড়া ঘূর্ণিবাত্যার ভয়ও এই নদী অঞ্চলে চৈত্র থেকে কার্তিক পর্যন্ত থেকেই যায়।

একবার গরমের ছুটির শেষে কলকাতায় ফিরবার পথে নদী পার হওয়ার মুখে ভীষণ ঝড়ের মধ্যে পড়েছিলো। ইপিন-বিপিন দুভাই।

সিরাজগঞ্জ চারাবাড়ির মধ্যে স্টিমার চলাচল বহুদিন বন্ধ। টিমটিম করে দুবেলা দুটো লঞ্চ চলছিলো সেও কিসের একটা ধর্মঘটে না দু দলের মারামারিতে তখন চলছে না।

গয়নার নৌকাতেই ইপিন-বিপিন সকাল সকাল টাঙ্গাইল বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলো। স্নান খাওয়া করে। স্টিমারে গেলে এর চেয়ে পরে বেরোলেও হয়। নৌকোয় নদী পেরোতে অনেক বেশি সময় লাগে।

অবশ্য গয়নার নৌকোর একটা সুবিধে আছে যে সেটা টাঙ্গাইল শহরের মধ্যেই খালের শেষ মাথায় মানদায়িনী সিনেমা হলের পাশে অনাথ দাসের ঘাট থেকে ছাড়ে। তার জন্য ঘোড়ার গাড়ি করে চারাবাড়ি ঘাটে যমুনা নদীর কিনারায় যেতে হয় না। গয়নার নৌকো খালে থাকতে পারে, কিন্তু স্টিমার বা লঞ্চ শহরের মধ্যে খালে থাকতে পারে না। লঞ্চ অবশ্য খালের মুখে লৌহজং নদীর ঘাটে এসে লাগতে পারে কিন্তু সেও ভরা বর্ষার সময়।

সেদিন সকাল বেলা, আষাঢ় মাসের দিন যেমন হয় যেন মেঘলা ছিলো। মাঝে মাঝেই পূব দিক থেকে জোর হাওয়া দিচ্ছিলো, তবে বৃষ্টির জোর ছিলো না। অল্প সল্প ঝিরঝিরে বৃষ্টি।

টাঙ্গাইল কালীবাড়িতে প্রণাম করে, কপালে দইয়ের ফোঁটা মঙ্গল চিহ্ন নিয়ে ইপিন-বিপিন যখন নৌকোয় উঠলো তখনো কোনো বড় ঝড়বাদলের আভাস পাওয়া যায় নি।

সে সময় বড় ডাইরেকটরি পঞ্জিকা খুলে যাত্রা শুভ, নিতান্ত যাত্রা মাধ্যম দেখে মঘা, অশ্লেষা, ত্র্যহস্পর্শ বাঁচিয়ে কলকাতা আসার দিনক্ষণ ঠিক হতো।

ফলে ভালো তিথি নক্ষত্রে যাত্রীর সংখ্যা কিছু বেশিই হতো। এর অধিকাংশ অবশ্য কলেজ পড়ুয়া কলকাতাগামী ছাত্রছাত্রী।

নৌকার ঘাট পর্যন্ত প্রায় সকলেরই বাড়ির লোক এসেছিল। স্মৃতিকণা ও প্রভাসকুমার ছাড়া তখন বাড়িতে এক দঙ্গল লোক আত্মীয় স্বজন, আশ্রিত-অনুগৃহীত। বেশ বড় একটা দঙ্গল নৌকার ঘাটে বিদায় জানাতে এসেছিল।

এবং সে বিদায় প্রায় শেষ বিদায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঐ নৌকার যাত্রীদের, সেই সঙ্গে ইপিন-বিপিনের পক্ষে।

বেলা সাড়ে তিনটে, চারটে নাগাদ পোড়াবাড়ি স্টেশন ছাড়িয়ে একটা ছোট গঞ্জ যার নাম

পটল, সেখানে গয়নার নৌকো পৌঁছালো, তখন আকাশের মুখ তেমন ভার নয়। এমনকি একটু হালকা বর্ষার বিকেলের কালচে রোদ ঝিলিক দিচ্ছে নদীর জলে। গাংশালিকেরা দল বেঁধে কোনাকুনি উড়ে যাচ্ছে সামনের একটা গ্রামের দিকে।

এখান থেকে প্রায় সরাসরি নদীটি পার হতে হয়। যদিও নদী এখানে ভীষণ চওড়া এপার-ওপার দেখা যায় না, অভিজ্ঞ মাঝিরা এই জায়গাটাই বেছে নেয় নদী পাড়ি দিয়ে সিরাজগঞ্জে পৌঁছানোর জন্য। যমুনা-ধলেশ্বরীর এই সঙ্গমটায় চোরা স্রোত কম, ঘূর্ণি নেই, যদিও নদী খুব গভীর এবং বড় বড় ঢেউ ওঠে সামান্য বাতাসেই, তবে পাকা মাঝি ঘুর্ণি ও চোরাস্রোতকে ডরায়, গভীর জল বা ঢেউ নিয়ে সে মাথা ঘামায় না, সেটুকু অতিক্রম করাই তার জীবিকা।

পালে বাতাস না থাকলে শুধু দাঁড় বেয়ে বৈঠা ঠেলে ওপারে সিরাজগঞ্জ ঘাটে পৌঁছাতে অন্তত দু-আড়াই ঘণ্টা লাগে।

পটল থেকে নৌকো ছেড়ে যখন প্রায় ঘণ্টাখানেকের পথ গেছে, বিপদের সঙ্কেত পাওয়া গেলো। ভালোই হাওয়া ছিলো পটলঘাটে। নৌকোয় পাল টাঙানো হলো। পাল নয় বাদাম, ধলেশ্বরী অববাহিকায় নৌকোর পালের নাম বাদাম।

সেই বাদামের টানে তরতর করে নৌকো এগিয়ে যাচ্ছিলো অন্য পারের দিকে। হঠাৎ মাঝ নদীর একটু সামনে এসে হাওয়া একদম থেমে গেলো। বাদাম অকেজো হয়ে পড়লো। জলের স্রোতও কেমন নিস্তরঙ্গ।

বুড়ো মাঝি সোলেমান কৈবর্ত গামছা দিয়ে মুখ চোখ ঢেকে ছইয়ের উপরে কাত হয়ে শুয়ে ঘুমাচ্ছিলো। বাদামের দড়িখোলার শব্দ শুনে চোখ কচলিয়ে উঠে বসলো। তারপর নৌকোর মাল্লাদের বললো, 'তাড়াতাড়ি বৈঠা চালা।' এই বলে আকাশের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগলো।

সোলেমান কৈবর্ত বহুকাল আগে ভাগলপুর থেকে মানোয়ারি নৌকায় এসে এ অঞ্চলে বিয়ে করে বাসা বেঁধে পাকাপাকি থেকে গেছে। সে অর্ধেক বিহারী, অর্ধেক বাঙালী। পুবনো বাংলা-বিহার সীমানার রাজমহল অঞ্চলের কৈবর্ত খ্রীষ্টান। তবে মাছ ধরা নয়, পুরুষানুক্রমে নৌকা চালানোই পেশা।

যমুনা-ধলেশ্বরীর জল ও আকাশের মতিগতি সোলেমান কৈবর্তের নখদর্পনে ছায়া ফেলে। সে ঠিকই অনুমান করেছিল যে আকাশ অন্ধকার করে একটা বিশাল ঝোড়ো মেঘ দ্রুত দিগন্ত থেকে এগিয়ে আসছে।

সেই তুফানের বিশদ-বৃত্তান্তে গিয়ে কাজ নেই, তখনকার সব খবরের কাগজে তার ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ তার ধ্বংসলীলার কাহিনী দিনের পর দিন বেরিয়েছে।

ইপিন-বিপিন সেদিন রক্ষা পেয়েছিলো। সেই নৌকোর কেউই মারা পড়েনি। তবে সেদিন নয়, তার পরের দিনও নয়, পরের পরের দিন সিরাজগঞ্জ বাজার স্টেশন থেকে ইপিন-বিপিন পায়ে হেঁটে গিয়ে কলকাতাব ট্রেনে ওঠে। সিরাজগঞ্জ ঘাট স্টেশন পর্যন্ত রেল লাইন ঝড়ে দুমড়িয়ে উড়ে গিয়েছিলো। পরের স্টেশন, শহরের গায়ে ঐ সিরাজগঞ্জ বাজার।

এদিকে টাঙ্গাইল বাড়িতে হাহাকার পড়ে গিয়েছিলো। ঝড় টাঙ্গাইলেও হয়েছিলো, অতটা জোর তুফান নয়। তবে ওপারের দিকে যে বিরাট মহাপ্রলয় হয়েছে তার টুকরো টুকরো খবর, নৌকো ডুবি, গ্রামের পর গ্রাম ঝড়ে উড়ে গেছে, সিরাজগঞ্জ ঘাট স্টেশন বন্ধ হয়ে গেছে—লোকমুখে ক্রমাগতই সংবাদ আসছিলো।

কালীবাড়িতে সন্দেশ মানত করা হলো। কারো যেন কোন অমঙ্গল না হয়। ইপিন-বিপিন যেন মঙ্গলমত কলকাতায় পৌঁছে যায়।

দুশ্চিন্তা অনেকটা কাটলো যখন সোলেমান কৈর্বত এসে খবর দিলো যে দাদাবাবুদের নিরাপদে চড়ায় পৌঁছে দিয়ে এসেছে। যদিও জায়গাটা সিরাজগঞ্জ ঘাট নয়। এর কয়েকমাইল এদিকে।

দুদিন পরে অবশ্য কলকাতা থেকে তার এলো ইপিনের,

ARRIVED SAFELY. LETTER FOLLOWS.

ইপিন-বিপিন প্রত্যেকবারই কলকাতা পৌঁছে এ রকম টেলিগ্রাম করে পৌঁছান সংবাদ জানায়। সঙ্গে একটা চিঠিও দেয়, যেটা দু চারদিন পরে আসে।

বিপিন এসব দায়িত্ব পালন করে না। এ গুলো ইপিনই করে। বিপিন স্টেশনে নেমে সোজা তার মেসে চলে যায়। পিসির বাড়িতে এসে ইপিনই টেলিগ্রাম করে মোড়ের ডাকঘরে গিয়ে, তারপরে চিঠি দেয়।

এবারের চিঠির খবর কিন্তু একটু অন্যরকম। ইপিন একাই কলকাতায় এসেছে।

বিপিন আসেনি।

যখন সিরাজগঞ্জ থেকে ঈশ্বরদির দিকে ট্রেনে আসছিলো, তখন দু পাশ ঝড়ে বিধ্বস্ত গ্রাম, মৃতদেহ, কান্নাকাটি আর্তচীৎকার। মাটির সঙ্গে লেপটে আছে বাঁশবন, মুখ থুবড়িয়ে পড়ে আছে বনস্পতি, মরা গরুবাছুব, কুকুর-শেয়াল—সতেরো বছরের বিপিন, আঠারো বছরের ইপিন এরা দুজনে এমন দৃশ্যের কখনো এর আগে মুখোমুখি হয নি।

ঈশ্বরদি জংশন স্টেশন। সেখানে ট্রেন বদলাতে হবে। প্ল্যাটফর্মে একটা রেড ক্রশের দল, তারা যাচ্ছে সিরাজগঞ্জের দিকে, ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে। বিপিন তাদের সঙ্গে ভিড়ে গেলো, দাদাকে বললো 'আমি এখন কয়েকদিন এদিকে আছি, সাতদিন পরে কলকাতা যাবো।'

ইপিনের চিঠিতে প্রভাসকুমার খামখেয়ালী বিপিনের এই সংবাদ পেয়ে খুব চিন্তায় পড়লেন। তখন ঘোর পাকিস্তানি আমল। বিপিনের আবার ভারতীয় পাসপোর্ট।

একটু আগে কাছারিঘরটা খালি হয়ে গেছে। জুনিয়ার উকিলেরা নটা-দশটার মধ্যেই যে যার বাড়ি চলে যায় স্নান খাওয়া করে আদালতেব জন্য প্রস্তুত হতে। কিছুক্ষণ পরে মক্কেল ও তাদের সঙ্গী, সাক্ষী ও টাউট ইত্যাদিরা আদালতের দিকে যায়। তারা আদালতেব পাশে কোনো হোটেলে খেয়ে নেবে।

এই উনিশশো তিরানব্বুইতে, বাংলা তেরোশো সালের শেষে এই পঞ্চদশ বঙ্গাব্দের বাংলাদেশে অনেক কালাচার লোকাচার নিশ্চিহ্ন হযেছে কিন্তু হিন্দু হোটেল, মুসলমান হোটেল এখনো টুকটাক রয়ে গেছে। তবে সেই ছুংমার্গ আর নেই। এককালে বাঘে গরুতে হয়তো এক ঘাটে জল খেতো কিন্তু হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে বসে ভাত খেতো না।

এখন এ জাতীয় বাচবিচার একেবারে নেই। তবু ইতিহাসের হীন পরিহাসের মত স্টেশনে বাজারে বা কাছারির আশে পাশে হিন্দু হোটেল, মুসলমান হোটেল পাশাপাশি আলাদা রয়েছে।

গ্রাম থেকে যারা মামলা করতে আসে তারা আদলতের কাজের ফাঁকে এই সব হোটেলে খেয়ে নেয়। তবে সব হিন্দুই যে হিন্দু হোটেলে খায় তা নয় যার একটু ঝাল পেঁয়াজ পছন্দ

সে মুসলমান হোটেলেও খায় মুখ বদলানোর জন্যে। আবার নিরামিষ খাবারের জন্য মুসলমানেরাও হিন্দু দোকানে পাত পাতে। তখন আর কারো জাতধর্ম এতে যায় না, কেউ কিছু মনেও করেনা। মুসলমান খদ্দের খেয়ে যাওয়ার পরে জায়গাটা শুদ্ধ করার জন্য এখন আর সেখানে হিন্দু দাসী গোবর জল ছেটায় না।

তা ছাড়া চেনাজানা না থাকলে কে যে হিন্দু আর কে যে মুসলমান কথাবার্তা চালচলন দেখে বোঝা যায় না। রাস্তা ঘাটে লুঙ্গি সবাই পরছে, পাজামা, প্যান্ট, শার্ট, পাঞ্জাবি। ধুতি কদাচিৎ দেখা যায়, তখন বোঝা যায় লোকটা হিন্দু।

তবে সবাই তো হোটেলে খায় তা নয়। গ্রাম থেকে যারা আসে তারা অনেকেই সাবেক প্রথায় গামছায় চিড়ে, গুড় বেঁধে নিয়ে আসে। কেউ কেউ নিয়ে আসে লাল আলুর রাঙা গোল গোল পিঠে। গোটা দশেক খেলেই পেট ভরে যায়। শহরে হালকাভোজী লোক চারটের বেশি খেতে পারবে না।

কাছারিঘরের দেয়াল ঘড়িটায় এগারোটা বাজলো।

এ ঘড়িটা নতুন। আগে একটা পুরানো গ্র্যাণ্ড ফাদার ক্লক ছিলো জার্মান মডেলের, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের ঘড়ি সেটা, প্রভাসকুমারের বাবার আমলের। ঘড়িটা কলকাতা থেকে কিনে এনে উপহার দিয়েছিলেন হেমনগরের ছোট তরফের সুশীতলবাবু।

কি একটা পারিবারিক মামলা চলছিলো সুশীতলবাবুর তাঁর সঙ্গে তাঁর ভ্রাতৃবধূর স্ত্রীধন নিয়ে। খুব জটিল বিষয় শুধু হিন্দু আইনের ব্যাপার নয়, হিন্দু সংসার, জীবনযাত্রার নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন ওঠে এসব মামলায়। ভরণপোষণের, সামাজিক দায়দায়িত্বের প্রশ্ন।

প্রভাসকুমারের বাবা সুশীতলবাবুর পক্ষে উকিল ছিলেন। নিচু আদালতে তিনি যে সমস্ত যুক্তি পেশ করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত জেলা আদালত, সর্বোচ্চ আদালতে সে গুলো টিঁকে যায়। বিলেতে প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত মামলাটা গড়ায়, জমিদারির রেষারেষির মামলা সে কালে এ রকম হতো।

প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় লর্ডেরা খুব মনোযোগ দিয়ে নিম্নতম আদালতের ব্যবহারজীবীর বিশ্লেষণ খুঁটিয়ে দেখেছিলেন, ব্যবহারজীবীর সূক্ষ্ম নীতিবোধের প্রশংসা করেছিলেন এবং বলাবাহুল্য মামলার রায় সুশীতলবাবুর পক্ষে যায়।

মামলায় জিতে সুশীতলবাবু নিজে কলকাতার কুক এবং কেলভের ঘড়ির দোকান থেকে এই দেয়াল ঘড়িটা কিনে এনে উপহার দিয়েছিলেন। নিজের হাতে কাছারি ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। ডায়ালে ছিলো রোমান হরফ, ঋজু তীক্ষ্ণ কালো রেখা, আর ঘড়িটা বাজতো গির্জার ঘড়ির মতো গম্ভীর ডং ডং শব্দে। সেই শব্দের মধ্যে একটা আভিজাত্য ছিলো।

উনিশশো একাত্তর সালে জুলাইয়ের শেষ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত যখন প্রভাসকুমার বাড়ি ফাঁকা ফেলে পালিয়ে কলকাতায় ছেলেদের কাছে চলে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে অন্যান্য বহু জিনিষপত্র, খাট, আলমারি, বাসনকোসণ সমেত এই ঘড়িটাও লুট হয়ে যায়।

ফিরে আসার পর অবশ্য অনেক কিছুই শেষ পর্যন্ত ফিরে পান কিন্তু ঘড়িটা আর পাননি প্রভাসকুমার।

এখনকার দেয়াল ঘড়িটা নতুন। ঘণ্টায় আধঘণ্টায় বাজে বটে কিন্তু পেণ্ডুলাম নেই। ঘড়িটা জাপানি। ওকালতির পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে ঘড়িটা বার-লাইব্রেরি থেকে উপহার দিয়েছে।

প্রভাসকুমারের ব্যবহারজীবী জীবনের ষাট বছর আর কয়েকমাস পরেই পূর্ণ হবে। আজকের

কথা নাকি, সেই তেত্রিশ সালে ফাইন্যাল পাশ করে শিক্ষানবিশির পর কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সনদ পেয়েছিলেন। কয়েকদিন আগে আদালতে বার লাইব্রেরিতে কয়েকজন জুনিয়র উকিল এসে বললো, 'কাকাবাবু, সামনের মাসে আপনার, হীরক জয়ন্তী করবো আমরা।'

প্রভাসকুমার তাদের বলেছিলেন, 'আমার বয়েসের হীরকজয়ন্তীর বছর চলে গেছে আট বছর আগে আর আমার প্র্যাকটিসের হীরকজয়ন্তীর এখনো পনেরো বছর বাকি আছে। যদি ততদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তখন দেখা যাবে।'

প্রভাসকুমার যাদের জুনিয়ার উকিল ভাবেন তাদের বয়েসও পঞ্চাশ যাটের কম নয় তাদের অনেকই পৌত্র বা দৌহিত্রের মুখ দেখেছে। তবে প্রভাসকুমারের দুই ছেলে সেদিনের নাবালক ইপিন বিপিনের বয়েসইতো পঞ্চাশ যাট হয়ে গেলো। এ সব বয়েসকে তিনি এখন আর বয়েস বলে গণ্য করেন না।

প্রভাসকুমার মনে মনে হিসেব করেন বাংলাদেশ স্বাধীনতার সময় উনিশশো একাত্তরে তাঁর বয়েস ষাট পার হয়ে গেছে, সেই সময় কলকাতায় ছেলেদের বাড়িব বন্দী জীবন থেকে নবযুবকের মত স্বাধীন দেশে ছুটে এসেছিলেন।

সেদিন তার লাইব্রেরির মুখপাত্রদের প্রস্তাবকে তিনি পাত্তা দেন নি। তাদের বক্তব্য ছিলো আজকাল যাট বছরেই হীরক জয়ন্তী হচ্ছে, পঁচাত্তর বছবের জন্যে অপেক্ষা করা দরকার নেই।

বলাবাহুল্য, নাবালকদের এই যুক্তি প্রভাসকুমার মেনে নেন নি। যাট বছরে হীরক জয়ন্তী হতে পারে না, পঁচাত্তরেই হতে হবে।

বেলা দুপুর হয়ে গেছে।

দশটা নাগাদ সৌদামিনী এক গেলাস চিনিছাড়া দুধ খাইয়ে গিয়েছিলো। আর একটু পবেই এসে স্নান খাওয়ানোর জন্যে জোরাজুরি করবে।

স্নানখাওয়া নিয়ে আজকাল আর প্রভাসকুমার মোটেই মাথা ঘামান না। পুরো শীতকালটা ভিতরের বারান্দায় গোল সিঁড়ির ওপরে একটা পিতলের গামলায় সদা জলভরে বসিয়ে রাখে সকাল থেকে। একটু পরে যখন রোদের ঝাঁজ একটু চড়া হয় সেই তাতে পেতলের গামলার জল ইযদুষ্ণ হয়ে ওঠে। ততক্ষণে বেলা প্রায় একটা বেজে যায়।

এইরকম সময়ে মানিকনাপিত বাজার থেকে ফেরে। ফেরার পথে সে প্রভাসকুমারকে খেউরি করে দিয়ে যায়, খেউরি মানে দাড়িকামানো।

এ কাজ মানিকদের বংশানুক্রমিক। মানিকের জ্যাঠতুতো দাদা জহব প্রামানিক ছিলো প্রভাসকুমারের সমবয়সী। লোকটা চার-পাঁচ বছব হলো মারা গেছে। শেষের দিকে খুবই বুড়ো হয়ে গিয়েছিলো। চোখে দেখতো না, হাত কাঁপতো।

সৌদামিনীর কাছে একটা আলাদা ক্ষুর, দাড়ি কামানোর সাবান, বুরুশ বাখা আছে। মানিক এসে বাড়ির মধ্যে গিয়ে সেগুলো নিয়ে আসে।

এ শহরে আসল পুরনো মানুষগুলোর মধ্যে মানিকের মত আর দুয়েকজন আছে। মানিকেরা এই উকিলবাড়ির সঙ্গে তিনপুরুষ জড়িয়ে। বিয়ে পৈতে শ্রাদ্ধে হিন্দু ক্রিয়াকর্মে ক্ষৌরকারের বড় ভূমিকা রয়েছে। প্রভাসকুমারের বিয়েতে সঙ্গে ছিলো মানিকের বাবা। ইপিন-বিপিনের পৈতের সময় মাথা মোড়ানো, কান ফোটানো হয়। মানিকের বাবা করেছিলো অথবা জহর করেছিলো। প্রভাসকুমারের ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু এটা মনে পড়ে যে পৈতের দিন কানে ফুটো করা নিয়ে বিপিন খুব গোলমাল করেছিলো। নেড়ামাথায় ছুটে গিয়ে ছাদের ওপরে লুকিয়েছিলো।

মানিক এলে দাড়ি কামাতে কামাতে পাঁচ-দশ মিনিট পুরনো দিনের কথা হয়। একবার সেই দ্বিতীয় যুদ্ধের মাঝামাঝি রটে গিয়েছিলো নেতাজী সুভাষ নাকি মাদরাইল গ্রামে চক্রবর্তীদের বাড়িতে লুকিয়ে রয়েছেন। ব্যাপারটা পুলিশ পর্যন্ত জানাজানি হয়েছিলো। কিন্তু পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায় ঐ টাকমাথা, গোলগাল, চশমা পরা ভদ্রলোক, চক্রবর্তী বাড়ির বড় শরিকের বেয়াই, কলকাতায় খিদিরপুরে বাড়ি, জাপানি বোমার ভয়ে এখানে এসে রয়েছেন।

তারো অনেক আগে একবার শহরের মধ্যে খালে দুটো বড় কুমির কি করে ঢুকে গিয়েছিলো। শহরজোড়া কি হৈচৈ। মানিক তখন নিশ্চয় খুব ছোট কিংবা জন্মায়নি কিন্তু তার তবু মনে আছে। কুমির দুটোকে ডাঙায় তুলে পিটিয়ে মারা হয়েছিলো।

প্রভাসকুমারের মনে পড়ে হেডমাষ্টার মশাই বলেছিলেন, মারা উচিত হলো না। কুমির দুরকম। এ্যালিগেটর আর ক্রোকোডাইল। কুমির আর ঘড়িয়াল, একটা মানুষখেকো আর একটা মাছ খেকো।

এতকাল পরে প্রভাসকুমার খেয়াল করতে পারেন না, কোনটা মাছ খেকো, কোনটা মানুষ খেকো, তবে হেডমাষ্টার সেসময় বলেছিলেন খালের কুমিরদুটো মানুষখেকো ছিলো না।

সে যা হোক প্রভাসকুমারের কিন্তু বিশ্বাস হয় না যে মানিক সেই কুমির মারার ঘটনা দেখেছিলো, তখন তার জন্মই হয় নি, মানিক কিন্তু সে কথা স্বীকার করে না। সে বলে, 'স্পষ্ট' চোখে দেখেছি।

প্রভাসকুমার জানেন, আদালতে সাক্ষীর জেরার সময়েও এ ব্যাপারটা দেখেছেন, অনেক সময় একই ঘটনার কথা অন্যের মুখে শুনে শুনে নিজের মনেও ভ্রম হয় যে ঐ দৃশ্য আমিও দেখেছি।

এই রকম তুচ্ছ বৃহৎ পুরনো সব ঘটনা নিয়ে প্রত্যেকদিন বচসা লেগে যায় মানিকেব সঙ্গে। পাকা উকিল হিসেবে প্রভাসকুমার মানিকের স্মরণশক্তির প্রতি সংশয় প্রকাশ করেন, মানিকও প্রতিবাদ করে, 'আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

এই সময়ে বাড়ির মধ্যে থেকে হৈ হৈ করে ছুটে আসে সৌদামিনী, 'এতক্ষণ কি লাগছে? জামাইবাবুর কি আজ স্নানখাওয়া হবে না। সেই কখন ক্ষুর-সাবান দিয়েছি। এখনো দাড়ি কামানো হলো না।' ঝাঁকি দিয়ে সৌদামিনী বলে, 'একটা বুড়ো মানুষের দাড়ি কামাতে কতক্ষণ সময় লাগে শুনি?'

সৌদামিনী কথা শুনে মানিক চটে যায়। সে হাতের তালুতে ক্ষুরের সাবান মুছে বলে, 'তুমি বিধবা মেয়েছেলে, দাড়ি কামানোর বোঝোটা কি?'

বিধবা কথাটা সৌদামিনীর ভালো লাগে না। সে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চায়। সে প্রভাসকুমারকে জিজ্ঞাসা করে, 'জামাইবাবু, আজ কিসের গল্প হচ্ছিলো? সেই জোড়া কুমিরের গল্প? সুভাষ বোসের গল্প?'

সৌদামিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রভাসকুমার মৃদুমৃদু হাসেন। চোখের ঝাপসা ভাবটা থাকলেও রোদের ঝকঝকে আলোয় সৌদামিনীর মুখটা পরিষ্কার দেখা যায়।

ঠাণ্ডার দিন। তবু সৌদামিনীর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বোধ হয় রান্নাঘরে ছিলো এতক্ষণ।

প্রভাসকুমার ভাবেন, দুজন মানুষের রান্না করতে এত সময় কি লাগে সৌদামিনীর।

সৌদামিনী কিন্তু খুব যত্ন করে ভেবে চিন্তে সব রান্না করে। রীতিমত স্বাস্থ্যসম্মত।

সপ্তাহে একদিন করে, শুক্রবার ছুটির দিন সকালে রুহুল ডাক্তার আসেন। নাড়ি টিপে, জিব দেখে, স্টেথসকোপ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে যত্ন করে বুক পিঠ দেখে, যন্ত্র দিয়ে প্রেসার

মাপেন। এ ছাড়াও রুহুল ডাক্তার মাসে অন্তত একবার করে প্রভাসকুমারের রক্ত আর পেচ্ছাব পরীক্ষা করান।

প্রত্যেকবার সব রকম পরীক্ষানিরীক্ষার পর শেষবার অনেকক্ষণ ধরে প্রভাসকুবারের নাড়িটা মনোযোগ দিয়ে ঘড়ি মিলিয়ে দেখেন রুহুল ডাক্তার, তারপর হাসিমুখে বলেন, 'কাকাবাবুর নাড়ি একটা যুবকের চেয়েও পারফেক্ট।'

রুহুল ডাক্তারও অনেক দিনের লোক। প্রায় তিরিশ বছর এই শহবে ডাক্তারি করছেন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম বি বি এস পাশ করে সেই যুবক বয়েসে এ শহরে প্র্যাকটিশ কবতে এসেছিলেন। ধলেশ্বরীর চরের এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের জোতদারের ছেলে।

স্মৃতিকণা রুহুল ডাক্তারকে খুব পছন্দ করতেন। রুহুল এ পাড়ার মোড়ে এসে কালীবাড়ির পাশের একটা ওযুধের দোকানে চেম্বার করে বসেন। পবে এ পাড়াতেই আরেক প্রান্তে বাড়ি কবেছেন।

আগেকার প্রধান ডাক্তারবা একে একে মবে গেলেন। হিন্দু ডাক্তাররা অনেকে ভারতে চলে গেলেন। এদিকে আসাম থেকে কিছু কিছু মুসলমান ডাক্তাব এখানে উদ্বাস্তু হযে এলেন। তাঁদের কাবো কাবো হাতযশ থাকলেও ডিগ্রি ঠিক নয।

তা ছাড়া রুহুল ডাক্তাব এই মহকুমার-ই ছেলে। এই শহবেই ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ কবেছে। রুহুলেব বাবা আবাব প্রভাসকুমারেব অনেকদিনের পুরানো মক্কেল।

অন্যান্য অনেক জুনিয়ার উকিলের মতই রুহুল প্রভাসকুমারকে কাকাবাবু বলেন। এ নামটা প্রভাসকুমারের গত বিশ বছরে পেটেন্ট হয়ে গেছে। শুধু গ্রামের মক্কেল এখনো উকিলবাবু বলে এবং খুব জুনিয়ার নতুন উকিলরা স্যার বলে ডাকে।

শহবে ডাক্তারি করলেও বাবার মৃত্যুর পরের থেকে গ্রামের জোতদারিব যে অংশটা তিনি পেযেছেন সেটা রুহুলকেই দেখাশোনা কবতে হয়।

মামলা মোকদ্দমায় কাকাবাবু সহায়। রুহুল কাকাবাবুর কাছ থেকে কখনো কোনো ভিজিট নেন না। তিনিও ফি নেন না।

রুহুলের কাছ থেকেই সৌদামিনী বুঝে নিয়েছে প্রভাসকুমাবের কি খাওয়া উচিত, কি খাওয়া অনুচিত।

প্রভাসকুমারের এমনিতে কোনো অসুখ নেই। তবে রক্তে চিনির পরিমাণটা বেশ বেশি। আর খিদে, ঘুম একটু কম। তন্দ্রার ভ৷ ৩াই বেশি। চোখে আবছায়া দেখেন কিন্তু ছানি নয়। রুহুল ডাক্তারের ধারনা ওটা ঐ রক্তে চিনির ভাগ অতিরিক্ত হওয়ার ফলে গ্লোকুমা থেকে হয়েছে। এব কোনো চিকিৎসা নেই। ঢাকায় নয়, কলকাতায় নিয়ে গেলে কিন্তু চেষ্টা করা যায় হয়তো।

কিন্তু প্রভাসকুমার যাবেন না। ইপিন বিপিন মধ্যে দুয়েকবার এসে অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রভাসকুমার বাড়ি ছেড়ে নড়তে চাননি। তাঁর এই অবস্থাটা তিনি মেনে নিয়েছেন।

রুহুল ডাক্তারের পরামর্শমত সৌদামিনী জামাইবাবুকে চিনি মোটেই দেয় না। ভাত-আলু এই সবও খুব কম।

জামাইবাবুর রক্তে যে চিনি বেশি সেটা সৌদামিনী জানে। শীতকালে জামাইবাবুর পায়ের নরম চামড়া ফেটে যায়, সেই কাটা ঘায়ে অনেক সময় পিঁপড়েগুলো ধরে থাকে।

জামাইবাবুর রক্তে এত চিনি হয়েছে জামাইবাবুর নিজের দোষে। সেটা সৌদামিনী জানে। সৌদামিনী নিজের চোখে দেখেছে স্মৃতিকণা বেঁচে থাকা পর্যন্ত কি মিষ্টিটা খেতেন প্রভাসকুমার। এক সঙ্গে চার পাঁচটা বড় বড় চমচম, আট দশটা রসগোল্লা।

স্মৃতিকণা বেঁচে থাকা পর্যন্ত কিন্তু জামাইবাবুর রক্তে চিনির দোষটা ধরা পড়ে নি। পরের বছর ছেলেদের কাছে কলকাতায় গিয়ে অসুখটা ধরা পড়ে। বিপিন ভালো করে বুড়ো বাবাকে ডাক্তার দেখিয়েছিল। কলকাতার ডাক্তাররাই বলে দেয় হাইসুগার।

অসুখটা ধরা পড়ায় প্রভাসকুমার শুধু দুঃখিত হন নি, চটে গিয়েছিলেন। তবু বাড়ি ফিরে আসার পর সৌদামিনীর পাল্লায় পড়ে বাধ্য হয়ে ওষুধ খেতেন। সৌদামিনীও মিষ্টি না খাওয়ার তেমন কড়াকড়ি করেনি।

কড়াকড়িটা করতে হলো একবার আদালতের বারান্দায় প্রভাসকুমার অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, তারপর থেকে। সেবার তিনি প্রায় দুমাস শয্যাশায়ী ছিলেন।

মানিক চলে যাওয়ার পরে বারান্দার তোলা জলে স্নান করে প্রভাসকুমার খেতে বসলেন।

একটা কালো পুরানো দিনের তেপায়া গোল টেবিল। তার ওপরে বড় একটা কাঁসার থালায় এক মুঠো ভাল, দুটো ছোটছোট ময়দার রুটি। আর নানা রকম তরকারি। অল্প একটু ফুলকপি সেদ্ধ, একটু বেগুন পোড়া, অল্প লঙ্কা, কালোজিরে দিয়ে থোড় ছেঁচকি, হালকা মুগের ডাল, এক বাটি মাগুর মাছের ঝোল।

সবশেষে একটু টক দই, সেটা সৌদামিনী নিজেই ঘরে পাতে।

জামাইবাবু খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করেন, 'এটা কি? ওটা কি?' সৌদামিনী বলে, 'খেলেই বোঝা যাবে।'

তরকারিটা একটু মুখে দিয়ে জামাইবাবু জিজ্ঞাসা করেন, 'তোর জন্যে রেখেছিস তো?'

সেবছর বিপিনের জন্যে প্রভাসকুমারকে খুব দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল।

বিপিন চিরকালই এইরকম। ছোট বেলায় স্কুলে পড়ার সময় পাড়ার টিমের সঙ্গে ফুটবল খেলতে গিয়ে জামালপুরে প্রায় একমাস রয়ে গেল।

পাড়ার ছেলেরা খেলে ফাইনালে শিল্ড জিতে 'হিপ-হিপ-হুরে' করে ফিরে এলো। বিপিন তাদের সঙ্গে ফিরল না।

তবে একেবারে বেপাত্তাও নয়। ফাইনালে পাড়ার টিম আদালতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন তিন-এক গোলে জিতেছিল। তার মধ্যে দুটো গোলই নাকি বিপিন দিয়েছিল।

একথা ঠিক যে বিপিন ফুটবলটা বেশ ভাল খেলত। সে জন্যেই জামালপুরের একটা স্থানীয় টিম তাদের ক্লাবে সই করিয়ে তাকে নাকি রেখে দিয়েছে পুরো মরসুমের জন্যে।

তখন ইপিন-বিপিনের পিসিমা প্রভাসকুমারের বিধবা দিদি ছিলেন এ বাড়িতে। ইপিন-বিপিন দুজনে ছিল তাঁর দুচোখের মণি। তিনিই এদের আগলাতেন, অনর্থক বাড়াবাড়ি স্নেহ করে দুজনকে গোল্লায় পাঠানোর বন্দোবস্ত করেছিলেন।

ইপিন একটু ভীতু স্বভাবের, সাবধানি ছেলে ছিল। পিসির প্রশ্রয়ে তার খুব হেরফের হয়নি।

কিন্তু বিপিনের ক্ষতি হয়েছিল। পিসি নীরবালা একবার লুকিয়ে বিধবার শেষ সম্বল গলার সোনার চেন পাড়ার স্যাকরার দোকানে বন্ধক রেখে বিপিনের বায়নায় তাকে ফুটবল খেলার

নি-কাপ, এ্যাঙ্কলেট, বুট, মোজা এসব কিনে দিয়েছিলেন। তখনো ঢাকা-কলকাতার বাইরে বুট পরে ফুটবল খেলা একটা অভিনব ব্যাপার ছিল। একবার ময়মনসিংহ বেড়াতে গিয়ে সেখানে লিগ ম্যাচে বিপিন পণ্ডিতপাড়া স্পোর্টিংয়ের প্লেয়ারদের পায়ে বুট দেখে আসে। তাই এই বায়না। সে বায়না মা-বাবা পুরণ করেননি, কিন্তু পিসি করেছিলেন।

সেবারে অবশ্য ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার পরে দিদিকে অনেক গালাগাল করে তারপর গোপাল কর্মকারের কাছে থেকে আসল সমেত অহেতুক প্রচুর সুদ গুণে সোনার চেন হারটা ছাড়িয়ে এনেছিলেন। গোপাল কর্মকারকেও প্রভুত গালমন্দ করা হয়েছিল। পুলিশের ভয়ও দেখানো হয়েছিল। কিন্তু গোপাল নির্বিকার ছিল,সে আর কি করবে, এটা তো তার জাত ব্যবসা, এর মধ্যে কোন প্রতারণা বা জোচ্চুরি সে দেখতে পায় না।

তখন টাঙ্গাইল থেকে জামালপুর সরাসরি বাস ছিল না। বাসে ময়মনসিংহ পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে ট্রেনে জামালপুর। বিপিনের দুই বন্ধু পাড়ার আর দুটি ছেলে, যারা জামালপুরে বিপিনের সঙ্গে খেলতে গিয়েছিল আফসার আর মাহবুব, তাদের গাড়িভাড়া করে বিপিনকে ফেরত আনতে পাঠানো হল।

না পাঠিয়ে উপায় ছিল না। নীরবালা প্রায় রাতদিন কান্নাকাটি করতেন, খাওয়াদাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। স্মৃতিকণা অবশ্য চিরকালই খুব শক্ত ধাতের ছিলেন, তিনি ভালমন্দ কিছু বলেননি, খুব উদ্বেগও প্রকাশ করেননি।

কিন্তু পরের দিন আফসার আর মাহবুব বিপিনকে ছাড়াই ফিরে এল। সিজন শেষ না হলে ফিরতে পারবে না। ফিরতে ফিরতে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি হয়ে যাবে।

বিপিনের বয়েস তখন বড়জোর পনেরো-যোলো। এই বয়সেই বেশ লম্বা হয়েছে। কিন্তু সে বছরই তার ম্যাট্রিক পরীক্ষা। সেপ্টেম্বরেই প্রি-টেস্ট।

আগের বছর ম্যাট্রিক পাশ কবে ইপিন কলকাতায় পড়তে চলে গেছে। এ বছর বিপিনও পাশ করে যাবে। কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব হবে।

দিন সাতেকের মাথায় কিন্তু প্রভাসকুমারের, একজন মুহুরিবাবুর সঙ্গে, জামালপুরে যেতে হল। সেখান থেকে খবর এসেছে, একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলার চরম মুহূর্তে আহত হয়ে পা ভেঙে জামালপুর মহকুমা হাসপাতালে বিপিন ভর্তি হয়েছে।

ঘটনাটা নীরবালাকে জানানো হল না। কিন্তু তিনি কানাঘুষোয় খবর পেয়ে গেলেন। তবে প্রভাসকুমার যে বিপিনকে আনতে গেছেন, তাতে তিনি একটু আশ্বস্ত হলেন।

জামালপুর থেকে বিপিনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করলেন প্রভাসকুমার। সেখান থেকে মাসখানেক পরে পায়ে প্লাস্টার বাঁধা অবস্থায় বিপিন বাড়ি ফিরল।

তখন ভাঙা মোচকানোয় প্লাস্টার বাঁধা এত, সাধারণ ঘটনা ছিল না। বিপিন ফিরে আসার পর সকাল বিকেলে দলে দলে লোক এসে তাকে দেখে যেত।

বিপিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার প্লাস্টারের ওপরে পেন্সিল দিয়ে হিজিবিজি কাটাকুটি করত, হিজিবিজি ছবি গাছ, লতাপাতা, পাখি আঁকত। তবে বাইরের লোকের সামনে নয়। বাইরের লোকেরা মফঃস্বলের মক্কেলরা সেসব কাটাকুটি দেখে ভাবত এটাও বুঝি হাড়ভাঙা চিকিৎসার একটা অঙ্গ।

প্লাস্টার খোলার পরেও বিপিন প্রায় তিন মাস খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। এখনো তার ডান পায়ে একটু টান আছে। সব সময় দেখা যায় না। কিন্তু বিশেষ করে নজর করলে দেখা যায়। বিপিনের চলাফেরাটা একটু ডান দিকে হেলানো।

তবে এই ঘটনার একটা বড় ফল পাওয়া গিয়েছিল। বিপিন আর জীবনে ভুলেও ফুটবল খেলেনি। অবশ্য অল্প কিছুদিন পরেই সে ম্যাট্রিক পাশ করে যথারীতি কলকাতায় পড়তে চলে যায়। সেখানে মেসবাড়িতে থেকে কলেজে পড়ে ফুটবল কেন প্রায় কোনো খেলারই সুযোগ ছিল না। বলে রাখা ভাল, বিপিন কিন্তু ভালভাবে ম্যাট্রিকও পাশ করেছিল, বেশ ভালভাবে। লেখাপড়া কম করলেও, ছিল অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র।

তিরিশের দশকের যুগে একটা হাসির গান খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

'এক পো দুধে কি হবে?

ইপিন খাবে, বিপিন খাবে...'

ইত্যাদি ইত্যাদি।

পুরো গানটার মধ্যে বলা হয়েছিল মাত্র এক পোয়া দুধ কতজনে খাবে, কত রকম ভাবে ব্যবহার করা হবে। শিশু, বৃদ্ধ, রোগী, কর্তা গিন্নি সবাই খাবে, তাছাড়া ছানা হবে, ননী হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

পুরোপুরি অসম্ভব ব্যাপার।

তাছাড়া যে সময়েব গান এটা সেই পঞ্চাশ যাট বছব আগে বাংলাদেশে আর যাই হোক দুধেল গরু ছিল। বাজারেও দুধ উঠত প্রচুর। অধিকাংশই মিষ্টির দোকানদারেরা কিনত। শহুরে গোয়ালারাও কিনত ঘি, মাখন, ঘোল, এই সব বানানোর জন্যে।

প্রভাসকুমারের ঠিক মনে পড়ে না দুধের দাম সেই যাট বছর আগে কত ছিল। তিন পয়সা? চার পয়সা? নাকি আরো কম।

প্রভাসকুমারের কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে কাছারির পিছনে খালের ধারের রাস্তা ধরে গাছতলা দিয়ে আশেপাশের গ্রাম থেকে, নদীর ওপার থেকে দুধের ব্যাপারিরা হুমহুম করে টাউনের বাজারে ছুটে আসছে। তাদের হাঁটু পর্যন্ত ধুলো। কাঁধে বাঁশের ঝাঁকে মাটির জালা ভর্তি দুধ। ব্যাপারিদের খালি গা, কালো চকচকে পিঠ দিয়ে ঘাম ঝরছে, কাঁধের রঙিন গামছা ভেজা। দুধের জালাগুলোর মুখে বাঁশপাতা কিংবা আমপাতা ঢুকিয়ে দেওয়া আছে, যাতে চলার গতিতে দুধ ছলকিয়ে পড়ে না যায়।

দুধ ভর্তি মাটির জালাগুলোর পাশাপাশি একটা বড় পেতলের কলসির কথাও মনে পড়ে প্রভাসকুমারের। বিশাল সাতসেরি কলসি একটা।

কলসিটা এসেছিল প্রভাসকুমারের ঠাকুমার সঙ্গে, বিয়ের সময়।

সে অন্য এক শতাব্দীর কথা।

প্রভাসকুমার জন্মানোর কিছু পরে তাঁর ঠাকুমা বিগত হয়েছেন, তবে তিনি ছোটবেলায় দেখেছেন ওই কলসিটাকে বাসায় বলা হত সাতসেরি কলসি। খুব ভারি বলে তেমন শক্ত সমর্থ না হলে কাজের মেয়েরা এই কলসি জল ভরা অবস্থায় কাঁধে বহন করতে পারত না। তখন তো কলের জল হয়নি, ইঁদারা থেকে খাওয়ার জল তোলা হত। সেই জল রাখা হত একটু ছোট পাঁচসেরি দুটো কলসিতে।

তবে সাতসেরি কলসিটা ব্যবহার হত পূজো পার্বণে, বাজার থেকে দুধ আনার জন্যে। পিঠে-পায়েস বা ক্ষীর তৈরির জন্যে বাসায় গরুর দুধের অতিরিক্ত সাতসের দুধ আনা হত। হবিষ্যি ঘরের বারান্দায় বড় পেতলের কড়াটাতে সেই দুধ জ্বাল দেওয়া হত।

দুধ টগবগ করে ফুটছে। সুঘ্রাণ ভাসছে বাতাসে।

দুপুরবেলায় খাওয়া দাওয়ার পরে আবার এসে বাইরের বারান্দায় ইজিচেয়ারটায় বসেন প্রভাসকুমার। বিকেল প্রায় চারটে পর্যন্ত খোলা দক্ষিণ দিয়ে রোদ আসে এই বারান্দায়, তারপর সূর্য পশ্চিমে হেলে যায়, দালানের আড়ালে পড়ে।

ইজিচেয়ারে চোখ বুজে শুয়ে কিছুটা এলোমেলো ভাবনা, কিছুটা তন্দ্রার মধ্যে জড়িয়ে ছিলেন প্রভাসকুমার। পায়ের শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখেন সৌদামিনী বলছে, 'আজ যে ইপিনমামার জন্মদিন।'

প্রভাসকুমারের খেয়াল হল একটু আগে আরেক বার তন্দ্রা কেটে গিয়েছিল। বাতাসে ঘনতপ্ত দুধ জ্বাল দেওয়ার গন্ধ পেয়েছিলেন। চোখ বোজা অবস্থাতেই টের পেয়েছিলেন এটা স্মৃতিগন্ধ নয়, সত্যিকারের ঘন দুধ জ্বাল দেওয়া হচ্ছে, বোধহয় সৌদামিনীই বারান্দার রান্নাঘরে জ্বাল দিচ্ছে। পায়েস রান্না করছে।

কি ব্যাপার, খোঁজ নেওয়ার জন্যে তন্দ্রার ঘোরেই প্রভাসকুমাব সৌদামিনীকে ডেকেছিলেন। সাধাবণত ও সময় তিনি সৌদামিনীকে ডাকেন না। ভাত খেযে উঠে এক টুকবো শুকনো হরিতকি মুখে দিযে ইজিচযোবে এসে নিবিবিলি আপন মনে শুযে থাকেন।

বান্নাঘবে বারান্দা থেকে জামাইবাবুর 'সদা, সদা' ডাক শুনতে পেয়েছিলেন সৌদামিনী। কেন জামাইবাবু ডাকছেন তাও সে বুঝতে পেরেছিল। সাড়া দিযেছিল, জামাইবাবু সেটা শুনতে পাননি বোধহয, আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

উনুনে টগবগে দুধ বেখে সৌদামিনী তখন বাইবেব বারান্দায আসতে পারেনি। তাছাড়া অন্য কাজও আছে। প্রথমে অল্প গুড় দিয়ে হালকা একটু পায়েস একটা ছোট বাটিতে জামাইবাবুর জন্যে আলাদা কবে রাখতে হবে।

জামাইবাবু অবশ্য এ পাযেস খেযে বলেন, 'সদা, তোব হাতে পাযেসেব একদম স্বাদ হয় না।' আসলে মিষ্টি কম বলে পাযেসে স্বাদ লাগে না জামাইবাবুর, কিন্তু সেটা ধবতে পারেন না। সৌদামিনীও সে কথা প্রভাসকুমারকে অবশ্য বলে না।

জামাইবাবুব পাযেস রাখা হয়ে গেলে আরও অনেকেটা গুড় দিয়ে বেশ ঘন করে পায়েস জ্বাল দেয় সৌদামিনী। খেজুরে গুড়ের পায়েসে গন্ধচাল দিলেই হয, কর্পূব এলাচ, তেজপাতা বা কিসমিস, চিনির পায়েসের মত দরকার পড়ে না।

জ্বাল শেষ করে কড়াই নামিয়ে বড় বড় দুটো জামবাটিতে পায়েস ঢালে সৌদামিনী। কড়াইযে একটু বেখে দেয়, সেটুকু তার নিজের জন্যে। কডাইযেব গা থেকে ঝিনুক দিয়ে চেটে যে চাঁছিটা বেবোবে সেটাও সৌদামিনীর। সে চাঁছি খেতে ভালবাসে। আর তার নিজেব পায়েসের ভাগ থেকে পাশের বাড়ির মেনি বেড়ালটাকে দেবে যদি সে ঠিক সময় মত আসে। মেনি বেড়ালটার পেটটা ঢোলা, পেট ভর্তি বাচ্চা, দুয়েকদিনের মধ্যেই বিয়োবে।

বড় জামবাটির পায়েসের এক বাটি যাবে কালীবাড়ী। সেখানে ইপিনের নামে প্রসাদ হবে। সেই প্রসাদ কালীবাড়ীর বারান্দাতেই ভিখিরি আর ভবঘুরেদের ভাগ করে দেওয়া হবে।

এসবই স্মৃতিকণার কাছে সৌদামিনীর হাত ধরে শেখা। অন্য জামবাটি সন্ধ্যায় কাছারিঘরে যাবে, কাছারি ঘরে সে সময়ে যে কজন থাকবে ভাগ করে খেয়ে নেবে। নতুন কোনো মক্কেল থাকলে হয়তো কৌতূহলবশত জিজ্ঞাসা করবে, 'কি ব্যাপার?' মুহুরিবাবুরা জানেন, তাঁরা কেউ বলবেন, 'কর্তার বড় ছেলের জন্মদিন।' কর্তার ছেলেরা যে কলকাতায় ইণ্ডিয়ায় থাকে কর্তা এখানে একা থাকেন, সেটা কিন্তু নতুন পুরনো মোটামুটি সবাই জানে।

চোখ মেলে সামনে সৌদমিনীকে দেখলেন প্রভাসকুমার, সৌদামিনী যেন কি বলল। সৌদামিনী

বুঝতে পারল আগে যা বলেছে জামাইবাবু শুনতে পাননি। তাই সে আবার বলল, 'আজ যে ইপিনমামার জন্মদিন, তাই পায়েস করছিলাম।'

কয়েক মুহূর্তে স্মৃতি হাতড়িয়ে প্রভাসকুমার জিজ্ঞসা করলেন, 'আজ কি দশই অগ্রহায়ণ।'

সৌদামিনী বলল, 'হ্যাঁ, এছাড়াও এবার, দশই অগ্রহায়ণ আর বৃহস্পতিবার এক সঙ্গে পড়েছে।'

দশই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার ইপিনের জন্মদিন। এই শূন্য বাড়িতে পুরনো, দামি সব তারিখ সৌদামিনীর নখদর্পণে। আগে বাংলা বছরের প্রথমে বাসস্ট্যাণ্ডে সাধনা ঔষধালয়ের দোকান থেকে একটা বাংলা ক্যালেণ্ডার নিয়ে আসত সৌদামিনী প্রায় জোর জবরদস্তি করে। এখন বছরের প্রথমে একটা করে হাফ নবকুমার পঞ্জিকা কেনে কুড়ি টাকা দিয়ে। তাতে দাগিয়ে রাখে সব বার তারিখ।

আজ কি খেয়াল হল, সৌদামিনীকে বললেন, আমার লেখার বাক্সটা নিয়ে আয়তো।

লেখার বাক্সটা খুব শৌখিন। গায়ে মাছ, লতাপাতা কাঠ খোদাই করে আঁকা।

অনেকদিন আগে একটা কাঠের সিন্দুক ছিল বাড়িতে। সেটা কেটে একবার কয়েকটা চেয়ার, টেবিল করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে এই কাঠবাক্সটাও। সেও নিশ্চয় পঞ্চাশ বছব আগের কথা।

কাঠের বাক্স খুলে চশমা, পোষ্টকার্ড, কলম বার করল সৌদামিনী। আজকাল কিছুই লেখেন না প্রভাসকুমার, অন্যেরা লেখে, সেটা শুনে কাছারির কাগজে দরকার পড়লে সই করেন। তার জন্যে দোয়াত কলম আছে কাছারিঘরে।

বাক্সের ফাউণ্টেনপেনটা দামি। পুরনো মোটা, লালচে ডুফোল্ড পার্কার। অনেকদিন ব্যবহার হয়নি। সৌদামিনী সেটায় কালি ভরে দিল।

চোখে চশমা দিয়ে কোনো সুবিধে হল না প্রভাসকুমারের। একই রকম ঝাপসা দেখাচ্ছে। কোনোরকমে কলম শক্ত করে ধরে লিখলেন।

কল্যাণবরেষু,

আজ তোমার জন্মদিন।

এই পর্যন্ত লিখে অনেকক্ষণ থমকিয়ে রইলেন প্রভাসকুমার। তারপর তার নিচে ধীরে ধীরে লিখলেন,

ইতি

আঃ প্রভাসকুমার চৌধুরী

ঈশ্বরদি স্টেশন থেকে কলকাতার দিকের ট্রেনে না উঠে বিপিন রেডক্রশের লোকেদের সঙ্গে সিরাজগঞ্জ ফেরার ট্রেনে উঠে গেলো।

বহু বছর আগের কথা।

প্রভাসকুমার সব ঠিকঠাক মনে করতে পারেন না। কিন্তু সে বছর বিপিনের জন্য খুব গোলমালে পড়তে হয়েছিল, এতদিন পরে পুরো ঘটনাটা আবছা আবছা মনে করে তিনি মনে মনে একটু হাসলেন।

কতদিন হয়ে গেলো। সময়ের ব্যবধানে কত বড় গোলমেলে ব্যাপার এতদিন পরে কেমন তুচ্ছ মনে হয়। অথচ একদিন এই ঘটনা অনেক বিনিদ্ররজনীর কারণ হয়েছিল।

ইপিন আর বিপিন পর পর দু'বছরে প্রায় পিঠোপিঠি জন্মালো। একজন অঘ্রাণে, একজন পৌষে। মনে আছে দু'জনেই মামার বাড়িতে জন্মেছিলো, তখন পিতৃগৃহে প্রসব হতে যাওয়াটাই মেয়েদের নিয়ম। তা ছাড়া স্মৃতিকণার প্রথম সন্তান ইপিন যখন হলো, তখন স্মৃতিকণা সদ্য আঠারো পূর্ণ হয়ে উনিশে, স্মৃতিকণারও জন্মমাস ছিলো অঘ্রাণ। পরের বছব বিপিন জন্মালো।

ইপিন-বিপিনের বৈষ্ণব মাতামহ মামার বাড়িতেই দুই দৌহিত্রেব নামকরণ কবেছিলেন গৌর এবং গোপাল। নাম দুটো এ বাড়িতে জানিয়েও দিযেছিলেন, আর নির্বিবাদে মাতামহের নাম দুটো এ বাড়িতে মেনে নেওয়া হয়েছিলো। অবশ্য দুটো পোশাকি নাম এ বাড়ি থেকে দেয়া হযেছিল মনোজকুমার এবং কনোজকুমার। কনোজ শব্দের সঠিক মানে কি সেটা অবশ্য প্রভাসকুমার কোনো অভিধানে পাননি।

কেউ জিজ্ঞাসা করলে একটা ব্যাখ্যা দিতেন, বাঙালি ব্রাহ্মণেবা কনৌজ থেকে এসেছিলো, তাই বাঙালি ব্রাহ্মণ সন্তানের নাম কনোজ হতেই পাবে। ঐ কাব কি হলো, কেউ একথা জিজ্ঞাসা কবলে তারও একটা মনগড়া জবাব ছিলো, কনৌজ আর কনোজ দুইই হয, দু'বকম উদাহবণই আছে। আবার কখনো ব্যাকরণেব কথা বোঝাতেন, কনোজ তদ্ভব শব্দ, কনৌজ থেকে কনোজ।

মনোজ-কনোজ এখনো চলছে। স্কুল কলেজ থেকে অফিসেব খাতায, ঠিকানায। কিন্তু ডাকনাম গৌর আর গোপাল চলেনি। হাসির গানের বেকর্ডের ওই 'ইপিন খাবে, বিপিন খাবে' থেকে ইপিন-বিপিন নাম দুই ভাইয়ের কাঁধে চেপে গিয়েছিলো।

ব্যাপারটা স্মৃতিকণারই অবদান। দৈনিক জ্বাল দেয়া দুধ কড়াই থেকে কাঁসার গেলাসে দুই ভাইয়ের জন্য ভাগ করে ঢালার সমযে স্মৃতিকণার বলা অভ্যেস হয়ে গিযেছিলো, 'ইপিন খাবে, বিপিন খাবে'। সেটা থেকে কাজের লোকেরা, মুহুরিবাবুবাও ইপিন-বিপিন বলা শুরু করলো।

তবে মামার বাড়িতে গেলে সেখানে দু'ভাইকে গৌর এবং গোপাল বলেই ডাকা হতো। সেখানে ইপিন-বিপিন চলেনি। কিন্তু মামার বাড়িতে তাদের গৌর এবং গোপাল বলে ডাকা দু'ভাইয়ের কখনো পছন্দ হয়নি। একটু বড় হয়ে তারা এ বিযযে আপত্তিও জানিয়েছে। একবার তো স্মৃতিকণার বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় বিপিন আপত্তি করেছিলো, বলেছিলো যে সে আর মামার বাড়িতে যাবে না, ওখানে খালি গোপাল-গোপাল করে।

সেবার অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্মৃতিকণা বিপিনকে সঙ্গে নিযে যেতে পেবেছিলেন। বলেছিলেন, 'ওখানে গিয়ে সবাইকে বলে দেবো। তোমাকে কেউ গোপাল বলে ডাকবে না।'

বিপিন কখনোই বোকা ছেলে ছিলো না। আবেগের মতো তার বুদ্ধিও ছিলো প্রখর। বলেছিলো, 'দাদাকে যদি গৌর বলে ডাকে, আমকেও গোপাল বলে ডাকবে।'

বিপিনের কথাই ঠিক হয়েছিলো। ইপিন কিন্তু এ সব ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ করেনি। যদিও মনে মনে গৌর নামে তারও আপত্তি ছিল।

'এক পো দুধে কি হবে? ইপিন খাবে, বিপিন খাবে' সেই পুরনো রেকর্ডটাও ও বাড়িতে অক্ষত অবস্থায় বহুকাল ছিলো। একাত্তর সালে ঘর ছাড়া হয়ে চলে যাওয়ার পরে ফিবে এসে যে সব জিনিস আর বাড়িতে পাওয়া যায়নি তার মধ্যে সাবেকি গ্রামোফোনের সঙ্গে বেকর্ডগুলোও ছিলো। একটা রেকর্ডও ফেরত পাওয়া যায়নি। কিন্তু প্রভাসকুমার টের পান সেই খোয়া যাওয়া রেকর্ডগুলোর গান এ বাড়ির বাতাসে এখনো ভেসে বেড়ায়, তিনি একটু চোখে বুজলেই।

সৌদামিনী বাড়ির মধ্যে ফিরে গেছে। অল্প আগে বারান্দা থেকে রোদটাও সরে গেছে। তবে সামনের পুকুরের জল শীতের বাতাসে অল্প অল্প ঢেউ ভাঙছে। সেই ঢেউয়ের চূড়ায় ঝিমকিম করছে পশ্চিমের হলুদ হালকা রোদ। একটা পানকৌড়ি খুনসুটি করছে পুকুরের জলের সঙ্গে সেই রোদে।

বারান্দার সামনের ব্যাডমিন্টন কোর্টটায় অন্য দিনের চেয়ে একটু আগেই আজ খেলা শুরু হয়ে গেছে। আজ বোধ হয় কোনো কারণে স্কুল হাফ ডে হয়েছে।

পুকুর থেকে হাঁস দুপুর বেলায় মাঠে উঠে আসে। এখানে রোদ পোহায়। এখন খেলা শুরু হতে তারা দালানের পিছনের সরু পায়ে হাঁটার রাস্তা ধরে প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে সারি বেঁধে নিজেদের আস্তানার দিকে রওনা হয়ে গেলো। ওরা অনেকটা পথ যাবে, সেই খালপারে, জাহাঙ্গির মোক্তারের বাড়িতে। খালের ধারে বাড়ি বলে জাহাঙ্গির মোক্তার হাঁস পোষে। কিন্তু হাঁসগুলো খালে নামে না, এতটা পথ হেঁটে এই পুকুরে চলে আসে।

প্রভাসকুমার আপন মনে ভাবেন, এই হাঁসগুলো জানলো কি করে এদিকে একটা পুকুর আছে। সাতসকালে খোঁয়াড়ের দরজা খুলে দিতেই এ দিক পানে চলে আসে। পাখিরা না হয় উড়ে উড়ে সব দেখে, সব খোঁজ পায়। হাঁসেরা তো উড়তে পারে না।

ভাবতে ভাবতে প্রভাসকুমার ছেলেমানুষের মতো ঠোঁটের কোণে একটু হাসলেন। হাঁস উড়তে পারে না, ঠিক তা তো নয়। বিপদে পড়লে বেশ ওড়ে, ওড়ার চেষ্টা করে। পুকুরপার থেকে এক উড়ালে মধ্যপুকুরে গিয়ে পড়ে।

এলোমেলো ভাবনার জাল ছিঁড়ে প্রভাকুমার ইজিচেয়ারে উঠে বসলেন। হাওয়ায় ঠাণ্ডা ভাবটা একটু জোরে হয়েছে। গায়ে একটা পুরনো হাফ সোয়েটার রয়েছে। ছেঁড়া আলোয়ানটাও জড়ানো রয়েছে। তবু কেমন শীত করছে। আরেকটু গরম জামাকাপড় পরা দরকার।

এই সময় সৌদামিনী এলো। তার হাতে চায়ের পেয়ালা। চায়ের পেয়ালাটা প্রভাসকুমারের ইজিচেয়ারের হাতায় বসিয়ে দিয়ে সৌদামিনী ঘরের ভিতরে গেলো জামাইবাবুর জন্যে গরম জামাকাপড় আনতে।

একটা ফুলহাতা গোলগলা উলের সোয়েটার। বছর তিনেক আগে পুজোর ছুটির সময় শেষবার যেবার প্রভাসকুমার কলকাতায় গিয়েছিলেন বিপিন দিয়েছিলো। বিপিনের মেয়ে লণ্ডন থেকে পাঠিয়েছে। স্কলারশিপের পয়সা বাঁচিয়ে ঠাকুরদার জন্যেই পাঠিয়েছে। পুজোর ছুটির সময় আজকাল বিলেত থেকে অনেক প্রবাসী বাঙালী কলকাতায় বেড়াতে আসে। তাদেরই একজনের হাতে সোয়েটারটা দিয়ে দিয়েছিলো অমরা, অমরাবতী। এই একই মেয়ে বিপিনের।

একালের নাতনিরাও পিতামহের সঙ্গে বেশ রসিকতা করে, গোলাপি-কমলা ছককাটা সোয়েটারটার পিঠে লেখা আছে, 'You can't beat me', যার মানে হলো, 'তুমি আমাকে হারাতে পারবে না।'

মাথার মধ্যে গোল গলাটা গলিয়ে সৌদামিনী ধীরে ধীরে সোয়েটারটা জামাইবাবুকে পরিয়ে দিলো। হাত দুটো উঁচিয়ে সৌদামিনীকে যথাসাধ্য সাহায্য করে প্রভাসকুমার সোয়েটারটা আত্মস্থ করলেন।

সোয়েটারটা বেশ গরম। বেশ ওম লাগছে। নাতনির উপহারে উষ্ণতা একটু থাকবে ওটা আর বড় কথা কি ? প্রভাসকুমার ঠোঁট টিপে একটু হাসলেন।

অমরার কথা মনে করার চেষ্টা করেন প্রভাসকুমার। একটু ওর ঠাকুমার মতো দেখতে হয়েছে কি? একটু কেন, অনেকটাই।

অমরাকে খুব বেশি দেখেননি প্রভাসকুমার। সেই বাংলাদেশ যুদ্ধের পর কলকাতায় কয়েকবার, তখন ওর দু'তিন বছর বয়েস। খুব ন্যাওটা হয়ে গিয়েছিল স্মৃতিকণার। স্মৃতিকণা শুয়ে থাকলে তার বুকের ওপর বসে গলা টিপে ধরতো। গ্রাম্য রসিকতা করে স্মৃতিকণা বলতো, 'এটা আমার সতীন।' অমরাও জবাব দিতো, 'তুমি আমার সতীন।' উত্তরটা স্মৃতিকণাই বোধহয় শিখিয়েছিলো।

বাংলাদেশ যুদ্ধের আগে দু'দিকের মধ্যে যাতায়াত প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিলো। ইপিন মোটেই আসতো না। বিপিন এক-আধবার অবশ্য এসেছে।

স্বাধীনতার পরে অমরা তার মা-বাবার সঙ্গে পরপর দু'বছর এ বাড়িতে এসেছে। তখনো সে শিশু। এই বারান্দায় আপন মনে এক্কা-দোক্কা খেলতো। এ পাড়ার সমবয়সী মেয়েদের কাছ থেকে 'ফুল ফুল ফুলটি, কদম কদম কদমটি' গুটি খেলা শিখলো। স্মৃতিকণা ছুতোর মিস্ত্রী ডেকে চৌকো চৌকো কাঠের গুটি বানিয়ে দিয়েছিলেন অমরাকে। অমরা সেগুলো মায়ের বাক্সে ভরে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলো।

মুজিব হত্যার পরে পরে যাতায়াত একেবারে বন্ধ হয়ে গেলো। তারপরও ইপিন, বিপিন মাঝে মধ্যে এসেছে। স্মৃতিকণার মৃত্যুর সময় বৌমারাও এসেছে। কিন্তু অমরা আসেনি, অমরার মা তাকে বাপের বাড়িতে রেখে এসেছিলো।

সোয়েটার পরানো শেষ হয়েছে। এবার চায়ের কাপটা বাড়ির মধ্যে রেখে দিয়ে এসে সৌদামিনী একটা মাফলার দিয়ে জামাইবাবুর কান মাথা ঢেকে, পায়ে গরম মোজা পরিয়ে দিলো।

মোজাগুলো ফুটো হয়ে গেছে। এখানে গরম মোজা খুব দাম, একশো দেড়শো টাকা, তাও ভালো জিনিস নয়। এক জোড়া মোজা পরার পরে তো জামাইবাবুর পায়ে কি রকম লাল লাল চাকা চাকা দাগ বেরিয়েছিল। একমাস ওযুধ খাওয়ার পরে দাগ মিলিয়ে যায়।

সামনের মাসে বড় দিনের সময় বিপিনমামা আসতে পারে। বিপিনমামাকে মোজার কথা লিখতে হবে।

মোজা পরে ফিতেওলো অক্সফোর্ড জুতোজোড়া জামাইবাবুকে পরানো হলো। ঘরের কোণা থেকে একটা বেতের লাঠি এনে জামাইবাবুর হাতে ধরিয়ে দিতে তিনি খুব ধীর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠোনে নামলেন।

এখন এই বিকেলে মিনিট পনেরো পুকুরপারে পায়চারী করবেন প্রভাসকুমার। তারপর কালীবাড়ি।

কালীবাড়ির মধুপুরুতের বাঁধা রুটিন হয়ে গেছে প্রভাসকুমারের জন্যে অপেক্ষা করা। কালীবাড়ির বারান্দায় মধুপুরুত দাঁড়িয়ে থাকেন। ঠিক সন্ধ্যার মুখে কালীবাড়ির গেট দিয়ে প্রভাসকুমার ঢোকেন। তখনই মধু দেবতাদের ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন। ধূপ-ধুনোর আয়োজন করেন।

তারপর আরতি। তখন বারান্দার, উঠোনের এবং প্রতিটি ঘরের ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এখন জ্বলবে রাত দশটা পর্যন্ত।

আরতির সময় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কালীপ্রণাম করেন প্রভাসকুমার। ছোটবেলা থেকে এই কালীপ্রতিমা তিনি প্রণাম করে আসছেন। তবে আজ কিছুদিন হলো ধর্মের প্রতি খুব একটা টান নেই প্রভাসকুমারের। নিতান্ত অভ্যাস বা সংস্কার বলতে হাত জোড় করে ঠাকুরপ্রণাম করেন।

ঠাকুর প্রণাম শেষ হয়ে গেলে সিঁড়ি থেকে নেমে পাশে টিনের চালায় অফিসঘরে গিয়ে একটা চেয়ারে বসেন। অনেকদিন প্রায় পঁচিশ-তিরিশ বছর এই কালীবাড়ি কমিটির সম্পাদক ছিলেন প্রভাসকুমার। তাঁরই আমলে এই টিনের অফিস ঘর তৈরি হয়েছিলো। তবে পুজোমন্দিরের

দালানটা অনেক দিনের পুরানো। এই শহর পত্তনের গোড়ার দিকেই সন্তোষের মহারানীর আনুকূল্যে মন্দিরটা তৈরি হয়েছিলো। মন্দিরের ছাদে একটা গম্বুজ আছে, গম্বুজের চূড়ায় ছিলো পিতলের কলস। উৎসবের দিনে সেই কলস তেঁতুল গোলা দিয়ে মাজা হতো। সোনার কলসের মতো ঝকঝক করতো।

কলসটা এখন আর নেই। একাত্তর সালে পরিত্যক্ত শূন্য কালীমন্দিরের চূড়া থেকে সেটা খুলে নিয়েছিলো পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোকেরা, বোধহয় সোনার জিনিস ভেবেছিলো।

মা কালীর মূর্তিটাও থাকতো না। কেন যেন সেনাবাহিনীর খুব রাগ ছিলো মা কালীর মূর্তির ওপরে। হয়তো প্রতিমার গোলমেলে চেহারার জন্যেই। কালীপ্রতিমা দেখলেই, তারা 'ভূত-ভূত' বলে চেঁচিয়েছে এবং গুলি করেছে। তাদের রাইফেলের গুলিতে কত যে পাথর আর মাটির প্রতিমা ধরাশয়ী হয়েছিলো সে সময়ের পূর্ববঙ্গে তার ইয়ত্তা নেই।

এই মন্দিরের প্রতিমা নিকষ কালো পাথরের। করালী মূর্তি, সোনার জিব, সোনার চোখ, গায়ে সোনার গয়না। ভক্তরা বিভিন্ন সময়ে মানত রেখে বানিয়ে দিয়েছেন। এ সব অলঙ্কার আর প্রতিমার গায়ে নেই।

কিভাবে খোয়া গেছে, সে কথা বলা কঠিন।

সে যাই হোক, সে বছর পুজোর আগে যখন এই শহর প্রায় হিন্দুশূন্য, যারা রয়েছে তারাও কালীবাড়িতে আসতে সাহস পায় না, এবং কেউ কেউ ইতিমধ্যে রাজাকার এবং আনসারদের চাপে ধর্মান্তরিত হয়েছে, সেই সময়ে এক রাতে মন্দিরের পিছনের ডোবায় মা কালীর প্রতিমাটি বিসর্জন দিয়ে জীবনে প্রথমবার লুঙ্গি পরে মধুপুরুত শহর থেকে পালিয়ে যায়। মধুপুরুতের বক্তব্য সে সালঙ্কারা দেবী প্রতিমাই বিসর্জন দিয়েছিলো। শহরের লোক সে কথা অবশ্য কখনোই বিশ্বাস করেনি।

স্বাধীনতার পরে হিন্দুরা ফিরে এলো শহরে। পৌষ-মাঘে, সারা শীতকাল ধরে সেবার পুরনো লোকেরা ফিরলো, তাদের অনেকে একাত্তরের বহু আগে দেশছাড়া হয়েছিলো। তারা ফিরে আসার আগেই রাজাকার আর বেদখলকারেরা ভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়েছিলো। এদের মধ্যে অনেকেই সাবেকি ভিটেয় গিয়ে নতুন করে ঘর তুললো, অনেকের ঘর ছিলো তারা সারিয়ে ঠিকঠাক করে নিলো। অনেকে ফিরে এসেও থাকলো না, ভাঙা শহরে মন বসলো না। জীবিকারও অভাব ছিলো, তারা যেখান থেকে এসেছিলো, ফিরে গেলো।

সে যা হোক ফিরে আসার পরে প্রায় সবাই প্রথমত কালীমন্দিরে প্রণাম করতে গিয়ে দেখে শূন্য বেদী, প্রতিমা অনুপস্থিত।

অবশ্য এতে কেউই বিশেষ আশ্চর্য বা আহত বোধ করেনি। কালীমন্দিরটা যে আস্ত ছিলো সেটাই যথেষ্ট। যুদ্ধের সময় কলকাতার খবরের কাগজে নিয়মিত খবর বেরিয়েছে, 'শত শত হিন্দুমন্দির ধ্বংস'। তার মধ্যে টাঙ্গাইলের মন্দির ধ্বংসের কথাও ছিলো।

ফাল্গুনের গোড়ায় একগাল দাড়ি আর আন্তর্জাতিক রেডক্রশ থেকে পাওয়া একটা লাল পশমি কম্বল গায়ে জড়িয়ে মধুপুরুত ফিরলো।

তখন কালীবাড়ির পিছনের ডোবার জল প্রায় শুকিয়ে এসেছে। মধুপুরুত ফিরে আসার পরের দিনই তার কথামত সবাই মিলে দল বেঁধে ডোবার জল ছেঁচা হলো। যারা গামছা এনেছিলো তারা প্রাণভরে কই মাগুর ট্যাংরা মাছ ধরলো। অবশেষে কাদা খুঁটে মা কালীর মূর্তি পাওয়া গেলো।

কলকাতা থেকে আসার সময় স্মৃতিকণা কয়েক বোতল বিশুদ্ধ গঙ্গাজল নিয়ে এসেছিলেন।

তাব এক বোতল বাড়ি থেকে নিয়ে এলেন প্রভাসকুমাব। প্রথমে টিউবওযেলেব তাবপবে গঙ্গাজলে স্নান কবিযে কালীঠাকুবেব পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলো। সেদিন সন্ধ্যায় কালীমন্দিবে, অনেকদিন পবে, খুব ভিড় হয়েছিলো, একই সঙ্গে পূজাবী আব প্রতিমা ফিবে আসা কম কথা নয়।

ঈশ্ববদি স্টেশনে বেডক্রশেব দল দেখে বিপিন তাদেব সঙ্গে ভিড়ে গেল, বিধ্বস্ত এলাকায ত্রাণ কার্যে সহাযতা কবাব জন্যে। এ ধবনেব কাজে বিপিনেব খুব উৎসাহ।

ব্যাপাবটা অবশ্য খুব সহজ হযনি। এই সব সমাজসেবা সংঘগুলি হঠাৎ কবে কাউকে দলে নিতে চায না। অনেক সমযেই একটা অনুদাব বক্ষণশীল মনোভাব কাজ কবে। সেবামূলক এবং ধর্মীয প্রতিষ্ঠানগুলো তা সে দেশীয হোক বা আন্তর্জাতিক হোক খুব আটঘাঁট বেঁধে নিযমবীতি মেনে চলে।

তাছাড়া ঈশ্ববদি স্টেশন থেকে যে দলটি ঝড়েব এলাকায যাচ্ছিল সেটা ঠিক বেডক্রস ছিল না। বেডক্রশেব ইসলামিক সংস্কবণ গ্রীন ক্রিসেণ্ট বা সবুজ চন্দ্রকলা। আন্তর্জাতিক বেডক্রশকে নানা অজুহাতে বহু দেশে কাজ কবতে দেওযা হয না। এসব জাযগায গড়ে উঠেছে গ্রীন ক্রস বা গ্রীন'ক্রিসেণ্ট এবং এগুলো বহুক্ষেত্রেই স্থানীয সংগঠন, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ছুৎমার্গতাব ভযে বেডক্রশ যেখানে অচল বা নিষিদ্ধ সেখানে এইবকম প্রতিষ্ঠানকেই দাযিত্ব নিতে হয।

সে যা হোক বিপিন স্টেশন চত্ববে গ্রীন ক্রিসেণ্টেব লোকেবা যেখানে জিনিসপত্র নিযে অপেক্ষা কবছিল সেখানে গিযে আত্মপবিচয দিযে বলে যে ঝড়েব এলাকা হযেই সে আসছে এবং সে দুর্গতদেব সাহায্যে অংশগ্রহণ কবতে চায।

এক প্রৌঢ় পাঞ্জাবি মুসলমান ভদ্রলোক দাযিত্বে ছিলেন, তিনি বিপিন চৌধুবী নাম শুনে হযতো বুঝতে পাবেননি সে হিন্দু না মুসলমান। অন্যথায এক অজ্ঞাত পবিচয় হিন্দু যুবককে ত্রাণকার্যে নিযে গ্রামে গ্রামে জনগণেব কাছে পৌঁছানোয় তাঁব সায হত না।

তিনি কিছু না বুঝে একটু কিন্তু কিন্তু কবে বিপিনকে সঙ্গে নিলেন। তাঁব লোকবলেব কিছু অভাব ছিল এবং তিনি ভেবেছিলেন বিপিন হযত অঞ্চলটা ভাল কবে চেনে।

বিপিনও মহোৎসাহে সবচেযে ভাবি ওযুধেব প্যাঁটবাটা কাঁধে তুলে সকলেব সঙ্গে ট্রেনে উঠে বসে।

ঈশ্ববদি থেকে সিবাজগঞ্জ বেললাইনেব দুধাবে ববীন্দ্রনাথেব গল্পগুচ্ছেব গ্রাম।

ছোটবড নদী, খাল বিল। নববর্ষায় জলে টইটম্বুব। জলে ঘেবা গ্রাম। অনন্ত ধানখেত বর্ষাব পূবালী বাতাসে সবুজেব হিল্লোল তুলে ঢেউ খাচ্ছে। ফাঁকে ফাঁকে বাডি ঘব। আম, কাঁঠাল, নাবকেল, সুপুবিব গাছ। বেললাইনেব পাশে জংলা আগাছায জানা অজানা পাখি। তাদেব মধ্যে দুঃসাহসীবা বেল গাড়িব সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়ছে। কলমিলতায, দণ্ডকলসেব গাছে ফুল, প্রজাপতি, মৌমাছি। কলসী কাঁখে মেযেবা নদীব ঘাটে যাচ্ছে। সেই পুবনো দৃশ্য মাথাব ঘোমটা খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে, দামাল শিশু ছুটোছুটি কবছে পাযে পায়ে। তাব সঙ্গে লেজ নাড়তে নাড়তে চলেছে সদাপ্রসন্ন ভোলা কুকুর।

এদিকে উঠোনে লক্ষ্মীগাই তার বাছুরের পিঠ চাটছে চো চাটছেই, চিরুনি দিয়ে আঁচড়ালে যেমন হয়, পিঠের সব লোম পাট পাট হয়ে গেছে। এরই মধ্যে বিনা কারণে কি এক খুশির আনন্দে হঠাৎ তিড়িং করে এক লাফ দিয়ে লম্বা ছুট দিল বাছুরটা দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে।

ততক্ষণে রেলগাড়ি একটা ছোট নদীর ওপরে খোলা সাঁকো পেরোচ্ছে। একটু পেছনেই পড়ে আছে ঈশ্বরদির ওপাশে পদ্মানদীর ওপরের বিখ্যাত সাড়া ব্রিজ, যার একপাশে পাকশি একপাশে ভেড়ামারা। কিন্তু ট্রেন এখন তার উল্টো দিকে। পদ্মা থেকে যমুনার দিকে চলেছে।

ছোট নদীর জলে নৌকো। খেয়ার নৌকো আছে। গয়নার নৌকো, যা, একালের বাসের মতন, একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়, মাথা প্রতি নির্দিষ্ট ভাড়া মোটামুটি নির্দিষ্ট সময়ে ছাড়ে পৌঁছে। তাছাড়া সাধারণ ছইওলা নৌকোও ঘাটে ঘাটে বাঁধা রয়েছে। এগুলো সাধারণভাবে গৃহস্থবাড়ির ব্যবহারের জন্যে। এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে, এই অঞ্চল থেকে ওই অঞ্চলে যাতায়াতের একমাত্র বাহন নৌকো। হাসপাতালের রোগী, আদালতেব মক্কেল থেকে সলজ্জ নতুন বৌ এই বাঁশের ছইওলা নৌকোতেই তাদেব যাতায়াত। পানসি নৌকোও রয়েছে। সম্পন্ন গৃহস্থদের, তালুকদার, জমিদার জোতদাবদের নৌকো,, এগুলো বাঁশের ছইয়ের নয, কাঠের ছাদ বেলিং দেওয়া। দরজা জানলা, অন্দর-বাহিব আছে।

সাদা পালের মাথা ছুঁযে যাচ্ছে ধবল বক। আকাশে কালো মেঘের সারি। মাথায় লাল গামছাবাঁধা একলা মাঝি লগি হাতে গলুইযে বসে। যেন পটে আঁকা ছবি।

ভরা বর্ষায রাস্তা বলতে কিছু থাকে না। এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি, এ পাড়া থেকে ও পাড়া, যাতায়াতের একমাত্র উপায় হল ডিঙি নৌকো কিংবা কলাগাছের ভেলা। ডিঙি নৌকো অবশ্য সাদা পাল টাঙিয়ে নদী পারাপারও হয়।

এসব দৃশ্য শুধু ট্রেনে যেতে যেতে নয়, এবার ট্রেন থেকে নেমে গ্রামের মধ্যে সেবা কাজ করতে গিয়ে দেখেছে বিপিন।

বিপিন একটু কবি স্বভাবের। ইস্কুলে পড়ার সময় জসীমউদ্দীনের 'নকশি কাঁথার মাঠ' বইটি সাঁতারে ফাস্ট হয়ে প্রাইজ পেয়েছিল। সেই থেকে কবি জসীমউদ্দীনের সে অল্প অনুরাগী, বিশেষ করে 'রাখালী' পড়ার পর থেকে, 'কাজলতলার হাটে গিয়ে, আনব কিনে পাটের শাড়ি। ওগো বালা, গাঁয়ের বালা, যাবে তুমি আমার বাড়ি।'

কলকাতায় কলেজে পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে বিপিনের মনে গ্রামবাংলার একটা পুরনো ছবি ভাসত যার সবটা সত্যি নয়, খাঁটি নয়। সেটা বাইরের ছবি, অনেকটা স্মৃতি ও কল্পনা জড়ানো, শ্যামল সৌন্দর্যে ভরা। কিন্তু তার ভিতরের পল্লীবাংলায দুঃখ দারিদ্র্যের, বেদনার কোনো ছায়া নেই। এবার রেডক্রশের দলের সঙ্গে ভিড়ে কিছুটা রূঢ় সত্যের মুখোমুখি হল বিপিন। কিন্তু তখনো তার মনে আছে,

> কলমি ফুলের নোলক দেবো।
> হিজল ফুলের দেবো মালা।
> মেঠো বাঁশি বাজিয়ে তোমায়
> ঘুম পাড়াবো গাঁয়ের বালা।

এসব কথা অবশ্য প্রভাসকুমার জানেন না। তিনি ইপিনের চিঠিতে যেদিন জানতে পারলেন বিপিন ঈশ্বরদি স্টেশনে নেমে রেডক্রশের দলের সঙ্গে বন্যাত্রাণে গিয়েছে সেদিনই খুব চিন্তায় পড়েছিলেন।

সে চিন্তা আরো ঘনীভূত হলো পরের দিন যখন পাবনা থেকে তাঁর দূর সম্পর্কের এক

মামাতো ভাইয়ের টেলিগ্রাম এলো বিপিন গ্রেপ্তার হয়েছে এই খবর বহন করে।

বিপিনের অবশ্য সেরকম কোনো দোষ ছিলো না।

ত্রাণের কাজ করতে গিয়ে খুন-রাহাজানি বা কোনো ফৌজদারি অপরাধ সে করেনি। সে হিন্দু যুবক এবং ভারতীয় নাগরিক। এই পরিচয় তার বিপদের কারণ হয়েছিল।

প্রথম দিন দুপুর নাগাদ সেবাদলটি সিরাজগঞ্জের কাছেই সলপ স্টেশনে এসে নামে। স্টেশন মাস্টারের ঘরের পাশেই একটা টিনের ছাউনি দেওয়া ফাঁকা ঘর, সেইখানে রেডক্রশের দলের জায়গা হল।

কঠোর পরিশ্রম করলো বিপিন। আগে স্টেশনের সেবাকেন্দ্র সাজিয়ে গুছিয়ে কাঁধে ওযুধের বাক্স তুলে দলের সঙ্গে একটা নৌকোয় উঠে চিতলমারি নামে একটা গ্রামে গেল। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেলো ঝড়ের প্রকোপ ওদিকেই খুব বেশি হয়েছিল। তাছাড়া জায়গাটাও জনপদ থেকে একটু বিচ্ছিন্ন।

বিরাট একটা বিল পার হয়ে যেতে হয়। বিলের জলে থরে থরে শালুক আর পদ্মফুল। বিলের মাঝামাঝি থেকে এপারে ওপারে কোনো গ্রামগঞ্জ চোখে পড়ে না। এমনকি কোনো নৌকো পর্যন্ত না।

বড় বড় কালো জলের ঢেউ উঠছে বিলের মধ্যে, ঠিক সমুদ্রের মত না হলেও রীতিমত উত্তাল, প্রায় আকুল পাথার বলা চলে।

সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় চিতলমারিতে পৌঁছানো গেলো। জায়গাটা পুরোপুরি জেলে আর নিকারিদের গ্রাম। প্রায় সবাই মাছ ধরে, মাছ বেচে খায়, কেউ কেউ নৌকো চালিয়ে।

চিতলমারিতে পৌঁছে দেখা গেল যতটা শোনা গিয়েছিল ঝড়ের অত্যাচার তেমন হয়নি। দুচারটে পুরনো গাছ, একটা আটচালা ঘর অবশ্য মুখ থুবরে পড়ে গিয়েছে। আর একটা গোয়ালঘর চাপা পড়ে একটা বাছুরও মারা গেছে।

তবে গুজব রটার একটা কারণ আছে। ওই ঝড়ের দিন বিলের মধ্যে চিতলমারির একটা জেলে নৌকো ডুবে গেছে। তাতে সাতজন লোক ছিল, জেলে নিকারি, হিন্দু-মুসলমান উভয়েই ছিল, সকলেই চিতলমারির। এখনো কারো খোঁজ নেই।

সেদিন রাতে চিতলমারির পাঠশালা ঘরে বিপিনদের জায়গা হল। পাঠশালা ঘর রয়েছে। পাঠশালা কিন্তু অনেককাল উঠে গেছে। আগের মাস্টারমশাই পার্টিশনের পরে কয়েক বছর ছিলেন এখন কিছুদিন হল ওপারে চলে গেছেন। নতুন মাস্টামশাই আর পাওয়া যায়নি। শুধু চিতলমারি পাঠশালায় নয়, সেই সময়ে সারা পূর্ব পাকিস্তানের পাঠশালায়, স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারমশায়ের টান পড়েছিল, সংখ্যালঘু শিক্ষকেরা দলে দলে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ায়।

এসব কথা প্রাসঙ্গিক নয়। তবে এসব কথা নিয়ে এক সময় প্রভাসকুমার খুব মাথা ঘামিয়েছেন। বিপিন কখনো মাথা ঘামায়নি।

বিপিনের শুধু মনে আছে পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙলে পাঠশালার খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেয়েছিল একটা নাম না জানা লতা সামনের পুরনো আমগাছ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। সেই লতা থেকে গোল গোল লাল ফল ফুটছে আর একপাল টুনটুনি পাখি লতায় দোল খেতে খেতে সেই ফল ঠোকরাচ্ছে।

আমগাছতলায় একটা চাঁদকপালি ছাগল গলায় দড়ি বেঁধে খুঁটিতে পুঁতে দিয়ে গেল রঙিন ডুরে শাড়ি পরা এক কিশোরী। তার নাকে রুপোর নোলক। সে ছাগলটাকে বেঁধে রেখে আমগাছের পেছনে গিয়ে একটু পরে দুই কোলে দুই ছাগলছানা নিয়ে এসে মায়ের কাছে ছেড়ে দিল।

এখনো ভাল করে হাঁটতে শেখেনি বাচ্চারা হয়তো দুয়েকদিন আগে জন্মেছে। তাদের মায়ের গায়ের রং কপাল ছাড়া সব জায়গায় কুচকুচে কালো কিন্তু তারা দুজনেই পুরোপুরি সাদাকালোয় মেশানো। এতদিন পরে বিপিন এখনো মনে করতে পারে।

আমগাছের একটু পিছনেই একটা খোড়া বাড়ি, ওই বাড়িতেই কিশোরী ফিরে গেল।

এর মধ্যে আলো-ছায়া মেশানো মেঘভাঙা রোদ উঠেছে। সব কিছু কেমন ছায়া ছায়া। একটু পরে সেই নোলক পরা কিশোরীটি হই চই করে একপাল হাঁস নিয়ে বিলের দিকে গেলো মুথি ঘাসের মধ্য দিয়ে পায়ে চলা পথ ধরে। ভাড়াটে নৌকো বিলের ঘাটে বাঁধা ছিলো। সকালবেলাতেই গ্রামের লোকদের কাছে কিছু ওষুধ-পথ্য রেখে বিপিনরা ফিরে এলো সেই হাঁসে চলার পথ ধরে। বিলের ঘাটে দাঁড়িয়ে কিশোরীটি অনেকক্ষণ বিপিনদের নৌকো চলে যাওয়া দেখলো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা এত কাব্যময় ছিল না। টেলিগ্রাম করে, পাবনা থেকে মামাতো ভাই জানালেন, 'Bepin Arrested in Amtala. Come Sharp'

ব্যাপারটা বেশ জটিল। পরের দিন দুপুরে দলের লোকদের সঙ্গে আমতলা বলে একটা গ্রামে নদীর ঘাটে স্নান করতে নামার সময় বিপিনের গলায় পৈতে পাঞ্জাবি কর্তার নজরে পড়ে। বিপিনকে জিজ্ঞাসা করতে বিপিন কবুল করে যে সে হিন্দু ব্রাহ্মণ। এর কয়েক ঘণ্টা পরে বিপিন 'ভারতীয় গুপ্তচর' বলে পুলিশের দ্বারা গ্রেপ্তার হয়।

এরকম সেসময় অনেক হয়েছে। কারণে-অকারণে একটা ইণ্ডিয়া ফোবিয়া ক্রমবর্ধমান ছিলো। সেবার অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বহু ধরাধরি করে মুচলেকা দিয়ে বিপিনকে ছাড়িয়ে কলকাতাতে ফেরত পাঠাতে হয়।

অবশ্য এই প্রথম বটে, কিন্তু শেষ নয়।

এর পরেও আরেকবার পাকিস্তানে জেল খেটেছে বিপিন।

সেটা উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে ভারত-পাকিস্তান প্রথম যুদ্ধের বছর। ইপিনের স্ত্রী মেনকা সন্তানসম্ভবা। প্রথম গর্ভ, সাবধানতার প্রয়োজন আছে।

কলকাতায় থাকে শুধু ইপিন আর তার স্ত্রী মেনকা। আগের বছরই জাতগোত্র মিলিয়ে সম্বন্ধ করে পাত্রী দেখে প্রভাসকুমার আর স্মৃতিকণা গিয়ে ইপিনের বিয়ে দিয়ে এসেছেন। তারা ভাড়াবাড়িতে আছে।

বিপিন অবশ্য ইপিনের সঙ্গে থাকে না। সে থাকে শ্রীরামপুরে।

মেনকাদের বাপের বাড়িতে কি একটা কুসংস্কার আছে গর্ভবতী কন্যাকে পিত্রালয়ে না রাখার, তাহলে নাকি নবজাতকের অমঙ্গল হয়, কয়েকবার নাকি আগেকার দিনে মৃত সন্তানও জন্মেছে।

সুতরাং সেখানে যাওয়ার কথা ওঠে না। স্মৃতিকণাই যাবেন পুত্রবধূর দেখাশোনা করতে।

এর মধ্যে বেশ কিছুদিন বিপিনের বাড়ি যাওয়া হয়নি। কয়েকবার চিঠিপত্র চালাচালি করে ঠিক হল বিপিন যাবে মাকে নিয়ে আসতে। মেনকার বাচ্চা হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ দুর্গাপুজো

নাগাদ। মহালয়ার দিন পনেরো আগে বিপিন অফিসে ছুটি নিয়ে বাড়ি গেলো।

স্মৃতিকণা কাবলি ছোলা ভাজা ভালবাসেন আর কলকাতার ভাল দার্জিলিং চা। প্রভাসকুমার ভালবাসেন মশলা পাঁপড়, খেজুর। এগুলো ওখানে পাওয়া যায় না।

ইপিন বিপিন দুভাই যখনই দেশে যেত এগুলো খুঁজে পেতে মা বাবার জন্যে নিয়ে যেত। নিতান্তই সামান্য জিনিস সোনা-দানা, ভাং-চরস, চোরা-বন্দুক নয়। কিন্তু ওর জন্যেও সে সময়কার কুখ্যাত দর্শনা বানপুরে কম ঝামেলা পোহাতে হয়নি, কম অপমান হয়নি, সীমন্তের আবগারির লোকদের হাতে।

সে সব কথা বলে লাভ নেই। কঠিন কথাটা এই যে সেবার নিগ্রহের চূড়ান্ত হয়েছিল।

বিপিন পৌঁছানোর পর স্মৃতিকণা পাঁজি দেখে ঠিক করেছিলেন যে মহালয়ার আগে পিতৃপক্ষে নয়, দেবীপক্ষ পড়ার পর শনিবার দ্বিতীয়ায় শুভযাত্রা করবেন কলকাতার উদ্দেশ্যে।

তার আগে অবশ্য প্রস্তুতিপর্ব সমাধা করেছিলেন পোয়াতি বৌয়েব জন্যে। যদিও দেরি হয়ে গেছে এক বাক্স আমসত্ত্ব, নতুন জরিপাড় টাঙ্গাইল শাড়ি, নবজাতকেব জন্যে গোটা পনেরো খুব নরম কাপড়ের কাঁথা সব সাজানো গোছানো শেষ।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণা হল। ঠিক হঠাৎ নয়। দুপক্ষই অনেকদিন ধরে তাল ঠুকছিল আর পাঁয়তারা কষছিল। কিন্তু কেউ ভাবেওনি আসল যুদ্ধ হবে।

এইতো কয়েকমাস আগে কচ্ছের উপকূলে গজ কচ্ছপের লড়াই হয়ে গেল, গুলিগোলা, হাতাহাতি মাবামারি, আন্তর্জাতিক চেঁচামেচি কিন্তু ঘোষিত যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াযনি।

মোটামুটি সবাই ধরে নিয়েছিল এইবকমই চলবে। কিন্তু এবাব তা হল না। এতদিন অঘোষিত লড়াই চলছিল। এবার যুদ্ধ ঘোষিত হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে দুদেশের মধ্যে লেনদেন, যাতায়াত, সীমান্ত, এমনকি চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম বন্ধ। কোনো খবর ইপিনেব কাছে কলকাতায় পাঠানো গেল না।

বিপিন আটকিয়ে পড়ল। প্রথম দুদিন বাড়িতেই ছিল। তৃতীয় দিন থানা থেকে পুলিশ এসে 'পাকিস্তান রক্ষা আইনে' তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। এবং সে শুধু একাই নয়। যত ভারতীয় হিন্দু নাগরিক সে সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে ছিল তা ছাড়াও কিছু রাজনৈতিক নেতা গ্রেপ্তার হল। বিভিন্ন জেলে তারা সাধারণ কয়েদিদের মত লাপসি ও মশার কামড় খেয়ে, তাদের সঙ্গে এক কম্বলে শুয়ে কারাবাস করতে লাগল।

তবে বিপিনসহ অন্য ভারতীয় নাগরিকেবা একটু সুখেব মুখ দেখেছিল দিন পনেরো পরে। তখন যুদ্ধ থেমে গেছে। দুপক্ষই বলেছে, 'আমরা জিতেছি।' তবে কোনো সন্ধিচুক্তি হয়নি।

সেই সময় জাতিপুঞ্জ প্রেরিত তত্ত্বাবধাযকেরা এলেন। তাঁরা পাকিস্তানে আটক ভারতীয়দের আন্তর্জাতিক বিধি অনুসারে যুদ্ধবন্দী ঘোষণা করলেন।

সারা পূর্ব পাকিস্তানে জেলা মহকুমায় বিভিন্ন কারাগারে যে ভারতীযরা আটক ছিল তাদের একত্রে রাখা হল ময়মনসিংহের কাছে মুক্তাগাছার মহারাজার বিশাল প্রাসাদে

আশ্বিন মাস এসে গেছে। কয়েকদিন মেঘবৃষ্টি কিছু নেই। আকাশ ঝকঝকে, রাতের আকাশ ঝলমল করে পালিশ করা তারার আলোয়। আকাশে আলগোছে ভেসে বেড়ায় হালকা সাদা মেঘ।

বাড়িতে, আশেপাশের বাড়িতে ছোটবড় সব শিউলি গাছে সারারাত আঝোরে শিউলি ঝরে পড়ে, সেই সঙ্গে শরতের শিশির।

বিপিন আটকিয়ে গেছে বাড়িতে। যাতায়াত রেল, বিমান, সড়কপথ সব বন্ধ। মিটে যাবে, মিটে যাবে। এ রকম গোলমাল দুদেশের মধ্যে নিয়মিত হচ্ছে, এবারও সেই রকম নৈমিত্তিক ব্যাপার মনে হয়েছিল।

কিন্তু ক্রমশ সব কিছু জটিল হতে হতে অবশেষে একেবারে যুদ্ধ লেগে গেল। এদিকে পূর্বপ্রান্তে তেমন নয়, আসল যুদ্ধটা পশ্চিমে, মূলত পাঞ্জাবের সীমান্তে ট্যাঙ্কে-ট্যাঙ্কে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই।

এরই ফল স্বরূপ ব্ল্যাক আউট, ইমার্জেন্সী, নানা কালা কানুন। আসল বা নকল গুপ্তচরের জন্য তল্লাসি গ্রেপ্তার। দু পাশেই, দু দিকেই প্রায় এক ব্যাপার। বহু নির্দোষ মানুষ নির্বিচারে জেলে চলে গেলো।

পূর্ব-পাকিস্তানের ছোট শহরে, গ্রামেও ব্ল্যাক আউট। সন্ধ্যা হতে না হতে জানলা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে যথাসম্ভব আলো না জ্বেলে, জ্বাললেও সে আলো যেন বাইরে থেকে দেখা না যায়—এইভাবে রাত কাটানো। রাস্তাঘাট দোকানপাটও অন্ধকার।

সন্ধ্যার পর বাড়ির লোকদের সঙ্গে বিপিন বাড়ির মধ্যে ভিতরের বারান্দায় বসে থাকতো। পাড়ার লোকেরা পুরানো বন্ধুবান্ধবেরা কেউ কেউ আসে। নিচু গলায় গল্পগুজব হয়।

গল্পের চেয়ে গুজবই বেশি। কলকাতার হাওড়া ব্রিজ বোমায় ধ্বংস হয়ে গেছে। নিউ মার্কেট, রাইটার্স বিল্ডিংস পড়ে গেছে। এই এক রকমের গুজব।

আরেক রকমের গুজব, পাকবাহিনী রণে ভঙ্গ দিয়েছে। ভারতীয় সৈন্য সাতক্ষীরা, হিলি, আখাউড়ার পথে মার্চ করতে করতে এগিয়ে আসছে।

সন্ধ্যার পর চারদিক নিঝুম অন্ধকার হয়ে আসে। আশেপাশের ঝোপঝাড়ে উঠোনে, দালানের পিছনে জোনাকিগুলো টিপটিপ করে।

সেদিন চর্তুদশী পড়ে গেছে। কৃষ্ণা চর্তুদশী বোধহয় শেষরাতে লাগবে। রাস্তার মোড়ে কালীবাড়ীতে ঠাকুরঘরে একটা ক্ষীণ আলো তিরতির করে জ্বলছে। কাল মহালয়া। অন্য বছর ঢাকীরা এ সময় দল বেঁধে এসে যায়। কালীবাড়ীতে অনেক রাত পর্যন্ত জোড়কাঠিতে ঢাক বাজে, হ্যাজাক জ্বলে।

বারান্দায় চুপচাপ কথা বলে ইপিন ও তার বন্ধুরা। অন্ধকার ও নীরবতা গাঢ় হয়ে আসে। শুধু ওপরে শরতের আকাশে ছায়াপথটা এই দেবীপক্ষের আগেই একেবারে দুধের মত সাদা হয়ে উঠেছে। দু-একটা নিশাচর পাখি তারাভরা আকাশ আর ক্ষুদ্র ছায়াপথের নিচে ওড়াউড়ি করছে।

বিপিন খুব একটা আশঙ্কা করেনি। কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই প্রভাসকুমার ভয় পাচ্ছিলেন, তিনি বুঝতে পারছিলেন বিপিনের এখন এখানে থাকা নিরাপদ নয়।

কিন্তু যাবেই বা কোথায়। যুদ্ধের সময় সীমান্ত দিয়ে পালিয়ে যাওয়া একেবারেই নিরাপদ নয়। এদিকে যুদ্ধ কবে থামবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই।

কয়েকদিন আগেও রাত এগারোটা-সাড়ে এগারোটা নাগাদ রাতের খাওয়াদাওয়া হতো। রান্নাঘরের বারান্দায় একটা পুরনো ডুমলণ্ঠন জ্বালিয়ে। তখনো শহরে ইলেকট্রিসিটি আসেনি, খাওয়ার জন্য টেবিল-চেয়ারও চালু হয়নি। প্রভাসকুমারের বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, সেও অনেকদিন আগের কথা, তিনি একটা গোল শ্বেতপাথরের টেবিলে খেতেন। এখনো তেমন অভ্যাগত এলে তাঁকে ঐ টেবিলে খেতে দেওয়া হয়। বাকিরা সবাই রান্নাঘরের বারান্দায় কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি পেতে খায়। মুহুরিবাবুরা, বাড়ির লোকেরা, বাইরের কেউ থাকলে পুরুষমানুষেরা সবাই বাড়ির কর্তা সমতে এক জায়গায় নৈশভোজন।

যুদ্ধ লাগার পর থেকে রাতের খাওয়ার সময় অনেক এগিয়ে এসেছে। রান্নাঘরের বারান্দায় নয়, দালানের মধ্যের ঘরের মধ্যে একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাস্তার দিকের জানলা বন্ধ করে কোনো রকমে খেয়ে নেওয়া হয়।

আনসারের খুব উৎপাত। আনসার মানে স্বেচ্ছাসেবক আনসার বাহিনীর সদস্য। সন্ধ্যার পর কোনো বাড়ি থেকে সামান্য আলোর আভাস পেলে, বিশেষ করে সেটা যদি হিন্দুর বাড়ি হয়, সেখানে গিয়ে হুমকি দেবে, হমবি-তমবি করবে, পারলে গৃহস্থের কাছ থেকে কিছু ঘুষও খাবে। এমন কি একদিন কালীবাড়িতে সন্ধ্যারতির সময় আলো বাইরে দেখা যাচ্ছে বলে হামলা চালায়।

আজো দালানের ভিতরের ঘরে জানলা-দরজা ভেজিয়ে পিঁড়ি পাতা হয়েছে। রান্নাঘরে আমকাঠের উনুন জ্বলে। এ অঞ্চলে বলে আখা। সেই আখার আলোও কিছু কম নয়। যাতে সে আলোও বাইরে না যায়, সে জন্য রান্নাঘরের দরজাও উনুন জ্বালার সময় ভেজিয়ে রাখা হয়।

আজ দুপুরে বিপিন বাজারে গিয়েছিল। স্কুলে পড়ার সময় বাড়ির বাজার সে নিজেই করত। একটু বড় হওযার পর থেকে তারপরেও ছুটিতে বাড়ি এলে এখনো সেই বাজার করে। আসলে সে বাজার করতে ভালোবাসে, খেতেও ভালোবাসে।

এবারে এসেও বিপিন প্রায় প্রতিদিনই বাজাব করেছে। বাজারেব দোকানদাররা অনেকেই তার চেনা। দোকানদাররা সবাই এই শহবের কিংবা আশেপাশের গ্রামের লোক। খদ্দেবদের অনেককেই তারা পারিবারিক সূত্রে বংশানুক্রমে চেনে। বাজাবে গেলে বিপিনকে তাবা জিজ্ঞাসা কবে, 'বিপিনদা কবে এলেন?' 'বিপিন কবে যাবে?' 'ইপিনদা কেমন আছে?'

পুরানো দিনের সম্পর্কের এই সব ছোটখাট মধুর সংস্পর্শ বিপিনেব ভালো লাগে। কলকাতায় ঠিক এমন হয় না। সেখানে কে কাকে চিনতে চায়, কে কার খোঁজ রাখে। বাজারেব দোকানদার ব্যবসার খাতিরে হয়তো চেনা খদ্দেরকে দু-চাবটে ঘরোয়া ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞাসা করে, বলে 'স্যার অনেকদিন আসেন নি,' বৌদি অনেকদিন আসেন নি।' এসব ঠিকই আছে। কিন্তু কোথায় যেন আন্তরিকতার অভাব রয়েছে, প্রাণের ছোঁযা নেই।

বাজারের মালিক ছিলেন সন্তোষের রাজারা। যোলো আনা জমিদারি লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমল থেকে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে অনেকদিন আগেই ভাগ হয়ে পাঁচ আনা-ছয় আনা হয়ে গেছে। লোকেরা মুখে মুখে বলতো পাঁচআনি, ছয়আনি।

শহরের বাজারের রাস্তা মসজিদের সামনে থেকে রওনা হযে লৌহজং নদীর ঘাট পর্যন্ত চলে গেছে। সেই রাস্তার একপাশে পাঁচ-আনি অন্য পাশে ছয় আনি বাজার।

পাঁচআনি বাজারে বিক্রি হয় পানসুপুরি, দুধ আনাজ-তরকারি, চাল-ডাল, মুড়ি-মুড়কি, বাতাসা-গুড়। অল্পসল্প মুদি-মসলার দোকান, দুটো মাংসের দোকান এবং সবশেষে মাছের বাজার।

ছযআনি বাজারের চেহারা অনেকটা শহুরে। সেখানে মণিহারি জিনিসের ঝমমকে দোকান। মিষ্টির দোকান। ঘড়ি আর কলমের, সাইকেলের বাজার। তা ছাড়া রয়েছে বড় বড় বকম্দি দোকান। বইয়ের দোকান, ওযুধ, ডাক্তার।

বিপিনের মনে আছে ছয়আনি বাজারের মধ্যখানে ছিলো গঙ্গাধর পোদ্দার এ্যাণ্ড সনসের ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর। কলকাতার কমলালয় বা ওয়াছেল মোল্লা নিশ্চয় নয়। কিন্তু সেই অজ মফঃস্বলে দোতলা দালানের দোকান, যার মধ্যে দিয়ে চওড়া রাস্তা, দুপাশে একেক রকম দ্রব্য-সম্ভার। এমন সুন্দর দোকানটা কবে উঠে গেলো বিপিনের মনে পড়ে না। দেশ ভাগ হওয়ার পরেও বেশ কিছুদিন ছিলো। পরে একবার গরমের ছুটিতে বাড়িতে ফিরে দেখলো দোকানটা বন্ধ। মালিকেরা নবদ্বীপে না কোথায় যেন চলে গেছে।

বিপিনের প্রিয় জায়গা মাছের বাজার। বিপিন খুব মাছ ভালবাসে বলেই যে এ রকমটা তা নয়। ইপিন-বিপিন দুজনেই মাছের ভক্ত, মা স্মৃতিকণার কাছ থেকে জন্মসূত্রে এই অনুরাগটা তারা পেয়েছে। কলকাতায় চলে আসার আগে ইপিন-বিপিন আমিষ বলতে বুঝতো মাছ, শুধুই মাছ। ডিম বা বাংস নয়। ছোটবেলায় কালেভদ্রে তারা ডিম বা মাংস খেয়েছে। মুরগি ছিল রীতিমত নিষিদ্ধ।

খুব অল্প বয়েসের কথা বিপিনের আবছা আবছা মনে আছে। তখন তার ঠাকুমা বেঁচে ছিলেন। একবার পিছনের ডোমপাড়া থেকে কি করে একটা মুরগি ডোবার ধার ধরে এসে পিছনের বাড়ির বেড়া ডিঙিয়ে, তাদের বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে উঠোনের মধ্যে চলে এসেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। ঝি-চাকর-মুহুরিবাবু-মক্কেল সবাই মিলে 'হুশ-হুশ' করে মুরগিটাকে তাড়া করে, ফলে মুরগিটা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দালানের মধ্যে পুজোর ঘরে ঢুকে ঠাকুরের আসনের নিচে লুকিয়ে পড়ে।

এর পরে সত্যিকাবের হুলুস্থুল কাণ্ড হয়েছিল। সেদিন এবং তার পরের দিন অন্তত দু হাঁড়ি গোবর গোলা জল ছিটোনো হয়েছিল বাড়িটাকে শুদ্ধ করতে, ম্লেচ্ছতা মুক্ত করতে।

মাছের বাজারে প্রায় সবাই বিপিনকে চেনে। এই বাজারটা বিশেষ বদলায়নি। তার প্রধান কারণ এই যে এই বাজারটা চালায় দক্ষিণ পাড়ার নিকারিরা। তারা সবাই জাতে মুসলমান। মাছ ধরা ও মাছ বেচাই বহুকাল ধরে তাদের পূর্বপুরুষদেব ব্যবসা।

বিপিনের মনে আছে এক সময়ে নিকারিদের নিকারি বললে তারা অপমান বোধ করত, রাগ করত। কিন্তু পরে আর এরকম দেখেনি।

নিকারি পাড়ার অনেক ছেলেমেয়ে পাঠশালায় বিপিনের সঙ্গে পড়েছে। ছেলেরা কেউ কেউ পরে স্কুলেও নিচের দিকে দুয়েক ক্লাশ তার সঙ্গে পড়েছে। তবে বেশি পড়াশুনো এ সমাজে চল নেই।

বিপিনের সঙ্গে পড়েছে বা ফুটবল খেলেছে এমন বেশ কয়েকজন এখন মাছের বাজারে বসে। তারা বিপিনকে বাজারে দেখলে আন্তরিক খুশি হয়। জিজ্ঞাসা করে, 'এবার কয়দিন থাকবে ?' কিন্তু এই পর্যন্তই, সামান্য সুযোগ পেলে ঠকানোর চেষ্টার কসুর করে না, বোধহয় সেটা স্বভাব দোষেই। বিপিন সেটা বুঝতে পারে বলেই, মুখে বলে, 'তুমি কবেকার পুরনো দিনের দোস্ত, তোমারে আমি ঠকাতে পারি।'

যুদ্ধের বাজারে জিনিসপত্রের দাম তরতর করে চড়েছে। দামটা পুরোপুরি কারণে বেড়েছে তা নয়, বেশির ভাগ অকারণে হুজুগে বেড়েছে। এ সব পাকা ব্যবসায়িক হুজুগ, এর সঙ্গে সাধারণ লোক পেরে ওঠে না।

এ বছর মাছের বাজারে মাছের চালান বেশ ভাল। বিশেষ করে ইলিশ মাছ। পুজোর আগে আগে এখন যমুনা আর ধলেশ্বরী থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ ধরা পড়ছে। সে সবই আসছে শহরের বাজারে।

এদিকে পদ্মা-গঙ্গার ইলিশ আসে না। কাছাকাছি তেমন কোনও বড় বাজারও নেই। ধলেশ্বরী-যমুনার যা কিছু মাছ এ দিকেই থাকছে। যুদ্ধের আগে থেকেই কলকাতার চালান বন্ধ।

বাজারে মাছের অভাব না হলেও মাছের দাম খুব চড়া। দুয়েক বছর আগে যে ইলিশ বিপিন দেড়টাকা বা দু টাকায় কিনেছে এবার তার দাম ছিল তিন-সাড়ে তিন টাকা। এদিকে সরষের তেলের দাম আড়াই টাকায় উঠে গেছে।

অবশ্য দাম বাড়া-কমায় বিপিনের খুব ভাবনা নেই। প্রভাসকুমারের রমরমা প্র্যাকটিশ, বাজার

খরচের টাকার কোনও অকুলান হওয়ার কথা নয়।

আজ বাজার থেকে প্রায় দু'সের ওজনের দু'টো বড় ইলিশমাছ সাড়ে সাত টাকায় এনেছিল বিপিন। দুপুরে ভাজা আর লঙ্কাবাটা ঝোল হয়েছিল। সেই সঙ্গে একটা মাছের মাথা দিয়ে কচুর শাক। রাতের জন্যে আরেকটা মাথা রেখে দেওয়া হয়েছে। অত বড় মাথা কেউ একলা খাবে না।

স্মৃতিকণা খুব যত্ন করে চালকুমড়ো দিয়ে এই মাথাটা নিজের হাতে রান্না করেছেন। সঙ্গে সবষে বাটা মাছের ঝোল। খুব ঘন, গাঢ়।

রান্নাঘর থেকে গরমভাতের ঘ্রাণ আসছে। জিনিসপত্র ভিতরের কোঠায় খাওয়ার জায়গায় নিয়ে আসা হচ্ছে। পিঁড়ি পাতা হয়ে গেছে। থালা, গেলাস দেওয়া হচ্ছে।

বিপিনের বন্ধুরা সব একে একে চলে গেছে। এর মধ্যে একজন বলে গেল, বি বি সি-তে নাকি বলেছে যে দু পক্ষই নাজেহাল, দুয়েকদিনের মধ্যেই যুদ্ধ থেমে যেতে পারে।

বন্ধুরা চলে যাওয়ার পরে এই সুখবরটা স্মৃতিকণাকে দেওয়ার জন্যে বিপিন রান্নাঘরে ঢুকলো। স্মৃতিকণা এ কয়দিন খুবই উৎকণ্ঠিত রয়েছে যতটা বিপিনের জন্যে তার চেয়ে বেশি ইপিন আব ইপিনের বৌযের জন্যে। বাচ্চাটা জন্মানোর সময তো এসে গেল।

বিপিন যখন রান্নাঘরের বারান্দায গিযে দাঁড়িয়েছে বাইরের উঠোনে একটা সাইকেল রিকশা থামাব শব্দ হলো। উঠোনে টর্চের আলো পড়ল। থানা থেকে এক জমাদার আর সেপাই এসেছে। বিপিনকে বড়বাবু ডাকছেন।

প্রভাসকুমার কাছারিঘর থেকে শব্দ ও কথাবার্তা শুনে বেরিয়ে আসতে জমাদার ও সেপাই দুজনেই তাঁকে চিনতে পারল। সরকার পক্ষেব অনেক জটিল মামলাই তাঁব কাছে আসতো।

জমাদার সাহেব উকিলবাবুকে চিনতে পেরে আদাব জানলেন। বললেন, 'থানার বড় সাহেব একটু বিপিনবাবুকে দেখা করতে বলেছেন।'

এবকম ব্যাপারের সঙ্গে প্রভাসকুমারের বেশ পরিচয় আছে। তিনি বললেন, 'বিপিনের যাওযার দবকার কি ? আমিই থানা থেকে ঘুবে আসছি।'

জমাদার সাহেব তখন বললেন, 'না আপনি গেলে তো হবে না। বিপিনবাবুকেই বড় সাহেব ডাকছেন।'

দালানের মধ্যে স্মৃতিকণা চলে গিযেছিলেন উঠোনে পুলিশ দেখে। সেখানে তাড়াতাড়ি ভাত-বাড়ছিলেন।

বিপিন জমাদার সাহেবের কথা শুনে বলল, 'ঠিক আছে। চলুন আমি যাচ্ছি আপনার সাথে।'

স্মৃতিকণা এ কথা শুনে বারান্দায় বেরিয়ে এসে বললেন, 'ভাত খেয়ে যা।'

বিপিন বলল, 'আমি যাব আর আসব।'

কি বুঝে প্রভাসকুমার বললেন, 'আমি তোর সঙ্গে যাই।'

কালীবাড়ির মোড় থেকে একজন একটা রিকশা ডেকে নিয়ে এল। ছেলেকে নিয়ে প্রভাসকুমার থানার দিকে গেলেন। পিছনের রিকশায় থানার লোকেরা।

.

ঘণ্টাখানেক পরে রিক্শা করে থানা থেকে ফিরে এলেন প্রভাসকুমার। রিক্শায় তিনি একা। বিপিনকে থানায় রেখে দিয়েছে।

থানার লোকদের অবশ্য কিছু করার ছিল না। সরকারি নির্দেশে বলা হয়েছে পাসপোর্ট ভিসা নিয়ে যে সব ভারতীয় নাগরিক পূর্ব পাকিস্তানে রয়েছে তাদের যুদ্ধবন্দী হিসেবে গ্রেপ্তার করতে।

বিকেলের দিকে পুলিশের রেডিও মেসেজ এসেছে। অবশ্য পি ও ডাবলু বা পিজনার অফ ওয়ার মানে যুদ্ধবন্দী ব্যাপারাটা যে কি সে বিষয়ে থানার কোনো ধারণা নেই। থাকার কথাও নয়।

সদর থানায় শেষবার যুদ্ধবন্দীর রেকর্ড রয়েছে উনিশ শো পনেরো (১৯১৫) সালে। জার্মান নাগরিক এক আধা ইংরেজ আধা জার্মান। মা জার্মান বাবা ইংরেজ। জুলিয়াস সাহেব, সবাই বলতো জুলি সাহেব পাটের ব্যবসা করতেন। তাঁকে সে সময় ইংরেজ সরকার যুদ্ধবন্দী করে ব্যারাকপুরে না কোথায় যেন চালান দিয়েছিল যুদ্ধবন্দীদের ক্যাম্পে।

সে কথা বা সেই রেকর্ড পঞ্চাশ বছর পরে উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে কারো মনে থাকার কথা নয়।

তবে প্রভাসকুমার ব্যাপারটা জানতেন। তাঁর বাবার কাছে জলি সাহেবের গল্প শুনেছেন। জলি সাহেব যখন যুদ্ধবন্দী হিসেবে গ্রেপ্তার হল তাঁকেও জামিনে খালাস করার চেষ্টা করেছিলেন প্রভাসকুমারের বাবা। তবে সেটা সম্ভব হয়নি। যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারটা আন্তর্জাতিক আইনের প্রশ্ন, ক্রিমিন্যাল কোড, পুলিশের কোডের আওতায় পড়ে না।

আজ থানা থেকে ভাবি মনে বিপিনকে রেখে একা রিকশায় ফিরতে ফিরতে বারবার আনমনা হয়ে যাচ্ছিলেন প্রভাসকুমার।

জুলি সাহেবেকে প্রভাসকুমার চোখে দেখেননি, তবে ছোটবেলায় বাড়িতে বাবার কাছে, মুহুরিবাবুদের কাছে অনেক গল্প শুনেছেন।

লম্বা-চওড়া, সাড়ে ছয়ফুট অতিকায় জার্মান। চুল, ভুরু, গোঁফ লালচে, চোখ নীল। ফুর্তিবাজ, পরিশ্রমী। নারকেল গাছে চড়ে নারকেল পাড়তে পারত জুলি সাহেব। শীতের দিনে খেজুরের গাছে উঠে খেজুরের রস কাটতো। পাটের কোম্পানির বাংলোর পিছনের মাঠে বিঘে তিনেক জমিতে নিজের হাতে গম চাষ করেছিল জুলি সাহেব, নিজে কাস্তে দিয়ে সেই গাছ কাটত।

তখন এ অঞ্চলে গমের চাষও মোটেই ছিল না। চৈত্রমাসের বিকেলে খালি গায়ে কাস্তে হাতে যখন জুলিসাহেব লাল গমের খেতে নেমে ফসল কাটতেন মাঠের ধারে ভিড় জমে যেত দেখার জন্যে।

রাস্তায় আলো নেই। ব্ল্যাক আউট চলছে। এদিকে অমাবস্যা, মহালয়া সামনে, ঘুটঘুটে অন্ধকার। রিক্‌শাতেও আলো জ্বালানো বারণ।

আস্তে আস্তে, খুব সাবধানে সাইকেলের ঘণ্টি টিং টিং করে রিক্‌শাটা এগোচ্ছে। পাঁচ আনি আর ছয় আনি বাজারের মধ্যের রাস্তা দিয়ে।

রিক্‌শাওয়ালা চেনা। পাড়ারই ছেলে। এই সেদিনো উঠোনে ডাংগুলি খেলত। আফু বলে সবাই ডাকে। পুরো নাম আফজাল। আফজালের বাবা সেলিম আবার বিয়ে করেছে, আফজালেরই এক দূর সম্পর্কের মাসীকে। মেয়েটি ওদের বাড়িতেই আশ্রিতা ছিল।

সেলিমের ছোটখাট সুতোর ব্যবসা। বাজিতপুরে কাপড়ের হাটে। হাটবার একদিন। কিন্তু সুতো কেনাবেচায় দৌড়োদৌড়ি বাজারে পাইকারের গদিতে তাঁতির বাড়িতে সারা সপ্তাহ ধরেই চলে।

সেলিম আবার বিয়ে করে নতুন বৌকে নিয়ে বাজিতপুর হাটের পাশে ঘর নিয়েছে। আফুর মাকে অবশ্য তালাক দেয়নি। আফুর আরো তিন-চারটি ছোট ভাই-বোন, তার মধ্যে একটি মাত্র তিন মাস বয়েসের।

আফুর মা এখন লোকের বাড়িতে কাজ করে। বাসনমাজা, কাপড়কাচা। আফু রিক্‌শা চালানো আরম্ভ করেছে।

রিক্‌শা চালাতে চালাতে এতক্ষণ কোনো কথাই বলেনি আফু। বাজার পেরিয়ে আদালতের

দিকে বাঁক নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো 'বিপিনদাকে ছাড়লো না ?' প্রভাসকুমার দায়সারাভাবে বললেন, 'হুঁ।'

আফু এবার বিজ্ঞের মতো বললো, 'কাল ছেড়ে দেবে নিশ্চয়। বিপিনদাতো দোষ কিছু করেনি।'

রাস্তার সামনে একগাদা কুকুর শুয়ে ছিলো। পাশেই মিঠাই পট্টি। এদিকে কুকুরের খুব ভিড়। অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না। একটা মিশমিশে কালো কুকুর রিক্শার সামনের চাকার নিচে পড়ে কেঁউ-কেঁউ করে দৌড় দিলো। আর একটু সাবধান হয়ে আফু রিক্শার ঘন্টিটা একটু জোরে বাজাতে বাজাতে এগোতে লাগলো।

জুলিসাহেব যুদ্ধবন্দী হয়ে চলে যাওয়ার অনেক জিনিষ চেনাজানা সবাইকে দিয়ে গিয়েছিলেন। জুলিসাহেবের একটা সাইকেল ছিলো প্রভাসকুমারদের বাড়িতে। আনেকদিন আগে সেটা ভেঙেচুবে গেছে। মনে আছে প্রভাসকুমারের সেই সাইকেলে তিনি সাইকেল চড়া শিখেছিলেন। তার ঘন্টাটাও এইরকম টিং টিং বাজতো।

আফুর সাইকেল রিক্শার টিং টিং শব্দে প্রভাসকুমারের সেই কবেকার ভুলে যাওয়া অদেখা জুলিসাহেবের কথা মনে পড়লো।

কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন প্রভাসকুমার। কেমন খারাপও লাগছিল। এই শহরের সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দাদের মধ্যে তিনি একজন। সেই শহরপত্তনের যুগ থেকে তাঁদের পরিবার এই শহরে রয়েছে। পুরুষাণুক্রমে গত তিন পুরুষ তাঁরা এই শহরে জন্মেছেন, বড় হয়েছেন, লেখাপড়া করেছেন। পিতৃপুরুষেরা এই শহরেই দেহত্যাগ করেছেন। এই শহরের শ্মশানে তাঁদের দাহ করা হয়েছে। অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ, বিয়ে, উপনয়ন সব সংস্কার, সব অনুষ্ঠান এখানেই পালিত হয়েছে।

আফু রিক্শা নিয়ে বাড়ির উঠোনে ঢুকে গেছে। খুব ভারাক্রান্ত মনে প্রভাসকুমার রিক্শা থেকে নামলেন। যদিও পঞ্চাশ দূর নয়, সে সময়ে তিনি বেশ শক্ত সমর্থ যুবক। মাথার চুলে পাক ধরেছে কিন্তু শরীর নিরোগ এবং কর্মঠ।

প্রভাসকুমার মনস্থির করে ফেললেন এখানে আর থাকার মানে হয় না। যুদ্ধ নয়, ভারত পাকিস্তান নয়। সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন নয় শুধু একটা কথাই প্রভাসকুমারের মনের মধ্যে নড়াচড়া করছে। তাঁর প্রপিতামহ কালীরাম চৌধুরী, কিংবা পিতামহ বলরাম ভাবতে পেরেছিলেন তাঁদেরই বংশধর এই শহরে বিদেশী অজুহাতে অন্তরীণ হবে। দেশকালের সমস্ত হিসেব কোথায় যেন গোলমাল হয়ে গেছে। ঘটনাটা নির্মম বাস্তব, কিন্তু মেনে নেওয়া যায় না।

মেনে না নিতে পারলে একটাই উপায় কলকাতার বা পশ্চিমবঙ্গে অন্য কোথাও চলে যাওয়া।

পার্টিশনের প্রথম দিকে চলে যাওয়ার কথা অনেকবার ভেবেছেন প্রভাসকুমার। দুয়েক বার মনে মনে বাক্স বিছানাও বেঁধেছেন কিন্তু আর যাওয়া হয়নি।

প্রভাসকুমার মনে মনে পারিবারিক ইতিহাসের কথা ভাবতেন।...আমরা তো আর এখানকার লোক নই।...আমাদের এখানে থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই।...

একদা সেই সতেরো শতকের শেষে সাতকড়ি চৌধুরী যশোহর অঞ্চল থেকে উঠে এসে এই গহন নদীজলের দেশে বাসা বাঁধেন।

সেটা ছিলো মোগল যুগের শেষ পর্যায়। দিল্লির বাদশার বিরুদ্ধে বাঙালি বারো ভুঁইয়াদের বিদ্রোহ। তারপরে এলো বর্গীর অত্যাচার। খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গী এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে ?

লুণ্ঠন, সশস্ত্র আক্রমণ ও লড়াইয়ে মধ্য ও পশ্চিম বাংলা জেরবার হয়ে উঠেছিল। এদিকে

দক্ষিণ বাংলায় সমুদ্র উপকূলও নিরাপদ ছিলো না জলদস্যুদের অত্যাচারে। বর্গী মগ থেকে ইউরোপীয় হার্মাদ, দিনেমার, ওলন্দাজ হানাদারেরা অতর্কিতে, প্রায় বিনা বাধায় লুঠ করে গেছে গ্রামের পর গ্রাম, দিনের পর দিন। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে জাহাজে তুলে নিয়ে গেছে ক্রীতদাস কেনাবেচার হাটে।

সেই সময়ে এবং তারো কিছু আগে থেকে, সম্ভ্রান্ত বনেদি অনেক পরিবারের কর্তা পূর্ববঙ্গের ভিতরে বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন বাংলার নানা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উঠে এসে। গড়ে উঠতে থাকে, নতুন গঞ্জ, নতুন গ্রাম। বিস্তৃত জনপদ।

আরো বহুজনের সঙ্গে সাতকড়ি চৌধুরীও এই অঞ্চলে এসে ভিটে পত্তন করেন। মন্দির, জলাশয় সমেত বিশাল চৌহদ্দি ঘেরা বসতবাটি।

সাতকড়ি নিজে অবশ্য যশোহর ছাড়েননি। তিনি কোনো এক ভুঁইয়ার ভগ্নিপতি ছিলেন এবং সেই দরবারেই অমাত্যের কাজ করতেন, ফলে সেখানেই সেই যশোহরের কালিয়াতেই তাঁকে থাকতে হতো, শুধু দোলের সময় একবার বাড়ি আসতেন। পুরো যাতায়াত জলপথে। সাতকড়ি ক্ষমতাবান লোক ছিলেন। তিনি যে নৌকায় আসতেন তাব আগে পিছে দুটো নৌকা থাকতো। সামনের নৌকায় কাড়া-নাকাড়া বাজতো, কোনো রাজপুরুষ যাচ্ছে এটা বোঝানোর জন্য। আর পিছনের নৌকো ছিলো রক্ষীদের নৌকো।

এসব কথা প্রভাসকুমার ছোটবেলায় বাড়িতে শুনেছেন। পুবনো গ্রমাবাসীদের কাছেও শুনেছেন।

দেশভাগ যখন হচ্ছে, প্রভাসকুমার ভেবেছিলেন, কয়েক পুরুষ আগে সেই যশোহর থেকে যখন এসেছিলাম এতকাল পরে যদি আবার তলপি তলপা গুটোতেই হয় তবে সেই যশোহরেই ফিরে যাবো।

কিন্তু সেটা সম্ভব হলো না। দেশভাগ হতে র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদে দেখা গেলো যশোহর-খুলনাও পাকিস্তানে পড়েছে।

সেই সাতচল্লিশ সালের শেযাশেযি সময় সেটা। পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয়বন্ধুরা ধীরে ধীরে দেশ ছাড়া আরম্ভ করেছে। ইপিন-বিপিন তখন স্কুলে পড়ে। আটচল্লিশের জানুয়ারিতে দেখা গেলো স্কুলের ছাত্রসংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেছে। মাস্টারমশাইরাও যে যার মত দেশ ছেড়েছেন।

তখনো বাসায় অনেক লোকজন ছিলো। বাড়ির লোকজন, মুহুরিবাবুরা, কাজের লোকেরা। আসেজন, যসেজন। দালানের বাইরের বারান্দায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে নানারকম আলোচনা হতো।

পুরনো লোক কারা চলে গেলো। নতুন লোক কারা কোথা থেকে কোন বাড়িতে এলো। আমাদেরও শেষপর্যন্ত চলে যেতে হবে এইরকম সব আলোচনা।

কিন্তু একদিন এ সব আলোচনাও বন্ধ করতে হলো।

থানা থেকে সাদা পোযাকের আই বি পুলিশ এসে প্রভাসকুমারকে বলে গেলো, 'আমাদের কাছে খবর আছে, আপনার বাড়ির বারান্দায় প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলায় পাকিস্তানবিরোধী সভা

হয়, সেখানে চক্রান্ত হয়।'

এরই মধ্যে ছোট ভাই প্রতুলকুমার প্রায় দিনসাতেক নিখোঁজ।

প্রতুলকুমার ছোটবেলা থেকেই একটু খামখেয়ালি স্বভাবের ছিলো। একদিন দুপুরবেলায় দেখা গেলো প্রতুলকুমার খেতে আসেনি। খবর পাওয়া গেলো ঘোড়ার গাড়ি করে তাকে স্টিমার ঘাটের দিকে যেতে দেখা গেছে।

এরপর আর সাতদিন প্রতুলকুমারের দেখা নেই। বিপিন অনেকটা তার কাকা প্রতুলকুমারের স্বভাব পেয়েছে। সে যা হোক, একসপ্তাহ বাদে প্রতুলকুমার ফিরলো।

প্রতুলকুমার ফিরেছিলো দুপুরে। বিকেলে কোর্ট থেকে ফিরে প্রতুলকে নিয়ে পড়লেন প্রভাসকুমার। সব কথা পরিষ্কার করে বলে না, রীতিমত জেরা করতে হলো।

'কোথায় গিয়েছিলে ?'

'যেখানে এরপর আমাদের সবাইকে যেতে হবে সেখানে।'

'সে সেতো শ্মশান।' প্রভাসকুমার গম্ভীর হয়ে বললেন।

প্রতুলকুমার বললো, 'না। শ্মশান নয়। এখান থেকে ভিটেমাটি তুলে যেখানে গিয়ে আমাদের বসবাস করতে হবে সেই জায়গাটা সরেজমিনে দেখে এলাম।'

'সে জায়গাটা কোথায় ?' প্রভাসকুমার জানতে চাইলেন।

এবার প্রতুলকুমাব বললেন, 'সেটা যেখান থেকে আমরা এসেছিলাম।'

প্রতুলকুমারের সারল্য দেখে প্রভাসকুমার হেসে ফেললেন, 'সেখানে গিয়ে লাভ কি ? যশোহরও যে পাকিস্তানেই পড়েছে।'

প্রতুলকুমার বললেন, 'যশোহরের কথা আমি মোটেই বলছি না। আমরা তার আগে প্রথম যেখান থেকে এসেছিলাম।'

একটু চিন্তা করে প্রভাসকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা প্রথম কোথা থেকে এসেছিলাম ?'

'কেন কনৌজ।' প্রতুলকুমার সঙ্গে সঙ্গে বললেন।

'কনৌজ।' এবার প্রভাসকুমারের অবাক হওয়ার পালা।

এরপরে প্রতুলকুমারের কথার খেই ধরতে একটু সময় লাগলো। সেই অনেককাল আগে বোধহয় লক্ষ্মন সেনের আমলে কান্যকুব্জ বা কনৌজ থেকে ব্রাহ্মণদের নিয়ে আসা হয়েছিলো বাংলাদেশে। তারপর বহু, বহুকাল চলে গেছে। বাংলায় মাটিজলের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে সেই আদি ব্রাহ্মণেরা, এখানেই ঘর সংসার পেতে বাঙালি হয়ে গেছে।

এতকাল পরে আবার কনৌজে ফেরা। নিতান্ত বাঙালি ব্রাহ্মণ বলে।

প্রতুলকুমারের যুক্তিটা খুব হালকা মনে হয়েছিলো প্রভাসকুমারের কাছে। প্রতুলও পরে এ নিয়ে খুব জোরাজুরি করেনি, বোধহয় কনৌজে তাঁর অভিজ্ঞতা খুব ভালো হয়নি। কনৌজের একালের ব্রাহ্মনেরা তাকে আত্মীয় বলে গণ্য করতে রাজি হয়নি। 'মাছখোর' বলে হাসাহসি করেছিলো। প্রতিবাদে সেও তাদের মাউরা বলে সম্বোধন করেছিলো এবং ফলে রীতিমত প্রহৃত হয়।

* * *

আফু রিক্শাটা নিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াতে প্রভাসকুমার পুরনো চিন্তার জাল ছিঁড়ে বাস্তবের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন।

উঠোনে অনেক লোকজন। সবাই পাড়া প্রতিবেশী। বিপিনের ব্যাপারটা জানতে এসেছে।

জানার আর কি আছে?

সেদিন রাতটা আরো দু'জন ভারতীয়র সঙ্গে থানার হাজতে রইলো বিপিন। পরের দিন সকালে দু'জন পুলিশ পাহারায় ময়মনসিংহের বাসে তুলে এই তিনজনকে মুক্তাগাছা রাজবাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেই বিশাল শূন্য রাজবাড়ির অন্দরের ঘরগুলিতে তৈরি হয়েছিল যুদ্ধবন্দীদের শিবির।

মুক্তাগাছার রাজবাড়িতে বিপিন বড় ভাল ছিলো।

এখনো এই তিরিশ বছর পরের বিপিনকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার জীবনে সবচেয়ে মধুর স্মৃতি কি?'

বিপিন বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বলবে, 'উনিশ শো পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি সালের শরৎ হেমন্ত ও শীতকাল।

এরপরেও হয়তো কেউ ধরে নিতে পারে এই দীর্ঘ সুখময় সময়টা কেটেছিলো কোথাও প্রবাসে বিলেত না আমেরিকায়। সঙ্গে সঙ্গে বিপিন তার ভুল সংশোধন করে দিয়ে বলবে, 'না না। অতদূরে নয়। মুক্তাগাছার মহারাজার বাড়িতে।'

আসলে বিপিনের ভালো খাবাপ বোধ নেই। রোদে পুড়তে, বৃষ্টিতে ভিজতে, শীতে কাঁপতে সে ভালোবাসে। তার বাগ নেই, দুঃখ নেই। অভিমান নেই, অভিযোগ নেই।

সেদিন রাতে মশার কামড় ছাড়া বিপিনের প্রায় কিছুই খাওয়া হয়নি। ঘুমও হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। ঐ রকম অবস্থায় কেউ খেতে পারে? ঘুমোতে পারে? বাড়িতেও কারো কোনো খাওয়া দাওয়া হয়নি। যত্ন করে রান্না করে রাখা সরষে বাটা মাছের ঝোল আর চালকুমড়োর ঘন্ট রান্নাঘরের আলমারিতে পড়ে রইলো।

প্রভাসকুমার থানা থেকে ফিরে আসার আগে এবং পরে স্মৃতিকণা চুপচাপ ভিতরের বারান্দায় গোলসিঁড়ির পাশে একটা থামে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন।

এই যে বিপিন আজ বিপদে পড়লো, তারপব ইপিনের বউয়ের ছেলে হওয়ার সময়ে তিনি যেতে পারলেন না, এব্যাপারে স্মৃতিকণার দায়িত্ব রয়েছে। ভাদ্রমাস, তারপরে পিতৃপক্ষ এসব ধুয়োয় সায় দিয়ে কলকাতায় যাওয়াটা তাঁর নিজের জন্যেই পিছিয়েছে।

স্মৃতিকণা নিজে যে এই সব আচার-অনাচার, সংস্কার-কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন তা নয় কিন্তু ছেলেই বাড়ির বাইরে চোখের আড়ালে থাকায় কি একটা অজানা ভয় থেকে যে যা বলতো সব মেনে চলতেন।

তাছাড়া সে সময় জুটেছিলো তখনকার এক বিধবা পিসি। সেই পিসি সারদা ছিলো বালবিধবা, স্বামীর মৃত্যুর পরে পিত্রালয়েই থেকে যায় এবং ভাইদের সংসারে ভালভাবেই মানিয়ে নেয়। কিন্তু মধ্যবয়েসে পৌঁছে সারদা এক বিপদে পড়ে।

সেই সাবেকি বিপদ। গ্রামের এক দুশ্চরিত্র কবিরাজ তার পিছনে লাগে। সারদার দোষ ছিলো যে তার শরীরের গঠন ছিলো নিঁখুত, যৌবন যত ফুরিয়ে আসছিলো তার দেহের মাদকতা আরো উচ্ছল হয়ে উঠেছিলো।

খোলামেলা হালকা স্বভাবের মানুষ ছিলো সারদা। স্বভাবচরিত্র খারাপ ছিলো না। চেনাশোনা সবাই তাকে পছন্দ করতো।

মধ্যবয়সিনী মহিলাদের একটা মেয়েলি সমস্যা হয়। সেই সমস্যা নিয়ে শ্রীনাথ গুপ্তের, মানে গঞ্জের কবিরাজের কাছে সারদা গিয়েছিলো।

শ্রীনাথ গুপ্ত ও অঞ্চলের মানুষ নন, আগে কবিরাজিও করতেন না। ধলেশ্বরীর ওপারে

তিনক্রোশ গিয়ে তারপর এক গ্রামের শেষে বাজারে এক বিখ্যাত কবিরাজি ঔষধালয়ের শাখা দোকানে কাজ করতেন। সেলসম্যানের কাজ।

সেখানে দীর্ঘদিন কাজ করার ফলে শ্রীনাথের কবিরাজি চিকিৎসা ব্যাপারে কিছু অভিজ্ঞতা ছিলো, তা ছাড়া তিনি খুব চতুর ব্যক্তি ছিলেন।

ঐ কবিরাজি ঔষধালয়ের একটা তহবিল তছরূপের ঘটনায় শ্রীনাথ জড়িয়ে পড়েন, তাঁকে চাকরি ছাড়তে হয়। শোনা যায় ফৌজদারি বিশ্বাসভঙ্গের মামলাও হয়েছিলো।

তখন শ্রীনাথ এসে সৌদামিনীদের গ্রামে সহবতপুরের বাজারে একটা ছোট ঘর ভাড়া করে বসেন, দোকানে সাইনবোর্ড টাঙানো হয়, 'বিশুদ্ধ চিকিৎসালয়।'

এখানে আয়ুর্বেদ, হেকিমি এবং ইউনানি মতে চিকিৎসা করা হয় কবিরাজ শ্রীনাথ গুপ্ত ভিষগ্‌শাস্ত্রী।'

বলা বাহুল্য শ্রীনাথ ভিষগশাস্ত্রী ছিলেন না। কোনো কবিরাজি বা আয়ুর্বেদীয় উপাধি তাঁর ছিলো না। হেকিমি বা ইউনানি চিকিৎসাও জানতেন না। কিন্তু তাঁর বুদ্ধি ছিলো।

আয়ুর্বেদীয় ওষুধের দোকানে কাজ করে তিনি অনেক রকম জেনেছিলেন। হেকিমি প্রায় কবিরাজির মতই দেশীয় গাছলতাপাতার ওষুধ দিয়ে মুসলমানী চিকিৎসা এবং ইউনানি মানে হলো গ্রীকমতে চিকিৎসা। বিভিন্ন যুগে উত্তর পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে এই সব চিকিৎসা চিকিৎসকদের সঙ্গে এ দেশে এসেছিলো এবং ছড়িয়ে পড়েছিলো প্রত্যন্ত পূর্ব পর্যন্ত।

সে যা হোক শ্রীনাথ গুপ্তের খুব হাতযশ হলো সহবতপুর বাজারে।

তার প্রধান কারণ হলো চিকিৎসকের অভাব। দেশভাগ হওয়ার পর তখন প্রায় দু'দশক কেটে গেছে। ডাক্তারি ব্যবসায়, অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু, তাঁরা এর মধ্যে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। দু-চারজন বৃদ্ধ চিকিৎসক এদিক ওদিকে যাঁরা তবুও ছিলেন, তাঁরা ততদিনে গত হয়েছেন।

তা ছাড়া সে সময়ে গ্রামের দিকে খুবই নিরাপত্তার অভাব কেউই নতুন করে গ্রামে বসতে সাহস পাচ্ছেন না।

শ্রীনাথ গুপ্ত অতি অল্পদিনেই কবিরাজি চিকিৎসায় সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। সারদা তাঁকে দুয়েকবার, দেখাতে গিয়েছিলো। সারদার প্রতি নজর পড়লো তাঁর।

যতদূর জানা গেছে শ্রীনাথের স্ত্রীপুত্র পরিবার বাড়ির লোকজন সবাই নৈহাটি-কাঁচরাপাড়ার কাছে কোথায় রিফিউজি কলোনিতে থাকে, তাদের মাসে মাসে শ্রীনাথ টাকা পাঠান। তখন এরকম ঘটনা খুব স্বাভাবিক ছিলো। জীবিকার জন্য একা থেকে বাড়ির সবাইকে ওপারে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো। এক সঙ্গে দু নৌকোয় পা দেয়া।

সারদাকে শ্রীনাথের খুব পছন্দ হয়েছিলো। সারদাকে বশীভূত করার জন্য যে কোনো চরিত্রহীন লোকের মতো তিনি প্রথমে সারদাকে নানারকম প্রস্তাব দেন, গোড়ার দিকে আকারে ইঙ্গিতে, পরে সরাসরি। তারপর যথারীতি প্রলোভন দেখান।

অবশেষে রাতবিরেতে সারদা যে ঘরে ছোটছোট ভাইপো-ভাইঝিদের নিয়ে শুতো সে ঘরের দরজা-জানলায় টোকা পড়তে লাগলো। বাড়ির পিছনের বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে একটি সর্পিল রাস্তা ধরে পচা ডোবা ও নোংরা জঞ্জালের স্তূপের মধ্য দিয়ে ক্ষিপ্র ও নিঃশব্দ যাতায়াত শুরু হয়েছিলো শ্রীনাথের। সে এক হাস্যকর পাগলামি এবং লম্পটমাত্রেই এ রকম পাগলামি করে থাকে। অন্ধতাড়নায় সব কিছু বোধবুদ্ধি লুপ্ত হয়ে যায়।

অবশেষে যা হওয়ার তাই হয়েছিলো। শ্রীনাথের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়। কিন্তু অপবাদ সারদার ঘাড়েও চাপে।

শেষ পর্যন্ত একদিন মাঝরাতে সারদাদের দাসপাড়ার লোকেরা শ্রীনাথকে বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পথে ধরে ফেলে এবং পরদিন দুপুর পর্যন্ত কবিরাজ মশায়কে সেই বাঁশবনের মধ্যে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখে। ঐ গ্রাম্য কেলেঙ্কারি, যেমন হয়ে থাকে আর কি।

শ্রীনাথ গুপ্তের বয়েস তখন পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, ষাটের কাছাকাছি। চোখে গোল কাঁচের চশমা, মাথায় গোল টাক, চেহারাও কালোকেলো গোলগাল।

ধাক্কাটা কিন্তু সামলে গেলেন শ্রীনাথ। তাঁর ওজর ছিল যে একটা ইউনানি ওযুধের জন্যে তল্লা বাশেঁর শিকড় লাগবে, তাও তুলে আনতে হবে মাঝরাতে, একাদশী-অমাবস্যা ইত্যাদি তিথি হতে হবে। পঞ্জিকা খুলে কি একটা মানানসই তিথি ছিলো সেই রাতে, সেটাও শ্রীনাথ দেখিয়ে দিলেন। তিনি আবার মোটামুটি সসম্মানে কবিরাজি পেশা শুরু করলেন।

কিন্তু সারদাকে গ্রাম ছাড়তে হলো। প্রায় বিনা দোষে। গ্রামে তার আর মুখ দেখানোর জায়গা ছিলো না।

সারদার বাপের বাড়ির গ্রাম আর প্রভাসকুমারদের গ্রাম পাশাপাশি। প্রভাসকুমার এমনিতেও সারদাকে ছোটবেলা থেকেই চিনতেন। সে বছর কি একটা ছুটির সময়ে ইদ কিংবা বড়দিন হবে, প্রভাসকুমার শহরে ফিরে আসার সময় সারদাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।

টাঙ্গাইলের বাড়িতে আগে যে মহিলাটি ঘরগেরোস্থালির কাজ দেখাশোনা করত তা তাকে কিছুদিন আগে তার নাতিরা এসে নিয়ে গেছে। তারা ভিটেবাড়ি বেচে ওপারে চলে যাওয়ার সময় তাদের ঠাকুমাকে রেখে গিয়েছিলো। এতদিনে একটা উদ্বাস্তু কলোনিতে সরকারি জমিতে ঘর তুলেছে, তাই এপারে এসে পিতামহীকে নিয়ে গেছে।

স্মৃতিকণার বেশ অসুবিধে হচ্ছিলো। বাসায় এমনিতে নিজেদের লোকজন কেউই নেই। কিন্তু তখন প্রভাসকুমারের জমজমাট পশার। মহুরি-মক্কেল, বাইরের লোকে সবসময় গমগম করছে।

তা ছাড়া বিশাল একটা বাড়ি। পুরনো লম্বা দালান, দু পাশে ঢালাও বারান্দা, বিরাট আটচালা কাছারি ঘর, রান্নাঘর, হবিষ্যিঘর, ঠাকুরঘর, গরু নেই কিন্তু গোয়াল, ঢেঁকিহীন ঢেঁকি ঘর, দুদিকে দুটো ভিতর আর বাইরে উঠোন, ফুলবাগান ফল গাছ, পুকুর-ডোবা শক্ত সমর্থ দেখাশোনার লোক অনেক দরকার।

এ কাজে, বিশেষ করে অন্যদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার কাজে সারদা খুবই যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু গহন পাড়াগাঁয়ে বালবিধবার দীর্ঘজীবন যাপন করে সে হাঁচি টিকটিকি, শেয়াল বাঁ-হাতি, কালো বেড়াল অশুভ অমঙ্গল সবরকম গ্রাম্যচিন্তার বশবর্তী হয়েছিলো। যাকে বলে একেবারে কুসংস্কারের ডিপো।

মুক্তমনা স্মৃতিকণা প্রথম দিকে এসব বিশেষ পাত্তা দিতেন না। কিন্তু মন দুর্বল হলে একেক সময় একেকটা বিধিনিষেধ যতই অযৌক্তিক হোক না কেন, চিন্তার মধ্যে কুটকুট করে।

সেই সহবতপুর বাজারেই শ্রীনাথ কবিরাজ থেকে গিয়েছিলেন। রীতিমত নামডাক হয়েছিলো। শেষের দিকে শুধু কবিরাজি বা হেকিমি চিকিৎসা নয় রীতিমত এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাও করতেন। কয়েকটি মোটামুটি জ্বরজাতির অসুখবিসুখের ওষুধ তাঁর দোকানে থাকতো। আগের সাইনবোর্ডে নিজের নামের পাশে 'ভিষগশাস্ত্রী' মুছে দিয়েছিলেন। সেই সাইনবোর্ডও খুব পুরনো হয়ে গিয়েছিলো, তার পাশে একটা একটু ছোট ইংরেজি সাইনবোর্ড লাগিয়েছিলেন, দু পাশে রেডক্রশের ছবি, মধ্যে লেখা—

Gupta Farmacy, Dr. S. N. Gupta

ইংরেজি ফার্মেসী বানানটা ভুল ছিলো কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় নি। কেই বা শরীর সারাতে এসে ওষুধের দোকানের সাইনবোর্ডের বানানের শুদ্ধতা নিয়ে মাথা ঘামায়? তারপরে বাংলাদেশ থেকে ইংরেজি সাইনবোর্ড তো উঠেই গেলো, ইংরেজি বাহুল্য হয়ে দাঁড়ালো।

কিন্তু ততদিন পর্যন্ত আর শ্রীনাথ গুপ্তের খবর মেলেনি।

পাকিস্তানী আমলের শেষ দিকে দু'দেশের মধ্যে যাতায়াতের জন্য ভিসা পাসপোর্টের খুব কড়াকড়ি হয়। সে সময় বছরের পর বছর শ্রীনাথ কবিরাজ তাঁর পরিবারের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ রাখতে পারেন নি। যাতায়াত বন্ধ, কালে ভদ্রে দু চার ছয় মাসে একটা সংক্ষিপ্ত পোস্টকার্ড। সব কিছু বিস্তারিত লেখারও উপায় নেই, সব চিঠিপত্র সেন্সর হয়, গোয়েন্দা পুলিশ কড়া নজর রাখে।

শেষের দিকে একেবারে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন শ্রীনাথ, স্ত্রী, বিধবা দিদি নাবালক দুই ছেলে, দুই মেয়ে, ভাগ্নে ভাগ্নী রিফিউজি কলোনির বাড়িতে তারা অন্যদের মত কষ্টে, সৃষ্টে সংসার কাটাতে লাগলো।

ধীরে ধীরে দুই ছেলে বড় হলো। একজন রীতিমত মাস্তান, স্মাগলার হয়ে গেলো। আরেকজন যুবনেতা।

যা হোক তারা তাদের চার কাঠা জমির ওপরে জবর দখল করে বানান নড়বড়ে টালির ঘর ভেঙে দোতলা বাড়ি করলো। বোনেদের বিয়ে দিলো। শ্রীনাথ গুপ্তের ভাগ্নে কোথায় কি একটা কাজ পেয়ে মা বোনদের নিয়ে চলে গেলো।

এরই মধ্যে একবার খবর এলো শ্রীনাথ গুপ্তের স্ত্রী মারা গেছেন, কি অসুখ, কেন, কিছুই জানাতে পারলেন না শ্রীনাথ। স্ত্রীর মৃত্যুতে অশৌচ হয় কিনা সেটাও কেউ বলতে পারলো না। আশেপাশে গ্রাম গঞ্জ তখন প্রায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতহীন হয়ে গেছে। তেরোদিন হবিষ্যি করলেন। ভাবলেন শ্রীনাথ যে ছেলেদের কাছ থেকে একবার ঘুরে আসি। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও পাসপোর্ট পেলেন না।

একাত্তর সালের যুদ্ধের সময় প্রায় সকলেই যখন দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলো শ্রীনাথ পালান নি। দোকানে বসবাস, সেখানেই শুতেন রোগী দেখতেন, ওষুধ দিতেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর সামলাতে পারেন নি। মুক্তিযুদ্ধ একেবারে শেষ পর্যায়ে, তখন অবস্থা অতিশয় মারাত্মক হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত শ্রীনাথ কবিরাজ মোল্লাদের চাপে পড়ে এক রাজাকার সর্দারের মেয়েকে বিয়ে করে মুসলমান হয়ে যান।

কি করে সেই সাংঘাতিক বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলার দিনেও রিফিউজি কলোনির দোতলা বাড়িতে তাঁর ছেলেদের কাছে এ খবর পৌঁছেছিলো। তারা অবশ্য আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছে এ কথা স্বীকার করেনি। বলেছিলো, 'বাবা খবর পেয়েছি মধুপুরের গড়ের দিকে লুকিয়ে আছেন।'

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে অবশ্য শ্রীনাথ কবিরাজের আর কোনো খবর পাওয়া যায় নি। তাকে আর কেউ চোখে দেখেনি।

সহবতপুর বাজারের একপাশে তালাবন্ধ 'গুপ্ত ফার্মেসি' এর পরেও বেশ কিছুকাল ছিলো। পরে সেটা মুক্তিযোদ্ধা সমিতির স্থানীয় অফিসঘর হয়।

প্রভাসকুমার যখন আফুর রিক্সায় থানা থেকে ফিরে এসে নামলেন, উঠোনের অন্ধকারে আরো কয়েকজনের মধ্যে দু'জন জুনিয়ার উকিল চঞ্চলভাবে পায়চারি করছিলো। প্রভাসকুমার ফিরে আসার পরে তারা বললো, 'স্যার, একটা কিছু করতে হয়। ঢাকায় হোম সেক্রেটারিকে ফোন করবো।'

প্রভাসকুমার বললেন, 'কেউ কিছু করতে পারবে না। এটা হলো আন্তর্জাতিক যুদ্ধ। স্থানীয় প্রশাসনের কেউ কিছু করতে পারবে না।'

জুনিয়ার উকিলদের একজন মনসুর আলি, স্কুলে বিপিনের সহপাঠী ছিলো। সে জিজ্ঞাসা করলো, 'বিপিনের রাতের খাওয়া হয়েছে?'

সারদা উঠে গিয়ে রান্নাঘর থেকে একটা কাঁসার থালায় ভাত বেড়ে, তার সঙ্গে এক ঘটি জল, একটা গেলাস, দুটো বাটিতে মাছের মাথা, চালকুমড়োর তরকারি আর মাছের ঝোল বেড়ে নিয়ে এলো।

আফুর রিক্শায় করে মনসুর সেই খাবার নিয়ে থানায় গেলো।

বিপিনের তখন খাওয়ার অবস্থা নয়। থানার ঘরের একটা বেঞ্চিতে সে বসে ছিলো। হাজতবাস করতে হয়নি। সেটুকু ভদ্রতা পুলিশ করেছিলো।

মনসুরের নিয়ে আসা ভাত-মাছের ঝোল থানায় মেঝের একপাশে বেড়ে দিয়েছিলো।

পরের দিন বিপিন মুক্তাগাছায় চালান যায়। সেখানেও থানা থেকে ভদ্রতা করা হয়েছিলো, কোমরে দড়ি বা হাতে হাতকড়া না পরিয়ে একটা রিকশায় করে বাসস্ট্যাণ্ডে নিয়ে গিয়েছিলো।

বলা বাহুল্য থানা থেকে সেই কাঁসার থালাবাসন আর ফেরত পাওয়া যায়নি।

পাকিস্তানী আমলের সেই দুর্দিনের আমলেও থানার টি এস আই এক হিন্দু। টি-এস-আই মানে টাউন সাব ইনস্পেক্টর। রোগা, ফরসা, লম্বা সুখেন হালদারের কবি কবি চেহারা কিন্তু তার দাপট খুব। তার সাইকেলের ঘণ্টি শুনলে শহরের চোর-জোচ্চোর তটস্থ হয়ে উঠতো।

সুখেন হালদার নোয়াখালির লোক। কথায়, উচ্চারণে স্পষ্ট টান। তার মধ্যেও একটা পৌরুষের ছাপ আছে। ময়মনসিংহ জেলায় দারোগাগিরি করত এসে এখানেই কালিহাতিতে স্বজাতি পাল্টা ঘরে বিয়ে করে স্থানীয় লোক হয়ে গেছে সুখেন।

সেই সুখেন হালদারই পরের দিন সকালে থানা থেকে বিপিন ও আরেকজনকে রিকশায় তুলে নিজে সাইকেলে করে বাসস্ট্যাণ্ডে গিয়েছিল।

টি-এস-আই বা টাউন দারোগা হিসেবে সে প্রভাসকুমারকে ভালোভাবে চেনে। আগের দিন সন্ধ্যাবেলা যখন বিপিনের ব্যাপারে প্রভাসকুমার থানায় গিয়েছিলেন সে থানায় ছিলো না, রামলাল বৈরাগীর বাংলা মদের দোকানে গিয়েছিলো এক পুরনো সাগরেদের খোঁজে।

একে জরুরি অবস্থা। সন্ধ্যা থেকে ব্ল্যাক আউট। শহরে চুরি চামারি হঠাৎ খুব বেড়ে গেছে, বিশেষ করে হিন্দু বাড়িতে। যে লোকটার খোঁজে সুখেন হালদার গিয়েছিলো, নিজাম নিকারি সে মোটামুটি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে চোরাই মাল কেনা-বেচার দালালি করে।

নিজাম নিকারি কৃতবিদ্য ব্যক্তি। তাঁর অনেক রকম দোষ। শহরের পশ্চিম প্রান্তে নদীর ধার ঘেঁষে নটি পাড়া, কিন্নরী পল্লী। সেই পতিতা পাড়ায় নিজামের নিজস্ব একটি বাড়ি আছে।

দেশভাগ হওয়ার পরে অন্য সকলের সঙ্গে হিড়িকে পড়ে, বেশ্যারা কেউ কেউ কলকাতায়, বালুরঘাটে, শিলিগুড়িতে চলে যায়। সেখানে আস্তানা বাঁধে। এরকমই একজন পুরনো বাড়িউলি মালাদাসীর কাছ থেকে নিজাম টিনের চালা, উঠোন, ডোবা, টিনের বেড়াশুদ্ধ আম জাম গাছ-ওয়ালা আধ বিঘের মত জমির ওপরে বাড়ি প্রায় জলের দরে কিনে নেয়।

সেখানে সে তার নিজের মেয়েছেলে রেখেছে। কিছুটা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে। কিছুটা ব্যবসার জন্য। তাছাড়া প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে হাকিম, দারোগা, নেতাদের মনোরঞ্জনের কাজে লাগে। ছোট্ট শহর হোটেল বার নেই, আগেকার মত পানসি নৌকাও নেই। মালাদাসীর বাড়িটা সুখ ভোগে লাগে নিজামের।

সুখেন হালদার কুড়ি বছর আগে ইংরেজ আমলে পুলিশে ঢুকেছিলো, তারপরে আঠারো বছর হয়ে গেলো পাকিস্তানী পুলিশে। তার শুচিবায়ু দোষ নেই।

নিজাম নিকারির আস্তানায় নিজাম চাটগাঁর বন্দরঘাট থেকে কয়েকদিন হলো একটি ফুল্ল কুসুমিত আরাকানি কিশোরিকে নিয়ে এসেছে। তার ঠোঁট ফুলের পাঁপড়ির মতো, তার দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ খেলে। নিজাম তাকে ছোট বিবি বলে ডাকে।

নিজামের সেই ছোট বিবির ঘরে প্রায় রাত দুপুর অবধি কাটিয়ে সুখেন থানার কোয়ার্টারে ফেরার পথেই খবর পেল বাসায় যাবার আগে তাকে একবার থানার অফিসঘরে হয়ে যেতে।

বিশেষ জরুরি ব্যাপার থাকলে অনেক সময় এরকম হয়।

থানায় ঢুকে সুখেন দেখলো বড় দারোগা সাহেব থানার টেবিলে হাত রেখে তার ওপরে মাথা দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। মোটা, খুব মোটা ভুঁড়িওয়ালা মানুষ। ওই রকমভাবে ঘুমন্ত অবস্থাতেই প্রচণ্ড জোরে নাক ডাকছে তাঁর। একেকবারের নাক ডাকুনিতে পুরো থানাবাড়িটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

যাদের ঘুমের মধ্যে খুব বেশি নাক ডাকে তাদের সাধারণত ঘুম ভালো হয় না। বড় দারোগা খন্দকার সাহেবের ঘুম খুব হাল্কা। বারান্দা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকতে সুখেনের পায়ের শব্দে বড় সাহেব ঘুম থেকে জেগে টেবিল থেকে মাথা তুললেন। তারপর একটু চোখ কচলিয়ে নিয়ে সুখেনকে বললেন, 'এই যে ভাইস্তা।'

এ অঞ্চলে 'ভাইস্তা' বলতে ভাইপো বোঝায়। এটা পাতানো সম্বন্ধ। সুখেনকে খন্দকার সাহেব ভাইস্তা বলেন। অনেক কাল আগে, সে প্রায় পঁচিশ তিরিশ বছর হবে, খন্দকার যখন লিটারেট কনেস্টবল হয়ে পুলিশে ঢোকেন, সেটা ছিল মির্জাপুর থানায়। তখন মির্জাপুরের ও. সি. ছিলেন সুখেনের কাকা নগেন হালদার।

নগেন হালদারই সার্কেল ইনস্পেক্টর হওয়ার পরে ভাইপো সুখেনকে পুলিশে ঢুকিয়েছিলেন। এককালে পুলিশের চাকরি প্রায় বংশগত ব্যাপার ছিলো।

এই নগেন হালদারের সুবাদেই খন্দকার সাহেব সুখেনকে ভাইস্তা বলে ডাকেন।

সুখেন খন্দকার দারোগাকে জানালেন, 'আপনি সেই চুরির কেসগুলোর খোঁজ নিতে বলেছিলেন, নিজাম নিকারির কাছে গিয়েছিলাম।'

নিজাম নিকারির কথা শুনে খন্দকার একটা হাই তুলে চেয়ারের ওপরে সোজা হয়ে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছোট বিবিকে দেখলে নাকি?'

সলজ্জভাবে সুখেন স্বীকার করলো, 'দেখলাম।'

খন্দকার দারোগা স্বগোতোক্তি করলেন, 'আগুন', তারপর সুখেনকে বললেন, 'এ জিনিস নিজাম জোগাড় করলো কি করে তারও একটা তল্লাস নিতে হবে।'

এরপরে কাজের কথায় এলেন খন্দকার। সুখেনকে বললেন, 'সন্ধ্যাবেলা ঢাকা থেকে মেসেজ এসেছে থানার এলাকার মধ্যে যত ইণ্ডিয়ান আছে একত্র করে মুক্তাগাছায় চালান করে দিতে হবে। তাদের বাইরে রাখা নিরাপদ না। ভিসা রেজিস্টারে দেখা গেলো টাউনের মধ্যে এই দু'জন আছে।'

থানার ঘরের মধ্যে দেয়াল ঘেঁষে একটা কাঠের হেলান দেয়া বেঞ্চিতে বসে বিপিন আর তার পাশে আর একজন।

সেই একজন হলো গোমজানির নিত্যরঞ্জন ভৌমিক। নিত্যরঞ্জনের তখন বছর পঞ্চাশেক বয়েস। পাকানো শক্ত চেহারা, জাত পেশা স্বর্ণকার। আগে নাগরপুর বাজারে দোকান ছিল। সে সব কবে উঠে গেছে, গোমজানির গ্রামের বাড়িও নেই। সবাই আসামের দিকে চলে গেছে পঞ্চাশ সালের দাঙ্গার পর। নিত্যরঞ্জন এখন টাঙ্গাইলে এলে কলেজপাড়ায় শালার ওখানে ওঠেন। শালা মাধবলাল দে ফৌজদারি আদালতে মোক্তারি করে।

নিত্যরঞ্জনের অনেকগুলো পাশপোর্ট, ভারতের পাশপোর্ট আছে, পাকিস্তানের পাশপোর্টও আছে। ময়মনসিংহ, ঢাকা, কৃষ্ণনগর যখন যেখান থেকে পেরেছে একটা পাশপোর্ট করিয়ে নিয়েছে।

দুইদেশের মধ্যে পাশপোর্ট চালু হওয়ার গোড়ার দিকে দু তরফেই যথেষ্ট ঢিলেঢালা ভাব ছিল, তখন অনেকে প্রয়োজনে লাগতে পারে, এইভেবে দুদিক থেকেই পাশপোর্ট নিয়ে বেখেছিলো।

তবে নিত্যরঞ্জনের পাশপোর্টের ওপর ঝোঁকটা একটু বেশি ছিলো। সে যা হোক এ যাত্রায় তাঁর একটু ভাগ্য বিড়ম্বনা ঘটেছে। ভারতীয় পাশপোর্টে পাকিস্তানী ভিসা নিয়ে এসেছিলেন। আজ থানায় খাতা দেখে তার ডাক পড়েছে।

থানার লোকেরা অবশ্য নিত্যবঞ্জনকে মোটামুটি চেনে, তবে ভালো চোখে দেখে না। নিত্যরঞ্জন স্বর্ণকারের কাজ করে না, দোকানও নেই। লোক পরমরায় কানাঘুষো যে টুকু শোনা যায় সে খুবই বিপজ্জনক।

নিত্যরঞ্জনের হাতে সদাসর্বদাই তেল চুকচুকে, মাথামোটা শক্ত বাঁশের লাঠি থাকে, আজও এই থানার ঘরের মধ্যেও আছে। এই লাঠিটিই তাঁর জীবিকার উৎস। অতিশয় অভিজ্ঞ এবং দক্ষ লাঠিবাজ তিনি।

মাত্র একশো টাকা দিলে তিনি রাতের বেলা অন্ধকারে নিঃশব্দে এসে নির্দিষ্ট ব্যক্তির মাথায় পিছন থেকে লাঠি মারতে পারেন। এ বিষয়ে তিনি পেশাদার। কেউ হয়তো সন্ধ্যাবেলা বাজার করে কি মসজিদে নামাজ পড়ে ফিরছে, কিংবা কেউ হযতো সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থেকে বেরোয় না, রাতের খাওয়া-দাওয়ার পরে হাত ধুচ্ছে উঠোনে নেমে, অতর্কিতে অব্যর্থ লক্ষ্যে বিদ্যুৎ গতিতে নিত্যরঞ্জনের লাঠি তার মাথায় পড়বে। খুব সম্ভবত নিত্যরঞ্জনকে তিনি চেনেনও না, তার কোনও শত্রু একশোটি টাকা দিয়ে গোপনে তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছে নিত্যরঞ্জনকে।

নিত্যরঞ্জন অবশ্য খুন করবার জন্য মাথায় লাঠি মারতেন না, তার চুক্তি হতো মেরে অজ্ঞান করে দেওয়ার, বাছাধন একবার টের পাক, একটু সাবধান হোক। যেই লাঠির আঘাত পাক না কেন, জ্ঞান ফিরে সে অবশ্যই বুঝতে পারতো কেন এরকম হলো, কে শত্রুতা করছে।

তখনও গ্রাম্য শত্রুতা এই পর্যায়ে চলতো। খুব প্রকাশ্য ছিলো না।

নিত্যরঞ্জন অবশ্য একটা ব্যাপারে খুবই সাবধান ছিলেন। শহর এলাকার মধ্যে এমন কি টাঙ্গাইল থানা এলাকার মধ্যে তিনি তাঁর পেশায় রত হতেন না। তাঁর কাজ কারবার ছিলো নদীর ধারে গঞ্জ এলাকায়, চরের দিকে। সে সব দিকের লোকেরা নিত্যরঞ্জনের খোঁজ খবর রাখতো, দরকার মতো তাঁকে কাজকর্ম দিতো।

সে যা হোক এই নিত্যরঞ্জনের সঙ্গে বিপিনকে এক ঘরে প্রায় ছ'মাস থাকতে হয়েছিলো মুক্তাগাছায়, যুদ্ধবন্দী শিবিরে।

এসব পরের কথা। এখন থানার বেঞ্চিতে বসে নিত্যরঞ্জনের সঙ্গে বিপিনও ঢুলছে। মশার খুব উৎপাত, একটু ঝিমুনি আসতেই মশার কামড়ে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। মশার জাতও খুব খারাপ।

আগে একটা বড় অংশই ছিলো ম্যালেরিয়ার বীজানুবাহী। এখন ম্যালেরিয়াবাহী মশা অবশ্য কম।

সুখেন খন্দকার সাহেবের কাছ থেকে নির্দেশ নিয়ে নিজের বাসায় ফিরে গেলো। তাকে খন্দকার সাহেব বলে দিয়েছেন সকালের ফার্স্ট বাসে এই দু'জনকে মুক্তাগাছায় নিয়ে যেতে হবে।

সেখানে মহারাজার প্রাসাদে পুলিশ ক্যাম্প আর প্রিজনার ক্যাম্প হয়েছে। এই দুজনকে পাশপোর্ট সমেত সেখানে জিম্মা করে দিয়ে আসতে হবে।

খন্দকার সাহেব এমনিতে ভালো মানুষ। সুখেনকে বলে দিলেন হাতকড়া কিংবা কোমরে দড়ি লাগাবে না। এরা তো চোর ডাকাত নয়। দেশভাগের গোলমালে উটকো বিপদে পড়েছে। অবশ্য 'চোর-ডাকাত নয়' বলার সময়, তিনি একবার খন্দকার সাহেবের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ছিলেন।

খন্দকাব সাহেব পুবনো আমলের পুলিশের লোক। আজকের বিকেলের সরকারি মেসেজে একটা জিনিস তার ভালো লাগে নি, হিন্দু ভারতীয় নাগরিকদের যুদ্ধবন্দী হিসেবে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ এসেছে। মুসলমান ভারতীযদের কথা কিছু নেই। একটি অল্প বয়সী পাঞ্জাবী মুসলমান ছেলে সিভিল সার্ভিস পাকিস্তান সংক্ষেপে সি এস পি, সে তখন স্থানীয় এস ডি ও, মহকুমা শাসক, মেসেজটা এস ডি ও সাহেব মারফতই এসেছিলো।

সন্ধ্যার পরে সাইকেল চালিয়ে এস ডি ও সাহেবের সঙ্গে তাব বাংলোয় গিযে খন্দকার সাহেব দেখা করেছিলেন। এস ডি ও সাহেব তখন পাজামা পাঞ্জাবি পরে বাংলোব ভিতবের বারান্দায় স্ত্রীর সঙ্গে ক্যারাম খেলছিলেন, স্ত্রীর পরনে হাতকাটা নীল ফুল ফুল সাদা ফ্রক, স্কুলের মেয়েদের মত। না পর্দা, না বোরখা, না ওড়না।

থানার ও. সি মানে এস ডি ও'র কাছেব লোক। খন্দকার সাহেবকে এস ডি ও সাহেব ভিতরেব বারান্দাতেই ডাকলেন। সাহেবের খাস চাপরাশি তুলসী এসে ডেকে নিযে গেলো।

খন্দকার সাহেব সেলাম জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হিন্দুবা যারা ইণ্ডিয়ান পাশপোর্টে রয়েছে তাদের তো ধবেছি কিন্তু কিছু মুলসমানও ইণ্ডিয়ান পাসপোর্টে এসেছে।'

এস ডি ও সাহেব খন্দকারকে বললেন, 'ও নিয়ে আপনি ভাবতে যাবেন না। মেসেজে যা আছে সেই রকম করুন। তেমন গোলমেলে মুসলমানের কেস থাকলে, কোনও সন্দেহেব ব্যাপার থাকলে আমাকে বলবেন আমি দেখবো। মুসলমানদের ব্যাপার আলাদা, কিন্তু হিন্দুদের বিশ্বাস করা ঠিক না এখন।'

স্ট্রাইকার দিয়ে লাল খুঁটির দিকে তাক করে এস ডি ও সাহেব আবার ক্যারাম খেলায় মনোনিবেশ করলেন। তুলসীর সঙ্গে বাংলোর বাইরে বেরিযে আসতে আসতে খন্দকার সাহেব ভাবতে লাগলেন, এই পাঞ্জাবি ছোকরা কি জানে যে তুলসী হিন্দু। এদেশে কে হিন্দু, কে মুসলমান বাইরের লোক এসে বুঝবে কি করে।

ময়মনসিংহের বাস রাস্তায় পথে মুক্তাগাছা।

শেষ রাত থেকে আধ ঘণ্টা পর পর বাস ছাড়ে তখন। পঞ্চাশ মাইল রাস্তা। পথে দুটো বড় খেয়া পার হতে হয়। খেয়া দুটো অবশ্য মুক্তাগাছার আগেই পড়ে।

ময়মনসিংহ পর্যন্ত পৌঁছাতে চার ঘণ্টা সাড়ে চার ঘণ্টা লাগে। ময়মনসিংহের আধ ঘণ্টা আগে মুক্তাগাছা। মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ সদর মহকুমার মধ্যে। তার আগে পর্যন্ত টাঙ্গাইল মহকুমা।

ভোররাতের মুখে রীতিমত অন্ধকারের মধ্যে যে ফার্স্ট বাসটা ছাড়তো, সেটা যুদ্ধ আরম্ভ

হওয়ার পর থেকে বন্ধ।

বাসটা ময়মনসিংহে ঢাকা মেল ধরিয়ে দিতো। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে ঢাকা মেল বন্ধ। কলকাতা যাতায়াত, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে, ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে।

বাসস্ট্যাণ্ডে যখন বিপিন ও নিত্যরঞ্জনকে নিয়ে সুখেন এসে পৌঁছাল তখন সবে দিন ফরসা হয়েছে। দুটো বাস পরপর ছাড়বে। তারই পিছনেরটায় ড্রাইভারের সিটে বিপিনদের নিয়ে সুখেন উঠে বসলো।

তিনটে সিটের বাসভাড়া পাওয়া যাবে না ব্যাপারটা ড্রাইভার সাহেবের খুব ভালো লাগলো না। কিন্তু টাউন দারোগা সাহেবকে কিছু বলার সাহস বাস ড্রাইভারের নেই। বরং একটু হেসে বলল, 'টি-এস-আই সাহেব কতদূব যাবেন?'

প্রশ্নের সঙ্গে ড্রাইভারের এগিয়ে দেওয়া ক্যাপস্টান সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে সুখেন বললো, 'পুলিশকে এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে নেই।'

মুক্তাগাছা বন্দীশিবিরে বিপিন গিয়েছিলো বর্ষার শেযাশেষি, ঠিক পুজোর মুখে।

বর্ষা শেষ হয়ে গেলো। আকাশে কালো মেঘ বদলিয়ে গিয়ে সাদা মেঘ, কিছুদিন সাদাকালো মেঘের মেলামেশা তারপর ধীরে ধীরে আকাশ ঝলমলে নীল হয়ে উঠলো। কোথাও এক বিন্দু মেঘের দেখা নেই। উত্তরের দিক থেকে সারবন্দি পাখিরা উড়ে এসে চারপাশের জলে-জঙ্গলে এমনকি রাজপ্রাসাদের পিছনের পুবনো দীঘির তীরে আমগাছ, কাঁঠাল গাছে বাসা বাঁধলো।

এ সব শুরু হয়েছিলো শীতের শুরুতে। এ দিকে হেমন্তেই, কার্তিক পড়তেই শীতের আভাস পাওয়া যায় বাতাসে। আমগাছ, কাঁঠালগাছ থেকে হলুদ পাতা ঝরে পড়া শুরু হয়ে যায়। দিন ছোট হয়ে আসে। কামিনীগাছের শেষ ফুলের গুচ্ছটি একদিন সাদা বরফ কুচির মত উঠোনে ঝরে পড়ে।

টানা দোতলা অন্দরমহল। নিচে ওপরে ঘরের সংখ্যা কুড়ি-পঁচিশটার বেশি হবে। তারই মধ্যে সবচেয়ে উত্তরের একটা পূর্বদুয়ারি ঘরে বিপিনের জায়গা হয়েছিলো।

সাতচল্লিশ সাল কিংবা তারও অনেক আগে থেকে এ সব ঘরে কেউ থাকেনি। এতকাল খালি পড়ে ছিলো। এখন যুদ্ধবন্দীদের ঠাঁই হয়েছে। মহারাজা শশীকান্তের দান-ধ্যানে নাম ছিলো। তাঁর আতিথ্য এতকাল পরে বিপিনরাও পেলো।

পুরনো দিনের মোটা দেওয়াল। পঙ্খের কাজে ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। মোটা শিকের জানলা, বিশাল ভারি পাল্লা। তিন মানুষ উঁচু ছাদ, দরজাটাও বিরাট। ওপরের ছিটকিনি সাধারণ বেঁটে লোক হাত দিয়ে ধরতে পারবে না।

পূর্বমুখী দরজার সইসই একটা পশ্চিমের জানলা। তারই ধার ঘেঁষে বিপিনের বিছানার জায়গা হয়েছিলো।

প্রথম কয়েকদিন মেঝেতেই শুতে হয়েছিলো, টাঙ্গাইল বাসা থেকে একটা চাদর আর বালিশ মুক্তাগাছায় পাঠিয়ে দিয়েছিলো পরদিনই। সেই সঙ্গে একটিন মুড়কি, মোয়া আর তিলের নাড়ু। নারকেল বরফি দু কৌটো।

কয়েকদিন পরে প্রভাসকুমার নিজে মুহুরিবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এসে তোষক, কম্বল, কিছু জামাকাপড় দিয়ে গিয়েছিলেন।

তারও পরের সপ্তাহে বন্দিশিবিরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সামরিক অধিকর্তা একশো টাকা উৎকোচের বিনিময়ে, অবশ্য সরাসরি নয় দালাল মারফৎ, দালালকে আরও পঁচিশ টাকা দিতে হয়েছিলো,

বিপিনকে খাট ব্যবহার করার অনুমতি দেন।

রাজবাড়ির ওপাশে একটা পরিত্যক্ত হলঘরে যত রাজ্যের পুরনো আসবাবপত্র গাদা করে রাখা ছিলো। সেখান থেকে একটা চমৎকার কালো মেহগিনির খাট, তাতে গোলাপ আর গোলাপ পাতার নক্সা করা বিপিনের জন্য বন্দোবস্ত হয়।

মাসিক তিন টাকা ভাড়া। ভাড়াটা কে পেতো। কে জানে? বন্দোবস্তটা প্রভাসকুমার করেননি। এ জাতীয় বন্দোবস্ত তাঁর পক্ষে করা সম্ভব ছিলো না।

বিপিন মুক্তাগাছায় অন্তরীণ হওয়ার দিন দশেক পরে আফুকে সঙ্গে নিয়ে স্মৃতিকণা এসেছিলেন বিপিনকে দেখতে। তিনিই আফুর মারফৎ বন্দোবস্তটা করে যান। আফু ঘুরে ঘুরে নানা ঘাটে নানারকম দক্ষিণা দিয়ে বিপিনের বন্দি জীবন একটু আরামপ্রদ করেছিলো।

সেদিনটা ছিলো লক্ষ্মীপূজোর পরের দিন। পূজোর মোয়া, মুড়কি, নাড়ু, গুড় এমনকি আস্ত নারকেল কয়েকটা স্মৃতিকণা মুক্তাগাছায় নিয়ে এসেছিলেন।

সে সময়ে স্মৃতিকণার মন খুব খারাপ। ইপিনের বৌ-এর কি হলো জানতে পারছেন না। ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে। একটা কাক একটু বেসুরে ডাকলে পর্যন্ত কেমন যেন অমঙ্গলে মনে হচ্ছে।

এদিকে বিপিনের কি হবে সেটাও এক বড় চিন্তার ব্যাপার। ছেলেটা বিনা দোষে এইভাবে পুজোর মধ্যে বৎসরকার দিনে বন্দি হয়ে রইলো।

অনেকদিন ধরেই স্মৃতিকণা বলে আসছেন প্রভাসকুমারকে, 'ছেলেরা বড় হয়েছে এদিকের পাট চুকিয়ে এবার চলে যাওয়াই ভাল।' কিন্তু প্রভাসকুমার গা করেননি। তখন তাঁর জমজমাট পশার। তাছাড়া সবসময়ই তার একটা গয়ং-গচ্ছ, হচ্ছে-হবে ভাব। ছেলেদের আলাদা-আলাদা সংসার। যদিও বিপিন বিয়ে করেনি। দাদার সঙ্গেও থাকে না। সে শহরতলীতে আলাদা বাসা করেছে, শিগগিরই নাকি বিয়ে করবে। তার জন্যে মেয়ে দেখতে হবে না, সম্বন্ধ করতে হবে না। সে মেয়ে দেখে রেখেছে।

এ রকম ব্যাপারে বাধা দেওযার মতো লোক প্রভাসকুমার নন। স্মৃতিকণারও আপত্তি নেই। এসব বিষয়ে বরং স্মৃতিকণাই অনেক বেশি আধুনিক। তবে প্রভাসকুমারের কোনও গোঁড়ামি নেই। তিনি মহকুমা সংখ্যালঘু সমিতির সম্পাদক। এই তো গত বৈশাখ মাসে তাঁদের বাড়িতে ধুমধাম করে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে জেলে পাড়ার একটি বিধবা মেযের বিয়ে দেওয়া হলো। নদীর ঘাট থেকে চরের লোকেরা মেয়েটিকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো। রীতিমত থানাকাছারি করে পুলিশ দিয়ে মেয়েটিকে উদ্ধার করে ধুমধাম করে স্বজাতিতে বিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

কিন্তু এর পরেও একটা কথা ছিলো, সে কথাটা স্মৃতিকণার কাছে প্রভাসকুমার কখনও কবুল করেননি। তবু খুব সম্ভব কানাঘুষো হয়ে কথাটা স্মৃতিকণার কানেও উঠেছিলো।

মেয়েটি নাকি বিয়ের এক সপ্তাহের মধ্যে নিজেই পালিয়ে আবার সেই চরের গ্রামে তার আগের সংসারে ফিরে গিয়েছিলো। এর পরে আর বলপ্রয়োগের কথা ওঠে না। প্রভাসকুমার কিংবা তাঁর সহযোগীরা আর আইন আদালতের পথ ধরেন নি।

তবে তখনও ওই পঁয়ষট্টি সালের যুদ্ধের আগে পর্যন্ত আইন আদালতের দরজা খোলা ছিলো। হয়তো সব সময়ে সুবিচার পাওয়া যেত না কিন্তু ইংরেজের পুরনো আইনের কাঠামো তখনও পুরো খুলে পড়ে নি। পূর্বপাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা তখনও নাগরিক অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয় নি, তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়নি।

স্মৃতিকণা মুক্তাগাছায় বিপিনের সঙ্গে দেখা করতে এলেন লক্ষ্মীপুজোর পরের দিন।

এ বছর দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো খুব মন খারাপের মধ্যে কেটেছে স্মৃতিকণার। প্রায় চোখে জল আসার মত সব দিন। পাকিস্তান হওয়ার পরে দেশভাগ হওয়া ইস্তক এমন খারাপ দিন আর কখনও আসে নি।

পঞ্চাশের দাঙ্গার বছর স্মৃতিকণার মনে আছে সেই ভয় আর উৎকণ্ঠার, নিরাপত্তাহীনতার দিনগুলি। তেরোশো পঞ্চাশ নয় উনিশশো পঞ্চাশ দুই-ই প্রায় একরকম।

ইংরেজি বাংলা দুইরকম ক্যালেণ্ডারের মধ্যে শতাব্দীর ব্যাপারটা ছেড়ে দিলে সাত-আট বছরের ব্যাবধান। এই সাত-আট বছর, তেরোশো পঞ্চাশ থেকে উনিশশো পঞ্চাশ, মন্বন্তর থেকে দাঙ্গা, মধ্যে মহাযুদ্ধ, তারপর দেশভাগ এমন চরম দুর্দশার দিন একটা জাতির জীবনে খুব কম আসে।

স্মৃতিকণার মনে আছে, বিরাজ বলে বহুদিনের পুরনো যে লোকটা টাঙ্গাইলের বাড়িতে জনমজুরের কাজ করে, ঠিকে ফাই-ফরমাশ খাটে, আর সুযোগ পেলেই বিয়ে করার চেষ্টা করে, সেই বিরাজ কামলার একটা কথা "এখনকার একেকটা মাস আগেরকার দশটা বৎসরের সমান"।

এদেশের জনমজুরকে কামলা বলে। কামলা কথাটা অসম্মানজনক নয়। সকালবেলায় গৃহস্থ বাড়িতে হাতে কোদাল বা কুড়ুল নিয়ে অনেকেই খোঁজ নেয়, 'মা কামলা লাগবে। সাহেব কামলা রাখবেন।'

সাহেব কথাটা অবশ্য আগে ছিলো না। অন্তত স্মৃতিকণা শোনেনি। আগে বাবু সম্বোধনটাই চলত। পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে সাহেব চালু হয়েছে। তার একটা বড় কারণ বাবুরা প্রায় সবাই চলে গেল ঘর-সংসার তুলে। পুরনো বাবুদের মধ্যে প্রভাসকুমারের মতো দু-চারজন যা এখনও রয়েছে।

এই যাঁরা এখনও রয়ে গেছেন। এঁরা কেমন যেন মরিয়া। না বুঝেই একটা মরিয়াভাব নিয়ে দেশের মাটি কামড়িয়ে পড়ে আছে। যেন কখনও একটা বড় রকমের হেস্তনেস্ত হয়ে, পাকিস্তানের শেষ না দেখে এরা দেশ ছাড়বে না।

উনিশশো পঁয়ষট্টি সালের অক্টোবরের প্রথমভাগ সময়টা। দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ আপাতত বন্ধ। বিলেত, আমেরিকা, রাশিয়া কোনওরকমে মধ্যস্থতা করে যুদ্ধের ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়েছে।

যুদ্ধ বিরতি হয়েছে। কিন্তু শান্তি চুক্তি এখনও হয়নি। দুপক্ষই অন্ধ আক্রোশে ফুঁসছে। দুপক্ষই দাবি করছে যে তারাই যুদ্ধে জিতেছে, এরা বলছে আমরা ওদের এতোগুলো ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছি। ওরা বলছে আমরা ওদের এতটা জায়গা, এত বর্গমাইল এলাকা দখল করে নিয়েছি। বন্দি শিবির মানে মহারাজের বাড়ির উঠোনে পা দিয়ে স্মৃতিকণার মনে পড়লো অনেকাল আগে এবাড়িতে তিনি এসেছিলেন।

তখন স্মৃতিকণা নববধূ।

পুরুষানুক্রমে মহারাজাদের জমিদারির উকিল ছিলেন তাঁর শ্বশুর বংশ। তখনকার মফঃস্বলের উকিলবাড়ি মানে একাধারে এটর্নি হাউস, সলিসিটার বাড়ি আর অ্যাডভোকেট বা ব্যারিস্টারের সেরেস্তা।

স্মৃতিকণার বিয়েতে মহারাজা এসেছিলেন কিন্তু মহারানী আসতে পারেন নি। মহারানী পিত্রালয়ে গিয়েছিলেন ভাইপোর বিয়েতে।

নববধূকে তাঁর আশীর্বাদ করা হয়নি। তাই মহারাজা প্রভাসকুমারের পিতৃদেবকে হাতচিঠি দিয়েছিলেন নববধূকে একবার রাণীমার দর্শন করিয়ে নিয়ে যেতে। আসলে এটা ছিলো উপলক্ষ্য মাত্র। উকিলবাবুর সঙ্গে মহারাজার কিঞ্চিৎ ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা প্রয়োজন ছিলো।

ঘাটাইলে দুটো কি তিনটে পরগণা নিয়ে গোলমাল চলছে। পুরনো উকিলবাবুর সঙ্গে কিছু বিশেষ পরামর্শ ছিলো মহারাজার। কারণ গোলমালটা যে পক্ষের সঙ্গে, পূর্ববঙ্গের আরেক বনেদি জমিদার বংশ, সেই বংশের সঙ্গে মহারাজাদের আত্মীয় কুটুম্বিতা বহুকালের।

স্মৃতিকণার আজ রাজবাড়িতে ঢুকে মনে পড়লো সামনের ওই অন্দরমহলের বড় দরজার কাছে এগিয়ে এসে মহারাণী তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গিয়েছিলেন। বেনারসী শাড়ি আর সোনার গিনি দিয়ে তার মুখ দেখেছিলেন। এটা অবশ্য উপরি পাওনা, কারণ বিয়ের সময় মহারাজা নিজেই সোনার মোহর, আকবরি আশরফি দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন।

অন্দর মহলের সেই বড় দরজাটা আজ ভেতর থেকে বন্ধ। ওদিকে যুদ্ধবন্দিরা রয়েছে, তাদের সঙ্গে বিপিনও রয়েছে। কিন্তু মহিলা যুদ্ধবন্দিও এসেছে। তাদের ওদিকের পুরনো অতিথিশালায় আলাদা করে রাখা হয়েছে।

বিপিনের সঙ্গে দেখা হলো। প্রথমদিকে খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট ছিলো। জেলের কয়েদীদের মত খাবার দেয়া হচ্ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলে যেতে অন্তরীন ভারতীয় নাগরিকেরা যুদ্ধবন্দির মর্যাদা পেয়েছে। তাদের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানে। পাকিস্তানী টাকায় সে অনেক টাকা।

দু একজন মুসলমান, খ্রীষ্টান যুদ্ধবন্দি প্রথম দিকে এসেছিলো। বাকি সবাই ভারতীয় হিন্দু। তাদের জন্যে বরাদ্দ টাকায় তারা দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত করেছিলো রাজবাড়িতে। স্মৃতিকণা এসব জেনে খুশি হয়েছিলেন, তিনি এতটা আসা করেন নি, বরং অনেক খারাপ ভেবেছিলেন।

* * *

মুক্তাগাছার কথা বিপিনের আবছা আবছা মনে পড়ে। বিপিনের স্মৃতিশক্তি ভালো নয়।

কলেজে পড়ার সময় এব্যাপারে তার কৃতী বন্ধুদের সে খুব হিংসে কবতো।

স্কুলের শেষ পরীক্ষাতেই সে ব্যাপারটা ভালো কবে ধরতে পেরেছিলো। সে জানতো মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ সাতটা। কিন্তু পরিষ্কার খাতায় উত্তর দিতে গিয়ে দেখলো তিনটের বেশি কারণ সে দেখতে পারছে না।

কতকাল হয়ে গেলো। সেই বন্দিশিবির থেকে বিপিন মুক্তি পেয়ে চলে এসেছে।

স্মৃতিকণা-প্রভাসকুমার এখন আর কেউ কোনোখানে নেই। সেই ইষ্ট পাকিস্তান সেও অবলুপ্ত।

মুক্তাগাছা বন্দিশিবিরের অনেক রকম স্মৃতিই বড় তাড়াতাড়ি আবছা ছায়াছায়া হয়ে গেছে। কিন্তু গত যুগের গত জীবনের ধূলি ধূসরতা, অবুঝ এক কাব্যলতিকা বিপিনের মনের দেওয়ালে এখনো দোদুল্যমান।

ভাড়া করা খাটটায় শুয়ে শুয়ে পশ্চিমের জানলা দিয়ে ভিতর বাড়ির উঠোনটা দেখতো বিপিন। কিছু করার ছিলো না, প্রায় সব সময়েই শুয়ে শুয়ে কাটতো।

বিপিন যখন এসেছিলো তখন কামিনীফুলের গন্ধে ভরপুর রাজবাড়ি। কামিনীফুলের একটা খুব বড় জংলা ঝাড় ওই ভিতরের উঠোনে। ধীরে ধীরে কামিনী ফুল ফুরিয়ে গেলো। কামিনী ফুলের গাছের ডালে পাখিদের চেঁচামেচিও কমে গেলো।

সেই সময়ে একদিন বিপিনের খেয়াল হয়েছিলো ওইদিকে কামিনী ঝাড়ের পিছনে হলঘরের দেয়ালে একটা বড় কাঁচের ফ্রেমে কি একটা ছবির মত আছে।

যুদ্ধ বিরতির পর একদিন ময়মনসিংহ থেকে জেলাশাসক সহ দুজন সৈন্য বিভাগের অফিসার

বন্দিশিবির পর্যবেক্ষণ করতে এসেছিলো। তার কয়েকদিন পরেই জাতিসঙ্ঘের সাহেবরা এলো। সেই জন্যেই বোধ হয়, জেলা শাসক পর্যবেক্ষণে আসার আগে বাড়িঘর পরিষ্কার করা হলো। এমনকি আলতো করে একটু চুনকাম, একটু সারাই করা হলো। উঠোনের ঝোপঝাড়, জঙ্গল কেটে ফেলা হলো।

সেই সঙ্গে কামিনী ফুলের ঝাড়টাও ভাল করে ছেঁটে দেয়া হলো। ন্যাড়া হয়ে গেল গাছটা। সেই ন্যাড়া গাছটার পিছনে ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটা স্পষ্ট হলো।

ফ্রেমের কাঠটা মজবুত, কিন্তু কাঁচটা নিচের দিকে একটু ফাটা। ফ্রেমেব ভিতরে ঠিক ছবি নয়, সেকালের কায়দামাফিক সূচীকর্মের একটা নমুনা। চারদিকে রঙীন লতাপাতার অলঙ্করণ, মধ্যে গোটা গোটা মেয়েলি অক্ষরে একটা পদ্য,

ফুলফুটিবার কালে
সকালে বিকালে
যতপাখি ডালে ডালে
সকালে বিকালে।
ফুল ঝবিবাব কালে
সকালে বিকালে
তত পাখি নাহি থাকে
সকালে বিকালে।।'

সাদা মোটা কাপড়ের খুব সম্ভব সেকালের টুইলের ওপবে রঙীন সূতোব সূচীকার্য। বেশ ময়লা হয়ে গেছে তবে পড়া যায। মুক্তাগাছা বন্দিনিবাসেব কথা এই তিরিশ বছর পরে এখন মনে পড়লে, প্রথমেই বিপিনের মনে পড়ে, এই ভাঙা কাঁচের ফ্রেমটার কথা,

ফুল ফুটিবার কালে
সকালে বিকালে।'

উনিশশো পঁয়ষট্টি সালের শরতের মাঝামাঝি সেই সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে পরের বছরের মার্চের শেষ পর্যন্ত প্রায় দীর্ঘ ছয় মাস, অর্ধেক বৎসর বন্দিশিবিরে আটক ছিলো বিপিন।

প্রথম প্রথম একটু একঘেঁয়ে, একটু খারাপ লাগলেও অভ্যেস হয়ে গিয়েছিলো তার। কলকাতায় ফেরার ব্যাপারে তার যথেষ্টই চিন্তা রয়েছে। সেখানে তার চাকরি বয়েছে সেখানে তার প্রেমিকা রয়েছে।

সবচেয়ে বড় কথা চিঠিপত্র যাতায়াত সব কিছু বাদ। এপারে ওপারে সবরকম যোগাযোগ নিষিদ্ধ।

কলকাতায় ইপিনের যমজ ছেলে হলো। কলকাতাতেও তখন ব্ল্যাক আউট, ইপিনের বৌ মেনকাকে বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা নার্সিং হোমে বাচ্চা পেটে আসার পর থেকে দেখানো

হচ্ছিলো, কিন্তু ব্ল্যাক আউটেব বাতে যদি প্রসব বেদনা ওঠে সেই আশঙ্কায পাড়াব মধ্যে চিত্তবঞ্জন সেবাসদনে টিকিট কবিয়ে আনলো ইপিন। যদি বাত বিবেতে যেতে হয়।

তাবপবে যুদ্ধ জটিল হওয়াব পবে যখন ইপিন বুঝতে পাবলো মাকে নিযে বিপিনেব পক্ষে এখন আসা সম্ভব নয তখন একদিন কাটোযা গিযে বিধবা পিসিমাকে নিযে এলো। এই সেই বিধবা পিসিমা, যিনি চল্লিশ বছব আগে বিধবা হয়ে ছেলেমেযে নিযে টাঙ্গাইলে বাপেব বাড়িতে চলে এসেছিলেন।

নীববালাব জন্যেই সেই পুবনো বাড়িব উঠোনে আলাদা কবে হবিষ্যি ঘব কবা হযেছিলো। ইপিন-বিপিন দু ভাই-ই নীববালাব প্রশ্রযে মানুষ হযেছে। প্রভাসকুমাব-স্মৃতিকণাব শাসন থেকে তিনি এদেব বাল্যে ও কৈশোবে সযত্নে বক্ষা কবেছেন। বেশ কিছুটা বখিযে দিযেছেন।

এখন নীববালা যথেষ্ট বুড়ো। কযেক বছব আগে ভাইযেব সংসাব থেকে চলে এসে কাটোযায ছোট মেয়েব কাছে থাকেন। তাঁব একই ছেলে, নেভিতে কাজ কবে, বছবে নয মাসই বাইবে বাইবে সমুদ্রে-গঞ্জে।

ছোটমেযেব বাড়িতে ভালই আছেন নীববালা। তাঁব চাহিদা খুব কম। সকালে এক বাটি চা, এক বেলা আহাব, সেও প্রায বিকেল পেবিযে সামান্য নুন তেল লঙ্কা দিযে কুমড়ো সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ বা বেগুন পোড়া মাখা ভাত। এব মধ্যে যেকোন একটা হলেই হয।

ইপিন-বিপিন ছোটবেলা থেকে পিসিব হাতেব মাখা ভাত খেযে আসছে। এব চেযে স্বাদু খাবাব তাবা জীবনে কখনো খাযনি। কখনো কখনো দুভাই পাঠশালা থেকে ফিবে হবিষ্যি ঘবেব বাবান্দায কাড়াকাড়ি কবে পিসিব হাত থেকে খাবাব খেযে তাঁকে হযতো অনাহাবেই বেখেছে। যদি স্মৃতিকণা দেখতে পেতেন তবে ননদকে আবাব জোব কবতেন বান্না কবাব জন্যে।

এক বেলায বিধবাব দুবাব বান্না কবতে নেই কিংবা পেট ভবে গেছে বা কেমন শ্বব শ্বব লাগছে, আজ ভাত খাবো না, এই সব যুক্তি দেখিযে তিনি স্মৃতিকণাব অনুবোধ উপবোধ এড়িযে গেছেন।

তাঁব কেমন একটা মনগড়া ধাবণা ছিলো যে তাঁব জন্যে যা কিছু খবচ হয তা [illegible] ও অন্যায।

অবশ্য পবে ইপিন-বিপিন একটু বড় হলে ইস্কুলেব উঁচু ক্লাসে ওঠাব পব ছুটিব পবে বা[illegible] ফিবে তাদেব জলখাবাব ছিলো ওই সেদ্ধমাখা গলা ভাত। হবিষ্যি ঘবেব বাবান্দায পি[illegible] পিঁড়ি নিযে বসে তাবা পিসিকে কাঁসাব বাটি এগিযে দিতো। তিনি গোল গোল বলেব ম[illegible] দলা পাকিযে তাদেব বাটি ভবিযে দিতেন। সে সময দু মুঠো চাল বেশি নেওযা হতো দু ভাইযে[illegible] জন্যে। সবষেব তেল, কাঁচালঙ্কা, নুন দিযে মাখা তবকাবিব সঙ্গে প্রায গলা লাল [illegible] চালেব মধ্যে এক ফোঁটা ঘি—সাবাদিন ইস্কুলেব পবে শুকনো জিবে খালি পেটে সে ছিলো [illegible] মত।

তাব স্বাদ এখনো ইপিন বিপিনের জিবে লেগে আছে, তাব মধ্যে পিসিব হাতেব গন্ধও আছে। গোগ্রাসে খাওযাব ফলে যেদিন ভাতে টান পবতো, পিসি জল দিযে দুটো বাতাসা বা একটা ঘরে তৈরি সন্দেশ খেয়ে নিতেন। জানতে পাবলে স্মৃতিকণা গজগজ কবতেন। 'তুই জন্যে উপোস করে থাকতে হবে? দুমুঠো চাল বেশি নিলে ক্ষতি হয় কি?'

নীরবালা এসব কথায় কান পাততেন না। তাঁর ধাবণা ছিল ভাইযেব সংসাবে তিনি গলগ্রহ। বিধবা হয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে এই বিড়ম্বনা চিবদিন তাঁব মনেব মধ্যে কাজ কবেছে।

কাটোয়ায় ছোটমেয়ের বর হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। বি এ পাশ ছেলে। কোন কাজ না পেয়ে

হোমিওপ্যাথি পাশ করে ডাক্তারি করছে। ভালো হাতযশ হয়েছে, উপার্জনও বেশ ভালো।.

ছোট মেয়ে চঞ্চলা ইপিন বিপিনের চেয়ে কয়েক বছরের ছোট। এক বাড়িতে এক সঙ্গে মানুষ হয়েছে। নীরবালা যখন বিধবা হয়ে আসেন চঞ্চলা তখন পেটে, টাঙ্গাইলের বাসাতেই সে জন্মালো। বড় হওয়ার পরে ইপিনই কলকাতায় নিয়ে এসে উদ্যোগ আয়োজন করে মেয়ে দেখিয়ে জাতগোত্র মিলিয়ে চঞ্চলার বিয়ে দেয়।

চঞ্চলার বরের নামটা সেকেলে হারাধন। ডাঃ হারাধন চক্রবর্তী। বাড়ির এবং চেম্বারের বাইরে লেখা আছে ডাঃ এইচ চক্রবর্তী। তবে এলাকার লোকে চক্রবর্তী ডাক্তার বলে।

চঞ্চলা-হারাধনের ছোট সংসার। একটি মাত্র মেয়ে, সে সময়ে সবেমাত্র দু বছর বয়েস। আর লোক বলতে, হারাধনের বাবা, বৃদ্ধ নিত্যধন চক্রবর্তী।

এই নিত্যধনবাবু ইপিনদের অফিসেই কাজ করতেন। কেন্দ্রীয় সরকারি অফিস, নিত্যধনবাবু অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হয়ে দুবছর আগে রিটায়ার করেছেন। কাটোয়ার উপকণ্ঠে বাড়ি, গঙ্গার দিকে একটা গলিতে। কলকাতায় মেসে থেকে চাকরি করতেন। সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়ি ফিরতেন।

ইপিন চাকরিতে ঢোকার বছর দুয়েকের মধ্যেই নিত্যধন রিটায়ার হয়ে যান। নিত্যধনবাবুই ছেলের বিয়ের খোঁজ করছিলেন, হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের পাত্রী পাওয়া কঠিন। সহায় সম্পত্তিও তেমন কিছু নেই। দেশভাগের পর কাটোয়ায় এসে এক টুকরো জমি কিনে সরকারি টাকা নিয়ে ছোট বাড়ি করেছেন। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন। বড় রাস্তায় হারাধনের একটা চেম্বারও করে দিয়েছেন। অল্প কয়েক মাস আগে নিত্যধন বিপত্নীক হয়েছেন। হারাধনের মাতৃশ্রাদ্ধে ইপিন আসতে পারেনি, বিপিনকে শ্রীরামপুরে খবর দেওয়ায় সে গিয়েছিলো, এসব দায় সাধারণত বিপিনই পালন করে।

এবারো মাকে আনতে গিয়ে পাকিস্তানে আটকিয়ে গেল বিপিন।

কি হলো বিপিনের। বাসায়ই আটকিয়ে গেল, নাকি যুদ্ধবন্দি হয়ে জেল হাজত খাটছে সব সময় বিপিনের চিন্তা করে ইপিন। পাড়া-প্রতিবেশী-বন্ধুবান্ধবও খোঁজ নেয়।

একেকজন একেক রকম উড়ো খবর দেয় তাছাড়া বিপিন যে রকম খামখেয়ালি স্বভাবের এই যুদ্ধের মধ্যে জলজঙ্গল দিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে আসতে গিয়ে বিপদে না পড়ে।

বিপিন শ্রীরামপুরে যে ব্যাঙ্কে কাজ করে সেখানে একদিন ইপিন গিয়ে জানিয়ে এলো, বিপিন কবে ফিরবে বোঝা যাচ্ছে না। যুদ্ধ না থামলে আসার সম্ভাবনা নেই। দেখা গেল বিপিন ছুটি নিয়ে, অনুমতি নিয়েই গেছে।

তখনো ব্যাঙ্ক সরকারিকরণ হয়নি। এটি একটি দক্ষিণ ভারতীয় ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বললেন, একটা চিঠি পাঠিয়ে দিতে, সেই চিঠিটা তাঁরা ব্যাঙ্কের হেড অফিসে পাঠিয়ে ঘটনাটা জানিয়ে রাখবেন।

ব্যাঙ্কের অফিসটা একতলা, ম্যানেজারের ঘর দোতলায়। ব্যাঙ্কের দোতলার সিঁড়ি থেকে নিচে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে ইপিন, একটা রিকশা ধরে স্টেশনের দিকে যাবে বলে, এমন সময় পেছন থেকে একটি মেয়ে এসে ডাকলো, 'দাদা'।'

ইপিন মুখ ফিরিয়ে তাকাতে দেখলো একটি কালো মেয়ে, ঢলঢলে মুখশ্রী রঙিনপাড় সাদা তাঁতের শাড়ি পরা। মেয়েটি বোধহয় তামিল, চুলে সাদা ফুলের মালা গোঁজা। ইপিন ঘুরে দাঁড়াতে মেয়েটি বললো, 'আমি উমা।'

'ও তুমিই তাহলে উমা', এই বলে ইপিন আর কি বলবে বুঝতে পারলো না।

এই তাহলে বিপিনের উমা, বিপিনের বাগদত্তা উমা। মেয়েটিতো চমৎকার। বাসায় গিয়ে মেনকাকে বলতে হবে।

বাসায় মেনকা একলা রয়েছে। পূর্ণগর্ভা, ও সময় সর্বদার জন্যে একজনকে কাছে থাকতে হয়। ইপিন উমাকে বললো, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। একদিন বাসায় এসো। আমাকে এখন তাড়াতাড়ি যেতে হচ্ছে।

উমা বিপিনের কথা জিজ্ঞসা না করে বললো, 'বৌদি, ভালো আছেন তো।'

'ভালো আছেন। বৌদির জন্যেই তাড়াতাড়ি ফিরতে হচ্ছে। তুমি একদিন বাসায় এসো না। এই বলে সামনের রিকশাটায় উঠে ইপিন স্টেশনের দিকে রওনা হলো।

পরের রবিবার সকালেই উমা এলো। তার আগে অবশ্য কাটোয়া থেকে নীরবালাকে ইপিন নিয়ে এসেছে। তিনি এখন প্রায় অশক্ত হয়ে পড়েছেন। বিশেষ হাঙ্গামা হুজ্জোত পোয়াতে পারবেন না। তবে তিনি বাতদিন নানারকম চিন্তা কবতে ভালোবাসেন। এখন অনেক চিন্তার খোরাক :পেয়েছেন।

নীরবালা রাতদিন মেনকার মাথায় হাত বুলোচ্ছেন আর চিন্তা কবে যাচ্ছেন। মেনকাব কথা চিন্তা করছেন, প্রভাসেব কথা, স্মৃতিকণার কথা, ইপিনের কথা, বিপিনের কথা, দূর সমুদ্রে তাঁর ছেলে জগন্নাথের কথা, এমনকি কাটোয়ায় চঞ্চলা-হারাধনের কথা।

কাটোয়ার বাড়িতে দৈনিক দুপুববেলা একজোড়া দাঁড়কাক এসে নিমের ডালে বসে কা-কা-কা-কা, ক-ক-ক-ক কবে তাবস্ববে চেঁচিয়ে তার কাছে খাবার চাইতো। চঞ্চলা কি কাক দুটোকে খাবার দেবে? কিছু তো-বলে আসা হয়নি। একটা চিঠি দিলে বোধহয় ভালো হয়।

বিপিন বন্দি নিবাসেব কর্তৃপক্ষেব কাছে জানতে চেয়েছিলো সে কোথাও চিঠি দিতে পারে কিনা। কর্তৃপক্ষ খোঁজ নিয়ে জানালেন, 'এ বিষয়ে কোনো হুকুম আসেনি।'

কি আব করবে বসে বসে। আগের রবিবাব আফু এক দিস্তে সাদা কাগজ দিয়ে গিয়েছিলো, সেই কাগজে প্রাণে যা চায় হিজিবিজি লিখে যাচ্ছে।

'গত বছরের নীড়ে
এ বছর আর একটি পাখিও আসে নাই ফিরে।'

এরপব বারদুয়েক মন দিয়ে পড়ার পর বিপিনের মনে হলো ভালো হয়নি, ডন কুইক্সোটের সেই পংক্তি, 'There are no birds this year in last years' nests,' তার ব্যঞ্জনা এখানে এসে গেছে।

অনেক ভেবেচিন্তে,দুবার কাটাকুটি কবে পংক্তি দুটি পরের দিন একটু অন্য রকম দাঁড়ালো,

'একটি পাখিও
এবার আসেনি ফিরে
গত বছরের নীড়ে।'

কবিতা লেখার সময় খেয়াল হয়নি, কিন্তু পরে বিপিন ধরতে পারে সেই কবেকার পড়া সার্ভেন্তেজের বই, সেই বইয়ের একটি না ভুলে যাওয়া লাইন, এতদিন পরে ফিবে এলো তার মনে।

কারণটা ওই ওদিকের দেয়ালে কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো এক অনুচ্ছেদ :—

"ফুল ফুটিবার কালে
সকালে বিকালে.....

"...ফুল ঝরিবার কালে
সকালে বিকালে"...

এক সময়ে বিপিনের কবিতা নিয়ে খুব বাতিক ছিলো। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও জীবনানন্দের, সুকান্তের অনেক কবিতা তার কণ্ঠস্থ ছিলো। তার খুব শখ ছিলো যে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকায় একটি কবিতা লেখে। গোটা পঞ্চাশেক কবিতা সে কবিতা পত্রিকায় পাঠিয়েছিলো, কিন্তু তার একটাও ছাপা হয়নি।

কবিতা অমনোনীত হওয়ার খবর বুদ্ধদেব বসু নিজের হাতে চিঠি লিখে জানাতেন। কি চমৎকার মুক্তোর মত অক্ষর, কি পরিচ্ছন্ন প্রত্যাখ্যান।

একবার বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে বিপিন দেখা করতে গিয়েছিলো। এক ছুটির দিনের সন্ধ্যাবেলা। রাসবিহারী এভিনিউয়ে 'কবিতাভবন'। বিপিনের ধারণা ছিলো, অন্তত কবিতাভবন নাম শুনে মনে হয়েছিলো, প্রাসাদতুল্য, বাগান ঘেরা বাড়ি নিশ্চয়। গিয়ে দেখলো দোতলার একটি উত্তরমুখী মাঝারি আকারের ফ্ল্যাট, রাস্তা থেকে একটা ছোট প্যাসেজ দিয়ে দোতলায় উঠে যেতে হয়।

তখনো রাসবিহারী এভিনিউয়ে খুব বেশি দোকানপাট ভিড়-ভাট্টা হয়নি। রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া তেমন নেই। ট্রাম যায়, দু নম্বর বাস যায়। একটু দূরে গড়িয়াহাটার মোড় সেখানে বাজারপাট আস্তে আস্তে শুরু হয়েছে।

কবিতাভবনের একতলায় একটা ঘড়ির দোকান। নীরবে কাজ হয় সে দোকানে। খদ্দের ভিড় নেই, হাঁকাহাঁকি নেই। দোতলায় কবিতাভবন, বুদ্ধদেব বসু-প্রতিভা বসুর বাসস্থান। বিপিন শুনেছিল, সব সময়ে গমগম করছে তরুণ কবিদের ভিড়ে।

বিপিন যখন সন্ধ্যাবেলায় কবিতাভবনে পৌঁছালো তখন কিন্তু ভেতরে লোকজন আছে বলে মনে হলো না। হয়তো সন্ধ্যার পরে ভিড় হয়।

সে যা হোক কলিংবেল বাজাতে বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং বেরিয়ে এলেন। সদর দরজায় চৌকাঠ আগলিয়ে দাঁড়ালেন। পরিষ্কার পাজামা-পাঞ্জাবি ধোপদুরস্ত পোশাক। বড়ুয়া-গলা মানে কাঁধের একপাশ দিয়ে বোতাম, আদ্দির পাঞ্জাবি, ঢোলা পাজামা। ঠোঁটের প্রান্তে একটা সিগারেট আলগোছে জ্বলছে।

বুদ্ধদেব কিন্তু অপরিচিত তরুণ কবিকে মোটেই পাত্তা দিলেন না। বিপিনের 'কবিতাভবনে' প্রবেশ করা হলো না। দরজায় দাঁড়িয়েই টুকটাক জিজ্ঞাসার জবাব দিলেন, বললেন, খুব ব্যস্ত থাকায় মাসখানেক কবিতা দেখে উঠতে পারেননি, সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে দেখা শেষ হলে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেবেন।

এরপর একটা আশ্চর্য কথা বললেন বুদ্ধদেব বসু, সেটা বিপিন বুঝতে পারেনি, ভুলতেও পারেনি।

বিপিন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে তখন বুদ্ধদেব ওই যে বললেন মনোনয়নের খবর চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেবেন, তারপর হঠাৎ স্বগতোক্তির মত বললেন, 'কিইবা জানবার আছে, আমি তো আপনাদের কবিতার ভালোমন্দ একটুও বুঝতে পারছি না।'

তবে বিপিনের মনে আছে পরে 'কবিতা' পত্রিকা উঠে যাওয়ার সময় এই একই কথা বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, 'এখনকার কবিতা বুঝতে পারছি না।'

রাজবাড়ির ভিতরের মহলের একতলার বারান্দার একপাশে যে ঘরটায় বিপিনের স্থান হয়েছে আরো দুজনের সঙ্গে, তার পেছন দিকে কিছুদূরে একটা দীঘি রয়েছে। বিপিনের ঘরের জানলা দিয়ে দীঘিটা পরিষ্কার দেখা যায় না, তবে সকালে সন্ধ্যায়, কয়েকটা হাঁস সামনের উঠানটা দিয়ে কামিনীফুল গাছগুলোর পাশ দিয়ে যাতায়াত করে।

হাঁসগুলোর প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজে খুব ভোরবেলা বিপিনের ঘুম ভেঙে যায়। ও পাশে রাস্তার দিকের কোথাও একটা বাড়ির থেকে ওরা আসে। সামনের দিকটায় এখনো কয়েকটা পরিবার বাস করে। পুরানো আমলের আমলা-মুহুরিদের কেউ কেউ এখনো রয়ে গেছে, যদিও জমিদারি উচ্ছেদ হয়ে গেছে পনেরো বছর আগে। তারই কোনো পরিবার হাঁসগুলো পোষে।

প্রতিদিন সাতসকালে হাঁসগুলো সামনের উঠোন দিয়ে ওই দীঘিতে চলে যায়। যুদ্ধবন্দীরা এখানে আটক রয়েছে বলে বাড়ির মধ্যের দরজা বন্ধ। সাধারণ মানুষের যাওয়াও নিষিদ্ধ, তবে হাঁস, কিংবা কুকুর বেড়ালের চলাফেরায় বাধা নেই।

বাইরের দিকে টিনের বেড়া রয়েছে। মাটিতে লেগে যাতে জং পড়ে নষ্ট না হয়ে যায় তাই মাটি থেকে একটু ওপরে বেড়া লাগানো। হাঁসগুলো ওই ফাঁকটুকুর মধ্যে দিয়ে গলে চলে আসে, আবার সন্ধ্যের আগেই আস্তানায় ফিরে যায়।

হাঁসের পরম শত্রু শেয়াল। আর এদিকে খুব উৎপাত শেয়ালের। সূর্য ডুবতে না ডুবতে চার-পাঁচটা শেয়াল, প্রত্যেকটা নাদুস নুদুস, লেজ মোটা, বিপিনদের জানলার সামনের উঠোনটায় বসে আকাশের দিকে মুখ তুলে অন্ধকারকে আবাহন জানায়। উঠোনের ও পাশের ঘরগুলোর একতলায় দোতলায় যে এতগুলো লোক রয়েছে সে বিষয়ে তারা নির্বিকার, বেপরোয়া।

দুয়েকবার জানলা দিয়ে হুস হুস করে শব্দ করে, কিংবা কাগজের বল পাকিয়ে বিপিন এবং আরো কেউ কেউ চেষ্টা করেছে শেয়ালগুলোকে ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর। তাতে কোনো কাজ হয়নি, শেয়ালরা খুব চালাক, কি করে তারা বুঝে গিয়েছিল এই লোকগুলো ঘরে আটক আছে, বেরিয়ে এসে কিছু করার ক্ষমতা নেই।

মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল একদিন।

তখন শীতের শুরু। বিপিনদের বন্দী জীবন প্রায় দু-মাস হয়ে গেছে। সেদিন সকাল থেকে আকাশ মেঘলা, একটু আধটু ঝিরঝিরি বৃষ্টি মাঝে মাঝে হচ্ছে। দূরে ব্রহ্মপুত্র নদী পার হয়ে গারো পাহাড় থেকে ঠাণ্ডা বাতাস গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে, কথা নেই, বার্তা নেই হঠাৎ উঠোনের ও পাশের কামিনীফুল গাছটা এই ঠাণ্ডায় ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। শীতের ভারি বাতাসে সেই গন্ধ থমথম করছে।

বিপিন দৈনিক দুপুরে ভাত খাওয়ার শেষে এক দলা ভাত হাতের মুঠোয় নিয়ে উঠে আসতো। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বন্দীভাতা থেকে বিপিন একটা দৈনিক কাগজ রাখতো। স্বাদ বদলের জন্যে একেকদিন একেকটা পত্রিকা, কোনো দিন 'দৈনিক ইত্তেফাক' বা 'ইত্তেহাদ', তখনো 'দৈনিক আজাদ' উঠে যায়নি। তাছাড়া 'পাকিস্তান অবজারভার', সেই হাস্যকর ইংরেজির কাগজ কিংবা করাচীর দুর্ধর্ষ 'ডন'।

শোয়ার ঘরে মাথার কাছে জানলার তাকে সব খবরের কাগজ জমানো থাকতো তার থেকে পাতা ছিঁড়ে মুঠোর ভাতগুলো বিপিন কাগজে মুড়ে রেখে দিতো। তারপর বিকেলে যখন উঠোন দিয়ে হাঁসগুলো সারি বেঁধে ফিরে যেতো, 'চই-চই' করে বিপিন সেগুলোকে ডাকতো, ডেকে জানালা দিয়ে ভাতগুলো ওদের সামনে ছিটিয়ে দিতো। পরম আনন্দের সঙ্গে হৈ হৈ করে হাঁসের দল সেই সান্ধ্যভোজে যোগ দিতো।

শীত শুরুর সেই মেঘলা দুপুরে সেদিন খুব তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে এসেছিলো হাঁসগুলো, উঠে এসে বিপিনের জানলার নিচে 'প্যাঁক প্যাঁক' শুরু করে দিয়েছে। বিপিন বিছানায় গা এলিয়ে ঘুমোচ্ছিলো, ঠিক এরকম সময়ে হাঁসগুলো আসে না। আজ মেঘলা দিন বলেই বোধহয়, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে ভেবে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে।

ঘুম চোখে জানলার তাকের ওপর থেকে ভাতের ঠোঙাটা হাতে নিয়ে উঠোনের হাঁসগুলোকে ভাত ছড়িয়ে দিচ্ছিল বিপিন, হঠাৎ দেখতে পেলো কি পেলো না, দীঘির ধারের কচু আর ভাঁট ফুল গাছের ঝোপের আড়াল থেকে একটা শেয়াল অতর্কিতে এসে বিদ্যুৎ বেগে সবচেয়ে পেছনের পাটকিলে রঙের একটা হাঁসের গলাটা কামড়ে ধরে দৌড়ে আবার দীঘির দিকে চলে গেলো।

বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে ওর থেকে বেশি দেখা গেলো না। মৃত্যু পথযাত্রী হাঁসের বিলীয়মান আর্তনাদ, অন্য হাঁসগুলোর ভীত চেঁচামেচি। তারপর ভাত ফেলে সন্ত্রস্ত হয়ে বাড়ির দিকের টিনের বেড়া গলিয়ে অন্য হাঁসের দ্রুত পালানো। একটু পরে উঠোন ফাঁকা, কিছু ভাত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে, এদিকে ওদিকে কয়েক ফোঁটা রক্ত, দু-একটা হাঁসের পালক।

মুক্তাগাছার সেই নিবপবাধ বন্দীজীবন নিয়ে বিপিনের মনে কোনো গ্লানি বা ক্রোধ নেই। চট করে এখন মনেও পড়ে না যে জীবনের মূল্যবান ছয়টি মাস বিনা দোষে কারাবন্দী হয়ে থাকতে হয়েছিলো। কিন্তু এক ময়লা শীতের দুপুরে পরিত্যক্ত জমিদার বাড়ির ভাঙা উঠোনে একটা শেয়াল একটা হাঁস মেরে নিয়ে যাচ্ছে, কিছু করা যাচ্ছে না, হাঁসটা এবং তার সঙ্গীরা করুণভাবে চেঁচাচ্ছে, পেছনে পোড়ো দীঘি, ঝোপঝাড় জঙ্গল—এরপর থেকে বিপিনের এটা একটা বাঁধা দুঃস্বপ্ন।

স্বপ্নটা দেখে এখনো বিপিন মাঝে মধ্যে ঘুমাতে ঘুমাতে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে। দুঃস্বপ্ন এর চেয়ে অনেক খারাপ হয়। ঘামে ভিজে যাওয়ার মতো মারাত্মক দুঃস্বপ্ন তো এটা নয়। বিপিন কখনো কখনো ভেবেছে স্বপ্ন দৃশ্যটা নিয়ে একটা কবিতা টবিতা লিখলে হয়তো মনের জটটা একটু ছাড়ানো যায়। দুঃস্বপ্নটা কেটে যায়।

কবিতা লেখার একটা শখ সেই ছোটবেলা থেকেই বিপিনের ছিলো। বড় হয়ে কলকাতায় এসে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মিশে কফি হাউসে আড্ডা দিয়ে, কবি সম্মেলনে গিয়ে নিজেদের কবিতার কাগজ বার করে এমনকি খালাসিটোলায় গিয়ে বাংলা মদ খেয়ে হল্লা করে একটা রীতিমতো কবি জীবনের অবতারণা করেছিলো বিপিন।

দুঃখের বিষয়, কবি বিপিন চৌধুরি কিন্তু এ লাইনে তেমন সুবিধে করতে পারেনি।

বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না, কিন্তু কবিতার ব্যাপারটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। অনেক শক্তি, খেদ, দীর্ঘশ্বাস, অনেক নিঃশব্দ রক্তক্ষরণ। অকারণ শত্রুতা বন্ধুবিচ্ছেদ—বহু ঝুঁকি নিতে হয় কবি হতে গেলে। শুধু কবিতা লিখেই পার পাওয়া যায়না। সঙ্গে থাকে অনবরত আড্ডা, অত্যধিক চা, কিংবা মদ্য পান। তারপর জীবিকার কেরিয়ার নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা, অল্প বয়েসের এই পাগলামির ঝুঁকি কিছু কম নয়।

অনেকে কিছু না বুঝেই এরকম একটা ঝুঁকি নিয়ে ফেলে। অনেকে আবার এত সব গোলমালের মধ্যেই বেশ গুছিয়ে নেয়।

বিপিন ঝুঁকিটা নিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি নেয়নি। সে যখন কলেজে ভর্তি হয়েছে

কলকাতা শহরে কবিতার খুব রমরমা। রাত বারোটার পর কলকাতা শাসন করেন চারজন যুবক, অনেক সময় রাত বারোটার আগে দিনে দুপুরেও কলকাতা শাসন করেন চারজন যুবক, চারজন কবি। রেস্তোঁরার, কফি হাউসের আড্ডায়, তাদের নিয়ে তুমুল আলোচনা।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তরাই থেকে সুন্দরবন। যখন কলকাতায় আছেন সারা দিন রাত ফুটপাথ বদল হচ্ছে উল্টোডাঙা থেকে বালিগঞ্জ পর্যন্ত।

পাড়ায়-পাড়ায় সপ্তাহে সপ্তাহে কবি সম্মেলন। কখনো সেটা ঘরোয়া ছোট হল ঘরে। কখনো ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, ওভারটুন হলে। বিরাট হৈ চৈ কাণ্ড।

বঙ্গ সংস্কৃতির মেলায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত কবিরা রঙীন ফানুস কাগজে কবিতার হ্যাণ্ডবিল বিলি করছেন। রাস্তায় মিছিল বেরোচ্ছে 'আরো কবিতা পড়ুন।' কবিতা মেলা বসছে বিভিন্ন স্কোয়ারে,ময়দানে।

চারদিক থেকে কত রকম ছোটছোট কবিতার কাগজ বের হচ্ছে। রাসবিহারী এভিনিউ থেকে 'শতভিষা' কাগজ বার করছেন আলোক সরকার। একবার শতভিষায় বিপিনের একটা দশ লাইন কবিতা বেরিয়েছিল। তাই নিয়ে বন্ধু মহলে কি উত্তেজনা।

কৃত্তিবাসেও দুটো কবিতা পাঠিয়েছিলো সে। তখন সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কবিতা দুটো ছাপা হয়েছিলো কি না সে জানে না কারণ কৃত্তিবাস কাগজ সে আর খুলে দেখেনি। দেখার সুযোগও ছিল না, কারণ সে কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছিলো। এদিকে কার কাছে যেন শুনেছিলো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমেরিকা চলে গেছেন। সেখানেই বিয়ে করে বসবাস করছেন।

বুদ্ধদেব বসুও ইতিমধ্যে 'কবিতা' পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছেন। এরই মধ্যে একদিন বারদোয়ারি আর খালাসিটোলা ঘুরে মুখে মুখোশপরা হাংরি জেনারেশনের লেখকেরা ঘোষণা করতে এলো 'কেউ খারাপ কবিতা (ওরা বলতো পদা) লিখলে, পড়লে, ছাপলে হাতুড়ি মেবে তার হাঁটু ভেঙে দেওয়া হবে, তার ডান হাতের বুড়ো আঙুল অ্যাসিড ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হবে।'

বিপিন আর কবিতা লেখেনি। অবশ্য এই সব কারণে সে কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলো, তা মোটেই নয়।

বিপিন কবিতা লেখা ছেড়েছিলো দুটি বড় কারণে। প্রথমত সে একটা চাকবি পেয়ে গিয়েছিলো। দ্বিতীয়ত সে প্রেমে পড়েছিলো। এই দুটি দিক দেখাশোনা করে তার আর কবিতা লেখার অবকাশ ছিলো না। তা ছাড়া চাকরি নিয়ে কলকাতার বাইবে চলে যাওয়ায় কবি বন্ধুদের, কবিতার আড্ডার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

বিপিনের একটা বড় সুবিধে ছিলো যে সে ছিলো কমার্সের ছাত্র। তাব সতীর্থদের মধ্যে কবিতা অনুরাগী তেমন কেউ ছিলো না। কবিতার লোকদের আড্ডা ছিলো দেশপ্রিয় পার্কে, সুতৃপ্তি রেঁস্তোরায়, কলেজ স্ট্রীট বা শ্যামবাজার কফি হাউসে, ইউনিভার্সিটি ক্যান্টিনে। যারা মদ্যপান শুরু করেছিলো খালাসিটোলা, বারদোয়ারিতে; বড় জোর ধর্মতলা মোড়ে ছোট ব্রিস্টলে আড্ডা বসতো। বেকারের পক্ষে খুবই মহার্ঘ আড্ডা।

সে যা হোক এই আড্ডাগুলো এড়িয়ে গেলে বিপিনের আর কবিতার ঝামেলা নেই। আড্ডা দিয়ে, নেশা করে ব্যয় করার মত সময় বা টাকা কিছুই বিপিনের ছিলো না।

কলকাতায় এসে প্রথমদিকে অবশ্য বিপিন টাকার কষ্ট খুব একটা পায়নি। তখন পাকিস্তানি টাকার বাজার দর বেশি। ওদিকের একশো টাকা দিলে এদিকের একশো পঁচিশ তিরিশ পাওয়া

যেতো। তার আগে তো আরো বেশি পাওয়া যেতো।

হুণ্ডি বা হাওলার কারবার চিরকালই চালু ছিলো। তবে টাকা নিয়ে যাতায়াতের অসুবিধে ছিলো না। অল্প কড়াকড়ি হয়তো ছিলো তবে মারাত্মক নয়।

প্রভাতসকুমার প্রত্যেক মাসে ইপিন-বিপিনকে টাকা পাঠাতেন, ইপিনের জন্যে তিরিশ আর বিপিনের জন্য সত্তর, মোট একশো টাকা।

বিপিন মেসে থাকতো, তার মেস খরচা 'মাসে পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ টাকা পড়তো, সেই জন্যে সে চল্লিশ টাকা বেশি পেতো।

ইপিন থাকতো প্রভাসকুমাবেব পিসির বাড়িতে। প্রভাসকুমারের ওই একই পিসি। প্রভাসকুমার জন্মানোর আগেই পিসি ননীবালার বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো।

ননীবালা ছিলেন ডাকসাইটে সুন্দরী। রংপুরের ভৌমিক পরিবারে বিয়ে হয়েছিলো। রংপুরের পাট ভৌমিক পরিবার বহুকাল আগেই তুলে দিয়েছিলো। তবে বসতবাটি, ভদ্রাসন, গৃহদেবতা জয়গোপাল, কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি, নাটমন্দির এসব যেমন থাকে, ছিলো। নায়েব, গোমস্তা, পুরোহিত এরা যে যার মত দেখাশোনা করতো। পার্টিশনের সঙ্গে সে সব ঝামেলা চুকে গেছে।

কলকাতার এণ্টালিতে ভৌমিক নিবাসের বয়েস একশো বছর হতে চললো। শাশুড়ি মরে যাওয়ার পর প্রায় পঞ্চাশ বছর হয়ে গেলো। এই পঞ্চাশ বছর ভৌমিক নিবাসের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী ননীবালা।

ননীবালা অকালবিধবা এবং নিঃসন্তান, কিন্তু তার জন্য কিছু ঠেকেনি। অপরিসীম দাপটের সঙ্গে তিনি রাজত্ব করে গেছেন।

রাজত্ব বললে কম বলা হয়। তার চেয়ে ঢের বেশি। পঞ্চাশের দশকেও দুবেলা ষাট সত্তর জন লোক খেতো ভৌমিক নিবাসে। এনামেলের কলাইকরা থালা, রাজার মুকুট আঁটা এ্যালুমিনিয়ামের অসমতল জলের গেলাস, কয়েকটা কাঠের পিঁড়ি, কয়েকটা চটের আর মাদুরের আসন। ভিতরবাড়ির বারান্দায় এক সঙ্গে কুড়িজন খেতে পারে।

খাদ্য সামগ্রী তেমন আহামরি নয়। কিন্তু তারও স্বাদ কিছু কম নয়। একটা শাক কিংবা সেদ্ধ, একেক দিন একেক রকম। ডালও তাই। শুধু মুগ-মুসুর, ছোলা-মটর নয়। বিউলি-অড়হর-খেঁসারি সপ্তাহেব সাতদিন সাতরকম ডাল। এর পরেও মাছের লম্বা ঝোল বেগুন, ঝিঙে ও মুলো দিয়ে।

এ সব খাদ্যের স্বাদ কদাচিৎ ইপিন পেয়েছে। সে ছিলো ননীবালার পরম আদরের ধন। ননীবালাকে না জানিয়ে দুয়েকদিন উঠোতে পাত পেড়েছে ইপিন, খুব ভালো লেগেছে খেতে কিন্তু সে স্বাদ ননীবালার খাবারের কাছে কিছুই নয়।

শুধু নিরামিষ খাবার নয়, ইপিনের জন্যে আমিষ খাবার আনা হতো। কলেজ স্ট্রিটে জ্ঞানবাবুর দোকান থেকে, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে চাচার হোটেল থেকে। এমনকি শ্যামবাজারের গোলবাড়ি থেকে কষা মাংস আর রুটি আনিয়ে নিতেন ননীবালা নাতির জন্যে।

ননীবালাকে পিসিঠাকুমা বলতো ইপিন। প্রথম দিন থেকে দোতলার ছাদে বড় দক্ষিণ-পূর্ব ঘরখানায় অর্ধেক ঘরজোড়া মেহগনি খাটে ননীবালার পাশে শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছিলো ইপিনের।

মধ্যে একটা মানুষ প্রমাণ সাদা ধবধবে টইটুম্বুর গোলবালিশ, ওপাশে বিগতযৌবনা কিন্তু অটুট শরীর পিসিঠাকুমা এপাশে ষোলো বছরের ইপিন।

রংপুরের ভৌমিকদের ব্যবসা ছিলো গবাণহাটায়। বই পত্রের ব্যবসা। প্রথম পুরুষ কালীনারায়ণ ভৌমিক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আহ্বানে কলকাতা এসেছিলেন পড়াতে, কোন একটা বিদ্যালয়ে হেডপণ্ডিতের চাকরি নিয়ে, চাকরি করতে করতে কয়েকটা পুরানের অনুবাদ করেন বাংলায়। সে সময় ধর্মগ্রন্থের খুব চাহিদা।

অবসর গ্রহণ করার পর কালীনারাযণ নিজের বই নিজেই প্রকাশ করা আরম্ভ করেন। সঙ্গে একটা ছাপাখানাও করেন। সে কালের অনেক পণ্ডিতমশায় এমন করেছিলেন। পুরানের অনুবাদ, গীতা, রামায়ণ এমনকি পূজা পদ্ধতি, পরোহিত দর্পন সেই সঙ্গে শিশু পাঠ্য, স্কুল পাঠ্য, নীতিকথামুলক অনেক কিছুই গত একশো বছর ধরে ভৌমিক পুস্তকালয় ছেপেছে। এখনো ব্যবসা খারাপ নয়।

কলকাতার এন্টালিতে 'ভৌমিক নিবাস' সেকালের তুলনায় না হলেও এখনকার মাপে বেশ বড় বাড়ি। নতুন সি আই টি রোড তৈরি হওয়ার সময়ে বাড়িটার সামনের কিছু অংশ ভাঙা পড়ে। দেউরি, দারোয়ানের ঘর। সামনে ছোট একটা ফুলবাগান, জবা, টগর, শেফালি গাছ এসব নতুন রাস্তায় খেযে নেয়।

এর পরেও বাড়ির যে অংশটুকু বর্তমান ছিলো, ইপিন এসে যা দেখেছিলো তাও যথেষ্ট। পুরো বাড়িটা বোধহয় এক সময় এক বিঘে জমির ওপরে তৈরি হয়েছিলো, এক বিঘে মানে কুড়ি কাঠা। ইপিন যখন এসেছিলেন তখনও বারো-চৌদ্দ কাঠার মত ভৌমিক নিবাসের আয়তন।

কলকাতা শহরের মধ্যে একটা বাড়িতে দুটো আমগাছ, দুটো কাঁঠালগাছ, গোটা কয়েক নারকেল গাছ দেয়াল ঘেঁষে, এমনকি একটা দিশি টোপাকুল গাছ—কেমন একটা সাবেকি ভাব। পিসি ঠাকুমার বাড়িতে বছর ছয়েক ভালই ছিলো ইপিন।

দোতলা বাড়ির একতলায় উঠোনের দুপাশে দুটো বড় ঘর, তার সামনে উঠোনে দুদিকে গন্ধরাজ ফুলের ঝাড়, কোনও কোনও গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় গন্ধরাজ গাছের ডালপালা, ঘন কালো সবুজ শক্ত পাতা ছেয়ে যেতো অজস্র সাদা ফুলে। প্রায় একই দিনে সব গাছগুলোয় একই সঙ্গে ফুল ফুটতো। গন্ধটা পাওয়া যেত ট্রাম স্টপে নেমে গলির মুখে একটু এগোলেই, সারা বাড়ি থই থই করতো গন্ধে।

আরেকটা কথা মনে আছে ইপিনের, রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে অদূরে শেয়ালদা স্টেশনের রেলের বাঁশি, কু-ঝিক-ঝিক শোনা যেত, পুবের দিকের লাইন দক্ষিণ শহরতলীর লাস্ট ট্রেন চলে যেত তার একটু পরেই ঘটাং ঘটাং করে দিনের শেষ ট্রাম ফিরতো পার্ক সার্কাসে, সেই ধারাবাহিকতা এখনও ইপিনের মনের মধ্যে আছে।

এই শেয়ালদা স্টেশন কাছে বলেই, হাঁটাপথে আধমাইলও নয়, ভৌমিকরা এন্টালিতে বাড়ি করেছিলেন। শেয়ালদা থেকে আসা যাওয়ার সুবিধে, রংপুরের সঙ্গে তখনও পুরোপুরিই যোগাযোগ ছিলো। লোকজন, আত্মীয় স্বজনের আসা-যাওয়ার বিরাম ছিলো না।

ইপিন যখন কলেজে ভর্তি হতে কলকাতায় এসেছে, তখন পাসপোর্ট ভিসার কড়াকড়ি দু দেশের মধ্যে রীতিমত শুরু হয়ে গিয়েছে। রংপুরের সঙ্গে যাতায়াত প্রায় বন্ধ। তাছাড়া একশো

বছর কলকাতায় বাসা করে থেকে ভৌমিক বাড়ির লোকদের রংপুরের ওপর আর সেই সাবেকি টান নেই। আর নতুন প্রজন্ম তো রংপুর দেখেই নি।

তবে পিসি ঠাকমার দুর্বলতা ছিলো রংপুর বিষয়। যখন পুজোর বা গরমের ছুটিতে ইপিন টাঙ্গাইল যেতো, ননীবালা হয়তো বলতেন, 'ফেরার পথে একবার রংপুরের বাড়িটা দেখে আসিস তো।' একেকবার বলতেন, 'একেবারে কোনও খোঁজখবর নেই। জয়গোপালের পুজো-আর্চা ঠিকমতো হচ্ছে কিনা একটু দেখা দরকার।' কিংবা 'নাট মন্দিরটা ঝড়ে ভেঙে পড়েছিলো শুনেছিলাম। সেটা তোলা হলো কিনা কেউ তো কিছু জানালো না। কোনও খোঁজখবর নেই।'

তবে খোঁজখবর একেবারে ছিলো না তা নয়। ননীবালার এক দূর সম্পর্কের ননদ রংপুরের বাড়িতে থাকতেন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। মাঝেমধ্যে পোস্টকার্ডে বাংলা নববর্ষে, পুজোয়, বিজয়া দশমীর পরে তার চিঠি আসতো। ননীবালাও তাঁকে কখনও কখনও চিঠি দিতেন।

তবে ননীবালা জানতেন না, আটচালা টিনের বড় নাটমন্দিরটা ভেঙে পড়ে যাওয়ার পর আর তোলা হয়নি। সেটার টিন, খুঁটি সব খুলে খুলে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিলো। আর জয়গোপালের নিত্যপুজোও প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। পাকিস্তান হওয়ার প্রথম দিকে রংপুর থেকে একবার জয়গোপালকে কলকাতায় এন্টালির বাড়িতে তুলে আনার কথা ভেবেছিলেন ননীবালা। কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠেনি।

অবশ্য ইপিনের আর রংপুরে কখনও যাওয়া হয়নি। রংপুর একদিকে আর টাঙ্গাইল অন্যদিকে। ব্রহ্মপুত্রের এপার থেকে পদ্মা-যমুনার ওপার।

প্রত্যেকবার টাঙ্গাইল থেকে আসার সময় ইপিন পিসি ঠাকুমার জন্যে টাঙ্গাইলে দয়াল ঘোষ কিংবা খোকা ঘোষের কাছ থেকে টিনের কৌটোয় দুসের ঘি নিয়ে আসতো। তারপর আসার পথে চারাবাড়ি কিংবা পোড়াবাড়ি থেকে এক হাঁড়ি চমচম। সিরাজগঞ্জের রেলগাড়িতেও চকোলেটের মতো ক্ষীরের বরফি সন্দেশ জাতীয় রাঘবসই নামে এক রকম মিষ্টি পাওয়া যেতো। তার স্বাদও চমৎকার। কোনও কোনও বছর ফেরার পথে ইপিন হাতে টাকা পয়সা থাকলে রাঘবসই কিছু কিনে নিতো কলেজের বন্ধুদের জন্যে। শুকনো খাবার, সহজে নষ্ট হতো না। ইপিনের অনেক বন্ধু আজ এতকাল পরেও দেশ থেকে নিয়ে আসা সেই রাঘবসইয়ের কথা মনে রেখেছে।

তবে টাঙ্গাইল থেকে আসার সময়ে ইপিনকে শুধু ঘি বা মিষ্টি আনলেই হতো না। গরমের ছুটির পরে অনেকবার ইপিন টাঙ্গাইলের বাড়ি থেকে একটা কি দুটো কাঁঠাল নিয়ে এসেছে। সেই কবে পিসি ঠাকুমাদের ছোট বয়সে নতুন ইঁদারার ধারে একটা খাজা কাঁঠাল গাছ ছিলো, পিসি ঠাকুমার ধারণায় ওকরম মিষ্টি, সুস্বাদু, রসে ভরা কাঁঠালকোয়া ভূ-ভারতে আর কোথাও নেই।

সেই নতুন ইঁদারা কবে পুরনো হয়ে গেছে। ইপিন-বিপিনদের ছোটবেলাতেই সেই ইঁদারা মজে, হেজে গেছে। আবর্জনায় ভর্তি, পার ভাঙা। বাচ্চা ছেলেপিলে কিংবা জীবজন্তু যাতে হঠাৎ করে তার মধ্যে না পড়ে যায় তাই তার চারপাশে মাদারকাঁটার বেড়া দেওয়া।

আর সেই অমৃতোপম খাজা কোয়ার কাঁঠালগাছও জন্মে ইস্তক ইপিন-বিপিন চোখে দেখেনি, তাদের জন্মানোর ঢের আগে সেই কাঁঠাল গাছ মরে গেছে। একটা কাঁঠাল গাছ আর কতদিন বাঁচে?

পিসি ঠাকুমার অবশ্য এত হিসেব ছিলো না। বাড়িতে কাঁঠাল বা আম গাছের কোনও অভাব ছিলো না। দালানের সামনে পিছনে, রান্নাঘরের পাশে, ডোবার ধারে ছড়ানো ছিটোনো অবিন্যস্ত অনেকগুলো গাছ, প্রচুর ছায়া। বসন্তে আমের মুকুল। কাঁঠালের মুচি। উঠোনে হলুদ পাতার

ছড়াছড়ি। কলভারে ন্যুব্জদীর্ঘ গ্রীষ্মের দিন।

বাড়িতে বেশ কয়েকটি গাছ তখনও ছিলো যেগুলো খাজা কাঁঠালের। সেই সব গাছে ইপিনের গরমের ছুটি শেষ হওয়ার মুখোমুখি যে ফলগুলো বাত্তি হতো, তার মধ্যে থেকে একটা দুটো স্মৃতিকণা বেছে নিয়ে দিতেন ভৌমিক বাড়ির পিসি শাশুড়ির জন্যে।

এই বাত্তি শব্দটা স্থানীয়। ইপিন কোনও অভিধানে শব্দটা পায় নি, তবে মানেটা পরিষ্কার, বাত্তি অর্থ পক্কমান, পাকার মুখে।

আম, কাঁঠাল, কলা, বেল ইত্যাদি সবরকম ফলই গাছে পুরো পেকে যাওয়ার আগে নামিয়ে আনাই নিয়ম। এর পরে একা একাই ঘরে পাকবে।

গাছে পাকতে দেওয়া সম্ভব নয়। দিনের বেলায় কাকের অত্যাচার। গ্রীষ্মকালে কাকের বাচ্চা জন্মায। গর্ভিনী বা প্রসুতি বায়সজননীর মতো খাদ্যলোভী পাখি নিতান্ত বিরল। প্রকৃতির প্রয়োজনেই তাকে অনেক খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়।

শুধু দিবাচরী বায়সী নয়, নিশাচরী বাদুড় রয়েছে। সূর্যাস্তের পরে অন্ধকারে ডানা মেলে তারা সুপক্ক ফলের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। যত শক্ত খোসাই হোক তারা শুষে শাঁস বের করে নেবে।

এর পরেও রয়েছে হনুমান-বাঁদর, শেয়াল। দিনের বেলা, রাতের বেলা ভেদাভেদ নেই, পাকা ফলের গন্ধে এরা বেসামাল হয়ে যায়। দিন বাতেব ব্যতিক্রম হয় না।

এ ছাড়াও আছে পাড়া-প্রতিবেশী। আম কাঁঠাল পেলে সবাই খুশি হয়। কেন যেন স্মৃতিকণা চান সবাই খুশি হোক, সবাই খুশি থাক। তবুও তারপরেও সবাইকে খুশি রেখেও দুটো খাজা কাঁঠাল ইপিনও সঙ্গে কবে কলকাতায় নিয়ে আসে।

কি করে কবে থেকে শুরু হয়েছিলো সেটা অনেক খোঁজখবর না করে বলা কঠিন, কিন্তু ঘটনাটা হলো এই যে, একসময়, বিশেষ করে দেশভাগের আগে পর্যন্ত কলকাতায় বই বাঁধাইয়ের কাজটা ছিলো টাঙ্গাইল-মুন্সীগঞ্জ-মানিকগঞ্জ অঞ্চলের ধলেশ্বরী নদীর তীরের কয়েকটি গ্রামের মুসলমান পরিবারগুলির একচেটিয়া।

এঁরা পুরুষানুক্রমে কলকাতার রাজাবাজার, পাটোয়ারবাগান অঞ্চলে বাস করতেন। কারিগরেরা এই শহরে সাধারণত সপরিবাবে বাস করতেন না। পরিবার থাকতো দেশে। পাঠ্যবইয়ের মরশুম শেষ হলে এবং দুই ঈদের সময় এঁরা বাড়ি যেতেন। কলকাতায় বই ব্যবসার জগতে এঁদের নাম দপ্তরি।

দেশভাগের পর ধলেশ্বরী তীরের দপ্তরিরা যাঁরা এতকাল কলকাতায় ছিলেন তাঁদের একটা বড় অংশ কারবার গুটিয়ে ঢাকায় চলে যান। ছেচল্লিশ সালের দাঙ্গা কলকাতায় প্রায় সমানে সমানে হয়েছিলো। কিন্তু উনিশশো পঞ্চাশ সালের সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে কলকাতার মুসলমানরা, বিশেষ করে নিরীহ, ছাপোষা শ্রমিক কর্মচারি শ্রেণীর লোকেরা খুব বিপদগ্রস্ত হয়। প্রাণ এবং সম্পদ হানিও কিছু কম হয় নি।

তবে শুধু কলকাতার মুসলমান বলে নয় দেশভাগের তিন বছর ঐ দাঙ্গায় ঢাকা-বরিশাল

থেকে বিহার পর্যন্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, ভারতে মুসলমান এবং পাকিস্তানে হিন্দু খুবই খারাপ অবস্থায় পড়ে। বহু ক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় খুন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ নির্বিচারে চলে।

অবশ্য এর পরেও দুই দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে অনেকে মাটি আঁকড়িয়ে থেকে গিয়েছিল, যেমন ছিলো টাঙ্গাইল মানিকগঞ্জের দপ্তরিরা পাটোয়ার বাগানে বা বৈঠকখানা রোড থেকে রাজাবাজার পর্যন্ত এলাকায়। এঁদের অধিকাংশেরই বাড়ি ধলেশ্বরী পারের সিংরাগি, হিঙ্গানগর, নাগরপুর ইত্যাদি গ্রামে।

প্রথমদিকে প্রভাসকুমার মাসে মাসে ইপিন-বিপিনদের টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন রহিম দপ্তরির মাধ্যমে। সেরেস্তা সূত্রে রহিম প্রভাসকুমারের পুরনো মক্কেল। নাগরপুরের পাশের একটা ছোট গ্রামে বাড়ি।

রহিম দপ্তরির কলকাতায় প্রায় তিন-চার পুরুষের বই বাঁধাইয়ের ব্যবসা। সেই ব্যবসার টাকায় গ্রামে কিছু জমিজিরাত হয়েছে। মোটামুটি সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। ফলে দেশেগাঁয়ে যা হয় কিছু মামলা-মোকদ্দমাও আছে।

এ সব বৈষয়িক ব্যাপারে কলকাতাবাসী রহিম সাহেব প্রভাসকুমারের ওপরে নির্ভরশীল ছিলেন। মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদির খরচখরচা বাবদ যে টাকা রহিম দপ্তরির কাছে প্রভাসকুমারের পাওনা হতো, সেই টাকা থেকে এবং সেই সঙ্গে রহিম দপ্তরির গ্রামের বাড়িতে কিছু থোক টাকা সময়ে অসময়ে দিয়ে প্রভাসকুমার ইপিন-বিপিনের কলকাতার খরচের ব্যবস্থা করেছিলেন।

প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে ইপিন গিয়ে রহিম সাহেবের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসতো, নিজের টাকা নিজের কাছে রেখে বাকি টাকা বিপিনকে দিয়ে দিতো।

ইপিন কোনওদিন বিপিনকে রহিম সাহেবের কাছে টাকা আনতে পাঠাতে পারেনি, সে নিজেই যেতো। এ সব ছোটখাট কাজ বিপিনের পছন্দ হতো না। কিন্তু নিজে থেকে একেকটা গোলমেলে ব্যাপারে সাংঘাতিকভাবে বিপিন জড়িয়ে যেতো।

বৃদ্ধ রহিম দপ্তরি ইপিনকে এক ধরনের স্নেহ করতেন। ইপিনেরও পছন্দ ছিলো তাঁকে।

রাজাবাজারের পাশে কেশব সেন স্ট্রিটে দপ্তরি খানায় মাসের প্রথমে ইপিন যখনই টাকা আনতে যেতো টাকা দেওয়া ছাড়াও আলমারিতে যত্ন করে তুলে রাখা একটা ফুলকাটা কাঁচের গেলাসে আধগেলাস আদা দেওয়া ঘন চা আর সেই সঙ্গে একটু লম্বু খাওয়াতেন।

এখন বোধহয় আর পৃথিবীতে কোথাও লম্বু পাওয়া যায় না। এটা ছিলো এক ধরনের চিনি ছড়ানো কিসমিস দেওয়া গোল মুচমুচে বিস্কুট। খুব সুস্বাদু, কিন্তু অনেক সময় খেলে পরে পেটে ব্যথা হতো।

মাসের প্রথম রবিবার সকালে মৌলালির মোড় থেকে প্রায় ফাঁকা তিন নম্বর বাসের দোতলায় আরামে বসে পুরনো পাঁচ পয়সার টিকেট কেটে রাজাবাজার চলে আসতো ইপিন, অবশ্য সামান্য একটু হেঁটে শেয়ালদা বৌবাজারের মোড়ে এলে এক আনা মানে চার পয়সাতেই বাসে যাওয়া যেতো। ট্রামের তিন পয়সায় রাজাবাজার কেন একেবারে শ্যামবাজার পর্যন্ত।

রহিম সাহেবের ওখান থেকে খুব সহজে ছাড়া পেতো না ইপিন। অনেক সুখ দুঃখ, দেশ গাঁয়ের গল্প হতো। তাঁর কথা শুনে ইপিন বুঝতে পারতো রহিম দপ্তরি পঞ্চাশ বছর ব্যবসা, বসবাস করার পরেও এই কলকাতা শহরে খুব বেমানান। এদিকে দেশে গাঁয়েও বেশিদিন থাকতে পারেন না, পালিয়ে চলে আসেন। এখন ভিসা পাসপোর্ট হয়ে যাতায়াত জটিল হয়ে পড়েছে, তাঁর আর বিশেষ যাওয়া হয় না। দেশে দুই স্ত্রী ছিলো রহিম সাহেবের। বড়জন সংসার ছেলে-মেয়ে

গরু-বাছুর জমিজমা দেখাশোনা করতেন। সেই মহিলা বছর দুয়েক আগে মারা গেছেন। তার পর থেকে একটা বৈরাগ্যের ভাব এসেছে রহিম সাহেবের।

ছোট বৌ কোনও কাজের নয়। বয়েসও কম। তখনও হয়তো তিরিশ হয় নি। তাঁরই এক কারিগরের মেয়ে। রহিম সাহেবের রান্না-বান্না করতো সন্ধ্যাবেলায় হাত-পা টিপে দিতো। সম্পর্কটা ধবে ধীরে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। তখন আর বিয়ে না করে উপায় ছিলো না। এ মাত্র দশ বারো বছর আগের ঘটনা। মেয়েটিকে কলকাতায় কাজীর কাছে বিয়ে কবে তিনি গ্রামে রেখে আসেন। এখন আর সে ব্যাপারে তাঁর কোনও টান নেই।

তরুণ ইপিনের কাছে বৃদ্ধ রহিম এসব কথা নির্বিচারে বলতেন। অনেক পুরনো গল্পও বলতেন তিনি। পিসিঠাকুমা ননীবালাকেও চিনতেন রহিম। কখনও কখনও এণ্টালিতে ভৌমিক নিবাসেও গিয়েছেন।

ভৌমিক পুস্তকালয়ের অনেক কাজ, বই পত্রিকা বাঁধানো আগে রহিম দপ্তরি করেছেন। কিন্তু পরে ওরা নিজেরাই বাঁধাই কারখানা করে ফেলে, তারপর থেকে খুব জরুরি বা বড় কাজ করতে না হলে রহিম দপ্তরির কাছে আসে না।

বহিম দপ্তারির পুরনো গল্পগুলোর মধ্যে একটা গল্প ছিলো ননীবালার বিযেব। সেই বিযেতে ছোটবেলায় রহিম তাঁর বাবার সঙ্গে নিমন্ত্রণ খেয়েছিলেন।

রংপুর থেকে নৌকায় তিনদিনের পথ। ব্রহ্মপুত্র, যমুনা হয়ে ববযাত্রীরা এসেছিলো। সব বরযাত্রীর মাথায় পাগড়ি, অনেকেরব হাতে রূপোর মাথা লাগানো মোটা মলাক্কা বেতেব লাঠি।

পিসি ঠাকুমাকে গল্পটা বলতে তিনি ইপিনকে বলেছিলেন 'তা হতে পারে। আমি তো আব ববযাত্রী দেখিনি।'

একবার মাসের প্রথমে টাকা আনতে গিয়ে রহিম সাহেবকে আর ইপিন পেলো না। দপ্তরিখানা বন্ধ। আশে পাশের লোকজন কেউ বিশেষ কিছু বলতে চাইলো না।

পরে ইপিন জেনেছিলো অবাঞ্ছিত বিদেশি বলে পুলিশ রহিম দপ্তবিকে ধবে বেলগাড়িতে দর্শনা সীমান্ত পার করে পাকিস্তানে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলো।

রহিম দপ্তরির অবর্তমানে বেশ অসুবিধের মধ্যে পরলো ইপিন। একশো টাকার মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেলো।

ইপিনের কলেজ এবং বিপিনের কলেজ ও মেসের খরচ ঐ একশো টাকায় টেনেটুনে হতো। ইপিন অবশ্য কখনই খুব বে-হিসেবি ছিলো না। কিন্তু তবুও তখনকার সস্তার বাজারেও দুজনের বেশ অসুবিধে।

বিপিন তখন বৌবাজারে একটা সরকারি কলেজে বি কম পড়ছে। মাইনে যৎসামান্য, দশ-পনের টাকা। ইপিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এম এ পড়ছে সেখানেও মাইনে কিছু নয়। তবুও দুজনারই হাত খরচায় বেশ টান পড়তো, বিশেষ করে বিপিনের মেসের মাসকাবারি বিল যেটা আগে পঁয়ত্রিশ টাকার মধ্যে হয়ে যেতো সেটাই এখন চল্লিশ-বিয়াল্লিশ টাকায় দাঁড়িয়ে গেছে।

ইপিনের অবশ্য একটা আয় ছিলো শেয়ারের ডিভিডেন্ট থেকে। অধিকাংশ চা কোম্পানির শেয়ার। এই শতকের গোড়ায় এবং গত শতকের শেষে অনেক বাঙালি ভদ্রলোক উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি এবং ডুয়ার্স এলাকায় গিয়ে জমি কিনে চায়ের বাগান করে ব্যবসার শুরু করে। অনেকে আবার সরাসরি সাহেব বা অবাঙালিদের কাছ থেকে তৈরি চা বাগান কিনে নেয়।

এই চা বাগানগুলো যাঁরা করেছিলেন তাঁদের যতটা উদ্যোগ ছিলো ততটা মূলধন ছিলো

না। তখনকার দিনে এ রকম ক্ষেত্রে সরকারি দান প্রায় অকল্পনীয় ছিলো, ব্যাঙ্কের সাহায্যও সহজলভ্য ছিলো না।

চা কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা এবং তাঁদের প্রতিনিধিরা শহরে, গঞ্জে, অবস্থাপন্ন গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন চা কোম্পানির শেয়ার বেচার জন্য। অধিকাংশ সময়েই চেনাশোনা এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্যে শেয়ার বেচা হতো কখনও বেশ জোর জবরদস্তি করে।

চা কোম্পানি ছাড়াও ছিলো কেমিক্যাল কোম্পানি, কটন মিল। বাণিজ্যভীরু বাঙালি হঠাৎ রাতারাতি নানা ধরনের ব্যবসায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। কিছুটা ছিলো স্বদেশিয়ানার ব্যাপার, ইংরেজের গোলামি করবো না, কিছুটা ছিলো আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ডাক। সব মিলে বাঙালির ব্যবসায় বেশ একটা রমরমা ভাব এসেছিলো।

রামনাথ মৈত্রের বাড়ি ছিলো বগুড়ায়। কলাগাছি গ্রামে। কলাগাছি গ্রামের মৈত্রকন্যাদের সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিলো। তাদের বিয়ে হয়েছিলো বাংলার নানা অঞ্চলে পালটি ঘরে অবস্থাপন্ন বাড়িতে, ব্যবহারজীবী কিংবা জমিদার গৃহে। সরকাবি চাকরির তখনও এত কদর হয়নি। চাকরি এবং বেতনের চেয়ে পারিবারিক পরিচয়, বিযয় আশয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। রামনাথ মৈত্রের দুই সুন্দরী বোনের বিয়ে হযেছিলো উত্তরবঙ্গের একই জমিদার বাড়ির দু'তরফে।

এই দু'তরফই চায়ের ব্যবসায় নেমেছিলো। রামনাথবাবু তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে পূর্ববঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে-শহরে ঘুরে ঘুরে সেই চায়ের কোম্পানি দুটির শেয়ার বেচে বেড়াতেন। এই রামনাথবাবুই প্রভাসকুমারের জ্যাঠা ও বাবার কাছে চায়ের বাগানের শেয়ার বেচেছিলেন।

রামনাথবাবুর সূত্রে আরও কয়েকটি চায়ের বাগানের শেয়ার কেনেন প্রভাসকুমারের জ্যাঠা ও বাবা। এঁরাও দুজেনই উকিল ছিলেন। প্রভাসকুমাবের বিপত্নীক জ্যাঠা ছিলেন নিঃসন্তান। জটিল দেওয়ানি মামলায়, জমিজমা বিষয় সম্পত্তির বিবাদে তাঁর জুড়ি ছিলো না। একসময় তিনি দুহাতে টাকা রোজগার করেছিলেন, তার পর ষাট বছব বয়স হতে একদিন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দানপত্র করে ছোটভাইকে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দিয়ে নিজে গৌড়ীয় মঠে গিয়ে আশ্রয় নেন। নগদ টাকা যা ছিলো সবই মঠে দিয়েছিলেন। সেখানেই বাকি জীবন কাটান, আর কোনওদিন দেশে ফিরে আসেননি। খুব মাছ খেতে ভালবাসতেন প্রভাসকুমারের জ্যাঠা অনন্ত চৌধুরী। কিন্তু তারপর জীবনে আর আমিষ স্পর্শ করেননি।

অনন্ত চৌধুরী যে সমস্ত বিষয় ভাইকে দান করে গিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিলো একগাদা শেয়ার সার্টিফিকেট। কালক্রমে তার মধ্যে অনেকগুলি কোম্পানি নষ্ট হয়ে যায়। তবুও বাবার আর জ্যাঠার শেয়ার সার্টিফিকেট উত্তরাধিকার সূত্রে প্রভাসকুমার যা পেয়েছিলেন পাকিস্তান হওয়ার সময় তার বার্ষিক আয় প্রায় সাত-আটশো টাকা ছিলো। সে টাকা সে আমলে কম নয়।

পাকিস্তান হওয়ার অল্পদিন পরে যখন দু'দেশে দু'রকম মুদ্রার মান হয়ে গেলো, তারও পরে মানি অর্ডার, ব্যাঙ্ক লেনদেন বন্ধ হলে প্রভাসকুমার একবার কলকাতায় এসে 'ভৌমিক নিবাসে' উঠে শেয়ার কোম্পানিগুলিতে ঘুরে ঘুরে ঠিকানা বদল রেকর্ড করালেন।

আগে মানি অর্ডারে ডিভিডেন্ট আসতো। পরে কিন্তু ব্যাঙ্কের চেক মারফৎ ডিভিডেন্ট দেওয়া হতো। সেই সময়ে, ইপিন কলেজে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পর, প্রভাসকুমার এসে ইপিনের সঙ্গে ব্যাঙ্কে একটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খোলেন।

টাঙ্গাইলে চল্লিশ দশকের গোড়ার দিকে ছিলো নিউ স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক, সেটাই পরে হয়ে যায় কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন তারও পরে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, সংক্ষেপে ইউ বি আই। সেই ইউ বি আইয়ের টাঙ্গাইল ব্রাঞ্চের এজেন্ট ছিলেন প্রেমেন্দ্র দত্ত। কুমিল্লার বিখ্যাত দত্ত

বাড়ির শাখা-প্রশাখার কোনও এক অংশের উত্তরপুরুষ। তখন ব্যাঙ্কে ম্যানেজার বা সুপারভাইজার হতো না। বলা হতো এজেন্ট।

প্রেমেনবাবুর সঙ্গে প্রভাসকুমারের বেশ সখ্যতা ছিলো টাঙ্গাইলে থাকতে। প্রেমেনবাবু ছিলেন দুর্দান্ত আড্ডাবাজ। সন্ধ্যার পর অনেক রাত পর্যন্ত টাউন ক্লাবে কাটাতেন। তাস খেলতেও খুব ভালবাসতেন। যদিও খুব ভালো খেলতেন না। ব্যাঙ্কের বাসায় একা থাকতেন। বাড়ি ফেরার তাগিদ থাকতো না।

যে বাড়িটাকে ব্যাঙ্কের বাসা বলা হতো সে বাড়ির মালিক ছিলেন প্রভাসকুমাররা, ব্যাঙ্ককে বাড়িটা ভাড়া দেওয়া হয়েছিলো। ব্যাঙ্কের বাড়ির উঠোনে একটা মিষ্টি টোপাকুলের গাছ ছিলো। যে গাছের কুল ছোটবেলায় ইপিন-বিপিন অনেক খেয়েছে। মিষ্টি হলেও টোপাকুলে একটা টকভাব থাকেই। কতবার বেশি কুল খেয়ে ইপিন-বিপিনের দাঁত টকে গিয়েছে। তখন ঝোলাগুড় দিয়ে দাঁত মেজে সেই টকভাব দূর করতে হতো, যদিও সবটা যেত না। কিছু শক্ত জিনিস মুখে পড়লেই দাঁত শিরশির করতো।

সারারাত ধরে পাকা কুল টুপটুপ করে টিনের চালায় ঝরতো। আলাতো করে ঝাঁকি দিলে উঠোন ছেয়ে যেত হলুদ-লালচে কুলে। তখন রাস্তাঘাটে-ইপিন-বিপিনের সঙ্গে দেখা হলে প্রেমেনবাবু তাদের খবর দিতেন, 'বাসায় যেয়ো। সব কুল পেকে গেছে। উঠোনে পড়ে আছে।'

পাকিস্তান হওয়ার পর প্রেমেনবাবু কলকাতায় হাতিবাগান ব্রাঞ্চে বদলি হয়ে চলে আসেন। প্রেমেনবাবুর খোঁজ করে সেখানে গিয়ে প্রভাসকুমার ইপিনের সঙ্গে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করেন। ইপিন তখন বালকত্ব পেরোলেও নাবালকত্ব পেরোয়নি। এমনিতে তার সঙ্গে জয়েন্ট অ্যাকাউন্টা হতো না। প্রেমেনবাবু করে দিয়েছিলেন।

এই হাতিবাগানের অ্যাকাউন্টে শেয়ারের ডিভিডেন্টের টাকাগুলো ইপিন জমা দিতো। খুব দবকার না পড়লে টাকা তুলতো না। জামা-কাপড়-জুতো, এমনকি সাবান-টুথপেস্ট সবই বছরে দুবার টাঙ্গাইল থেকে ফেরার সময় সঙ্গে নিয়ে আসতো। দর্শনা-বার্নপুর সীমান্তে কাস্টমস সার্চ করার সময় কখনও দুয়েকটা প্রসাধন সামগ্রী কেড়ে নিয়ে নিতো।

রহিম দপ্তরির নির্বাসনের পর ইপিন সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়লো ব্যাঙ্কের সঞ্চিত অর্থের ওপর।

সেটা সম্ভবত ১৯৫৮ সাল।

পাকিস্তানে সামরিক শাসন। ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান সে দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। কালোবাজারি বন্ধ, অফিস আদালতে ঘুষ বন্ধ, কাজে দেরি করে এলে মিলিটারি চাবুক মারছে, পরীক্ষার হলে পর্যন্ত মিলিটারি, তারা হুইসিল দেয়া মাত্র পরীক্ষা আরম্ভ হচ্ছে, হুইসিল দিয়ে পরীক্ষা শেষ হচ্ছে, একেবারে ফুটবল খেলার মত। রেল-বাস-স্টিমার কাঁটা ধরে ঠিক সময়ে চলছে। আয়ুবি শাসনের নানা রকম সত্যি মিথ্যে গল্পগুজব হাওয়ায় ছড়াচ্ছে। স্বৈরতান্ত্রিক প্রচার যেমন হয়ে থাকে আর কি।

বেশ কিছুদিন পরে প্রভাসকুমার কলকাতায় এলে ইপিন বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো 'আয়ুবের শাসন কেমন?' প্রভাসকুমার বলেছিলেন, 'খুব কঠিন ব্যাপার। চোর গুণ্ডার অত্যাচার প্রথম প্রথম একটু কমেছিলো। কিন্তু ঝামেলা দাঁড়িয়েছে অন্য জায়গায়। সব জিনিসের দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে কিন্তু দোকানে কোনও জিনিস থাকছে না। আগে পাঁচ টাকার জিনিস দশ টাকায় কিনতে হচ্ছিলো। এখন সেই জিনিস কিনতে হচ্ছে পনের-কুড়ি টাকায়। তাও দোকান থেকে সরাসরি নয়। কিনতে হচ্ছে বাজারের পাশের চোরাগলি থেকে লুকিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে। কিনতে গিয়ে অনেকে মিলিটারির হাতে ধরা পড়ে চাবুক খাচ্ছে, হাজত খাটছে।'

একটু করুণ হেসে প্রভাসকুমাব বলেছিলেন, 'আগে পাঁচ টাকা ঘুষ দিয়ে আদালতের পেসকারের কাছ থেকে যে কাগজের নকল পাওযা যেতো, যাকে আমরা ঘুষ না বলে বলতাম তহুরি, এবং প্রকাশ্যেই দেওয়া হতো, আজকাল সেই আদালতের কাগজ পেতে পঞ্চাশ টাকা লাগছে। গভীর রাতে আদালতের পিছনে বেতঝোপের মধ্যে লণ্ঠনের আলো কমিয়ে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর মুহুরিবাবুরা নকল হাতে পাচ্ছেন।'

স্বৈরাচার ব্যাপারটা পাকিস্তানে গা সহা হয়ে এসেছিলো যদিও একটা ছাই চাপা ক্রোধের ও অভিমানের আগুন সারা দেশে গনগন করে জ্বলছিলো। টের পাওয়ার মতো বুদ্ধি বা বিবেক শাসকদের তথা প্রেসিডেন্টের ছিলো না।

কিন্তু সত্যিকারের বিপদ হয়েছিলো ইপিনের। ব্যাঙ্কের কয়েকশো টাকা ফুবোতে আর কয় মাস লাগবে। রহিম দপ্তরি চলে যাওয়ার পরে প্রভাসকুমারের কাছ থেকে আব টাকা আসেনি।

পিসিঠাকুমার কাছ থেকে চাওয়া যেতো। তিনি নিজেও ইপিনের উদ্বিগ্নভাবে দুয়েকবার জিজ্ঞাসা করেছেন, 'এতো কি চিন্তা করিস?'

কিন্তু ইপিন লজ্জায় পিসিঠাকুমার কাছে টাকার কথা বলতে পারেনি।

টাকা জোগাড়ের আর একটা উপায় অবশ্য ছিলো। তা হলো সোনা বেচা। ইপিনের মা স্মৃতিকণার সব সময় ব্যবহারের গয়না, হার, চুড়ি, কানের দুল ইত্যাদি বাদে অবশিষ্ট সবই ছিলো ভৌমিক নিবাসে পিসিঠাকুমার কাছে গচ্ছিত। তার পরিমাণও অন্তত পঞ্চাশ-ষাট ভরি হবে।

পাকিস্তান হওয়ার ব্যাপারটা পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা স্বাভাবিক কাবণেই সুনজবে দেখেনি। পাকিস্তানি শাসকদের ওপরে একদম বিশ্বাস ছিলো না তাদের।

পাকিস্তান হওয়ার পরে পরেই অবস্থাপন্ন হিন্দুরা টাকা-পয়সা, সোনা-দানা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সব ভারতে সরিয়ে এনেছিলো। অনেকে জমিজমা ঘরদোর, বেচেও পাকিস্তান থেকে টাকা এদিকে নিয়ে এসেছে।

কাজটা অবশ্য সহজ ছিলো না। হিন্দুদের জমি-বাড়ি বিক্রি এক সময়ে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। প্রশাসনিক বাধা তো ছিলোই, অনেক সময স্থানীয় মুসলমানেরা বাধা দিয়েছে। অত্যন্ত কম দামেও ক্রেতা পাওয়া যায়নি।

পার্টিশনের পরে পরেই প্রভাসকুমার টাকা পয়সা না হোক, সোনার গয়নাগাটি ভৌমিক নিবাসে রেখে গিয়েছিলো তখনও ব্যাঙ্কের ভল্ট এতো জনপ্রিয় হয়নি। তাছাড়া আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের ওপর লোকের বিশ্বাস ও আস্থা ছিলো। গচ্ছিত সম্পদের বিশ্বাসভঙ্গের কথা কদাচিত শোনা যেতো।

ঐ প্রায় ষাট ভরি সোনা তখনও নীরবালার সিন্দুকে তোলা আছে। সোনার গয়নার বাক্সটা, কোনো কোনও কারণে সিন্দুক খুললে, নীরবালা ইপিনকে ডেকে দেখাতেন, বলতেন 'দেখে

রাখ। আমি যদি হঠাৎ মারা যাই নিজেদের জিনিস বুঝে নিবি।' তারপর বলতেন এটা কিন্তু স্ত্রীধন। এটা তোদের নিজের জিনিস নয়। অর্ধেক পাবে তোর বউ আর অর্ধেক পাবে বিপিনের বউ।'

তখন উনিশ-কুড়ি বছর বয়েস ইপিনের। বিপিনেব বয়েস আরও কম। কোথায় বিয়ে ? কোথায় বৌ ?

খুব টানাটানির সময়ে একেকবার ইপিন ভাবতো দরকার মতো দুয়েকটা গযনা বেচতে হবে। কিন্তু অসুবিধে হয়েছিলো তা হলে সে কথাতো পিসিঠাকুমাকে বলতে হবে। পিসিঠাকুমা কি ভাববেন, কি জানি ? হয়তো নিজে থেকেই তিনি টাকা দিতে চাইবেন। পিসিঠাকুমার কাছে ইপিন অনেক কিছু পেয়েছে, টাকা নিতে পাববে না সে।

তার সঙ্কোচের কথা ইপিন একদিন বিপিনকে বলেছিলো। আব বলতে তো হবেই, গযনার অর্ধেকের ভাগীদার তো বিপিনেব বৌ। সে বিপিন যবেই বিযে করুক না কেন, সেই বউযেরই তো প্রাপ্য এগুলো।

বিপিন কিন্তু প্রস্তাবটা শুনে হেসে উড়িযে দিয়েছিলো, 'সোনা বেচবো কোন্ দুঃখে ? পিসিঠাকুমা যা-তা বলে। এতো মার সোনা। আমাদের বৌয়েবা মার সোনা পাবে কেন ? বৌয়েরাই বা কোথায় ?'

ইপিন আমতা আমতা করতে লাগলো, মুখে বললো, 'এসব গয়না মা আব কবে গায়ে দেবে ?'

বিপিন কথা ঘুরিযে বললো, 'গয়না আমার লাগবে না। তবে গযনাব খালি বাক্সটা আমাকে দিস।'

একদিন বিপিন যখন ভৌমিক নিবাসে গিয়েছিলো পিসিঠাকুমা গযনাব বাক্সটা ইপিনের সঙ্গে বিপিনকেও দেখিয়েছিলো। পুবনো আমলের ভারি সিন্দুকটা সেদিন কি কারণে খোলার দরকাব পড়েছিলো।

বিপিন সচরাচর ভৌমিক নিবাসে যেতো না। সেদিন কি একটা কাজে, বোধ হয় কোনও উপলক্ষ ছিলো, সত্যনারায়ণ পুজো কিংবা ঐরকম কিছু একটা, বিপিন ভৌমিক নিবাসে এসেছিলো। কি কারণে সিন্দুকটা খোলার প্রয়োজন পড়েছিলো। আধমণি ওজনের ভারি ডালা। সেটা তুলবার জন্য নীরবালা দুই নাতিকে বলেছিলেন, হাতের কাছে কেউ ছিলো না। আর চাকর বাকর ভৃত্যস্থানীয় কাউকে দিয়ে সিন্দুক খোলাতেন না নীরবালা।

সিন্দুক খোলার পর কিছু টাকা বার করে, বন্ধ করার আগে বিপিনকে গয়নার বাক্সটা দেখিয়েছিলেন নীরবালা। কালো কুচকুচে মেহগনি কাঠের চমৎকার চৌকো বাক্স একটা। ডালার ওপরে ছোট ছোট ফুল খোদাই করা, দক্ষ কারিগরের সূক্ষ্ম কাজ। বাক্সটার গাযে সামনের দিকে এক টুকরো কাগজ আঠা দিয়ে সাঁটা রয়েছে। তাতে মেয়েলি আঁকাবাঁকা অক্ষরে নীরবালা লিখেছেন—

'প্রভাসের বৌ স্মৃতির গহনা
ইপিন-বিপিনের জিনিস।'

এর নিচে নীরবালা নিজের নাম লিখেছেন তার পাশে লেখা,

'কলিকাতা,
আঠারই বৈশাখ, তেরোশত পঞ্চান্ন।'

যাকে বলে একেবারে পাকা দলিল। সন-তারিখ মালিকানা সমেত উত্তরাধিকাবী পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা রয়েছে।

খালি মেহগনি বাক্সটা বিপিন চাওয়ায় ইপিন অবাক হয় না। ছোট ভাইকে তখনই সে বুঝতে শিখেছিল। বিপিন এ রকমই চায়।

পরের সপ্তাহেই বিপিন ইপিনকে এসে বলেছিল, 'তোকে আর মাসে মাসে আমাকে সত্তর টাকা দিতে হবে না।'

ইপিন অবাক হয়ে বললো, 'মানে?'

বিপিন বললো, 'আমার বন্ধু বেনুগোপালের বাবা অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের অফিসে কাজ করেন, বড় কাজ। আমাকে একটা চ্যাটার্ড ফার্মে অ্যাপ্রেন্টিসের কাজ জোগাড় করে দিয়েছেন। তাঁকে বেনুগোপাল আমার কথা বলেছিল। কাজটা ভাল। শেখাও যাবে আবার মাসে মাসে আশি টাকা হাত-খরচও দেবে। ওতে আমার বেশ চলে যাবে।'

বড় ভাইয়ের মত ইপিন বললো, 'তাহলে তোর পড়াশুনো? তার কি হবে?'

বিপিন বললো, 'কেন? সন্ধেবেলায় সিটি কলেজে পড়বো। বড়জোর একটা বছর নষ্ট হবে।' তারপর থেমে থেকে বলেছিল, 'তবে আমি বেশি পর্যন্ত পড়বো না। এই বি কম হয়ে গেলেই যথেষ্ট।'

অর্থকষ্ট হবে ভেবে ইপিন যতটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিল, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তত চিন্তার ব্যাপার ছিল না। সমস্যাটা অন্য পথে সমাধান হল।

দুটি ভিন্ন দেশের মধ্যে বেসরকারি ভাবে টাকা পাঠানো খুবই নিয়ম বহির্ভূত এবং আইনত দণ্ডযোগ্য অপরাধ। রহিমের মারফত টাকা পাঠানোটাও যথেষ্ট আইনানুগ ছিল না।

যতদিন রহিমদপ্তরির মাধ্যমে ইপিন-বিপিন টাকা পেয়ে যাচ্ছিল প্রভাসকুমারের ছেলেদের আর্থিক ব্যাপারে কোনও চিন্তা ছিল না। কিন্তু রহিমদপ্তরির অন্যায় ও গায়জোরি নির্বাসনের পরে ছেলেদের টাকা পাঠানো একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কেন যে রহিম দপ্তরিকে কলকাতা থেকে পুলিশ পাকিস্তানী বলে দর্শনা সীমান্তে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল সেটা আর কেউ তো নয়ই এমনকি রহিম নিজেও জানতে পারেন নি। অনুমান করতেও পারেন নি।

কলকাতায় বৈঠকখানা-রাজাবাজারে তিন পুরুষের বই বাঁধাইয়ের ব্যবসা, ট্রেড লাইসেন্স, ভোটার লিস্টে নাম, রেশন কার্ড, পুলিশ কিছুই দেখল না। রহিম সাহেব সে সুযোগ পান নি, পুলিশ তাঁর কোনও কথাই শোনেনি।

বছর দেড়েক পরে যখন একটু স্থিতাবস্থা এসেছে, দুই দেশের পরস্পরবিরোধী চিৎকার একটু কমেছে, রেলগাড়ি, যাতায়াত মোটামুটি চলছে, বিপিনের বি কম পরীক্ষা হয়ে গেছে টাঙ্গাইলে এসেছে, হাতে মাত্র চৌদ্দদিনের ভিসা।

ঢালাও ভিসার দিন শেষ হয়ে গেছে। সাতদিন, চৌদ্দদিনের জন্য তখন ভিসা দেয়া হচ্ছে। তাও আসার এবং যাওয়ার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে থানায় ডি আই বি অফিসে গিয়ে নাম লেখাতে হচ্ছে।

সেই সময়ে টাঙ্গাইল বাড়িতে একদিন আদালতের কি কাজে প্রভাসকুমারের কাছে রহিমদপ্তরি এসেছিলেন। বিপিন তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিল।

কলকাতায় ইপিনের সঙ্গেই রহিমের যোগাযোগ ছিল তবে বিপিনও তাঁকে ভালই চিনতো। এবার বিপিন দেখল রহিম কেমন যেন বুড়িয়ে গেছেন। দেশে এসে আর কোনও কাজকারবার

করছেন না, বিষয়-আশয় দেখছেন, কিন্তু তাতে মন নেই। কলকাতার ব্যবসার কোনও ক্ষতিপূরণও পান নি।

রহিম বিপিনকে দেখে খুব খুশি হলেন। বিপিন আসার আগে বুদ্ধি করে দেখে এসেছিল, রহিমকে জানালো দপ্তরির দোকান তালাবন্ধ আছে, তার কোনও পরিবর্তন হয়নি। পুলিশ যেমন সিল করে দিয়েছিল তেমনই আছে।

রহিম আফশোস করতে লাগলেন, তিনি যে বহিরাগত ছিলেন না এটা কিছুতেই পুলিশকে বোঝাতে পারেন নি। পুলিশ কোনও সময়ই দেয়নি, কথাই শোনেনি। তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে রাজাবাজার মসজিদে শুক্রবার দুপুরবেলা নামাজ পড়েছেন প্রায় নিয়মিত, সেখানকার ইমাম মৌলভি হামিদুল হককে জিজ্ঞাসা করতে পারতো, কেশব সেন স্ট্রিটে দুর্গাপুজোয় চাঁদা দিয়ে আসছেন সেও বহু বছর, সেখানকার হাবুবাবু, পটল পাল সবাই তাঁকে ভাল চেনে। আশেপাশের দোকান, বাড়ি ঘর পুলিশ একটা খোঁজখবর ভাল করে না নিয়ে এত বড় একটা বেআইনি কাজ করে বসলো।

এর কয়েকবছর পরে এর চেয়ে অনেক গর্হিত ব্যাপার মুক্তাগাছায় অন্তরীণ থাকার সময় প্রত্যক্ষ করেছিল বিপিন।

কি যেন নাম ছিল সেই চীনে ভদ্রলোকের ? চীনেদের নাম মনে রাখা কঠিন, বোধহয় ইয়ং সু নাকি ওই রকম কিছু হবে।

মুক্তাগাছায় যুদ্ধবন্দী শিবিরে উনিশ শো পঁয়ষট্টি সালে বিপিনদের সঙ্গে অন্তরীণ ছিলেন, কলকাতার লোক, বেশ ভাল বাংলা বলেন এবং একটু বেশিই বলেন, ইয়ং সাহেব তাঁর দুর্দশার কথা সবিস্তারে বলেছিলেন।

ইয়ং সাহেবের একটা চীনে খবরের কাগজ আছে কলকাতায়। তিনি কলকাতার চীনে সমাজে একজন মান্যগন্য ব্যক্তি। বাষট্টি সালে ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধের সময় ভারত রক্ষা আইনে তাঁর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরোয়। পুলিশ তাঁকে খুঁজে পাওয়ার আগেই গোপনে জানতে পেরে একটা গাড়ি করে বিহারে গিয়ে সেখানে থেকে হাঁটাপথে নেপালে যান এবং প্রায় দেড়বছর আত্মগোপন করে থাকেন।

এবারো গোলমাল বাঁধতে, জরুরি অবস্থা ঘোষণা হওয়ার মুখে তিনি বেনাপোল হয়ে পূর্বপাকিস্তানে চলে আসেন এবং এখানে ঢাকায় মগবাজারে এক আত্মীয়বাড়িতে ওঠেন। সেখান থেকেই পাকিস্তানি পুলিশ তাঁকে ধরে এনেছে এবারে ধরার কারণ হলো যে তাঁর পাশপোর্ট ভারতীয়, ইয়ং সাহেব ভারতীয় নাগরিক।

রহিমদপ্তরির দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে যখন অর্থচিন্তায় বেশ বিপন্ন, সেই সময়ে ইপিন টাঙ্গাইল থেকে একটা চিঠি পেলো।

সাধারণ একটা পোস্টাকার্ড, ঠিক টাঙ্গাইল থেকে পোস্ট করা নয়। চিঠিতে স্থানের নামের উল্লেখ নেই। তবে ডাকঘরের সিলমোহর রয়েছে দেলদুয়ারের। দেলদুয়ার নয় কথাটা হয়তো দিলদুয়ার হবে, মানে হৃদয়ের দরজা, বাংলায় বিখ্যাত এবং বনেদি মুসলমান ভূম্যধিকারি পরিবার গজনভিদের বাসস্থান। গ্রাম্য লোকদের মুখে দেলদুয়ার হয়েছে।

সে যা হোক, এই দেলদুয়ার ডাকঘরে এই চিঠিটি পোস্ট করা হয়েছে। চিঠিটি পাঠিয়েছেন হবিবর রহমান নামে একজন।

হবিবর রহমান যে কে সেটা ইপিন চট করে বুঝে উঠতে পারলো না। একটু অনুমান করার

চেষ্টা করতে মনে হলো, বোধহয় হবিবভাই হবে। ইপিন যখন ইস্কুলে ভর্তি হয় হবিব ভাই উঁচু ক্লাসে পড়তেন। তারপর পাশ করে বেরিয়ে যান। আগের বছর টাঙ্গাইলে গিয়ে ইপিন দেখেছিল হবিবভাই ঢাকা থেকে আইন পাশ করে এসে প্রভাসকুমারের জুনিয়ার হয়ে আদালতে ঘোরাঘুরি করছেন।

হবিবর রহমানই চিঠি দিয়েছেন। চিঠিটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু বিচিত্র ও রহস্যময়। প্রথমপাঠে বোঝা কঠিন।

যেদিন সকালের ডাকে হবিব রহমানের চিঠিটা এলো এবং চিঠিটা নিয়ে রীতিমত সংশয় সৃষ্টি হল ইপিনের মনে সেদিনই বিকেলের ডাকে প্রভাসকুমারের চিঠি এলো। সেটাও মামুলি চিঠি, নানারকম টুকরো খবরে ভরা।

থানাপাড়ার একটা নতুন সিনেমাহল হয়েছে। কাছারির পিছনের কাঠের ব্রিজ ভেঙে পড়ে গেছে। পরীক্ষার সময় মিলিটারি খুব কড়াকড়ি করেছিল। খাতা দেখা হয়েছে খুব কঠোর ভাবে, ফলে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় এবার পাশের হার মাত্র বাইশ পারসেন্ট। পুরো শহরের পাঁচটা স্কুল থেকে মাত্র তিনটি ছেলে আর দুটি মেয়ে ফার্স্ট ডিভিসন পেয়েছে।

এই চিঠির মধ্যেই এক জায়গায় লেখা ছিল 'কোনও চিন্তা করিবে না। হবিব তোমাকে চিঠি দিবে।'

সুতরাং হবিবের চিঠির একটা কার্যকারণ আছে। চিঠির বয়ান এই রকম।

স্নেহের ইপিন,

আশাকরি কুশলে আছো। এই পত্র লইয়া তুমি বড়বজারে বাইশ নম্বর গঙ্গাধর ঘোষ লেনে প্রভুরাম বসাকের দোকানে পাঁচশো নম্বর ঘরে দেখা করিবে।

চিন্তার কোনও কারণ নাই।

ইতি

হবিবর রহমান

বাইশ নম্বব বাড়ির পাঁচশো নম্বর দোকান, বড়বাজারের গলির গলি তস্য গলি, গঙ্গাধর ঘোষ লেনে প্রভুরাম বসাকের দোকান—পুরো চিঠিটার মধ্যে কেমন নীহাররঞ্জন গুপ্তের কিংবা মোহন সিরিজের মেজাজ।

খুঁজে খুঁজে গঙ্গাধর ঘোষ লেনে গিয়ে ইপিন দেখল ব্যাপারটা তেমন মারাত্মক কিছু নয়। প্রভুরাম বসাক তাঁকে ভালই চেনেন। ছোটবেলায় দেখেছেন, টাঙ্গাইলে তাঁতের শাড়ির ব্যবসা ছিল। এখানেও একই ব্যবসা, তবে এখন তাঁতের ব্যবসার সঙ্গে হুণ্ডির কারবারও করেন, টাঙ্গাইলের দোকানে ভাই সত্যরাম বসছেন, সেখানে টাকা জমা দিলে কলকাতায় চলে আসে।

চিঠিটা দেখে প্রভুবাবু ইপিনকে পাঁচশো টাকা দিলেন, পাঁচশো নম্বর ঘর মানে পাঁচশো টাকা।

মুক্তাগাছা বন্দিশিবিরে প্রথম দিকে মোটেই ভালো লাগতো না বিপিনের। ভাললাগার কথা নয়। কার আর বিনা দোষে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি থাকতে ভাললাগে। একেক সময় হাঁফ ধরে যেতো বিপিনের।

গোড়ায় বিপিনের সঙ্গে মাত্র কয়েকজন বন্দি ছিল। ক্রমে লোকসংখ্যা বাড়তে লাগল। বড় বড় ঘরে আট-দশ জন করে থাকত। বিপিনরা প্রথমে যে ঘরে দুজনে ছিল পরে আরও দুজন লোক এসে ঢুকলো সেই ঘরে।

প্রায় সবই ছাপোষা মানুষ। কাজেকর্মে বা বিশেষ প্রয়োজনে আত্মীয়স্বজনের কাছে এসেছে।

কেউ কেউ এসেছে ফেলে যাওয়া সম্পত্তির তদারক করতে, কিংবা কোনোভাবে সম্ভব হলে সেই সম্পত্তি বেচে দেওয়ার জন্য।

সরকারি কাজকর্মে বা ব্যবসায়িক দরকারে এসেছে এমন লোকও দু চারজন এর মধ্যে ছিল।

এরা সকলে মিলে সারাদিন ধরে নিজেদের মধ্যে নানা রকম গল্পগুজব করতো। কারো কারো মধ্যে এই একত্রে বসবাসের ফলে রীতিমত বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। পূর্ববঙ্গের লোকদের একটা পুরানো স্বভাব হল নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্বন্ধ পাতানো।

কোনো এক পরিচয় বা গ্রাম সম্পর্কের ছুতো ধরে একজনকে ভাগ্নে বানানো হল, ফলে অন্য একজন হয়ে গেল মামা। মামা-ভাগ্নে কিংবা খুড়ো-ভাইপো এই জাতীয় পাতানো সম্পর্কের চেয়ে অবশ্য অনেক জনপ্রিয় হল জামাই কিংবা বেয়াই।

বিপিন একটু হিসেব করে দেখেছিল অন্তত পাঁচ জোড়া মামা-ভাগ্নে, জনা তিনেক জামাই এবং বেশ কিছু বেয়াই সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল বন্দিশিবিরে।

একজন জামাইকে বিপিনের বন্দিশিবির ছেড়ে চলে আসার বহু পরেও মনে ছিল, সবসময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ধুতি পাঞ্জাবি পরে থাকতেন ভদ্রলোক, চেহারার মধ্যেই একটা জামাই জামাই ভাব ছিল।

ভদ্রলোকের সোনার গহনার দোকান ছিল রাণাঘাটে। কিশোরগঞ্জে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ শ্বশুরকে দেখতে এসে যুদ্ধের বাজারে গ্রেপ্তার হয়ে যান।

এই ভদ্রলোক, নবীনবাবু, সঙ্গত কারণেই জামাই খেতাব পেয়েছিলেন এবং প্রথমদিকে তিনি একাই জামাই ছিলেন। পরে আরো দু'জন জামাই হয়ে যাওয়ায়, নবীনবাবুকে বলা হতো বড় জামাই। পরবর্তী নতুন দুজন যথাক্রমে ছোট-জামাই এবং নতুন জামাই।

অল্প কয়েকদিন একটা মনমরা, দমবন্ধকরা ভাব থাকলেও লোক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্দিশিবির জমজমাট হয়ে ওঠে। নানা রকম চরিত্রের বিচিত্র সব মানুষ।

গোড়ায় খাওয়া দাওয়ার বেশ কষ্ট ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক হারে বন্দিভাতা এসে যাওয়ার পরে আর অসুবিধে হয়নি বরং স্বচ্ছলতাই দেখা দিয়েছিল।

বন্দিরা নিজেরাই মেস করে রান্নাবান্নার বন্দোবস্ত করতো। ভালমন্দ খাওয়া দাওয়া হতো। কাছেই ছিল মুক্তাগাছা বাজার। পুরো শীতকাল বড় বড় কই, মাগুর আর পাবদা মাছ সঙ্গে টাটকা তরকারি। সেই সঙ্গে চমৎকার সুগন্ধভরা রূপশালি ধানের চাল দিয়ে ভাত। যখন রান্না হতো, পুরানো জমিদারবাড়ির ঘর, বারান্দা, উঠোন ছেয়ে যেত গরম ভাতের সুঘ্রাণে।

মেস কমিটির দু'জন সদস্য পালা করে বাজারে যেত চারজন রক্ষী পরিবৃত হয়ে। ব্যাপারটা আইনানুগ ছিল কিনা বলা কঠিন তবে রক্ষীরা অধিকাংশই বাঙালি মুসলমান, দুয়েকজন হিন্দুও যে ছিল না তা নয়।

রক্ষীদের সঙ্গে মোটামুটি ভাল সম্পর্ক ছিল বন্দিদের। তারা বোধহয় জানতো যে এদের মধ্যে পালানোর মত কেউ নেউ। তা ছাড়া পালিয়ে লাভ নেই, সীমান্ত সম্পূর্ণ বন্ধ, একেবারে সিল করা।

রক্ষীদের অবশ্য একটা স্বার্থ ছিল। তারা বিনা খরচে বন্দিদের সঙ্গে খেত। শুধু ডাল, ভাত, মাছের ঝোল নয়। মুক্তাগাছার মণ্ডা বিখ্যাত। যেদিন বন্দিভাতার টাকা আসতো পাঁচু ঘোষের দোকানে অর্ডার দিয়ে বড় বড় কাঠের বারকোস ভর্তি মণ্ডা আনানো হত। রক্ষীরা নিজেরা তো খেতোই, কিছু কিছু মিষ্টি বাড়ির জন্যেও নিয়ে যেত।

শেষের দিকে আত্মীয়স্বজনের এসে দেখা করা, চিঠিপত্র লেখা, বাইরের থেকে বই এনে

পড়া কোনটাই তেমন বাধা ছিল না। খবরদারি বেশ শিথিল হয়ে এসেছিল। সেপাইরা বুঝে গিয়েছিল এরা চোর, জোচ্চোর নয়। ঠিক জেলে থাকার লোক নয়।

প্রভাসকুমার কিংবা স্মৃতিকণা কিংবা টাঙ্গাইল থেকে কেউ না কেউ প্রত্যেক সপ্তাহেই কিছু না কিছু জিনিষ নিয়ে এসে বিপিনের সঙ্গে দেখা করত। বইপত্র, খাদ্যদ্রব্য, মোয়া, মুড়কি, আচার, মোরব্বা এই সব জিনিস।

সব খাবার বিপিন খেত না। ঘরের রুমমেটদের মধ্যে বিলিয়ে দিত। তাদের বাড়ি থেকে, আত্মীয়-বন্ধুর কাছ থেকে ভালমন্দ কিছু এলে তারাও বিপিনকে দিত।

খাওয়া জিনিসটা বিপিনের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। ভালো ভালো খাবার ভালই লাগে খেতে কিন্তু তাব জন্যে তার কোনো টান নেই। তেল দিয়ে মাখা মুড়ি সঙ্গে একটা সবুজ কাঁচালঙ্কা, আচারের তেল হলে তো কথাই নেই। বিপিনের প্রিয় খাবার। দই মিষ্টি ফেলে তেলমুড়ি খাওয়ার লোক সে।

নানারকম জংলি, গ্রাম্য খাদ্যেব প্রতি ছোট বয়েসে তার খুব আকর্ষণ ছিল। শীতের সকালে ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাতের সঙ্গে এক মুঠো মুড়ি মিশিয়ে শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো আর ঝাঁঝালো সরষের তেল মেখে সে খেতে ভালবাসতো। এটা ভদ্রলোকেব খাবাব নয় বাড়ির কাজের লোকদের কাছে সে এই জাতীয় খাদ্যের স্বাদগ্রহণের শিক্ষা নিয়েছিল। এর জন্যে কখনো কখনো স্মৃতিকণা গালাগাল করেছেন, তবে স্মৃতিকণাব নিজেরও এ রকম গ্রাম্য খাবারের প্রতি খুব আকর্ষণ ছিল।

শীতের দিনে শুকনো আম পাতা, কাঁঠাল পাতা উঠোন থেকে ঝাঁট দিয়ে এক পাশে স্তূপাকার করে রাখা হত। প্রভাসকুমারের চরের মক্কেলরা আসতো গামছা ভরে বড় বড় কেশুর বেঁধে। কেশুর একধরনের অতিকায় আযতনের শাঁক-আলু। হাটে বাজারে সেরকম দেখা যায় না। কেশুর পোড়ার স্বাদ এখনো বিপিন ভোলেনি।

আম-কাঁঠাল পাতার স্তূপে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হত ধিকি ধিকি তুষের আগুনের মত সেই শিখা সঙ্গে প্রচুর ধোঁয়া। সেই ধোঁয়া আর নিবু নিবু আগুনে কেশুরগুলো আস্ত আস্ত পোড়াতো সেই চরের লোকেরা। সেই লোকগুলো ছিল দীর্ঘ ও কৃষ্ণকায়, সুগঠিত স্বাস্থ্য, একই সঙ্গে সরল এবং গোলমেলে।

কবিতা লেখার চেষ্টা করা ছাড়াও কলেজে পড়াব সময় একবার একটা গল্প লিখেছিল বিপিন। সেই গল্পটা জমা দিয়েছিল 'পূর্বাশা' কাগজে। পূর্বাশা কাগজের সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য একটা ছোট পোস্টকার্ডে চিঠি দিয়ে লিখেছিলেন, 'দেখা করুন।'

সঞ্জয়বাবুর হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মত ঝকঝকে, সুন্দর। তরুণ, অপরিচিত লেখককে তিনি এ রকম চিঠি দিতেন, তাঁর স্বভাবটাই ছিল ব্যতিক্রমী।

বিপিন সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করেছিল। তাঁকে তার ভাল লেগেছিল। টিপটপ, ধোপদুরস্ত ভদ্রলোক, বড় কবি। তাঁর চিন্তাভাবনা কথাবার্তা অন্যদের চেয়ে, সাধারণ বুদ্ধিজীবীদের চেয়ে একেবারে অন্যরকম। একবার মহেঞ্জোদড়োর প্রস্তরলিপি পাঠোদ্ধার করে তিনি হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন। পরে তা নিয়ে খুব হৈচৈও হয়েছিল। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছিলেন, 'সম্পূর্ণ মনগড়া ব্যাপার, বড় জোর কবির কল্পনা।' বাজে লোকেরা বলেছিল 'জোচ্চুরি।' সঞ্জয়বাবু খুব অদমিত ছিলেন।

যদিও গল্পটা শেষ পর্যন্ত ছাপাননি, সঞ্জয়বাবু গল্পটা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছিলেন বিপিনের সঙ্গে। গল্পটা নিশ্চয় ভাল ছিল না কারণ এত সব আলোচনার পরেও এখন আর বিপিনের

মনে নেই গল্পটার বিষয়বস্তু কি ছিল?

সে যা হোক, সঞ্জয়বাবুর সঙ্গে এই সূত্রে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। কোন জেলা, কোন গ্রামে বাড়ি, মামার বাড়ি কোথায়, জাত-গোত্র কি এসব ব্যাপারে সঞ্জয়বাবু প্রচণ্ড মাথা ঘামাতেন।

সঞ্জয়বাবু বিপিনকে বলেছিলেন 'তোমাদের দেশে নদীর চর এলাকায় লম্বা, শক্ত মানুষগুলো হল কিরগিজ। মোগলেরা ওদের এনেছিল, তারপরে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয় পাকাপাকি বসবাসের জন্যে। সমাজে ওদের স্থান হয়নি, তাই জলে-জঙ্গলে, চরে-বাদায় বাস করতো।'

এই বলে সঞ্জয়বাবু একটা পুরানো, জীর্ণ, পোকায় কাটা উনিশ শতকের এনসাইক্লোপিডিয়া খুলে এক পৃষ্ঠায় বিপিনকে দুটো ছবি দেখিয়েছিলেন, তার একটা হল এক সহাস্য কিরগিজ দম্পতি শিশুসহ আর অন্যটা হল কিরগিজদের বাড়িঘর। এরপর একটা জর্দাপান মুখে দিয়ে হাসিমুখে বিপিনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এইবার চিনতে পারছো তোমাদের দেশের চরের লোকদের? ওই যাদের তোমরা বলো চইর‍্যা না কি যেন?'

বিপিন কিন্তু ওই ছবি দুটোর মধ্যে সঞ্জয়বাবুর প্রতিপাদ্য বিষয়ের তেমন কোনো প্রমাণ খুঁজে পায়নি। তবে সেকথা সে সঞ্জয়বাবুকে বলেনি। এ ধরনের কথা শুনলে, সামান্য মতভেদ হলে সঞ্জয়বাবু ক্ষেপে যেতেন। বিপিন শুনেছিলো, একবার এক বিখ্যাত অধ্যাপক জোর তর্ক করে পূর্বাশা অফিস থেকে বেরোবার সময় সঞ্জয়বাবু হঠাৎ পিছন দিক থেকে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ির ওপরে ফেলে দিয়েছিলেন।

আরেকবার কবি মনীশ ঘটককে সঞ্জয়বাবু তর্ক করতে করতে উত্তেজিত হয়ে গিয়ে একটা ডিকশনারি ছুঁড়ে মেরেছিলেন। প্রত্যুত্তরে বলবান মনীশ ঘটক, যাঁর ছদ্মনাম নাম ছিল যুবনাশ্ব, সঞ্জয়বাবুকে মাথার ওপরে তুলে সাত পাক দিয়ে নামিয়ে দিয়েছিলেন, সঞ্জয় ঘুরপাকে ভিরমি খেয়ে অনেকক্ষণ মেজেতে পড়েছিলেন, দাঁড়াতে পারেননি।

বন্দিনিবাসে অনেক এলোমেলো কথা ভাবতে ভাবতে সঞ্জয়বাবুর কথা বারবার মনে পড়তো বিপিনের। এর কারণ ছিল মোয়াজ্জেম।

মোয়াজ্জেম ছিল গেটের সেপাই। বোধহয় আনসারবাহিনীর লোক, অনেকটা কলকাতার হোমগার্ডের মত।

মোয়াজ্জেমের নাকটা ছিল বড়, লোকটা ছিল খুব ঢ্যাঙা এবং চওড়া কাঁধ। কেন যেন মোয়াজ্জেমকে দেখলেই বিপিনের মনে হত এর পূর্বপুরুষ নিশ্চয় কিরগিজ ছিল। চেহারা ভযানক হলেও মোয়াজ্জেম লোকটা ভাল ছিল, তাকে বিপিন জিজ্ঞাসা করায় সে বলেছিল তার বাড়ি হল পাবনা জেলায় পদ্মাপারের এক গ্রামে।

সামান্য সিকি-আধুলি বখশিসের বিনিময়ে মোয়াজ্জেম বন্দিবাবুদের ফাই-ফরমাস খাটতো। যার যা টুকটাক প্রয়োজন পান-সিগারেট, মিষ্টির দোকান থেকে দই-মিষ্টি, বাজার থেকে তেল সাবান মনিহারি জিনিসপত্র মোয়াজ্জেম এবং আরো দু'য়েকজন এনে দিত।

বিপিনের মোয়াজ্জেমকে ভাল করে মনে আছে অন্য একটা কারণে।

মোয়াজ্জেম বাজার থেকে বিপিনকে একটা রুলটানা বাঁধানো দশ নম্বর খাতা এনে দিয়েছিল। প্রতি নম্বরে ষোলো পৃষ্ঠা করে দশ নম্বরে একশো ষাট পৃষ্ঠা।

বন্দিনিবাসের দমবন্ধ ভাবটা সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই কেটে গিয়েছিল এবং খুব জমজমাট হয়ে উঠেছিল মাস খানেকের মধ্যেই। তখন যাদের আসার সবাই এসে গেছে, নতুন লোক আর আসার নেই। বন্দিদের সরকারি অনুদানও এসে গেছে।

মুক্তাগাছার কুমারপাড়া থেকে একটা মাঝারি আয়তনের কালীপ্রতিমা কিনে এনে হৈ হৈ করে পুজো করা হল বন্দিনিবাসের ভিতরে রাজবাড়ির উঠোনে।

পাকিস্তান সরকার এতে আপত্তি করেনি বরং সায় দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক প্রচারের প্রয়োজনে এ রকম একটা অনুষ্ঠান সেই সময়ে তাদের খুব কাজে লাগলো। ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের, কালীপুজোর সেই ছবি দেশ বিদেশের কাগজে ছাপা হয়েছিল। ঢাকা থেকে রয়টারের প্রতিনিধি এসে সেই পূজোব প্রতিবেদন সারা পৃথিবীতে পাঠায়।

এই কালীপুজোর ছবি কলকাতার কাগজেও ছাপা হয়েছিল। সেই ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ইপিন দেখেছিল, কিন্তু বিপিনকে সে দেখতে পায়নি।

কালীপুজোর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি বিপিন। এ ধরনের ব্যাপারে তার সব সময়েই কেমন একটা ছাড়াছাড়া ভাব। সে ব্রাহ্মণ বলে পুজোর অনেক কাজ মায় মন্ত্রপাঠ পর্যন্ত তার ওপবে চাপানো হচ্ছিল কিন্তু সে বহু কষ্টে এড়িয়ে যায়।

তবে তাতে পুজোর কোনো অসুবিধা হয়নি। বন্দিদের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি পেশায় পুরোহিত। সুসঙ্গের রাজবাড়ির এক তরফের পুরোহিত বংশের সন্তান। পার্টিশনের পর কলকাতার যাদবপুরে রিফিউজি কলোনিতে বাসা করেন।

পুরোহিত ভদ্রলোক সুসঙ্গে এসেছিলেন বাৎসরিক দুর্গাপুজো করতে। তখনো সেটা বন্ধ হয়নি। বোধহয় সে বছর থেকেই সেটা বন্ধ হয়ে গেল।

এই পুবোহিত ঠাকুর কিন্তু অসম্ভব কাজের ছিলেন। মা দুর্গাই শুধু দশভুজা নন, দেখা গেল তাঁর পুরোহিতও দশভুজ। পুবো একটা কালীপুজো তিনি একা উতরিয়ে দিলেন। তিনিই ফল কুটছেন, পুজোর মন্ত্র পড়ছেন, শান্তির জল দিচ্ছেন আবার পুজোব প্রসাদও তিনিই রান্না করছেন। চমৎকার বান্নাব হাত। খিচুড়ি, লাববা, জলপাইযেব টক, পাযেস, সবাই খুব পরিতৃপ্তি করে খেযেছিল।

খেতে বিপিনেরও ভাল লেগেছিল। তবে জলপাইয়ের চেয়ে চালতা তার বেশি পছন্দ। ছোটবেলায় বাড়িতে পাকা আম ফেলে সে নদীর ধারে জেলে পাড়াতে যেত পাকা গাবফলের লোভে।

কালীপুজো মিটে যেতে বন্দিশিবিরের ভারপ্রাপ্ত বড় সাহেবের অনুমতি নিয়ে ভলি খেলার বন্দোবস্ত হল। আন্তর্জাতিক আইনে বন্দিদের স্বাস্থ্যচর্চার কথা আছে, সুতরাং কর্তৃপক্ষের আপত্তি হল না।

এক বন্দির আত্মীয় ময়মনসিংহ থেকে একটা ভলিবল, নেট আর পাম্পার এনে দিল। উঠোনে নেট টাঙিয়ে দু'বেলাতেই বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে মহা উৎসাহে ভলি খেলা হত।

কখনো দু-এক গেম খেলেছে বটে তবে ভলি খেলাতেও সে খুব উৎসাহ পেত না।

আবু এক দিস্তে কাগজ এনে দিয়েছিল। সেটা ফুরিয়ে যেতে মোয়াজ্জেম একটা দশ নম্বর খাতা এনে দেয়। খাতাটা এখনো বিপিনের কাছে আছে, খাতাটার ওপরে লেখা, 'উমামঙ্গল কাব্য'। প্রথম পৃষ্ঠাতেই আকুতি :

তুমি তো জানো না
আমি কি রকম আছি?
আমি তো জানি না
তুমি কি রকম আছ?

কি রকম? কি রকম?
দুপুর বেলায
একটি পাখির ঠোঁট
শুধু ঠোকবায়

ডিসেম্বর শেষ হয়ে জানুয়াবি এসে গেলো। এ বছব প্রচণ্ড শীত পড়েছে। বিকেল চারটে বাজতে না বাজতে রাজবাড়ির চারপাশের বড় বড় গাছেব ছায়া ঘন হযে আসে, ঘুবঘুর করে পাক খেতে থাকে উত্তরের হাওয়া ধারালো ছুরির তীক্ষ্ণতা নিয়ে, ক্রমশ হিমে ঠাণ্ডা হয়ে আসে জানলার কাঁচ। অন্ধকার হয়ে আসে।

এদিকে শীত পড়তে পড়তে শুরু হযেছে ভয়াবহ মশার উৎপাত। তারা সংখ্যায় যেমন প্রবল, তাদেব হুলেও তেমনি জ্বালাধরা বিষ।

শীত পডাব আগেই প্রভাসকুমার আর স্মৃতিকণা এসে একটা লালশালুব মোটা লেপ আব একটা মশাবি দিয়ে গেছেন। সন্ধ্যা হতে না হতে বিপিন মশারিব নিচে লেপের মধ্যে আশ্রয় নেয়।

দেউড়িতে রক্ষীরা ঘণ্টা বাজায়। পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা, ছটা বাজে। ঠিক ছটার সময় বারান্দায় দুপাশে দুটো লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিয়ে যায মোযাজ্জেম, প্রত্যেক তলায়, প্রত্যেক বারান্দার জন্যে দুটো করে লণ্ঠন বরাদ্দ।

বিকেল পাঁচটার মধ্যে বিছানায় ঢুকে পড়লে শীতের দীর্ঘ রাত কাটানো অসম্ভব। অথচ আর কিছু কবারও উপায নেই। ঘরের মধ্যে আলো থাকলে লেখাপড়া করতে পারলে ভালো হতো। বিপিন নিজের জন্যে একটা লণ্ঠন কিনতে চেয়েছিলো, কিন্তু আইনে বাধা আছে। কেরোসিন তেল জাতীয দাহ্য জিনিস বন্দীদের ঘবে দেযা যায না।

তবে মোয়াজ্জেমকে ঘুষ দিয়ে বিপিন বাজার থেকে এক বাণ্ডিল মোম আব একটা দেশলাই আনিযে নিয়েছে। সে নিজে সিগারেট খায় না, কিন্তু অন্যেরা যারা বিড়ি-সিগারেট খায় তারা বিপিনের কাছে দেশলাই থাকে জানতে পেরে নিজেরা দেশলাই কেনা ছেড়ে দিয়েছে। সব সময় দেশলাইয়ের জন্যে বিরক্ত করে। 'দাদা, আপনার ম্যাচটা একটু', ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে এসে হাত পাতে। এদিককার অধিকাংশ লোকই দেশলাইটাকে 'ম্যাচেস', আবার 'মাচিস'ও বলে।

বিপিন বিরক্ত হয়ে মোয়াজ্জেমকে দিয়ে একগুচ্ছি নারকেলের দড়ি আনিয়ে পানের দোকানের মত ঘরের জানলার শিকে আগুন ধরিয়ে ঝুলিয়ে দেয়। এতে দেশলাই প্রার্থীরা অনেকে অপমানিত বোধ করেন, বিপিনের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ কবে দেন।

দেশলাই-মোমবাতি সংগ্রহ হলেও মশারির মধ্যে জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে লেখাপড়া করা সম্ভব নয়। দুয়েকবার মশারি তুলে দিয়ে বিছানায় বসে চেষ্টা করে দেখেছে কিন্তু মশার অত্যাচারে

আর পারেনি।

তবু মাঝে মাঝে বিছানা থেকে নেমে মেঝের ওপরে একটা মোমবাতি ধরিয়ে দিতো বিপিন, অন্ধকারের একগুয়েমি কাটানোর জন্যে। এই একই কারণে বিছানায় মশারির মধ্যে শুয়ে শুয়ে টর্চের লাইট জ্বেলে ছাদের কড়িকাঠ গুনতো।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ এই অন্ধকার দশার আধঘণ্টার জন্যে বিরতি হতো। সাড়ে আটটার ঘণ্টাটা একবার না বেজে দীর্ঘলয়ে পরপর সাত-আটবার বাজতো। এটা ছিল খাওয়ার ঘণ্টা।

অনেকে ঘরে খেতো, বাকিরা রান্নাঘরে বারান্দায়। বিপিনও রান্নাঘরের বারান্দায় খেতে যেতো। অনেক লোকের সঙ্গে খেতে তার ভালোই লাগে, তা ছাড়া মশা বাঁচিয়ে, যতক্ষণ থাকা যায় বিছানা ছেড়ে সেটাই লাভ।

মহারাজাদের পুরনো কাছারি ঘর থেকে চেয়ার টেবিল বার করে খাওয়ার জায়গা হয়েছিল। দুটো মোটা সতরঞ্চি কার্নিশ থেকে বারান্দা বরাবর ঝুলিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ঠেকানো হয়েছিল।

ধীরে ধীরে খাওয়ার ব্যবস্থা বেশ ভালো হয়েছিলো। রাতের বেলায় কে কেমন খেতে চায় ভাত না রুটি। কোনো কোনো দিন লুচি বা পরোটাও হতো কখনো। সবই নির্ভর করতো মেস ম্যানেজারের ওপর। প্রত্যেক সপ্তাহে একজন করে মেস ম্যানেজার হতো রীতিমত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে। বিপিনকে ম্যানেজার করতে দুয়েকবার ধরা হয়েছিল। বিপিন মোটেই রাজি হয়নি।

বিপিন কলকাতায় একটা মেসে ছাত্রজীবনে বেশ কয়েক বছর বসবাস করে জেনেছে মেস ম্যানেজারি কোনো সহজ কাজ নয়। কেউ কেউ অসাধু ব্যক্তি এরকম কাজের দায়িত্ব পেলে হয়তো দু-চার পয়সা এদিক ওদিক করেন কিন্তু সীমিত ব্যয়ের মধ্যে ক্ষুধিত মানুষকে খাইয়ে তৃপ্ত করা কঠিন কাজ।

বন্দিশালার মেসে সাধারণত দুপুর বেলা ডালভাত তরকারি মাছের ঝোল হতো। এরই মধ্যে মেসকর্তারা টক ডাল কিংবা সজনের ডাটার চচ্চড়ি করে হয়তো একটু বৈচিত্র্য আনতেন।

এই টক ডাল আর সজনে ডাঁটার চচ্চড়ির ব্যাপারে বেশ একটু সুবিধে ছিলো রাজবাড়িতে। বাড়ির চারপাশে বড় বড় আম গাছ, মাঘের শেষ থেকে ছোট বড় আমের কুঁড়ি ছড়িয়ে থাকতো বাড়ির উঠোনে। গাছ থেকেও পাড়া হতো। সুরক্ষিত বন্দিশিবির বলে বাইরের লোকের উৎপাত ছিল না।

বাইরের দিকের দেয়াল ঘেঁষে বড়বড় সজনে গাছ ছিল। শীতের শুরু থেকে বর্ষা পর্যন্ত সারাদিন সারারাত টুপটুপ করে সজনে ফুল ঝরে পড়তো। ছাদের কার্নিশ, বারান্দা, উঠোন সাদা ফুলে ছেয়ে গেছে। ঠাণ্ডার মধ্যে খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে জানলা দিয়ে বিপিন দেখতো উঠোন থই থই করছে সজনের ছোট ফুলে। যদিও সে কখনো বরফপড়া দেখেনি, মনে হতো সাদা তুষারের আস্তরণ পড়েছে। সকালবেলার গভীর বাতাসে সজনে ফুলের ক্ষীণ মৃদু সৌরভ ভেসে বেড়াতো, তার সঙ্গে কখনো মিশে যেতো বাড়ির পিছনের পুকুর পাড়ের সদ্যফোটা বাতাবি লেবু আর গন্ধরাজ লেবুর ফুলের গন্ধ। তারাও পরে যোগ হয়েছিল আমের মুকুলের সুবাস।

বিপিনের দুঃখের দিনের, বিনাদোষে বন্দীজীবনের স্মৃতি ভরে আছে আকুল সৌরভে।

সজনে ডাঁটা, আম, লেবু এসব কিনতে পয়সা লাগতো না। পুলিশেরা আপত্তি করতো না। তারাও কিছু কিছু নিতো। সজনের ডাঁটা ছাড়াও ফুল ও কচিপাতাও কাজে লাগতো। সজনের ফুলের চমৎকার বড়া হতো চালবাটা দিয়ে, খুব মুচমুচে ও সুস্বাদু, স্বাস্থ্যের পক্ষেও নাকি ভালো।

যুদ্ধবন্দী মেসবাসীরা রাজবাড়ির পুকুর থেকে মাছও ধরার চেষ্টা করেছিল জেলে ডেকে জাল ফেলে। কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। রাজবাড়ির পুকুর নাকি আগে থেকেই ফিশারি ডিপার্টমেন্ট নিলাম ডেকে লিজ দিয়েছিল বাইরের মৎস্য ব্যবসায়ীদের।

তবে এরই মধ্যে সুতো, বড়শি জোগার করে পুকুরের পিছনের বাঁশবন থেকে কঞ্চি কেটে চমৎকার হাতছিপ বানিয়ে দুয়েকজন মৎস্য বিলাসী সারাদিন কাটিয়ে দিতেন পুকুরের ধারে মানকচুর বিশাল ঝোপের পাশে প্রাচীন ছাইগাদায় বসে। দুয়েকটা মাছ ধরাও পড়তো, সেগুলো তারা মেস কমিটিকে উপহার দিতেন। ভাজা, ঝোল হতো।

রাতের খাওয়াটা রকমারি হতো। বড় মাছের ঝোল বা কালিয়া, অন্যথায় বহুদিনই মাংস, কখনো ডিম হলে একসঙ্গে প্রত্যেকে দুটো ডিমের ঝোল। অনেক সময় রাতের পাতে দইও দেয়া হতো। ঘন, মিস্টি, লালচে দই। কিন্তু মধ্যাহ্নভোজে দই না দিয়ে রাতে কেন দেয়া হতো সেটা বিপিন বুঝতো না। অবশ্য এ সব নিয়ে সে কখনো কিছু জিজ্ঞাসা করেওনি।

দুবেলাই খাওয়ার আসরে নানা ধরনের কথাবার্তা হতো। তবে রাজনীতি এড়িয়ে অন্যান্য ব্যক্তিগত কথা। সবাই খুব সাবধানে কথা বলতো হিসেব করে। বন্দিদের মধ্যে দুয়েকজন নাকি গুপ্তচরও ছিল।

যে দু'তিনজন মুসলমান বন্দি ছিলেন তাঁদেব অন্যেরা সন্দেহের চোখে দেখতেন। একজন ছিলেন লতিফ চৌধুবী, তিনি কলকাতার বড় ব্যবসায়ী। ব্যবসার কাজে ময়মনসিং এসে আটকিয়ে গিয়েছিলেন। অতি সম্ভ্রান্ত লোক, ধবধবে ফর্সা রঙ, নীলচে চোখ, সেপাইদের সঙ্গে চোস্ত উর্দুতে কথা বলতেন। তাঁকে যুদ্ধবন্দি কবাব একমাত্র কারণ বোধহয় ছিল যে তাঁর এক ভাই ছিলেন ভাবতীয় সামরিক বাহিনীর অফিসার। অপর একজন ছিলেন, অতি সাদাসিধে নিরীহ চেহারার এক ভদ্রলোক, খুব কম কথা বলতেন, প্রায় সব সময়েই চুপ করে থাকতেন। যতদূর জানা গিযেছিল তিনি বোধহয় কমুনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন, তেষট্টি সালে চীন যুদ্ধের পর ভারত থেকে আত্মগোপন করার জন্যে পূর্বপাকিস্তানে চলে এসেছিলেন, থাকতেন সুসঙ্গে মনি সিংহদের বাড়িতে। সেখান থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার কবে আনা হয়েছিল।

যে যাই বলুক, এদের কাউকে বিপিনের গুপ্তচর বলে মনে হল না, বরং এঁদের দু'জনের সঙ্গেই বিপিনের যেন সদ্ভাব গড়ে উঠেছিল।

দিনের বেলায় খুব একটা ঘর থেকে বেরোত না বিপিন, খুব বেশি কথাবার্তাও কারও সঙ্গে হতো না। রাতের খাওয়া মেটার পর বারান্দায় দাঁড়িয়ে এঁদের সঙ্গে টুকটাক নানা বিষয়ে আলোচনা হতো।

এছাড়া বন্দিনিবাসের আরও অনেকের সঙ্গে সে সময় বিপিনের ভালোই পরিচয় হযেছিল কিন্তু অধিকাংশই নিতান্ত ছাপোযা মানুষ। প্রায় সব সময়েই নিজেদের অসুবিধার কথা, বাড়ির লোকজনের কথা, তাদের কি করে কিভাবে চলছে এইসব সমস্যার কথা উঠত।

বিপিন প্রায়ই এসব আলোচনা এড়িয়ে যেতো। যে সমস্যার সমাধান হাতে নেই তা নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। এক সঙ্গে ছয়মাস ছিল এতগুলো লোক, একেকজনের একেকরকম চিন্তা—কিন্তু এতদিন পরে, সে প্রায় তিরিশ বছর হয়ে গেল, এদের প্রায় কারোরই চেহারা নামধাম বিপিনের মনে নেই, কেমন অস্পষ্ট হয়ে গেছে সব।

শুধু একটা পুরনো ভাঙা রাজবাড়ি, তার ঘরে ঘরে অনেক রকম অনেক লোক, উঠোনে হুহু করে বয়ে যাওয়া উত্তুরে বাতাস, একটা জানলা, সকাল বিকেলে হাঁসেদের আনাগোনা, একটা হাঁসের অন্তিম আর্তনাদ, আর রাশি রাশি ঝরা ফুল, ঝরা ফুলের সৌরভ তার স্মৃতি

জুড়ে আছে।

খুব ঠাণ্ডা না থাকলে বারান্দায় কেরোসিন লণ্ঠনের নিচে অস্পষ্ট আলোয় বেশ কয়েকজন মিলে তাস খেলতে বসতো। এক সময়ে বিপিন তাসের পোকা ছিল। কিন্তু যে কারণেই হোক, সম্ভবত ওরা খুব চেঁচামেচি, চিৎকার করতো বলে, বিপিন এদের সঙ্গে কখনও তাস খেলেনি। তাছাড়া ওদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন তুখোড় খেলোয়াড়, বিপিন তাস খেলতে একদা ভালবাসলেও তাস মোটেই ভাল খেলতে পারতো না। তাস খেলায় এক ধরনের অভিনিবেশ ও কূটবুদ্ধি দরকার, সেটা বিপিনের কখনোই ছিল না।

বারান্দায় তাস খেলা হতো, বিপিন ধীরে সুস্থে, ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিত। দরজা বন্ধ করার নিয়ম ছিল না। বন্দিশালায় ঘরের ভিতর থেকে দরজা আটকানোর বিধি নেই। উপায়ও ছিল না, ভিতরেব দিকের সব ছিটকিনি, কুলুপ খুলে ফেলা হয়েছিল।

বাতাসের ধাক্কায় যাতে হঠাৎ দরজা খুলে না যায়, সেই জন্য উঠোন থেকে দুটো ইট জোগার করে ঘরের মেঝেতে রাখা ছিল। দরজার পাল্লায় সেটা ঠেকা দিয়ে আটকিয়ে রাখা হতো।

বিপিনের ঘরে প্রথমে একজন সেই লেঠেল নিত্যরঞ্জনেব পবে আরও দুজ। এসেছিল। তারা খুবই সাধারণ লোক, সবসময় চুপচাপ থাকতো। পাসপোর্ট নিয়ে বাড়ির লোকজনের কাছে এসে বিপাকে পড়ছিল।

একজনকে এখনো একটু মনে আছে, গদাধর সান্যাল। ব্রাহ্মণ সন্তান, বেশ ভাল মানুষ গোছের, সরল প্রকৃতির। ধর্মভীরু, কোথায় মালদায় না বালুরঘাটে একটা স্কুলে পণ্ডিতি করতো, অসুস্থ ঠাকুমাকে শেষ দেখা দেখতে এসে আটকিয়ে পড়েছে। বন্দিশালায় থাকতে থাকতে খবর পেয়েছিল ঠাকুমা মারা গিয়েছেন। শেষ দেখা আর হয়ে ওঠেনি, তবে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে দিনকয়েক ঠাকুমার কাছে থাকতে পেরেছিল সেইটুকু সান্ত্বনা।

সান্যালের গলায় পৈতে ছিল। সেই ঘোর পাকিস্তানী বন্দিশিবিরেও সে ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করতো, পায়খানায় যাওয়ার সময় কানের ওপরে পৈতে তুলে দিত। কোনরকম বিদ্রুপ বা ঠাট্টার ধার না ধেরে। তার সঙ্গে একটা পকেট গীতা ছিল, সেটা নাকি পঞ্চাশ বছর আগে ছাপা, তার ঠাকুর্দার অনুবাদ। প্রতিদিন বিছানার ওপরে পদ্মাসনে বসে সারাদিন আঠারো অধ্যায় গীতা সে পাঠ করতো, খুব অস্ফুট স্বরে।

বন্দিনিবাসে ঠাকুমার মৃত্যুসংবাদ আসার পবে সে অশৌচ পালন করেছিল। তার বাড়ির থেকে নতুন কোরা কাপড় এসেছিল,আতপ চাল, নতুন মাটির হাড়ি।

এক বস্ত্রে পুকুরে স্নান কবে সে কোঁচার খুট রোদে শুকিয়ে নিত। উঠোনের এক কোণে তিনটি ইট পেতে মাটির হাঁড়িতে আতপান্ন সেদ্ধ করে এক বেলা এক মুঠো দশদিন ধরে খেয়েছে। ঘাটের দিন নাপিত ডেকে অশৌচান্ত করেছিল।

মুসলমান সেপাইদের ধারণা ছিল সে মাথা ন্যাড়া করবে কিন্তু তা করেনি। এ বিষয়ে তারা বিস্ময় প্রকাশ করায়, সান্যাল তাদের বুঝিয়ে বলেছিল তার বাপ বেঁচে আছেন, তিনিই মস্তক মুণ্ডন করবেন, শ্রাদ্ধ করবেন, নাতি হিসেবে তার এসব করণীয় নয়।

সে যাই হোক তার ধার্মিক স্বভাবের জন্যই তাকে সকলেই একটু সমীহ করে চলতো, মুসলমান সেপাইরাও সম্ভ্রমের চোখে দেখতো।

আশ্চর্য, এই এতকাল বাদে সেই সান্যালকে মনে আছ বিপিনের। লেঠেল নিত্যরঞ্জনকেও মনে পড়ে, কিন্তু সেপাইদের সব কথা বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। আর সব সময় নানারকম অপ্রাসঙ্গিক

কথা বলে বিনা কারণে বিরক্ত করতো।

খাওয়া দাওয়ার পর ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে অন্ধকারে বিছানায় উঠে বিপিন মশারিটা ভাল করে গুঁজে দিত। তারপর বিছানায় কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর অন্ধকারের মধ্যেই বালিশের পাশ থেকে পেনসিল আর উমামঙ্গল নামাঙ্কিত খাতাটি নিয়ে বালিশটা বুকের নিচে গুঁজে দিয়ে যা ইচ্ছে লিখে যেত। অন্ধকারের মধ্যে লিখে যাওয়া বেশ অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, লাইন গুলো যা একটু আঁকাবাঁকা হতো। আবার, কবিতা লেখা সুরু করেছিল বিপিন।

সহজে চোখে ঘুম আসতো না। সারাদিন অলস কেটেছে, সামনে শীতের লম্বা রাত। হিজিবিজি লেখা, কাটাকুটি সব সময়ে যে মানে হতো তা নয়। সকালে উঠে অনেকদিন খাতা খুলে পাঠোদ্ধার করতে পারেনি, রাতে সে কি লিখেছে।

তার একটা কারণ, অনেক সময় সে ঘুমেব ঘোরেও লিখেছে। অন্ধকাবে ঘুমেব ঘোবে লেখা, এ যেন সেই অন্ধ মানুষের গল্প, যে একটা অন্ধকার ঘরে একটা কালো টুপি খুঁজছে।

বন্দিশিবির থেকে মুক্তি পাওয়ার পবে অনেক দিন পর্যন্ত বিপিন মনে মনে নিজেকে বাহবা দিয়েছে এই ভেবে যে বদ্ধজীবনটার সঙ্গে যে ভাবেই হোক সে মানিযে নিয়েছিল।

সবচেয়ে বেশি বিরক্ত করতো তার প্রথম থেকে শেয অবধি রুমমেট নিত্যরঞ্জন। এইরকম একটি বিদ্‌ঘুটে চরিত্র কদাচিৎ চোখে পড়ে।

ভদ্রলোক সারাদিন অনর্গল কথা বলার চেষ্টা করতেন, সে কথা কেউ শুনুক আর না শুনুক। সবচেয়ে বেশি উৎপাত হতো বিপিনের ওপরে কারণ তার পাশেই ছিল তাঁর খাট।

খাট মানে সত্যিই খাট, যাকে বলে সত্যিকারের পালঙ্ক। গদিসমেত পালঙ্ক। মহাবাজাদের ব্যবহারের জিনিস ছিল, রাজবাড়ির গুদাম না তোশাখানা থেকে কি কৌশলে যেন নিত্যবাবু সেটা বের করে এনেছিলেন। আরও দু'য়েকজন বন্দি এরকম করে খাট-তক্তপোশ সংগ্রহ করেছিল কিন্তু কোনটাই নিত্যরঞ্জনের পালঙ্কের মতো বাহারি ছিল না। বাকি কেউ কেউ বিপিনের মতই নিজেদের তক্তপোশ কিনে নিয়েছিল। অন্যেরা সবাই মেঝেতেই শুতো। দালানের মেঝে এমনিতে কোন অসুবিধে ছিল না, তবে শীতে খুব ঠাণ্ডা বোধ হত।

সেই বাহারি পালঙ্কে শুয়ে প্রায় প্রতিদিনই একবার-দু'বার নিত্যরঞ্জন বিপিনকে বলতেন, 'কপালে পালঙ্কে শোয়া লেখা ছিল। রাজার পালঙ্কে শোবে কোনদিন ভেবেছিল, বিপিনমামা?'

নিত্যরঞ্জনের মুখে বিপিনমামা সম্বোধন শুনে প্রায়ই বিপিনের মাথায় রক্ত উঠে যেত, তবুও সে কোনরকমে নিজেকে সামলিয়ে নিত।

সেই কবে কোন কালে স্মৃতিকণার এক পিসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে নাগপুর হাইস্কুলে নিত্যরঞ্জন কয়েক ক্লাস একসঙ্গে পড়েছিলেন, সেই সূত্র ধরে প্রথমে ভাগ্নে তারপর সরাসরি বিপিনমামা সম্বোধন। প্রাপ্তবয়স্ক, গ্রাম সম্পর্কে, ভাগিনেয়কে মামা বলার রীতি এতদঞ্চলে আছে, কিন্তু নিত্যরঞ্জনের মুখে 'বিপিনমামা' ডাক বিপিনের অসহ্য বোধ হত।

অনেক রকম উল্টো-পাল্টা কথা বলতেন নিত্যরঞ্জন। সে সব কথা অর্ধেকের কম বয়েসী কারও সঙ্গে বলা মোটেই সুরুচির ব্যাপার নয়।

ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে পালঙ্কে বসে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে নিত্যরঞ্জন একদিন আচমকাই বিপিনকে বললেন, 'জানো, তোমাদের টাঙ্গাইলে সাইকেল আসার অনেক আগে আমাদের গোমজানির হলধর নিয়োগী সাইকেল কিনেছিল। নিয়োগী যখন সাইকেল চালিয়ে যেতেন গ্রামের রাস্তা থেকে লোকজন ছুটে মাঠে নেমে পড়ত, গরু-ছাগল খুঁটির দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যেত।'

এরপর একটু চিন্তা করে নিত্যরঞ্জন বললেন, 'আমি অবশ্য হলধর নিয়োগীকে চোখে দেখিনি, বাবার কাছে শুনেছি। আমার ছোটবেলায় তো ঘরে ঘরে সাইকেল এসে গেছে। রাম-শ্যাম যে কেউ চালায়।'

নিত্যরঞ্জন সহজে গল্পের খেই ছাড়তেন না। হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে এসে মুড়ি চিবোতে-চিবোতে আমায় বলতে লাগলেন, 'তারপরে তো কলের গান, মোটর গাড়ি, রেডিও এইসব এল। কি শব্দ ছিল পুরনো রেডিওয়। এক বাড়িতে একটা রেডিও বাজলে সারা গ্রাম জুড়ে শোনা যেত।

বন্দিদের জেল থেকে সকালে চায়ের সঙ্গে বিস্কুট দিত। সেই চা-বিস্কুট খাওয়ার আগে নিত্যরঞ্জন একটু মুড়ি চিবিয়ে নিতেন। চায়ের সঙ্গে দু'টো করে বিস্কুট দিত। আটার ভুষি দিয়ে তৈরি বড় বড় টোস্ট বিস্কুট, খুব মুচমুচে। বিপিনের খুব ভাল লাগত এই গ্রাম্য বিস্কুট।

বিস্কুট দু'টো নিত্যরঞ্জন চায়ের মধ্যে চুবিয়ে নরম করে খেতেন। একদিন বিপিন বলেছিল, 'এই বিস্কুটগুলো মুচমুচে খেতেই তো ভালো লাগে। চায়ে চোবাতে যান কেন?' এত কথা বলতেন নিত্যরঞ্জন। কিন্তু বিপিনের এ কথায় কর্ণপাত করেননি।

খুব মনোযোগ দিয়ে চা-বিস্কুট খেতেন নিত্যবাবু। প্রায় সব বন্দিই একটা করে কাপ-গেলাস কিনেছিল, কিন্তু তিনি এসব কিছু কেনেননি। প্রথম থেকেই, সেই যেদিন টাঙ্গাইল থানায় তাঁকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল,তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে ঝোলাব মধ্যে একটা অ্যালুমিনিয়ামেব বড় বাটি ছিল। সেই বাটিতেই চা নিতেন। একদিন বিপিন তাঁকে বলেছিল, 'এক জোড়া কাপ-ডিশ কিনলে পারেন।' মুচকি হেসে নিত্যরঞ্জন বলেছিলেন, 'তা হলে কি আর এতটা চা দেবে।' শুধু চা নয়, ওই বাটিতেই জল খেতেন তিনি। উঠোনে নেমে কলাপাতা কেটে আনতেন দু'বেলা ভাত খাওয়ার জন্যে।

কথা আর শেষ হত না নিত্যরঞ্জনের, 'প্রথম যখন এরোপ্লেন এল লোকে ভিড় করে অবাক হয়ে আকাশে তাকিয়ে থাকতো, যতক্ষণ না পর্যন্ত বিমানটা বিন্দুতে পরিণত হয়ে যেত, একদম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত, ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখত। ঘাড়ে ব্যথা হয়ে যেত।'

বিপিন হুঁ হাঁ কিছু করতো না। সে আপনমনে ভেবে যেত, আকাশ-পাতাল ভাবনা। কখনও খাতা খুলে কাটাকাটি, কিংবা লেখালিখি।

তবে একেকদিন নিত্যরঞ্জনের কথায় গা জ্বলে যেত বিপিনের।

সেদিন খুব মেঘলা। সকাল থেকে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। বিপিন বিছানার ওপরে লেপ মুড়ি দিয়ে বসে নানা কথা চিন্তা করছিল। এলোমেলো চিন্তা। বিপিন এমনিতে চিন্তা করার মানুষ নয়। কিন্তু একদিন এমন আসে যেদিন ভাবনা-চিন্তার জাল ছিঁড়ে বেরনো যায় না।

উমার কথাই খুব বেশি করে মনে পড়ে। উমাকে বলা ছিল এবং সেটাই ঠিক ছিল যে মহালয়ার পরে পুজোর আগে যত তাড়াতাড়ি পারে ফিরে আসবে। পুজো গেল, কালীপুজো গেল, বড়দিন, ইংরেজি নতুন বছর—গাছের পাতা ঝরে গিয়ে নতুন সবুজ কুঁড়ি গজালো শীতের এক পশলা বৃষ্টির পরে।

আজ আবার ঝিরঝির করে বৃষ্টি এসেছে। গারো পাহাড়ের ওপাশে সমতল পূর্ববঙ্গের এ খুবই চেনা বৃষ্টি। কথায় আছে, 'যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ', খনার বচন নিশ্চয়। এই বৃষ্টির পরে কাঁঠাল গাছে মুচি আসবে, আমের কুষি গুটি হবে, বোল আসবে জামে-জামরুলে, রবিশস্যের মাঠ সবুজে সোনায় ঝলমল করবে।

এই শীতে উমার সঙ্গে বিয়েটা রেজিস্ট্রি করে ফেলবে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল বিপিন।

অবশ্য উমাকে বিশেষ আভাস দেয়নি। তবে উমার বাড়িতে তার বিয়ের সম্বন্ধ ঘনঘন আসছিল। উমার বাবাও কখনও-সখনও হঠাৎ যখন উমাদের বাড়িতে বিপিন যেত তাকে যেন কি বলতে চাইতেন, শেষ পর্যন্ত আর বলেননি, কিন্তু বিপিন বুঝতে পারত তিনি কি বলতে চাইছেন।

একদিন বিপিন উমাকে জিজ্ঞাসা করেই ফেলেছিল, 'আচ্ছা, তোমার বাবা কি বলতে চান বলো তো?'

উমা তার কালো চোখের তারায় বিদ্যুতের ঝিলিক তুলে বলেছিল, 'সে অনেক শতাব্দীর মনীষার ধন।'

এক সময়ে কবিতার এই অমোঘ পংক্তিটা প্রায় কথায় কথায় বিপিন বলতো, মুদ্রাদোষের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। বিপিনের এরকম হয়, একেক সময় একেকটা পংক্তি তার মাথায় ভর করে। যেমন আজ কিছুদিন হল এই মুক্তাগাছায় বন্দি শিবিরে তার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে মধুসূদন, 'রেখো মা দাসেরে মনে', 'এ মিনতি করি পদে'। সব সময়ে যে খুব কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে এই সব পদের সঙ্গে ঘটনার বা মনের অবস্থার, তা নয়।

সেই কবেকার কথা। রহিম দপ্তরির কাছ থেকে টাকা পাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। ইপিন কেমন ঘাবরিয়ে গিয়েছিল। বিপিন স্থির করল একটা কিছু করতে হবে।

কিন্তু কি করবে? কোথায় কাজ পাবে? কে কাজ দেবে? কাকে বলবে?

গোয়েঙ্কা কলেজের বি কম ক্লাসে বিপিনের সঙ্গে যারা পড়তো তাদের কয়েকজন হৃতদরিদ্র সরকারি স্কলারশিপে পড়তো। তখনও রিফিউজি স্কলারশিপ ছিল, ফার্স্ট ডিভিশন পেলেই উদ্বাস্তু ছাত্রেরা পেত। গৃহকর্তা প্রভাসকুমার চলে আসেননি বলে ইপিন-বিপিন উদ্বাস্তুর সুবিধেটা একেবারেই পায়নি। তবে বহু উদ্বাস্তু ছেলেই স্কলারশিপটা পেত।

এছাড়া স্থানীয় ছাত্রেরা ছিল অধিকাংশই নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে, তখন একটা ধারণা ছিল কমার্স পড়লে তাড়াতাড়ি চাকরি হয় তাই বেশ কিছু ভালো ছেলে কমার্স নিয়ে পড়তো।

আর ছিল খুব উচ্চবিত্ত বাড়ির কিছু ছেলে, বড় বড় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বা চাটার্ড ফার্মের বাড়ির ছেলে, সোনার ঘড়ি, সোনার চশমা, বন্ধুবান্ধবের জন্যে দেদার পয়সা খরচ করতো, বাড়ির গাড়িতে করে কলেজে আসতো। এদের মধ্যে ভালোমন্দ দু'রকমই ছিল।

বিপিনের যা স্বভাব এদের কারও সঙ্গেই তেমন ভাব ছিল না। সে পিছনের দিকে একটা বেঞ্চিতে কিছু খুচরো ছাত্রের সঙ্গে বসতো তার মধ্যে একজন ছিল একটি মাদ্রাজি ছেলে বেণুগোপাল।

বেণুগোপাল কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে কলেজে আসতো। প্রথম প্রথম অন্য ছাত্রেরা এ নিয়ে একটু ঠাট্টা-তামাশা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বেণুগোপালের ভাব সমাহিত নির্বিকার গম্ভীর আচরণে তারা বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি।

বেণুগোপালের গায়ের রঙ ছিল মত্রকৃষ্ণ, মাদ্রাজিদের একরকম ঝলমলে কালো রঙ হয় সেইরকম। সে সবসময় ধবধবে ফর্সা জামাপ্যান্ট পরে কলেজে আসতো। কথা খুব কম বলতো, হুঁ-হাঁ ছাড়া বিশেষ কথা নয় এবং একাধিক অর্থসূচক ঘাড় ও মাথা ঝাঁকি দিত।

খুব মনোযোগ দিয়ে ক্লাস নোট নিত বেণুগোপাল। অনেক সময় বিপিন বেণুগোপালের খাতা থেকে সেই নোট টুকে নিত। সমস্ত ক্লাসের মধ্যে কিংবা বলা চলে কলকাতায় কলেজে পড়তে আসার পরে যা একটু বন্ধুত্ব ওই বেণুগোপালেব সঙ্গেই হয়েছিল বিপিনের।

মাঝে মাঝে বিপিনের সঙ্গে বেণুগোপাল বিপিনের মেসেও এসেছে কলেজ ছুটির পর হাঁটতে হাঁটতে। একদিন বেণুগোপালকে বিপিন কিছু না আশা করে এমনিই কথায় কথায় বাড়ি থেকে টাকা আসা বন্ধ হয়ে গেছে, একটু আর্থিক অসুবিধে দেখা দিচ্ছে—এ কথাটা জানালো।

বেণুগোপাল কিছু বলল না। চুপচাপ ঘাড় নেড়ে শুনে গেল।

বেণুগোপালের বাবা ইণ্ডিয়ান অডিট অ্যাণ্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিসেব লোক ছিলেন, কলকাতায় এ জি বেঙ্গলে তখন পোস্টিং। বোধহয় অ্যাডিশনাল অ্যাকাউন্টেট জেনালের পদে।

পরেব দিন রবিবাব সকালবেলা, মেসবাড়ির অফিস ঘরে একটা নড়বড়ে কাঁঠের চেয়ারে বসে বিপিন সেদিনেব আনন্দবাজাবে শিবরাম চক্রবর্তীব 'অল্পবিস্তব' পড়ছিল। কযেকদিন আগে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র পদ্মশ্রী উপাধি পেযেছেন। সেই সূত্রে বিমল রাযচৌধুরি নামে এক ভদ্রলোক অল্পবিস্তরে জানিয়েছেন, 'পয়সার চেয়ে নয়া পয়সা বড় নয়। ইন্সপেক্টরের চেয়ে সাব-ইন্সপেক্টব বড় নয়, শেয়ালের চেয়ে খেঁকশেয়াল বড় নয়, শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্রের চেয়ে পদ্মশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র বড় নন।' বিমলবাবুর বক্তব্য পদ্মশ্রী খেতাবে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কোন মানোন্নয়ন হয়নি।

প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে শিবরাম চক্রবর্তী খুব রসিযে জবাব দিয়েছেন, 'কিন্তু ভাই, পতির চেয়ে তো উপপতি বড়, পত্নীর চেয়ে উপপত্নী, দেবতার চেয়ে অপদেবতা।'

জবাবটা তেমন জমেনি, শিবরাম সাধারণত এর চেয়ে ভাল টিপ্পনি কাটেন। আলগোছে পাশের টেবিলে খবরের কাগজটা নামিযে দরজার দিকে তাকিযে দেখে চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকছে বেণুগোপাল।

এই ছুটির দিনে সকালবেলায বেণুগোপালকে দেখে একটু আশ্চর্য বোধ করলো বিপিন। উঠে গিয়ে সহপাঠীকে স্বাগত জানালো, 'কি ব্যাপার?'

বেণুগোপাল বললো, 'চল, বেরোই। কথা আছে।'

বিপিনের পাজামা, গেঞ্জি পরা ছিল। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে নিজের ঘরে ঢুকে একটা পাঞ্জাবি মাথায় গলিয়ে সে বেরিয়ে এল।

তখনও ওয়েলিংটনের নাম নির্মল চন্দ্র স্ট্রিট হয়নি, কার্জন পার্ক দ্বিখণ্ডিত হয়নি, নাম বদল হয়নি এসপ্ল্যানেডের।

ওয়েলিংটন স্ট্রিট ধরে হাঁটতে হাঁটতে ধর্মতলা হয়ে কার্জন পার্ক পর্যন্ত চলে এল দু'জনে। পথে ওয়েলিংটন-ওয়েলেসলির মোড়ে স্যাঙ্গুভ্যালির দোকানে দু'জনে দু'কাপ চা খেয়েছিল।

কার্জন পার্কে এসে পুরনো মেহগনি গাছের ছায়ায় একটা কাঠের বেঞ্চে দু'জনে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলো। তখনও কার্জন পার্কে ছুঁচোর কলোনি গড়ে ওঠেনি। কলকাতার খালি জায়গাগুলো ভবঘুরেদের আস্তানা হয়ে ওঠেনি।

পথে আসতে আসতেই বেণুগোপাল বিপিনকে দু'টি সুখবর দেয়।

প্রথম সুখবর হল, বেণুগোপালের বাবা বলেছিল যে 'এম এল ওঝা অ্যাণ্ড ব্রাদার্স' নামে চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি ফার্মে আশি টাকার একটা শিক্ষানবিশি কাজ বিপিন নিতে পারে, তবে কাজ করতে করতে বিপিনকে অন্তত বি কম-টা পাশ করে নিতে হবে। বিপিন রাজি থাকলে দু'তিন মাসের মধ্যে তাকে নতুন শিক্ষানবিশ নেওয়া হবে, ওঝা কোম্পানির মালিক মাখনলাল ওঝার সঙ্গে বেণুগোপালের বাবার ভালো সম্পর্ক আছে। তিনি ওঝা সাহেবকে কাল রাতেই

ফোন করেছিলেন। ওঝা সাহেব বলেছেন, 'আপনি সুপারিশ করলে আমি অবশ্যই নিয়ে নেব। তবে খুব খাটুনির কাজ। মেধা ও পরিশ্রম দুই-ই চাই।'

বেণুগোপালের দ্বিতীয় প্রস্তাব হল তার বোন উমাকে বাংলা পড়ানো। উমা তখন লেক গার্লসে পড়ে, পরের বছর স্কুল-ফাইনাল দেবে। এমনিতে ভালো ছাত্রী কিন্তু বাংলায় বড় কাঁচা। আর বাংলাই স্কুল ফাইনালে তার ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ।

উমাকে বাংলা পড়ানোর বিশেষ কিছু ছিলো না। সে জন্মেছিলো তামিলনাড়ুর গুডুর জেলার এক গ্রামে মাতুলালয়ে। মা, বাবা ভাইয়ের সঙ্গে বড় হয়েছে দক্ষিণ কলকাতায়। বান্ধবী, সঙ্গিনী, সহপাঠিনীরা প্রায় সবাই বাঙালি, বাসায় নিজেদের মধ্যে তামিল ভাষায় কথা হলেও বাইরে সে বাংলাতেই কথাবার্তা বলতো পথে ঘাটে, বাজারে হাটে।

একটু মিষ্টি টানে বাংলা কথা উমার মুখে বেশ ভালো শোনাতো। কিশোরী উমার প্রতি নব যুবক বিপিন যে প্রথম থেকেই আকর্ষণ বোধ করেছিলো তার একটা বড় কারণ হলো উমার মুখে বাংলা কথা, তার ভাঙা উচ্চারণ।

কালোর ওপরে উমার মুখে, চেহারায় একটা লক্ষ্মীশ্রী আছে। পাতলা ঠোঁট, নিখুঁত চিবুক, গভীর কালো চোখ। গায়ের রং ফর্সা না হলেও উমাকে কেউ অসুন্দরী বলতে পারবে না। সব সময়ে ফিটফাট, ধবধবে সাদা স্কার্ট, শাড়ি পরা আরম্ভ কবার পরে শুধুই সাদা শাড়ি কদাচিত হালকা নীল বা মেরুন রঙের, মাথার চুলে, খোঁপায় বা বেণীতে সুগন্ধ বেল বা মল্লিকার মালা, এমনকি উমার কপালে পর্যন্ত শ্বেতচন্দনের ফোঁটা কিংবা সাদা টিপ।

বিপিন উমার ঘোরে পড়ে গিয়েছিলো। সে মুখ ফুটে বিশেষ কিছু বলতে পারতো না আর সেই সদ্য সাবালক বয়সে বিপিনের বারবার মনে হতো ওইটুকু মেয়েকে কি-ই বা বলা যায়।

উমাকে বাংলা শেখাতে বিপিনের অবশ্য খুব একটা পরিশ্রম করতে হয়নি। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত বাংলা উমার মোটামুটি জানা ছিলো। কিন্তু সে নম্বর কম পেতো কারণ ব্যাকরণ, বাক্যরচনা এইসব যে প্রশ্নগুলোতে ছাঁকা নম্বর ওঠে সেগুলো মোটেই সুবিধে করতে পারতো না।

ব্যাকরণে বিপিনেরও যথেষ্ট অনীহা। সে নিজেও কখনো মন দিয়ে ব্যাকরণ পড়েনি। এবার উমার দৌলতে তার নিজেরও কিছু ব্যাকরণ শেখা হলো।

কমার্সের কোর্সে সাহিত্যের ওপরে কোনো জোর দেওয়া হয় না। কলকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হয়ে আধুনিক বাংলা গল্প-উপন্যাস-কবিতা যা কিছু হাতের কাছে পেয়েছে পড়েছে। যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত', রঞ্জনের 'শীতে উপেক্ষিতা' তখনো লোকে পড়ছে। বিভূতিভূষণ ছাড়া কল্লোলের লেখকেরা প্রায় সবাই বেঁচে, দুহাতে লিখছেন সবাই।

অমিয় চক্রবর্তীর পারাপার আর পালাবদল কলেজ স্কোয়ারে সিগনেট বুকশপ থেকে হাতখরচ বাঁচানো পয়সা থেকে কিনেছিলো বিপিন। এরই মধ্যে বের হলো বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা।' এবং পরে পরেই আবু সৈয়দ আইয়ুবের 'পঁচিশ বছরে প্রেমের কবিতা।'

এইসব কবিতার রূপে-গন্ধে বিপিন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলো। সেই আচ্ছন্নতায় উমাও জড়িয়ে গিয়েছিলো।

এমনিতে সপ্তাহে দু'দিন পড়ানোর কথা ছিলো বিপিনের, মাইনে পঁচিশ টাকা। সোম ও শুক্রবারে যেতো। তখনকার হিসেবে মাইনে কম ছিলো না। কিন্তু কিছুদিন পরে শিক্ষানবিশির কাজটা যোগাড় হয়ে গেলো, উমার বাবারই কল্যাণে।

শিক্ষানবিশি শুরু হওয়ার পরে বিপিন প্রথমে কলেজের পড়ার পাট চুকিয়ে দিলো। ভাঙা

বছরে কোনো সান্ধ্য কলেজেও জায়গা পেলো না। ওঝা কোম্পানিতে সন্ধ্যার পরেও কখনো থাকতে হতো, সেই সময়েই কর্তারা আসতেন। সপ্তাহের কাজের দিনে উমাকে পড়াতে যাওয়ার ফুরসত বিশেষ মিলতো না। তাই পরে পর পর দু'দিন শনিবার আর রবিবার সন্ধ্যায় উমাকে পড়াতে যেতো।

শনিবার সন্ধ্যায় উমার কি একটা অসুবিধে ছিলো। পরে বিপিন জেনেছিলো ও দিন উমা গীতবিতানে গান শিখতে যেতো। কিন্তু বিপিনকে কিছু বলেনি, বাসায় পরীক্ষার পড়ার চাপ বলে উমা গান শেখা ছেড়ে দিলো।

শনিবার আর রবিবার সপ্তাহে মাত্র দু'দিন সেও পরপর দু'দিন। আর বাকি পাঁচদিন সন্ধ্যাবেলা সোম থেকে শুক্রবার কাজের জায়গা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে বিপিনের ইচ্ছে হতো যাই উমাদের বাড়ি। উমাকে পড়াতে যাবো না, বেণুগোপালের সঙ্গে আড্ডা দিতে যাবো। নিশ্চয় উমার সঙ্গে দেখা হবে, উমাই কফির গেলাস এনে দেবে।

উজ্জ্বল স্টেনলেস স্টিলের গেলাসে ফেনাভরা ঘন কফি। একটু মিষ্টি কম, একটু বেশি কড়া। উমা কতদিন জিজ্ঞাসা করেছে, 'স্যার, আর একটু চিনি দেবো?' বিপিন আপত্তি করেনি।

দাদার বন্ধু বলে তাকে বিপিনদা কিংবা স্রেফ 'মাস্টারমশায়' বলে সম্বোধন করতে পারতো উমা, স্কুলের রীতি মেনে বিপিনকে সে স্যার বলতো। উমার মুখে এই 'স্যার' সম্বোধন বিপিনের বেশ ভাল লাগতো। সবচেয়ে মজার কথা এই যে পরে বিপিন যখন একটা দক্ষিণী ব্যাঙ্কের শ্রীরামপুর শাখায় ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হয়ে এলো তখন উমা সেখানে ক্যাশ সেকশনে কাজ করছে। ক্যাশ সেকশনের পক্ষে চমৎকার কাজের মেয়ে, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, ধীর, স্থির, গোছানো।

ওঝাদের হিসেবের ফার্মে কাজের চাপ ছিলো প্রচুর কিন্তু হিসেব নিকেশের কাজটা বিপিন মোটামুটি বুঝে গিয়েছিলো। মাঝে মাঝে ক্লায়েন্টের প্রয়োজন একটু আধটু গোঁজামিল দিতে হতো তবে তাতে বিপিনের দায় ছিলো না, সই তো করতেন কর্মকর্তারা।

শিক্ষানবিসির কাজ করতে করতে পরের বছর নৈশ কলেজে আবার ভর্তি হয়ে যায় বিপিন। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পরে আর বিশেষ দেখা হয়নি উমার সঙ্গে বিপিনের। পরীক্ষার দিন পনেরো আগেই পড়ানো ছেড়ে দিয়েছিলো কিন্তু যেতে খুব ইচ্ছে করতো। কিন্তু সঙ্কোচবশত আর যায়নি। তবে সে গেলে উমা যে খুব খুশি হতো সেটা সে অনায়াসেই টের পেতো।

উমার জন্য এককে সময় বিপিনের মন খুব হুহু করে উঠতো। এই বয়েসে যেমন হয় আর কি। মা-বাবা, বাড়ি ছেড়ে প্রায় অপরিচিত এক শহরে অনাত্মীয় মেসবাড়িতে অল্প বয়েসের দিনগুলি উমার অনুসঙ্গে একটা অবলম্বন পেয়েছিলো। ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন সমাজের এক কৃষ্ণা বালিকার আঁখি পল্লবে বিপিন নিজের মনের ছায়া দেখেছিলো।

কিন্তু সে বেপরোয়া হতে পারেনি। উমাদের বাড়িতে ফোন ছিলো, আবহাওয়া ছিলো যথেষ্ট খোলামেলা। কোনো সময়ে একটা ফোনও সে করেনি। একটা চিঠিও লেখেনি উমাকে।

পরীক্ষার আগে একবার উমার সঙ্গে দেখা করতে যাবে ভেবেছিলো বিপিন, ঠিক করেছিলো উমাকে একটা কলম কিনে উপহার দেবে কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি। বর্ধমান জেলায় একটা সাবেকি ওয়াকফ এস্টেটের অডিট করতে যেতে হয়েছিলো। ফিরে আসে পরীক্ষার আগের দিন সন্ধ্যা পার হয়ে, সেদিন আর যাওয়া সম্ভব হয়নি।

পরের দিন সকালে হ্যারিসন রোডে গিয়ে ধর ব্রাদার্সের দোকান খোলার পরে কলম কিনে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে সে যখন উমাদের বাড়িতে পৌঁছালো তখন সকাল সোয়া ন'টা বাজে। উমাদের বাড়ির সদর দরজায় তালা। বাড়ির সবাই মিলে উমাকে পরীক্ষার হলে পৌঁছাতে গেছে।

সেদিন খুব আশাহত হয়েছিলো বিপিন। মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিলো তার। ওঝা কোম্পানির অফিস খুলতো বেলা ন'টায়। হাজিরার খুব কড়াকড়ি সেখানে। তাছাড়া সেদিন সকালেই বর্ধমানের ওয়াকফ এস্টেটের হিসেব নিয়ে জুনিয়র ওঝার সঙ্গে বসার কথা, সেই যে কাজে বাইরে গিয়েছিলো।

সেদিন মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে খরবায়ু বয় বেগে দক্ষিণ কলকাতার অগ্নিদাহ ফুটপাথে বিপিন প্রায় একটা পর্যন্ত এলোমেলো হাঁটাহাঁটি করেছে, একবার ভাবলো টিফিনের বিরতির সময় উমার একটা খোঁজ নেবে, বিশেষ করে আজ প্রথম দিনই বাংলা পরীক্ষা, এবেলা ওবেলা প্রথম পত্র দ্বিতীয় পত্র, গৃহশিক্ষক হিসেবে তার নিশ্চয় এ ব্যাপারে একটা দায়িত্ব আছে।

কিন্তু সেটাও বিপিনের পক্ষে সম্ভব হলো না। তার খেয়াল হলো যে উমার কোথায় সিট পড়েছে সেটাও সে জানে না। নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোনো মেয়েদের ইস্কুলে সিট পড়েছে, তবু হাবা-উদ্দেশ্যে কোথায় তাকে খুঁজবে।

সেদিন কাজে যাওয়ার আর চেষ্টা করেনি বিপিন। শিক্ষানবিশি শুরু করার চার মাসের মধ্যে এই তার প্রথম কামাই। সারা সকাল রাস্তায় ঘুরে ঘুরে খালি পেটে বেশ কয়েক কাপ চা খেয়ে তার পেটটা জ্বালা করছিলো।

গত চার মাসে সকালে শুধু এক কাপ চা খেয়ে মেস থেকে বেরোনো অভ্যাস হয়ে গেছে বিপিনের। এম এল ওঝা অ্যাণ্ড ব্রাদার্সের অফিসে কাজের ঝামেলা আছে, খাটুনিও খুব কিন্তু কতকগুলো রীতি আছে, বেশ ভালো ব্যবস্থা।

সকালে অফিস শুরু হওয়ার পর সাড়ে ন'টা নাগাদ বড় বড় শিরতোলা কাঁচের গেলাসে গলা পর্যন্ত ভর্তি চা দেয়, বেশি-দুধ, বেশি মিষ্টি, বেশি ঘন, সেই সঙ্গে চায়ের কোয়ালিটিও উচ্চমানের। ওঝাদের মক্কেলদের মধ্যে কয়েকটি দার্জিলিংয়ের চা বাগান আছে, তারাই কয়েকমাস পরপর এক পেটি চা পাঠিয়ে দেয়, বহুদিন ধরে চলে আসছে প্রথাটা।

চায়ের সঙ্গে কাগজের ঠোঙায় করে চারটে থিন অ্যারারুট কিংবা সার্কাস বিস্কুট। ওঝা কোম্পানির মালিকেরা সবাই এক বংশের। ঠাকুর্দা, বাপ-জ্যাঠা, নাতি—বিপিন থাকতে থাকতে এক নাতনিও যাতায়াত শুরু করেছিলো কিন্তু বুড়ো ওঝা সেটা পছন্দ করেননি। তাঁর নিজের কোনো পুত্রসন্তান ছিলো না। কিন্তু মেয়েকে অংশীদার করেননি, ভাইপোদের করেছিলেন। মেয়ে ব্যবসায় ঢুকলে তার বিয়ের পর জামাই আসবে, দৌহিত্র আসবে। অনেক সময়েই সে সব বড় অশান্তির ব্যাপার। বুড়ো ওঝা মানে মূল ওঝা এম এল ওঝা, মাখনলাল ওঝা এসব খুব মেনে চলতেন। মেয়ে-জামাইকে যা ইচ্ছে দিতে চাও দিয়ে দাও, কিন্তু বংশের ব্যবসায়ে এনো না।

সে যা হোক সে সময়ে মাখনলাল ওঝার বয়েস আশি পেরিয়ে গেছে। কিন্তু কড়া নজর ছিলো তাঁর, শুধু কাজে-কর্মে নয়, সব কিছুতে। অফিসে থাকলে লক্ষ্য রাখতেন কেউ বিস্কুট না খেয়ে ফেলে রেখেছে কিনা। খেতে ইচ্ছে না থাকলে বিপিন বুড়ো ওঝার ভয়ে না খাওয়া বিস্কুটগুলো ড্রয়ারে রেখে দিতো, মেসে ফেরার সময় পকেটে ভরে নিয়ে যেতো।

দুপুর বেলার খাবারও আসতো ওঝাদের বাড়ি থেকে। অফিসে লোক কম নয়, পনেরো-বিশ জন হবে। ওঝাদের বাড়ির মেয়েরা খাবার তৈরি করে পাঠাতো। ভঁয়সা ঘি মাখা চাপাটি আর শুকনো সবজি, সঙ্গে মিষ্টি আচার। সেটাই ছিলো মধ্যাহ্ন ভোজন। এই খাবারে বেশ রুচি হয়েছিলো বিপিনের।

আজ কিন্তু কিছু খাওয়া হয়নি। কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন সামনে। তার কাছেই হাজরার মোড়। তার পাশে পরপর কয়েকটা পাইস হোটেল আছে, কোনোটার নাম গ্র্যাণ্ড হোটেল, আবার

কোনোটা গ্রেট ইস্টার্ন।

কালিদাস পতিতুণ্ডি লেনের ওই দু নম্বর গ্র্যাণ্ড হোটেলে আগে দুয়েকবার খেয়েছে বিপিন। সেই যখন অল্প বয়েসে বাবা মায়ের সঙ্গে কলকাতায় বেড়াতে এসে কালীঘাট মন্দিরে এসেছে। সকাল সকাল মন্দিরে এসে প্রণাম করে, মন্দিরের চারদিকের হকারদের কাছ থেকে শাঁখা, পেতলের লক্ষ্মী, সরস্বতী অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে এই সব স্মৃতিকণা কিনতেন, সেই সময়টা প্রভাসকুমার ইপিন-বিপিনকে নিয়ে পাশেই হালদারপাড়া রোডে তাঁর জ্যাঠতুতো ভাইয়ের বাড়ি থেকে ঘুরে আসতেন। বহুদিন আগের কি এক পুরনো মান-অভিমানের কারণে স্মৃতিকণা কখনো সে বাড়িতে যেতে চান না।

হালদারপাড়া রোড থেকে প্রভাসকুমার ইপিন-বিপিনকে নিয়ে মন্দির চত্বরে ফিরে এসে হকারদের হাত থেকে স্মৃতিকণাকে মুক্ত করতেন। সে খুব সোজা ব্যাপার ছিলো না, কারণ ইতস্তত হকাররা বুঝে ফেলেছে স্মৃতিকণা খুব শাঁসালো খদ্দের। তাছাড়া সকালবেলায় বাজারে খদ্দেরও কম।

মন্দিরের ওখান থেকে এসে হাজরার মোড় থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে চিড়িয়াখানা, এটাই ছিলো কলকাতা ভ্রমণের রুটিন। এরই মধ্যে ওই কালিদাস পতিতুণ্ডি লেনে গ্র্যাণ্ড হোটেলে ভাত-মাছ খেয়ে নেওয়া হতো।

গ্র্যাণ্ড হোটেলে বাবা-মার সঙ্গে বার কয়েক খেয়েছে বিপিন। আজ দুপুরে সেখানেই খেতে ঢুকলো।

বাইরের গনগনে রোদের আঁচ থেকে গ্র্যাণ্ড হোটেলের পুরনো মোটা দেয়াল, জানলা বন্ধ আধো আবছায়া ঘরে ঢুকে বেশ আরাম লাগলো বিপিনের। ওপরের সিলিং থেকে ঘরের দু'পাশে দুটো চার ব্লেডের আদ্যি কালের পাখা ঘুরছে, গোটা কয়েক মিয়োনো বাল্ব ঘরের মধ্যে মৃদু আলো ছড়াচ্ছে।

ঘরের আরামটা বিপিনের ভালো লাগলো। সকাল বেলায় উমার সঙ্গে দেখা না হওয়ার দুঃখটাও যেন একটু প্রশমিত হয়েছে। বিপিন ছোটবেলায় শুনেছে তার ঠাকুমা কথায় কথায় বলতেন, 'শরীর বড় না মন বড়?'

গ্র্যাণ্ড হোটেল এই জাতীয় পাইস হোটেলের মত খুব অপরিচ্ছন্ন নয়। কাঠের পুরনো চেয়ার টেবিলে কলাপাতায় খাওয়া, সঙ্গে মাটির ভাঁড়ে জল। লেবু, পেঁয়াজ, লঙ্কা এক্সট্রা, তার জন্যে দু পয়সা বেশি লাগবে।

ভাত ডাল তরকারি মাছের ঝোল লেবু-লঙ্কা সুদ্ধ সাড়ে আট আনা লাগলো বিপিনের। মাছটাও খারাপ নয়, বেশ বড় একটা আস্ত পারসে মাছ।

বহুদিন পরে খুব পরিতৃপ্তি সহকারে খেলো বিপিন। মেসের রান্না কেমন পানসে, জোলো। পাইস হোটেলের রান্না পানসে হলে খদ্দের আসবে না।

সপ্তাহে পাঁচদিন দুপুরবেলায় ওঝা কোম্পানিতে চাপাটি-চাটনি সুস্বাদু হলেও একঘেয়ে লাগছিলো। আজ একটু মুখটা বদলালো।

খেয়ে উঠে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরোবার ইচ্ছে ছিলো না বিপিনের, ধীরে-সুস্থে সময় নিয়ে জিরিয়ে বের হবে। আজ তার খুব তাড়া নেই। সে ঠিক করেছে বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ হাঁটতে হাঁটতে উমাদের বাড়িতে যাবে, উমার সঙ্গে দেখাও হবে পরীক্ষা কেমন হলো সেটাও জানা যাবে। সেই সঙ্গে নতুন কেনা কলমটাও দিয়ে আসবে, না হয় একদিন বাদে কাজে লাগবে।

কিন্তু গ্র্যাণ্ড হোটেলে বেশিক্ষণ বসতে পারলো না বিপিন। দুপুরের এই সময়টায় খদ্দেরদের খুব ভিড় হয়। আশেপাশের দোকানদারেরা, ঠিকে লোকেরা, ভ্রাম্যমাণ সেলসম্যানেরা খেতে

আসে।

ক্যাশ কাউন্টারে হোটেলের ম্যানেজারের সামনে একটা চেয়ারে বসে বিপিন মৌরি চিবোচ্ছিল হোটেলের প্লেট থেকে তুলে, ভিড় বাড়তে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।

দুপুর উতরিয়ে এসেছে। বছরের প্রথম পিচ গলতে শুরু করেছে। হাওয়ায় গরম ধোঁয়া। রোদে কাসুন্দির মত ঝাঁঝ।

বিপিন একটু এগিয়ে হাজরার মোড়ে গিয়ে একটা মিষ্টি পান কিনে খেলো। তারপর মোড় পেরিয়ে ওপারে হাজরা পার্কে গিয়ে ঢুকলো।

পার্কের পশ্চিম দিকটায় একটু ছায়া আছে। কয়েকটা সোনাঝুরি, কৃষ্ণচূড়া, একটা ছাতিম গাছ। ছাতিম গাছের বেঞ্চিতে একটু ফাঁকা জায়গা ছিলো। একটা লোক গামছা মাথায় দিয়ে ঘুমিয়ে, তার পায়ের কাছে একটু গুটিয়ে কাঠের বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে বিপিন বসলো।

হাতঘড়িতে দেখলো প্রায় আড়াইটা বাজে। এখানে একটু জিরিয়ে, কোথাও এক কাপ চা খেয়ে উমাদের বাড়িতে যাওয়া যাবে। হাতে অনেক সময় আছে, কোনো তাড়া নেই। উমাদের বাসা কাছেই সতীশ মুখার্জি রোডে, কালীঘাট প্যার্কের পাশে।

দূরের গাছটা থেকে দুপুরের ঘূর্ণি বাতাসে সোনাঝুরি ফুল ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে চারদিকে, বিপিনের মাথায়, পায়ের কাছে। একটু ঠাণ্ডা হাওয়া যেন আসছে কোন্ দিক থেকে।

ক্লান্তিতে, আবেশে চোখ জুড়ে এসেছিলো বিপিনের, হঠাৎ শোঁ শোঁ শব্দে ঘুম ভেঙে দেখে আকাশ অন্ধকার, দমকা হাওয়া উঠেছে, প্রবল ভাবে বৃষ্টি আসছে। বছরের প্রথম কালবৈশাখি।

জোরে দৌড়েও শেষ রক্ষা করতে পারলো না। আশুতোষ কলেজেরর মধ্যে ঢুকে আশ্রয় নেওয়ার আগেই সম্পূর্ণ ভিজে গেলো। ঝড়-বাদল সন্ধ্যার আগে থামলো না। উমাদের বাড়িতে আর যাওয়া হলো না।

মেসে ফিরবার পথে একটা টু-বি বাসের দোতলায় উঠে সিঁড়ির পাশে খোলা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বাইরের বৃষ্টি-ভেজা শহরের দিকে তাকিয়ে বিপিনের মনে পড়লো, 'বৃষ্টি-ভেজা বাড়ির মত রহস্যময়, তোমার হাতে আছে আমার একটু সময়।' কে যেন লিখেছে এই কবিতাটা?

তখনো বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে।

উমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি বিপিনের। অথচ প্রত্যেক দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে উমার কথা মনে পড়তো তার। উমাদের বাড়িতে গিয়ে উমার সঙ্গে দেখা করতে তার খুব ইচ্ছে হতো, মনের মধ্যে সদা সর্বদা ঘুর পাক করতো ইচ্ছেটা কিন্তু বিপিন নিজেই পুরণ হতে দেয়নি। একদিন টিফিনের সময় উমার দাদার সঙ্গে গোয়েঙ্কা কলেজে দেখা করতে গিয়েছিল, কিন্তু বেণুগোপাল কলেজে আসেনি। বেশ কয়েকদিন ধরে আসেনি। একজন বললো, 'জ্বর হয়েছে।'

পুরানো সহপাঠীরা বিপিনকে অনেকদিন পর দেখে খুব খুশি হলো। চাকরির বাজার খুব খারাপ, এর মধ্যে বিপিন যে একটা চাকরি পেয়েছে এটা যেন সকলেরই পক্ষে আনন্দের কথা। প্রথম যৌবনের ঈর্ষাহীন দিনগুলি।

বিপিন অনেকক্ষণ গল্প করলো বন্ধুদের সঙ্গে। রাস্তার পাশে কাঠের বেঞ্চিতে বসে যোগেশবাবুর চায়ের দোকানে চা খেলো। চায়ের দাম বিপিন মিটিয়ে দিলো কারণ সে একাই উপার্জন করে।

যোগেশবাবুর দোকানের পাশেই ছোট প্যাসেজ। সেই প্যাসেজ গিয়ে পিছনে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটে পড়েছে। যার প্রচলিত নাম হাড়কাটা গলি, নিষিদ্ধ পল্লী। দিনে দুপুরে সেখানে মেয়েরা সারি সারি দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে, খদ্দেরের জন্যে। চা খাওয়ার পরে বন্ধুদের সঙ্গে একবার হাড়কাটা গলির মধ্যে দিয়ে হেঁটে এলো। নিষিদ্ধ এলাকায় এই ভ্রমণ এবং শুধুই ভ্রমণ, আর কিছু নয় বেশ উত্তেজনাপ্রদ।

ওঝা কোম্পানির অফিসে টিফিনের সময় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। কাছেই চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের মোড়ের ডানদিকে অফিসের বাড়িটা। একটু পুরনো পাঁচতলা বাড়ির একতলায় অফিস।

প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের মোড়ে ফিরে এসে কথা বলতে বলতে রূপম সিনেমার টিকিট কাউণ্টারের ওপরে দেয়াল ঘড়িটায় চোখ পড়লো। সোয়া দুটো বেজে গেছে। এখান থেকে অফিস মাত্র তিন-চার স্টপ, তবু তাড়াতাড়ির জন্য সামনের দিক দিয়ে আসা একটা শ্যামবাজার-ডালহৌসি ট্রামে একলাফে উঠে পড়লো বন্ধুদের 'টা-টা-বাই-বাই' করে, তখন খুব চালু হয়েছিলো কথাগুলো। কবে অনেক কিছুর মতই একা একাই বাতিল হয়ে গেছে।

সামনের সপ্তাহ থেকে কলেজে গরমের ছুটি হবে। গরমেব ছুটিতে বেণুগোপালেরা দেশে যাবে, উমাও সেই রকম বলেছিলো। তার মানে এখন মাস দেড়েক উমার সঙ্গে দেখা হবে না। তার পরেও হবে কিনা ঠিক নেই।

অবশ্য আজকালের মধ্যে গেলে অসুস্থ বেণুগোপালকে দেখে আসা হয়, উমার সঙ্গেও দেখা হয়ে যায়।

পরের দিন বিকেলে অফিস ছুটির পর এসপ্ল্যানেডে গিয়ে একটা ট্রামে করে কালীঘাট পার্কের স্টপে নেমে সতীশ মুখার্জি রোডে উমাদের বাসায় গেলো। বেণুগোপালের জ্বর ছেড়ে গেছে। খারাপ ধরনের ডেঙ্গু হয়েছিলো। এখনো বেশ দুর্বল।

কিন্তু উমার সঙ্গে দেখা হলো না।

উমা বাসায় নেই।

জীবনে প্রথম বড় পরীক্ষা শেষ হওয়ার আনন্দের দিন চলছে। বেণুগোপাল বললো উমা বান্ধবীদের সঙ্গে বিকেল চারটেয় নিউ মার্কেটে গেছে। সেখান থেকে টিকিট পেলে ছটার শোয়ে গ্লোবে 'রোমান হলিডে' দেখে ফিরবে।

টিকিট নিশ্চয়ই পেয়েছিলো। কারণ দু গেলাস কফি আর দুপ্লেট ডালবড়া খেয়ে বেণুগোপালের বাড়ি থেকে বিপিন যখন বেরোলো তখন রাত প্রায় সাড়ে সাতটা।

বসে বসে বেণুগোপালেব সঙ্গে অনেক কথা হলো। বেণুগোপালই বললো বিপিন শুনে গেলো।

বেণুগোপালের বাবা সরকারি কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন। মাদ্রাজের একটা ব্যাঙ্কে যোগদান করছেন। মাইনে প্রায় দ্বিগুন। বেণুগোপালেরা সবাই এখান থেকে মাদ্রাজ চলে যাচ্ছে। তবে উমা, বেণুগোপাল সব সেখানেই পড়াশুনো করবে। তবে এখনই নয়, সব কিছু গুটিয়ে কলকাতার বাসা তুলে নিতে আরো এক বছর লাগবে। এর মধ্যে বেণুগোপালকে বি কম পরীক্ষাটা পাশ করে নিতে হবে।

বেরোনোর মুখে বেণুগোপাল বিপিনকে বললো 'দাঁড়া। তোর একটা জিনিস আছে।'

এই বলে ভেতরের ঘরে গিয়ে একটা বইয়ের প্যাকেট নিয়ে এলো, এনে বললো, 'এ বইগুলো

তোর। উমা আলাদা করে রেখে গেছে।' তারপরেই বইগুলো বিপিনের হাতে দিয়ে বললো, 'এই সবগুলো বই-ই কবিতার বই? আমি আবার বাংলা কিছু বুঝি না।'

বেশি নয়, গোটা পাঁচেক বই। দুটো অমিয় চক্রবর্তীর। বোধহয় 'পালা বদল' আর 'পারাপার'। সেই সঙ্গে জীবনানন্দের 'বনলতা সেন', কয়েক বছর আগের নতুন সিগনেট সংস্করণ। আরো দুটো চটি বই একটা নরেশ গুহের 'দুরন্ত দুপুর'। অন্যটাও ওই রকম কি একটা নতুন কবিতার বই।

বইগুলো নিয়ে কিছুক্ষণ থেমে থেকে তারপর কি যেন ভেবে কিংবা কিছুই না ভেবে বিপিন সামনের টেবিলের ওপরে বইগুলো রেখে বললো, 'এগুলো আজ থাক। পরে একদিন নিয়ে যাবো।'

বলা বাহুল্য, পরে আর বইগুলো আনতে বিপিনের যাওয়া হয়নি। তার জন্য তার দুঃখ নেই। ওগুলো সে অনেক আগেই মনে মনে উমাকে উপহার দিয়েছে।

বোধহয় পরের সপ্তাহেই বেণুগোপালেরা দেশে চলে গেলো।

সে বছর কলকাতায় গ্রীষ্ম খুব প্রখর ও দীর্ঘ ছিলো। তবে তখন লোডশোডিং ছিলো না। তা হলেও, দুয়েকটা আচমকা কালবৈশেখী ছাড়া, টানা রোদে পোড়া দিন। দুই দফায় একশো দশ-এগারো সেন্টিগ্রেড উত্তাপে টানা পাঁচ-সাতদিন গেলো। বৃষ্টি এলো একেবারে জৈষ্ঠ্যের শেষে। প্রায় আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে।

বৌবাজার স্ট্রিটে বিপিনদের মেসবাড়ির সামনের রাস্তার ফুটপাথে সকাল সন্ধ্যা বেলফুল, মল্লিকার মালা, নিয়ে বসে থাকে ফুলওয়ালারা। গ্রীষ্মের সকাল সন্ধ্যা বিভোর হয়ে যায় সাদা ফুলের ঘ্রাণে।

এবং উমাকে মনে পড়ে যায় বিপিনের, যে কিশোরীটি চুলে সাদা ফুলের মালা জড়িয়ে সন্ধ্যাবেলায় তার জন্যে বইখাতা খুলে অপেক্ষা করতো।

উমা বাংলা প্রায় ভালমতো বলতে পারতো, ওই একটু যা দক্ষিণী টান ছিলো। তাতে আরো মিষ্টি শোনাতো। পড়তেও পারতো বেশ ভালোই। না পারার কথা নয়, অল্প বয়েস থেকে পড়ে আসছে। উমার অসুবিধে ছিলো লেখা নিয়ে। লেখার ব্যাপারে জড়তা ছিলো তার কলমে। সে সব কতটা দূর করতে পেরেছিলো বিপিন ভেবে দেখেনি, কিন্তু উমার মনে সে কবিতার নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। বিপিনের দেওয়া কবিতার বইগুলোর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা তার কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিলো।

বৃষ্টি শুরু হয়ে যাওয়ার দিন সাতেক পরে একদিন দুপুর থেকে তুমুল বৃষ্টি। ফেরার পথটুকু, অফিস থেকে মেস পর্যন্ত, বিপিন ছুটির পরে সাধারণত পায়ে হেঁটেই ফেরে। যত ঝড়-বৃষ্টি রাস্তায় গোলমাল হোক না কেন অফিস ছুটির পরে অফিসে এক মুহূর্তও বসে থাকতে বিপিনের ভালো লাগে না। বিশেষ কোনোদিন কাজে কর্মে আটকিয়ে গেলে কেমন হাঁফ ধরে যায় তার।

সে দিনও অফিস ছুটি হওয়ার পরেও বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। কখনো ঝিরঝিরে কখনো বেশ জোরে। বর্ষার দিনে যেমন হয় আর কি।

বিপিনের ছাতা ব্যবহার করার অভ্যাস নেই। বৃষ্টি মাথায় করেই সে রাস্তায় বেরিয়ে পরলো। একটু ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজতে মন্দ লাগে না। কিন্তু একটু পরেই ঝমঝম করে বৃষ্টি এলো। বিপিন সেটা উপেক্ষা করে একদম ভিজে মেসে ফিরে এলো।

পূবদিক থেকে একটা ঠাণ্ডা বাতাস জোরে বয়ে আসছিলো, বেশ একটু শীত শীত করছিলো বিপিনের। তাড়াতাড়িতে মেস বাড়ির দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে এক ঝলক ভেজা ফুলের গন্ধ নাকে এলো। ফুটপাথের ফুলওয়ালারা বৃষ্টির ছাঁট এড়াতে ও বাড়ির সিঁড়ির নিচে এসে

আশ্রয় নিয়েছে। অনেক রাত পর্যন্ত ফুলওয়ালারা রাস্তায় থাকে। প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের যাত্রীরা অনেকে এখান থেকে জুঁই ফুল, বেল ফুলের মালা কিনে নিয়ে যেতো। এই সব ফুলের গন্ধে কেমন একটা নিষিদ্ধ যৌন মাদকতা।

ভাঙা মেসবাড়ির উঠোন থেকে নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। ছাদের কার্নিশ চুঁইয়ে বৃষ্টির জল পড়ছে কাঠের সিঁড়িতে। সিঁড়িটা পিছল হয়ে আছে। সাবধানে দোতলায় উঠতে গিয়ে বিপিনের চোখে পড়লো পুরানো কপাট খোলা ডাকবাক্সটায় একটা ফিকে নীল রঙের নিঃসঙ্গ ইনল্যাণ্ড লেটার পড়ে রয়েছে।

টাঙ্গাইল থেকে মা-বাবার চিঠি আসা ছাড়া বিপিনের তেমন একটা চিঠিপত্র আসে না। কিন্তু আজ বিপিনের কেমন যেন মনে হলো চিঠিটা তার।

সে একটু ফিরে ডাকবাক্সের ভেতর থেকে চিঠিটা তুলে নিলো। চিঠিটা বৃষ্টির জলের ছাঁটে একটু ভেজা ভেজা। চিঠিটা হাতে নিয়ে দোতলায় উঠে নিজের ঘরের দরজায় তালা খুলে, আলো জ্বালিয়ে বিছানার ওপরে চিঠিটা রাখলো।

চিঠিটা উমা মাদ্রাজ থেকে লিখেছে। উমাকে বিপিন কখনো তার ঠিকানা দেয়নি। কিন্তু কবিতার বইগুলোতে তার নাম ঠিকানা লেখা ছিলো নিশ্চয়ই, সেখান থেকে ঠিকানা নিয়েছে।

প্রত্যেকদিনই ভাবে, অবসরে-নির্জনে, ঘুমোনোর আগে, ঘুমভাঙার পরে, একা একা কিংবা ভিড়ের মধ্যে উমার কথা ভাবে বিপিন। আঠারো বছর বয়েসের ভাবনা সে সব। কিন্তু আজ কয়েকদিন ধরে একটা বাস্তব সমস্যা দেখা দিয়েছে।

আজ শুক্রবার, গত সোমবার দিন স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে।

উমার রেজাল্ট কেমন হলো সে নিয়ে উৎকণ্ঠা রয়েছে বিপিনের মনে। কিন্তু উমার রোল নম্বর তার কাছে নেই। রেজাল্ট যেদিন বেরিয়েছে তার পরদিন সঙ্কোচ কাটিয়ে উমাদের বাড়িতে সন্ধ্যার পরে গিয়েছিলো বিপিন। কিন্তু সে বাড়ির সদর দরজার ওপরে নিচে বিরাট তালা ঝুলছে। ভেতরের দিকের জানালা দরজা সব বন্ধ। তার মানে বাড়ির সবাই মাদ্রাজে।

বিপিনের একবার মনে হয়েছিলো দুপুরের দিকে উমার ইস্কুলে গিয়ে খোঁজ নেবে। পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোলে এ রকম কত লোকেই তো খবর নেয়। কিন্তু নিজের ওপর খুব ভরসা হয়নি বিপিনের, কেমন অস্বস্তি বোধ করেছে, ইস্কুলে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তুমি কে?

একটু পরে ভিজে জামা কাপড় ছেড়ে, হাত-পা মাথা মুছে, চুল আঁচড়িয়ে বিছানার ওপরে ধীরে সুস্থে বসে উমার চিঠিটা হাতে নিলো।

রয়াল ব্লু কালিতে লেখা চিঠিটা জলের ছোঁয়া পেয়ে জায়গায় জায়গায় চুপসিয়ে গেছে কিন্তু পড়া যাচ্ছে। উমার হাতের লেখা হরফগুলো বড় বড়, বেশ যত্ন করে অনেক সময় নিয়ে চিঠিটা লেখা। উমা লিখেছে,

১৭/২২ মাউন্ট রোড, মাদ্রাজ
২২ জুন, ১৯৫৯

স্যার, আমি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছি। কলকাতা থেকে বাবার অফিসের একজন টেলিগ্রাম করে জানিয়েছে।

বাংলায় কত পেলাম, জানি না। নিশ্চয় ভালো পাইনি।

এখনো মার্কসিট আমার কাছে আসেনি। মার্কসিট পেলে আপনাকে জানাবো।

আমি আর কলকাতায় যাচ্ছি না, এখানকার কলেজেই ভর্তি হচ্ছি।
আজ দু-দিন হলো এখানে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। কলকাতার কথা মনে হচ্ছে।
দেখা হবে।

ইতি শ্রীচরণেষু
উমা

N.B.

"দূরে এসে ভয়ে থাকি
সে হয়তো এসে বসে আছে
হয়তো পায়নি ডেকে,
একা ঘরে জানালার কাঁচে
বৃষ্টির বর্ণনা শুনে
ভুলে গেছে এটা কোন সাল"...

চিঠি পড়ে বিপিনের মন একটু উথাল-পাথাল হলো।

উমা ভালো রেজাল্ট কববে, প্রথম বিভাগে পাশ করবে এটা বিপিন প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলো।

না বুঝে হোক কিংবা বুঝে, নিতান্ত মজা করার জন্যে চিঠির শেষে ইতি শ্রীচরণেষু একত্র করে ফেলেছে উমা। এবকম ঘুলিয়ে ফেলার মেয়ে সে নয়, কৌতুক করেই এটা করেছে। সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সবচেয়ে মারাত্মক চিঠির শেষের কবিতার অংশটুকু। অনেকগুলো কবিতার মধ্যে এই কবিতাটা বিপিনই বেছে দিয়েছিলো উমাকে। বেছে দেওয়ার অবশ্য তেমন দরকার ছিলো না। চার-পাঁচটা কবিতা বইয়ের অধিকাংশ কবিতাই কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিলো উমার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই।

কবিতার বইটা হাতে নেই। উমার কাছে রয়েছে। কিন্তু ও কবিতাটা বিপিনেরও পুরোপুরি মুখস্থ। বিপিন অনেকক্ষণ চুপচাপ বিছানায় শুয়ে রইলো। তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে উমা আর কবিতা। না পাওয়ার, হারিয়ে যাওয়ার, দেখা না হওয়ার কবিতা।

তবে উমা লিখেছে 'দেখা হবে।'

দেখা হলো পাঁচ বছর পরে শ্রীরামপুরে।

এণ্টালিতে ভৌমিক নিবাসে ইপিন উনিশশো তেষট্টি সাল পর্যন্ত ছিলো। তখন তার এম এ পরীক্ষা হয়ে গেছে মাঝামাঝি রেজাল্ট করেছে, একটা চাকরি খুঁজছিলো।

চাকরি খোঁজা মানে তখনো চাকরি পাওয়া এখনকার মত এত কঠিন হয়ে পড়েনি। সরকারি চাকরিগুলো ছিল, মোটামুটি দেখেশুনে পরীক্ষা দিয়ে গেলে, দু-চারবারের চেষ্টায় পাওয়া যেতো।

এদিকে একটা বিদেশ যাওয়ার হিড়িক পড়েছিলো। পশ্চিম জার্মানি আর গ্রেট ব্রিটেন থেকে প্রায় আয় আয় করে ডাকছিলো বেকারদের। সুস্থ, সবল এবং কিঞ্চিৎ শিক্ষিত যুবকদের জন্য

পশ্চিম জার্মানির দরজা খোলা। একটু আধটু উচ্চশিক্ষা থাকলে গ্রেট ব্রিটেনেও শিক্ষকতার কাজ পৌঁছলেই জুটে যেতো। নানা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাজ পাওয়াও খুব কঠিন ছিলো না, একটু ঝুঁকি নিয়ে গিয়ে কিছুদিন থাকলেই পাওয়া যেতো। অনেকে আবার এখান থেকেই চিঠিপত্র লিখে কিংবা প্রবাসী আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা জব-ভাউচার সংগ্রহ করে চলে যেতো।

ঝোঁকে পড়ে ইপিনও একবার একটা জব ভাউচার জোগার করার চেষ্টা করেছিলো।

ঝোঁকে পড়ার কারণ অবশ্য ছিলো। এন্টালির বাসস্থল থেকে পায়ে হেঁটে তালতলার মোড়ে এসে 'আইডিয়াল টি স্টল' নামে এক বনেদি চায়ের দোকানে প্রত্যেক রবিবার ও ছুটির দিনের সকালে আড্ডা দিতে যেতো ইপিন। ব্যাপারটা প্রায় নেশার মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আইডিয়াল টি স্টলকে চায়ের দোকান না বলে একটি প্রতিষ্ঠান বলা চলে। রাস্তার ওপরে ঘেরা বারান্দাওলা একটা ছোট একতলা বাড়িতে বহুদিনের পুরনো চায়ের স্টল। সেই মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমলের কলকাতায় প্রথম চায়ের দোকানগুলোর একটা। হাতল ছাড়া কালো এবং ভারি কাঠের চেয়ার দিয়ে ঘেরা বড় বড় গোল শ্বেত পাথরের টেবিল, মেজেতে টেবিল চেয়ারের আনাচে কানাচে অন্তত চার-পাঁচটা নীল চোখ, লেজ ফোলা কাবুলি বেড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আইডিয়াল টি স্টলের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা দুইই খুব জোরদার ছিলো। কালাজ্বরের ভুবনবিখ্যাত উপেন ব্রহ্মচারী এ দোকানে বন্ধুবান্ধব নিয়ে প্রথম যৌবনে হৈচৈ করে চায়ের আড্ডা দিয়েছেন। গদিতে বিশেষ অতিথি অভ্যাগত কেউ এলে তালতলার রাইস কিং, কলকাতার সর্ববৃহৎ চালের আড়তদার পশুপতি দাস আইডিয়াল থেকে চা আনিয়ে দিতেন। পাশেই একটু এগিয়ে মোড়ের মাথায় একটা ইংরেজি সিনেমার কাগজের অফিস, তারপরে আরেকটু এগিয়ে ঠাকুরদাস পালিত লেনে সুধাংশু বক্সীর রূপাঞ্জলি, এককালের রমরমা সিনেমা পত্রিকা। ফলে এ পাড়ায় চিত্রতারকাদের যাতায়াত একটু বেশি।

মোহনবাগানের দুই কর্মকর্তা কাছেই থাকেন, তাছাড়া পাড়ার ক্লাব তালতলা স্পোর্টিং রয়েছে। এইরকম নানা কারণে খ্যাত অনতিখ্যাত চিত্রতারকা, ফুটবল খেলোয়াড় একজনও তখন হয়তো পাওয়া যেতো না যে আইডিয়ালের চা খায়নি।

আইডিয়াল সম্পর্কে একটা গুজব ইপিন শুনেছিলো। এরা নাকি চায়ের সঙ্গে আফিং মিশিয়ে দেয়, সেই নেশার টানে লোক আসে। কথাটা সত্যি হতে পারে নাও হতে পারে। এখন আর যাচাই করার উপায় নেই। 'আইডিয়াল টি স্টল' নিঃশব্দে কবে উঠে গেছে।

আইডিয়ালের সর্বজনপ্রিয় অমায়িক মালিক মোহরবাবু সব সময়ে ধবধবে ধুতিপাঞ্জাবি পরা, হাসি মুখ। দোকানের একপাশে একটা ছোট টেবিলে ক্যাশবাক্স আর একপ্লেট মৌরি নিয়ে বসে থাকতেন।

চৌষট্টি সালের রায়টের সময় দোকান বন্ধ করে রাত দশটা নাগাদ ক্রীক রোর মেসে ঢোকার পথে মৌলালির কাছে মোহরবাবু খুন হলেন। তার আগে কেউ জানতো না যে তিনি মুসলমান, গুণ্ডারা যে কি করে জেনেছিলো কে জানে। মোহরবাবু যে মোহর রায় বা মোহর দাস নয় মোহর খান, যারা খুন করেছিলো তারা সেটা জেনেই করেছিলো।

এ অবশ্য কয়েক বছর পরের কথা। যে সময় ইপিন আইডিয়ালে যেতো, বিশেষত ছুটির দিনে বা রবিবারের সকালে, তখন সেখানে ভিড় থই থই করতো।

সেই ভিড়ের মধ্যে দরজার একপাশে একটা গোল টেবিলে ছিলো ইপিনদের আড্ডা। সেখানকার আড্ডাধারীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন খগেন, বিশ্ববন্ধু ইত্যাদি একে একে বিলেতে চলে গেলো।

আড্ডায় নৃপেনদা বলে এক প্রৌঢ় স্কুলমাস্টার আসতেন, তিনি ছিলেন সংবাদের খনি।

নৃপেনদা সবাইকে তাল দিতেন বিলেত যাওয়ার জন্য। আন্তর্জাতিক পাশপোর্ট পাওয়ার ব্যাপারে তদ্বির তদারক তিনিই অনেকটা করতেন। বিনিময়ে যৎসামান্য উপরি পাওনা হতো তাঁর।

নৃপেনদা ইপিনকেও তাল দিয়েছিলেন বাইরে যাওয়ার জন্যে। লোভনীয় প্রস্তাব। তাছাড়া ইপিনের তো এতকাল ভারত-পাকিস্তান পাশপোর্ট ছিলোই, সেটার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক পাশপোর্ট হওয়া কঠিন ছিলো না।

কিন্তু ইপিনের বাইরে যাওয়া শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। তার আগেই ইপিন একটা কাজ পেয়ে গেলো। মাস্টারির চাকরি, কিন্তু কাজ খারাপ নয়।

কোনো ধরাধরি বা মুরুব্বির জোরে নয়, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ইপিন দরখাস্ত করেছিলো। তখন শিক্ষিত বেকার যুবকেরা প্রত্যেক রবিবারে অমৃতবাজার পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন মনোযোগ দিয়ে দেখতো। সেখানেই অধিকাংশ স্কুল-কলেজের শিক্ষক পদের বিজ্ঞাপন বেরোতো। অনেক চায়ের দোকানে বিশেষত আউডিয়ালে সপ্তাহের অন্যদিন না হোক রবিবারে অমৃতবাজার রাখা হতো।

ইপিন তিনটে দরখাস্ত করেছিলো। তিনটিরই উত্তর এসেছিলো। আসলে সে সময়ে সদ্য উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়েছে। মাধ্যমিকে কয়েকজন ইংরেজি, অঙ্ক, বাংলার শিক্ষক, দুয়েকজন ইতিহাস, দুয়েকজন বিজ্ঞান ইত্যাদি হলেই চলে যেতো। কিন্তু উচ্চ-মাধ্যমিকে বিষয় অনুযায়ী পদার্থ, রসায়ন, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের নির্দিষ্ট শিক্ষক চাই। শিক্ষাগত যোগ্যতা অনার্স গ্র্যাজুয়েট বা এম এ।

ইপিনের অনার্স এবং এম-এ দুইই ছিলো। তিনটে চাকরির মধ্যে সবচেয়ে কাছে যেটা, কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীতে একটা উদ্বাস্তু হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলে ইপিন যোগদান করলো। মাইনে, মহার্ঘভাতা সব কিছু মিলিয়ে প্রায় দুশো টাকা, কিছু কম নয়।

কাজ পাওয়ার আগে থেকেই, বিশেষ করে তার এম এ পরীক্ষা মিটে যাওয়ার পরেই ইপিন ভৌমিকনিবাস ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছিলো। আর কতদিন অন্যের বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে থাকা যায়।

শুধু বাধা ছিলো ননীবালার। এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পথে ননীবালাই প্রথম ও একমাত্র বাধা, প্রায় অনতিক্রম্য। এ বাড়ির অন্যান্য অধিবাসীরা যে ইপিনকে খুব স্নেহের চোখে দেখে তা নয়, স্নেহের চোখে দেখার কথাও নয়। একটু দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের বাড়ির লোকেরা কখনোই পছন্দ করে না, বিশেষ করে যদি তারা গলগ্রহ হয়।

কিন্তু এই কয় বছরে ইপিনকে একেবারে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছেন ননীবালা। আক্ষরিক অর্থেই আষ্ঠেপৃষ্ঠে। একই বড়খাটে কোলবালিশের ব্যবধান রেখে একই বিছানায় সে ননীবালার সঙ্গে এখনো শুয়ে যাচ্ছে। কোনো কোনো দিন গভীর রাতে পিসিঠাকুমা বাহুবন্ধনে তার ঘুম ভেঙে যায়। দু'জনের মধ্যবর্তী পাশবালিশ সরে গেছে ঘুমের মধ্যে কিংবা স্বপ্নের ঘোরে কখন ননীবালা জড়িয়ে ধরেছেন ইপিনকে।

ইপিন এখন পূর্ণ যুবক। খুব অস্বস্তি হয় তার। সন্তর্পনে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পাশ ফিরে বিছানার শেষ প্রান্তে চলে যায় ইপিন।

কোম্পানির কাগজ, ব্যাঙ্কের ও পোস্টাফিসের সুদ, কিছু বাড়িভাড়া-ননীবালার নিজস্ব আয় ভালো ছিলো। ইপিন অবশ্য ননীবালার কাছ থেকে কখনো কোনো টাকাপয়সা আর্থিক সাহায্য নেয়নি। কিন্তু তাঁর পয়সায় চর্ব-চোষ্য করে খেয়েছে, তাঁর দেয়া জামাকাপড় পরেছে। ইপিনের

ওপরে ননীবালার এই অন্ধ ভালোবাসা যার সবটা স্নেহ নয়, সকলে ভালো চোখে দেখেনি। ফলে মোটামুটি বুদ্ধিমান ইপিন ভালোয় ভালোয় এখান থেকে বিদায় নিতে চেয়েছে।

বছর দেড়েক আগে একটা ঘটনা ঘটেছিলো সেটা খুব আশ্চর্যের। ইপিন বাইরে থেকে ফিরে এসে সন্ধ্যাবেলায় দেখে জানালার কাছে তার লেখার টেবিলের ওপরে সাদা তোয়ালে জড়ানো এক বোতল ব্র্যাণ্ডি। পিসিঠাকুমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে নাতিকে এই উপহার পিসিঠাকুমার।

ননীবালা এর মধ্যে কোনো অন্যায় দেখেননি। তাঁর স্বামী, শ্বশুর বলতে গেলে শ্বশুরবাড়ির পুরুষ মানুষেরা সকলেই অল্পবিস্তর মদ্যপান করতেন, তবে নিয়ম করে এবং তার মধ্যে লুকোচুরি কিছু ছিলো না। ননীবালাও একদা একটু আধটু ব্র্যাণ্ডি বা লেবু-জিন স্বামীর সঙ্গে খাননি তা নয়।

ইপিনের মদ খাওয়া সম্পর্কে খুব একটা সংস্কার ছিলো না। তখনকার টাঙ্গাইলে অবশ্য মদ খাওয়ার খুব চল ছিলো না। পুরো মহকুমার মধ্যে মাত্র দু-চারটে দিশি মদের আর একটা বিলিতি মদের দোকান। পথে ঘাটে যত্রতত্র মাতাল দেখা যেতো না। উৎসবে ব্যসনেও মদের ব্যবহার প্রচলিত ছিলো না। মাতালের সংখ্যা এতই কম ছিলো যে তারা একটা দ্রষ্টব্য বিষয় ছিলো। কদাচিৎ রাস্তায় মাতাল দেখা গেলে লোকে ভিড় করে তাকে দেখতো। আশেপাশের বাড়ির বেড়ার ফাঁক দিয়ে মেয়েরা উঁকিঝুঁকি দিতো।

কলকাতায় কিন্তু ইপিন-বিপিনের বন্ধুরা কেউ কেউ ঐ বয়েসেই মদ খেতো, সাধ এবং সাধ্যমত। ধর্মতলার মোড়ে মদন শায়ের দোকানে, যাকে বলা হতো ছোট ব্রিষ্টল, ওয়েলেসলিতে খালাসিটোলায় দিশি মদের হাটে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দলে পড়ে দুয়েকবার গিয়েছে ইপিন, তবে নিজে খুব একটা মদ খায় নি।

পিসিঠাকুমা ননীবালা কিন্তু ইপিনকে মদ খাওয়াটা ধরিয়েছিলেন। পড়ার টেবিলে বসে বোতল থেকে দু আঙুল পরিমাণ কাঁচের গেলাসে ঢেলে অনেকক্ষণ ধরে মিষ্টি মিষ্টি ব্র্যাণ্ডি চুকচুক করে খেতো ইপিন। একটু গোলাপি নেশা হতো, রাতে ভালো ঘুম হতো।

এই খারাপ অভ্যাসটা আজো ইপিনের রয়ে গেছে। বিয়ের পরে প্রথম দিকে মেনকা একটু বকাঝকা করেছে, এখন নিজেই ইপিনের সঙ্গে মদ খায়। মদ ফুরিয়ে গেলে বাজার থেকে ফেরাব পথে রিক্সা দাঁড় করিয়ে এক বোতল জিন কিনে আনে। স্বামী-স্ত্রী বেশ কয়েকদিন ধরে লেবুব রস আর জল দিয়ে অল্প অল্প করে খায়।

এ সব তো অনেক পরের কথা, ধরতে গেলে প্রায় এখনকার কথা।

কিন্তু ভৌমিক নিবাস ছেড়ে ইপিনের বেরিয়ে আসাতে খুবই অসুবিধে হয়েছিলো। সুখাদ্য ও পানীয়েব আকর্ষণ অবশ্যই ছিলো, একজন স্কুল শিক্ষকের পক্ষে সেটা কম লোভনীয় নয়। তবে ননীবালাই ছিলেন প্রধান অন্তরায়। তিনি ইপিনকে কিছুতেই ছাড়তে চাননি। বুড়ো বয়েসে অন্ধের লাঠির মত তিনি ইপিনকে শক্ত করে ধরেছিলেন।

পিসিঠাকুমার সব কথাবার্তা, স্মৃতিচারণ সবই নাতি ইপিনের সঙ্গে কিন্তু ইপিনও তাঁর নিজের নাতি নয়। এমনিতে যা সম্পর্ক তাতে দেখাশোনার কথাই নেই।

অবশেষে ইপিনকে মুক্ত করলেন ননীবালা নিজেই, তিনি একদিন দুম করে বিনা বাক্যব্যয়ে সকলের অজ্ঞাতসারে মরে গেলেন।

তখন বেশ কয়েকমাস হলো ইপিন স্কুলে পড়ানোর চাকরিটা পেয়েছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা স্কুল ছুটির পর যাদবপুর কফি হাউসে লম্বা একটা আড্ডা দিয়ে বাসায় ফেরার পর ইপিন জানতে পারলো ননীবালা মারা গেছেন।

বৈশাখ মাসের ভরদুপুরে খোলা ছাদে রোদে দেওয়া সদ্য তৈরি আমের আচার, কাসুন্দির তদারকি করতে গিয়েছিলেন, এরকম নিয়মিতই যেতেন। বিকেলে বাড়ির কাজের মেয়ে হারানি ছাদ থেকে রোদে শুকোনো কাচাকাপড় তুলতে গিয়ে দেখে ননীবালা দেবী একটা আচারের কালো পাথরের বাটির ওপরে মুখ থুবরে পড়ে আছেন।

হারানির চিৎকারে বাড়ির একতলা দোতলা থেকে সবাই ছুটে আসে। ধরাধরি করে ননীবালাকে তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। তাড়াতাড়ি পাড়ার ডাক্তারকে খবর দেয়া হয়।

ডাক্তার এসে নাড়ি পরীক্ষা করে বলেন, 'অনেকক্ষণ মারা গেছেন।' তখনো কিন্তু ননীবালার শরীর বেশ গরম। সারা দুপুর প্রখর রোদে তপ্ত ছাদে তাঁর দেহটা ভাজাভাজা হয়েছে। সেই উত্তাপ তখনো শরীরে রয়েছে।

ইপিন যখন এসেছে তার ঘণ্টা তিনেক আগেই ননীবালাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ততক্ষণে হয়তো পোড়ানোও হয়ে গেছে। এবাড়িতে ইপিনের আসার জন্যে কেউ অপেক্ষা করেনি।

ইপিনের মনে আছে তার ঠাকুমা টাঙ্গাইল বাড়িতে মাবা যাওয়ার পর শ্রাদ্ধের সময় পূর্ণিয়া থেকে ঠাকুমার এক ছোট ভাই এসেছিলেন, তিনি সব খোঁজখবর নিয়ে তারপর খুব রাগারাগি করেছিলেন, 'মরার আগে আমার বোন একমাস শয্যাশায়ী হয়ে রইলো। তোমরা আমাদের একবারো খবর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলে না। তোমাদের বাড়ির বৌ হলেও, সে তো আমাদের বাড়ির মেয়ে, আমাদের জানানো উচিত ছিলো। মেয়ে তো আমরা বেচে দিই নি, বিয়ে দিয়েছিলাম।'

ইপিনেরও সেদিন মনে হয়েছিলো সেই পূর্ণিয়ার দাদুর মত বলে, 'আমাদের বাড়ির মেয়ে তোমাদের বাড়িতে বেঘোরে মাবা গেলো, আর আমার জন্যে তোমরা একটু অপেক্ষা করতে পারলে না?'

ভৌমিক নিবাসের বাড়ির উঠোনে বেশ কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ইপিন।

পিসিঠাকুমার জন্যে কিছুটা মন খারাপ হবেই, মা-বাবাকে ছেড়ে কলকাতায় এতগুলো বছর ননীবালার যত্নে-ভালোবাসায় ভালোই কেটে গেছে। কখনো টাঙ্গাইলের জন্যে, টাঙ্গাইল বাড়ির লোকজন, মা-বাবার জন্যে মনখারাপ করেনি। যখন ছুটি-ছাটায় ইপিন টাঙ্গাইলে গেছে তখনও পিসিঠাকুমার কথা নিয়মিত মনে পড়েছে।

পিসিঠাকুমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ওই মুহূর্তে ভৌমিক নিবাসের সঙ্গেও বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেলো।

কয়েক বছর আগে শেয়ালদার রথের মেলা থেকে একটা কনকচাঁপার গাছ এনে এ বাড়ির বাইরের উঠোনে নিজের হাতে লাগিয়েছিলো ইপিন। ননীবালাই বলেছিলেন ঠিক ওই একই জায়গায় নাকি অনেককাল ধরে একটা কনকচাঁপার গাছ ছিলো। ইপিন ভৌমিক নিবাসে আসার আগের বছর ঘোর বর্ষায় মাটিতে শিকড় ছিঁড়ে পড়ে মরে গেছে, ইপিন সেই পুরনো গাছটাকে দেখেনি।

ননীবালা বলায় রথের মেলা থেকে বেশ খুঁজে বেছে একটা শক্তসমর্থ চারা এনে লাগিয়েছিলেন ইপিন। ননীবালাই বলেছিলেন, 'তুই লাগা, তোর হাতে লাগানো গাছ মরবে না।'

গাছটা মরেনি। প্রথম দুয়েক বছর একটু থমকিয়ে ছিলো। হঠাৎ গত বছর বর্ষায় মাথাঝাড়া দিয়ে উঠেছে। এ বছর গ্রীষ্মে ফুল এসেছে, খুব বেশি নয় কিন্তু গন্ধটা খুব তীব্র। এই তো মাত্র কয়েকদিন আগে বৈশাখী পূর্ণিমা গেছে। হঠাৎ মধ্যরাতে ঘুম থেকে টেনে তুলে ননীবালা ইপিনকে নিয়ে শোবার ঘরের বাইরের দিকের বড় জানালার সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'তোর কণকচাঁপার গাছে ফুল এসেছে। জ্যোৎস্নারাতে চাঁপা ফুলের গন্ধ, তুই বুক ভরে নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে নে।'

আজ ভর সন্ধ্যায় কোনো জ্যোৎস্না নেই, হয়তো অনেক রাতে চাঁদ উঠবে। কিন্তু দালানের ওপাশ থেকে কণকচাঁপার ক্ষীণ সুবাস পাওয়া যাচ্ছে। ঠিক সেই পূর্ণিমা রাতের মতো মাদকতাময় নয়, কেমন যেন হালকা হালকা, কেমন যেন ছাড়াছাড়া।

ইপিন আর সিঁড়ি দিয়ে উপবে উঠলো না। ধীরে ধীরে সিঁড়ির পাশের প্যাসেজ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। বেরোনোর মুখে বাইরের উঠোনে সেই কণকচাঁপার গাছ থেকে একটা ফুল পেড়ে নেবার জন্যে হাত বাড়ালো, কিন্তু গাছেব ডালগুলো বেশ উঁচুতে উঠে গেছে আর ফুল ফুটেছে সেই ডালের মাথায়। অন্ধকারে ভালো করে দেখাও যাচ্ছে না। একটু চেষ্টা করে তারপর ফুলের নাগাল না পেয়ে ইপিন ভৌমিকনিবাস থেকে বেরিয়ে এলো।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ এলোমেলো ঘুরতে ঘুরতে ইপিন সুরেন ব্যানার্জি রোড আর লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সন্ধে অনেকক্ষণ গড়িয়ে গেছে, রাত সাড়ে নটা বাজে। জায়গাটা ভালো নয়। রাস্তায় ছোটখাটো ভিড়। মাতালদের জটলা। কাছেই উল্টোদিকে গলির মধ্যে সিনেমা হলের পাশে একটা বাংলা মদের ভাটিখানা। ভাটিখানাটা আইনমাফিক সাড়ে নটাতেই বন্ধ হয়। তাই মাতালেরা বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে। অনেকেই দ্বিধার মধ্যে রয়েছে, বাড়ি ফিরবে নাকি, কাছাকাছি কোনো চুল্লুর ঠেকে বসবে।

ঠিক উল্টো দিকের ফুটপাথে রিপন স্ট্রিটের দুজন মধ্যবয়সিনী অ্যাংলো মেম প্রার্থিতদের জন্যে অপেক্ষা করছে। এ দুজনেরর মুখ ইপিনের বেশ চেনা। মোটা করে ভ্রু এঁকে, প্রচুর রং চঙ মেখে, ওরা এই মোড়েই দাঁড়িয়ে থাকে। ট্রামে বাসে যাতায়াতের পথে ইপিন বহুবার দেখেছে এদের। কিন্তু এদের কোনদিন খদ্দের সংগ্রহ করতে দেখেনি। কি করে যে এদের গ্রাসাচ্ছাদন চলে। ইপিন সে নিয়েও মাথা ঘামিয়েছে।

আজ ইপিনের এত ভাবনা চিন্তার সময় নেই, তার মাথার মধ্যে কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। ভৌমিক নিবাসে থাকলে এতক্ষণ এক চুমুক ব্র্যাণ্ডি খেতে পারতো। কিন্তু এখন আর সে হবার নয়, ভৌমিক নিবাসে এখনই সে ফিরছে না।

ওপাশের ফুটপাথে দুজন মাতাল একজন অ্যাংলো মেমের সঙ্গে কি সব কথাবার্তা বলছে। বোধহয় দামদর করছে। আরেকটু এগিয়ে একটা ট্যাক্সি থামলো, দ্বিতীয় মেমটি গাড়ির কাছে এগিয়ে গিয়ে কি সব কথাবার্তা বললো তারপর আবার ফিরে এলো। বোধহয় বনলো না। এ দিকে মাতাল দুজনও ফিরে গেছে।

এখন ওপারের রাস্তা ফাঁকা। ল্যাম্প পোস্টের দুপাশে কিঞ্চিৎ দূরত্ব বজায় রেখে দুই রমণী ক্লান্তভাবে দাঁড়িয়ে আচে। ইপিন দেখেছে, এই রকমই দাঁড়িয়ে থাকে ওরা দিনের পর দিন।

ইপিন মনে মনে ভাবছিলো কিন্তু নিজের ওপর ভরসা পাচ্ছিলো না। যাবে নাকি রাস্তা পেরিয়ে। ওদের যে কোনো একজনকে একরাত্তির আশ্রয় ও সঙ্গসুখের জন্যে বলবে। পকেটে অল্প কিছু টাকা আছে। এ লাইনে কতটা খরচ তা ঠিক জানা নেই তবে মনে হয় হয়ে যাবে।

ইপিন মনস্থির করতে পারছিলো না। ননীবালার মৃত্যুর দিনে তার এবকম অসামাজিক, অস্বাভাবিক

ইচ্ছা, সেটা নিয়েও ইপিনকে তার বিবেক খোঁচাচ্ছিল।

এমন সময় ইপিনকে রক্ষা করলেন নৃপেনবাবু। আইডিয়াল টি স্টলের বেশ কয়েকজন আড্ডাধারীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে নৃপেনবাবু সুরেন ব্যানার্জি রোড ধরে আসছিলেন।

ইপিনকে দেখে নৃপেনবাবু দাঁড়ালেন। ইপিন প্রথমে খেয়াল করেনি। নৃপেনবাবু দলবল নিয়ে সামনে দাঁড়ালে সে থমকিয়ে গিয়ে হঠাৎ তাকিয়ে এদের দেখে বললো, 'ও আপনারা।'

নৃপেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত রাতে এখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন?'

ইপিন উদভ্রান্তের মতো বললো, 'আমার পিসিঠাকুমা, আমি যার কাছে থাকতাম, তিনি আজ দুপুরে মারা গেছেন।

নৃপেনবাবু পরোপকারী, সজ্জন ব্যক্তি। তদ্বির তদারকি করলে ফাইফরমায়েস খাটলে সামান্য কিছু উপরি নিয়ে থাকেন সেটা বলে কয়ে। সব সময়ে যে নেন তাও নয়।

আজ ইপিনের অবস্থা দেখে নৃপেনবাবু বললেন, 'চলুন আইডিয়ালে গিয়ে একটু চা খেয়ে নিই। বুড়োমানুষ মারা গেছেন, সে জন্যে মন খারাপ করে লাভ নেই।'

ইপিন আইডিয়ালের ছুটির দিনের সকালের খদ্দের। সন্ধ্যায় কখনো আইডিয়ালে যায় নি। আর এখন যে অনেক রাত হয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করলো, 'আইডিয়াল এখনো খোলা আছে?'

নৃপেনবাবু হাসলেন, 'আমরা তো এইমাত্র চা খেয়ে আসছি। এখন তো রাত দশটাও বাজেনি। আইডিয়াল হলো নাইট ক্লাব। রাত এগারোটা পর্যন্ত খোলা থাকে। শেয়ালদার শেষ লোকাল ট্রেন আসার পরে বন্ধ হয়।'

সাঙ্গোপাঙ্গোরা আর নৃপেনবাবুর সঙ্গে এলো না। তাদের দেরি হয়ে গেছে। ইপিনকে নিয়ে নৃপেনবাবু আইডিয়ালে এসে ঢুকলেন।

আইডিয়ালের আড্ডা এখনো রীতিমতো জমজমাট। কে বলবে রাত দশটা। সকালের দিকে এদের কখনো দেখেনি। এরা রাতের খদ্দের। অধিকাংশই সেলসম্যান, ডেলি প্যাসেঞ্জার গোছের। আশেপাশে পাড়ায় বাড়ি। সারাদিনের পরিশ্রমের শেষে শেষ পেয়ালা চা খেয়ে, একটু আড্ডা দিয়ে ঘরে ফেরার লোভ। এ ছাড়া বেশ কয়েকজন রেসুরে রয়েছে, সন্ধ্যাবেলা চৌরঙ্গী থেকে সদ্য প্রকাশিত রেসের বই 'টার্ফ নিউজ' নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে, মাঝে মাঝে চাপা গলায় তর্কাতর্কি হচ্ছে ব্ল্যাক প্রিন্স নামক ঘোড়ার ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে কিংবা আরলি বার্ড নামের ঘোড়ার বংশ গৌরব নিয়ে, রক্তের বিশুদ্ধতা নিয়ে।

রবিবারের সকালে যে নির্দিষ্ট টেবিলে ইপিনরা সাধারণত বসে সে টেবিল এখন এক শৌখিন জ্যোতিষীর কবলে। তিনি পকেট থেকে তখন একটা ময়লা নোটবুক বার করে কি সব অঙ্ক মেলাচ্ছেন আর একটা ময়লা ফুলস্ক্যাপ কাগজে ছক আঁকছেন। যাঁর ছক আঁকছেন তিনি এবং তাঁর সুহৃদবৃন্দ গুম হয়ে বসে আছেন, কারণ ছক বিবেচনা করে এখনই জ্যোতিষী বলেছেন, 'বড় ফাঁড়া রয়েছে। চলন্ত যান থেকে বাঁ দিক দিয়ে কখনো নামবেন না।' যাঁর ছক তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন, শুধু একজন প্রতিবাদ করলেন, 'ট্রামে বাসে ডান দিকে দরজা কোথায়, বাঁ দিক ছাড়া কিভাবে নামবে?'

ঠিক সেই টেবিলের পাশের একটা বারোয়ারি টেবিলে নৃপেনবাবু ইপিনকে নিয়ে বসলেন। বেয়ারাকে দুকাপ চা অর্ডার দিয়ে নৃপেনবাবু ইপিনকে বললেন, 'খিদে পেয়েছে? কিছু খাবেন? এখন অবশ্য কেক ছাড়া কিছু পাওয়া যাবে না।' ইপিনের খিদে লেগেছিল। কিন্তু খেতে ইচ্ছে করছিলো না। এরকম দুঃখের দিন তার এই সামান্য জীবনে আগে কখনো আসেনি।

ইপিন মাথা নেড়ে বললো, 'খেতে ইচ্ছে করছে না।'

নৃপেনবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তার পর অস্পষ্টভাবে একটা বাজে কথা জিজ্ঞাসা করলেন, 'শ্মশানে যাননি?'

'না। যেতে পারিনি।' খুব সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে ইপিন একটু চুপ করে থেকে তারপর ধরা গলায় বললো, 'যাওয়া সম্ভব হয়নি। আমি খবর পাইনি। আমার জন্য কেউ অপেক্ষা করেনি।'

নৃপেনবাবু আবার ভুল করলেন, প্রশ্ন করলেন, 'আপনার পিসিঠাকুমা আপনাকে খুব ভালোবাসতেন তাই না?'

এবার ইপিন খুব বিরক্ত বোধ করলো, তার মনে হলো এর চেয়ে ওই মেমবেশ্যার সঙ্গে চলে গেলে অনেক ভালো হতো। এ রকম গায়ে পড়া কথা তার মোটেই পছন্দ হয় না। কিন্তু ইপিন মুখ ফুটে কিছু বললো না। সেটা তার স্বভাব নয়। চুপচাপ চায়ের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

একটু পরে চা এলো। ইতিমধ্যে আইডিয়ালের ভিড় অনেক বেড়ে গেছে। অদূরে ওয়েলেসলি স্ট্রিটের ক্রাউন সিনেমায় রাতের শো ভেঙেছে। কিশোর কুমার—নূতন সমর্থের পাগল প্রেমের বই। দর্শকেরা 'সি-এ-টি ক্যাট বিল্লি,' 'আর-এ-টি র‍্যাট চুয়া' গাঁজাখুরি সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এবং সদ্য দৃষ্ট চলচ্চিত্রের বিষয়ে অলোচনা করতে করতে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে চা খাচ্ছে।

নৃপেনবাবু বুদ্ধিমান লোক। একটু পরেই টের পেলেন আজকের দিনে ইপিনের কাছে পিসিঠাকুমার প্রসঙ্গটা আর টেনে আনা সঙ্গত হবে না।

কিন্তু চুপচাপ বসে থাকা নৃপেনবাবুর স্বভাবে নেই, তিনি কথা বলতে লাগলেন। তবে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন।

সত্য-মিথ্যে ইপিন জানে না, কিন্তু ইপিনের মনে আছে সেদিনের সেই শোকসন্তপ্ত রাতে নৃপেনবাবুর দুয়েকটা কথা। নৃপেনবাবু জানতেন না এমন কোন বিষয় নেই।

আউডিয়াল টি স্টলে যখন ভিড় জমজমাট, ইপিন বলেছিলো, 'বাবা, রাত এগারোটা বাজতে চললো, এখনো এত ভিড়।' নৃপেনবাবু তখন আইডিয়ালের জনপ্রিয়তা এবং ঐতিহ্য বিষয়ে দুটো খবর শোনালেন।

আর দুটিই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিছুটা অবিশ্বাস্যও বটে।

প্রথম খবর হলো, ওমলেটকে যে বাংলায় মামলেট বলা হয় সেই মামলেট কথাটার উৎপত্তি হয়েছে এই আইডিয়াল রেঁস্তোরা থেকেই। এখানকার বয়েরা ওই নতুন উচ্চারণ রচনা করেছে।

দ্বিতীয় খবরটি কম নয়। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের চায়ের দোকানে যে 'ডাবল-হাফ' চা নামের দুধ বেশি, চিনি বেশি, কড়া লিকার সেই 'ডাবল-হাফ' আবিষ্কার হয়েছিলো এই আইডিয়ালে, এখান থেকেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

আরেকটা মারাত্মক সংবাদ দিয়েছিলেন নৃপেনবাবু, কথাটা একটু গলা নামিয়ে বলেছিলেন, 'এই দোকানের মালিক কিন্তু ওই মোহরদা বা মোহরবাবু নন। তিনি ম্যানেজার মাত্র। এই দোকানের আসল মালিক কে জানেন?'

আলগোছে গাড় নেড়ে ইপিন তার অক্ষমতা জ্ঞাপন করতে যাচ্ছিলো তার আগেই ফিস্‌ফিস্ করে নৃপেনবাবু এক বিখ্যাত বিপ্লবী নেতার নাম করলেন, তারপর বললেন, 'ওঁর এই কাছেই একটা মাংসের দোকানও আছে।'

বলা বাহুল্য আজকের রাতে এই ধরনের চুটকি খবরে ইপিন তেমন উৎসাহ বোধ করছিলো না। সে একটু পরেই সরাসরি নৃপেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলো, 'আচ্ছা আপনি আমাকে একটা

বাড়ি ভাড়া জোগাড় করে দিতে পারেন।'

নৃপেনবাবু মুখে 'না' নেই, তিনি বললেন, 'সামনের রোববার বিকালে আসুন, এর মধ্যে খোঁজ নিয়ে রাখছি। আপনারা কজন থাকবেন বাড়িতে? আর একটা কথা ভাড়া মাস-মাস কত দিতে পারবেন?'

ইপিন বললো, 'আমি আর আমার ভাই। বড়জোর এই দুজন থাকবো। আর ভাড়াটা একশো টাকার মধ্যে হলে ভালো হয়।'

এগারোটা বেজে গেছে। আইডিয়াল এবার বন্ধ হবে। ইপিন নৃপেনবাবুর সঙ্গে ফুটপাথে এসে দাঁড়ালো। আকাশ অল্পসল্প মেঘলা। গ্রীষ্ম রজনীর প্রায় মধ্যদুপুর। খুব সুন্দর, আরামদায়ক একটা জোবালো হাওয়া দিচ্ছে। এই কাঠখোট্টা শুকনো তালতলাতেও কোথায় একটা কোকিল ডাকছে।

ইপিন সেইদিকে কান পেতে নৃপেনবাবুকে বললো, 'কোকিল ডাকছে।' নৃপেনবাবু একটু মনোযোগ দিয়ে কোকিলের ডাকটা শুনে কিঞ্চিৎ ভাবিত হলেন, তারপর বললেন, 'বোধ হয় কাবো বাড়ির পোষা কোকিল আছে বোধহয়।'

ইপিন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, 'পোষা কোকিল কি ডাকে?' কিন্তু কিছু না বলে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলো।

নৃপেনবাবু এতক্ষণ কি একটা ইতস্তত করছিলেন। সুরেন ব্যানার্জি রোডের মোড়ে পৌঁছে তিনি বাঁ দিকে যাবেন, বৌবাজারের সার্পেনটাইন লেনে তাঁর বাড়ি। ইপিন যাবে রাস্তা পার হয়ে সোজা নতুন সি আই টি রোড ধরে।

এইবার ছাড়াছাড়ি হওয়ার মুখে নৃপেনবাবু বললেন, 'আমার কিন্তু একটা কথা আছে।'

কি কথা বুঝতে না পেরে ইপিন বললো, 'বলুন।'

নৃপেনবাবু একটু হেসে বললেন, 'বাড়ির জোগার আমি আপনাকে করে দেবো। কিন্তু আমাকে সেলামি দিতে হবে। বুঝতেই তো পারেন, দিনকালের যা অবস্থা কর্পোরেশন স্কুলে মাস্টারি করে সংসার চলে না। কিছু উঞ্ছবৃত্তি করতেই হয়।'

ইপিন জিজ্ঞাসা করলো, 'কত আপনার সেলামি?'

নৃপেনবাবু বললেন, 'এক মাসের ভাড়ার সমান দেবেন।'

ইপিন এ প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে বললো, 'এক কিস্তিতে না পারি দুই কিস্তিতে দেবো।'

সামনের রবিবার বিকালে আসতে বলে নৃপেনবাবু হনহন করে চলে গেলেন।

ইপিন রাস্তা পেরিয়ে ভৌমিক নিবাসের দিকে চললো। রাস্তা ফাঁকা, ল্যাম্প পোস্টের পাশেই দুই বিগত যৌবনা মেমসাহেবও কখন চলে গেছে।

ভৌমিক নিবাসে পৌঁছে ইপিনের কেমন অস্বস্তি হতে লাগলো। শ্মশানযাত্রীরা একটু আগেই ফিরে এসেছে। কেউ তার সঙ্গে বিশেষ ভালো করে কথা বললো না। ইপিনের নিজেকে কেমন অবাঞ্ছিত মনে হলো। মনে মনে স্থির করে ফেললো, 'না। এ বাড়িতে আর থাকা নয়।'

ইচ্ছে থাকলেও অবশ্য থাকার উপায় ছিলো না। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখে ঘর বন্ধ, ঘরের দরজায় তালা।

কে তালা দিয়েছে, কার কাছে চাবি—কিছুরই খোঁজ করলো না ইপিন।

খোলা ছাদে শ্মশানবন্ধুরা সব শুয়েছে। যারা দূর থেকে খবর পেয়েছে সেই সব আত্মীয়স্বজন এত রাতে বাড়ি ফিরতে পারেনি।

শ্মশানবন্ধুদের একপাশে ঘামে ভেজা জামা প্যান্ট পড়েই শুয়ে পড়লো ইপিন। ফুরফুরে হাওয়া

দিচ্ছে, আকাশে একটা আধফালি চাঁদও রয়েছে।

গরমের দিন কলকাতায় খোলা ছাদে শুতে ভালই লাগে। কিন্তু শেষরাতের দিকে হিম পড়ে। বিশেষ করে যদি আকাশে মেঘ না থাকে, আকাশ পরিষ্কার হয় সেই সব রাতে হিম একটু বেশি পড়ে। ঠাণ্ডায় একটু আরাম হয়, কিন্তু সকালে উঠে মাথা ভার লাগে, শরীরে জ্বর জ্বর বোধ হয়।

ইপিনের যখন ঘুম ভাঙলো তখন ছাদের ওপর চনমনে রোদ। গতকাল রাতের শ্মশানযাত্রীরা প্রায় সবাই চলে গেছে। শুধু দুয়েকজন এপাশে ওপাশে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে।

ইপিন ঘুম থেকে উঠে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে দেখলো তার আর পিসিঠাকুমাব ঘরটা কালকে রাতেই মতই তালাবন্ধ, তবে দরজার সামনে স্তূপাকার করে রাখা আছে, তার জামা কাপড়, বইপত্র, সুটকেশ এবং অর্ধশূন্য ব্র্যাণ্ডিব বোতলটা পর্যন্ত।

এর মানে অবশ্য ইপিনের বুঝতে অসুবিধে হলো না। তাকে আর ওই ঘবে ঢুকতে দেওয়া হবে না। এসব জিনিস নিয়ে এবার তাকে চলে যেতে হবে।

এ বাড়ির কারো সঙ্গে কোনদিন তার কলহ হয়নি, বাদ-বিসম্বাদও হয়নি। ইপিন অবাক হয়ে ভাবলো, সে এখানে এতটা অবাঞ্ছিত হযে উঠেছিল। সেটা সে একবাবের জন্যেও এর আগে টের পায়নি। আসলে সে পিসিঠাকুমার সঙ্গে পিসিঠাকুমার ঘরে বাড়ির লোকদের থেকে আলাদা থাকতো, আলাদা খাওয়া দাওয়া করতো। সিঁড়ি দিয়ে নামাওঠা কবেছে, সদর দবজা দিয়ে যাতায়াত করেছে, ভৌমিক নিবাসেব সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিলো শুধু এইটুকু।

ভৌমিক নিবাসের আবহাওয়া ইপিন বুঝতে পারেনি। তাবা যে এতকাল তাকে সন্দেহ করে এসেছে, ভেবেছে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। ননীবালা নিশ্চয় সম্পত্তির ভাগ দিয়ে যাবে এই ইপিনকে।

ননীবালার মৃত্যুতে কোন বকম ভাগে বাঁটোয়ারা হওয়ার আগেই, সে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। তবে এ বাড়িতে ইপিনের মায়ের গয়না রয়েছে, অনেক টাকা দামেব জিনিস, সেটা উদ্ধার করতে হবে। সে ব্যাপারে বোধহয় বেগ পেতে হবে না, সব গচ্ছিত জিনিস, আলাদা আলাদা করে রাখা আছে। তার সঙ্গে যে রকম ব্যবহারই এখন করুক, বনেদি আত্মীয় বাড়িতে স্থাপ্যধনের বিশ্বাসভঙ্গ হবে না, তা ছাড়া আত্মীয়স্বজনদের সকলেরই ব্যাপারটা জানা আছে।

সে যা হোক ইপিন ঠিক কবলো, বাবা-মাকে চিঠি দিয়ে পিসিঠাকুমার মৃত্যুসংবাদটা জানানোর সময় অবশ্যই গয়নাগুলোর উল্লেখ করতে হবে। তারপর প্রভাসকুমার আর স্মৃতিকণা যা করণীয় করবেন।

ইপিনকে আরও একটা কথা জানাতে হবে যে সে ভৌমিক-নিবাসে আর থাকছে না। কারণটা লিখবে না অবশ্য কারণটা যে ঠিক কি তা ইপিন নিজেই জানেনা।

প্রভাসকুমার নিয়ম করে প্রত্যেক সপ্তাহে একটা করে চিঠি দেন, এয়ার মেল পোস্টকার্ডে। ইপিনের সপ্তাহে একটা করে চিঠি দেওয়ার কথা। স্মৃতিকণা বলে দিয়েছিলেন, শুধু 'আমরা ভালো আছি' এইটুকু জানালেই আমরা শান্তিতে থাকবো। তবু ইপিনের চিঠি লেখার ব্যাপারে প্রায়ই গাফিলতি হয়। আর বিপিন তো চিঠি দেয়ই না। হঠাৎ বিশেষ ঘটনা থাকলে অথবা কখনো নিতান্ত অকারণে দীর্ঘ চিঠি লেখে বিপিন, মা-বাবাকে একসঙ্গে চিঠি দেয় বিপিন, 'শ্রীচরণেষু মা-বাবা, সম্বোধন করে।

ইপিন ঠিক করলো, আজকেই বাবাকে চিঠিটা দিতে হবে এবং তাতে বলে দিতে হবে বাবা এবং অন্যেরা যেন তখন থেকে তার ইস্কুলের ঠিকানায় চিঠি দেয়।

'একটা লুঙ্গির মধ্যে আলগা জামাকাপড়, আধখালি পানীয়ের বোতল আর টুকটাক বইপত্র, যা কিছু দরজার মুখে বের করে দেয়া হয়েছিল, সব শক্ত করে গিঁট দিয়ে বেঁধে ইপিন ভৌমিক নিবাস থেকে বিরিয়ে এলো।

বেবোনোর মুখে বাইরে চিলতে বাগানটায় একটা শালিক কিচির মিচির করছিল। ছোটবেলা থেকে ইপিন শুনে এসেছে একটা শালিক অলক্ষুনে, যদিও সেটা কখনো মানে নি, কিন্তু আজকে ইপিন বেরোনের মুখে একটা শালিক দেখে মাথা ঘুরিয়ে তার জোড়াটাকে খুঁজতে লাগলো। নিশ্চয়ই কাছে-পিঠে কোথাও আছে।

মাথা ঘুরিয়ে ইপিন দ্বিতীয় শালিকটাকে খুঁজে পেলো না। কিন্তু একটা পুরস্কার পেয়ে গেল, বিদায় উপহার। তার লাগানো কণকচাঁপা গাছে ঠিক হাতের নাগাল মধ্যে একটা আধফোটা কণকচাঁপা ফুল, কাল সন্ধ্যায় চোখে পড়েনি, হয়তো তখনও কুঁড়ি ছিল। ডানহাত থেকে সুটকেশটা নামিয়ে হাত বাড়িয়ে ফুলটা তুলে নিলো ইপিন।

যাওয়ার জায়গা এখন একটাই, সেটা হল বিপিনের মেস।

এন্টালি থেকে বৌবাজার দূরে নয়, কাছেই। এখন সাড়ে ছটা বাজে, সকালবেলায় ট্যাক্সি পেতে অসুবিধে হলো না। ইপিন যখন বিপিনের মেসে পৌঁছালো তখনও বিপিন ঘুমোচ্ছে। মায়ের পেটের ছোট ভাই। বহুদিন বিপিনকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখেনি। এমন নিরুদ্বিগ্ন মুখে, অকাতরে ঘুমোচ্ছে ইপিনের একটু মায়া হলো।

ইপিন নিজে তবু পিসিঠাকুমার কাছে আদর যত্নে ভালোবাসায় এতদিন থেকেছে কিন্তু প্রায় প্রথম থেকেই সেই পনেরো-ষোলো বছর বয়েস অনাত্মীয়, জীর্ণ মেসবাড়িতে বিপিন একা একা থাকছে।

বিপিনের তক্তাপোষের পাশে একটা হাতলবিহীন সস্তা কাঠের চেয়ার রয়েছে। আর একটা কেরোসিন কাঠের টেবিল। দুটোই বিপিনের নিজের। এই মেসে আসার কয়েকদিনের মধ্যে শেয়ালদার মোড়ে গিয়ে ইপিন-বিপিন দুজনে কিনে এনেছিল। দুটো মিলে দাম পড়েছিল বোধহয় বারো টাকা না সাড়ে এগারো টাকা।

কাঠের চেয়ারটা টেনে ইপিন বসতে গেলো।' একটু শব্দ হওয়ায় বিপিন চোখ মেলে তাকিয়ে এই অসময়ে ইপিনকে দেখে, তার পরে ইপিনের পায়ের কাছে সুটকেশ, পোঁটলা দেখে একটু অবাক হল।

অবাক হওয়ারই কথা। তবে বিপিন একটা বেশ বড় হাই তুলে ইপিনকে জিজ্ঞসা করলো, 'কি ব্যাপার ? ভৌমিক নিবাস থেকে বহিষ্কার করে দিল ?'

পিসিঠাকুমার মৃত্যুতে, তারপরে ভৌমিক নিবাসের আচরণে ইপিনের মনটা ভারি হয়ে ছিল। এদিকে শেষ রাতে হিম লেগে মাথাটা দপদপ করছে। বিপিনের পরিহাসকে পাত্তা না দিয়ে ইপিন সংক্ষিপ্তভাবে বললো, 'পিসিঠাকুমা মারা গেছেন।'

একটা অপ্রাসঙ্গিক প্রবাদবাক্য, যার এখানে প্রয়োগ চলেনা, সেইটা বিপিন ব্যবহার করলো,

বললো, 'বামুন গেলো ঘর, লাঙল তুলে ধর।' তারপর উঠে মুখ ধুতে গেল। ইপিনও বিপিনের পিছন পিছন কলতলায় গিয়ে ভালো করে চোখ মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে নিল।

খানিক পরে দুই ভাইয়ে চা খেতে বেরোলো। মেসের সামনাসামনি উল্টো ফুটপাতে একটা ছোট চায়ের দোকান, বিপিনের ঘরের জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে 'গান্ধী, গান্ধী' হাঁক পাড়লেই একটি অল্প বয়েসী ছোকরা এসে চা দিয়ে যায়। এই ছেলেটির নাম গান্ধী।

গান্ধীর নামেই পাড়ার মধ্যে চায়ের দোকানটি 'গান্ধীর দোকান' নামে পরিচিত। গান্ধীর বাবা নেই। তার মা নিজেই দোকানটা চালায়। তোবরানো অ্যালুমিনিয়ামের কেতলিতে গান্ধী মেসবাড়ির ঘরে ঘরে, আশপাশের ছোট ছোট দোকানদারদের ফরমায়েসমত চা পৌঁছে দেয়।

গান্ধীর দোকানটা আসলে সস্তার ভাজাভুজির দোকান। সঙ্গে চা অতিরিক্ত। দাম খুব সস্তা। চা এক আনা, সিঙ্গারা নিমকি, দুই পয়সা করে। সাইজে ছোট কিন্তু অতি মুখরোচক। ছোট কচুরিও আছে, ওই একই দাম, প্রত্যেকটার সঙ্গে একটু করে সুজির হালুয়া কিংবা আলুর ছেঁচকি, যার যেটা ইচ্ছে, ফ্রি।

গান্ধীর মায়ের হাতের তৈরি খাবারে কেমন একটা অনাগরিক, দেহাতি স্বাদ ছিল। গান্ধীদের এটা হল পৈতৃক দোকান, গান্ধীরা কলকাতা শহরের বহুকালের পুরনো ভুজাওয়ালা, বৌবাজারের প্রায় সমান বয়সী। কলকাতার জন্মলগ্নে বিহারের কোন দেহাত থেকে মানোয়ারি নৌকায় গঙ্গার জলে ভাসতে ভাসতে এসে গান্ধীর পিতৃপুরুষেরা কলকাতার ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিল।

আজ দোতলা থেকে গান্ধীকে চেঁচিয়ে না ডেকে দাদাকে নিয়ে বিপিন গান্ধীর দোকানের সামনের কাঠের বেঞ্চিটায় গিয়ে বসলো।

ঠিক সামনেই এম বি সরকারের গয়নার দোকানের একটা বড় সাইনবোর্ড, এই খর বৈশাখের সকালে প্রায় বেলা নটা-সোয়া নটা পর্যন্ত পূর্ব দক্ষিণে রোদ আটকায়। গান্ধীর দোকানের পাশেই একটা ছোট উত্তর-দক্ষিণ গলি আছে, সেই গলি কাঁপিয়ে হু হু করে হাওয়া আসে গ্রীষ্মের সকালে।

গান্ধীর এই কাঠের বেঞ্চিটার কথা বিপিনের এখনো এতদিন পরেও মনে আছে। গরমের সকালে বাতাস ও ছায়াভরা, এদিকে শীত এলেই সূর্য ঘুরে গিয়ে সকালে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বেঞ্চিটায় রোদ্দুর পড়ে। বিপিনের বন্ধুদের অনেকের গান্ধীর দোকানের কথা এখনও মনে আছে। পুরনো প্রসঙ্গ, কলেজের বা মেসের দিনগুলোর কথা উঠলে গান্ধীর কথাও এসে যায়।

তবে গান্ধীর দোকানটা এখন আর নেই। অতকালের পুরনো দোকানটা উঠে গেছে। বেশ কয়েকবছর আগে কি একটা কাজে বৌবাজার দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে পুরনো মেসবাড়ির ফুটপাত থেকে লক্ষ্য করেছিল গান্ধীর দোকানটি নেই, সেখানে একটা লটারির টিকিট বিক্রির রমরমা দোকান হয়েছে।

সেদিন গান্ধীর দোকানের বেঞ্চিতে বসে ইপিন-বিপিনের অনেক কথা হল। আগের দিন রাতে খাওয়া হয়নি, ইপিন বেশ কয়েকটা নিমকি-সিঙ্গারা, হালুয়া দিয়ে কচুড়ি পেট পুরে খেয়ে নিল।

বিপিনের অফিসে খাবার দেয়। দুপুরে সে মেসে খায় না। ইপিন দুপুরে কোথায় খাবে বিপিন ব্যস্ত হয়ে উঠল।

ইপিন বলল, 'সে ভাবতে হবে না। এখন তো পেট ভরে খেয়ে নিলাম। যা খেলাম তাতে এরপর সারাদিন ধরে চোঁয়া ঢেকুর উঠবে। দুপুরে কেন, রাতেও বোধ হয় খেতে হবে না।'

এর পরেও বিপিন বললো, 'তবু।'

ইপিন বললো, 'এখন তোদের এখান থেকে স্নান করে ইস্কুলে চলে যাই। যদি দুপুরে খিদে লাগে, গড়িয়ার মোড়ে একটা ভালো ভাতের হোটেল আছে সেখানে খেয়ে নেবো।'

নয়টার মধ্যে স্নান করে ইপিন আর বিপিন দুজনেই নিজেদের কাজের জায়গার দিকে বেরোলো।

বিপিনদের মেসে সিট খালি নেই। তবে দুয়েকদিন কষ্ট করে থাকা যাবে। আর সামনে গরমের ছুটি এসে যাচ্ছে। দুজন মাস্টারমশাই এখানে থামেন, তাঁরা সেই সময় বাড়ি যাবেন। তাঁদের সিটগুলো খালি থাকবে। তখন মাসখানেক কোন অসুবিধে হবে না। আপাতত বিপিনের তক্তাপোষের নিচে ইপিনের জিনিসপত্র রেখে দেয়া হল। ব্র্যাণ্ডির বোতলটাও পোঁটলার মধ্যে রইলো।

কয়েকটা দিন বিপিনের ছোট তক্তাপোষে একটু কষ্ট করে শুয়ে ইপিন-বিপিন রাত কাটালো। দুজনের পক্ষে খুবই ছোট তক্তাপোষ। বড় জোর তিন ফুট বাই সাড়ে ছয় ফুট। একদিন বিপিন তক্তাপোষ থেকে মেজেতে রাতদুপুরে ঘুমের মধ্যে পড়েও গিয়েছিল।

পরের রাতে বিপিন মেঝেতেই বিঝানা করে নিয়েছিল, কিন্তু শুতে পারলো না। বৌবাজারের এই পুরনো এলাকায় ভাঙা দালানের মজ্জায় মজ্জায় নেংটি ইঁদুর আর আরশোলার বাসা।

তবে কয়েকদিনের মধ্যেই এক মাস্টারমশায় দেশে চলে গিয়ে একটা সিট খালি করে দিলেন, ইপিন সেই সিটে চলে গেল।

ইপিনের স্কুলেও গরমের ছুটি হয়েছে। এ বছর দারুণ গরম পড়েছে। সকাল দশটার পর ঘর থেকে বেরোনো একটা দায়। শূন্য মেসবাড়িতে ইপিন চুপচাপ বসে থাকতো।

বিপিন কি ভাববে এই ভেবে ইপিন পোঁটলা খুলে পানীয়ের বোতলটা আগে বার করেনি। এখন দুপুর বেলায় খালি ঘরে দরজা বন্ধ করে অল্প অল্প করে খেয়ে তিন দিনের মধ্যে ব্র্যাণ্ডিটা শেষ করে দিল। একটা বিক্রিওয়ালার কাছে খালি বোতলটা বিক্রি করে এক আনা পয়সাও পাওয়া গেল।

কিছুদিন আগে ইপিন এমনিই একটা সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বসার জন্যে আবেদন পাঠিয়েছিল। ভৌমিক নিবাসে থাকতেই তার কাগজপত্র এসে যায়, জুনের শেষে পরীক্ষা।

এসব পরীক্ষার ধরনধারণ একই রকম। সেই জেনারেল নলেজ, ইংরেজি, ভারতীয় সংবিধান আর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। প্রথম দুটোয় ইপিন কাঁচা নয়, একটু ঝালিয়ে নিলেই হবে। আর দ্বিতীয় দুটো স্কুলে পড়াতে হচ্ছে।

দুপরে খালি মেসবাড়ি পেয়ে ইপিন কয়েক সপ্তাহে একটু মন দিয়ে পরীক্ষার পড়াটা করলো। অবশ্য এ ছাড়া আর কিছু করারও ছিল না।

এদিকে আইডিয়াল স্টলে নৃপেনবাবু খবর এনেছিলেন, একটা মনোহরপুকুরে আর একটা টালিগঞ্জে। দুটোই দু ঘরের ফ্ল্যাট। টালিগঞ্জের ভাড়া কম আশি টাকা কিন্তু জল বাথরুম আলাদা নয়। মনোহরপুকুরের ফ্ল্যাটটার সুবিধে তার জল-বাথরুম, চিলিতে রান্নাঘর আছে। একতলায় সামনের ঘরটা দক্ষিণমুখী। ভাড়া বেশ বেশি, সোয়াশ টাকা।

ইপিন হিসেব করে দেখলো স্কুলের মাইনে থেকে বাড়ি ভাড়া দিয়ে যে টাকা থাকবে তাতে মাস ভিত্তিতে পাইস হোটেলের দুবেলা খাওয়া হয়ে যাবে। আর সব খরচাও কিছুটা হবে। বাকিটার জন্যে দুয়েকটা টিউশনি করতে হবে। তবে সে জুনমাসের পরীক্ষার পরে।

বিপিনের মেস থেকে ইপিন মনোহরপুকুরে জুনমাসের প্রথম সপ্তাহে চলে এলো।

* * *

মনোহরপুকুরের সেই ছোট ফ্ল্যাটে তিরিশটা বছর কেটে গেলো।

সেই এক জৈষ্ঠ্য মাসের সন্ধ্যাবেলা একটু আগে বিকেলে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, রাস্তাঘাট ভেজা ভেজা, হঠাৎ গরম কমে গেছে, দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে একটা জোরালো বাতাস বইছে। বিপিনকে সঙ্গে নিয়ে ইপিন বৌবাজারের মোড় থেকে আট-বি বাসে যখন উঠেছিল তখনো বেশ জোর বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু গ্রীষ্মের প্রথম দিকে বৃষ্টি, কয়েকদিন ধরে লোকে গরমে হাঁসফাস করছিলো, তাই এরকম বৃষ্টিতে পথচারীরা অনেকেই নির্বিচারে ভিজছিলো। ইপিন-বিপিনও মোটামুটি ভিজেই বৌবাজার দিয়ে হেঁটে এসে বাসে ওঠে।

ইপিনের আজো মনে আছে সেটা ছিলো রবিবারের বিকেল। আট-বি, শেয়ালদা হাওড়া দুই স্টেশন ছোঁয়া বাস, ছুটির দিনে রবিবারে নিত্যযাত্রীর অভাব থাকায় সকাল বিকেলে অনেকটা ফাঁকাই থাকে।

জামা কাপড় বৃষ্টিতে যেটুকু ভিজেছিলো, দোতলা বাসের ওপরে সামনের সিটে বসে হাওয়ার তোড়ে জামা শুকিয়ে গিয়েছিলো। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি তখনো পড়ছিলো, কিন্তু গায়ে তেমন লাগেনি। বরং সেলুনে চুলকাটার পরে যে গোলাপগন্ধ জল স্প্রে করে তার মতো আরামদায়ক, গোলাপের সুগন্ধ না থাকলেও টাটকা বৃষ্টির বিশুদ্ধ জলের গন্ধের মধ্যে একটা মাদকতা আছে।

নৃপেনবাবু বলেছিলেন দেশপ্রিয় পার্কের উল্টোদিকে লা কাফে রেঁস্তোরায় থাকবেন। ইপিনের লা কাফে সম্পর্কে তেমন পরিষ্কার ধারণা ছিলো না। একটু ডানদিকে সুতৃপ্তির চায়ের দোকান সে চেনে, সেই জন্যে নৃপেনবাবুকে সুতৃপ্তিতে থাকতে বলেছিলো।

কিন্তু নৃপেনবাবু বলেছিলেন, শনি-রবিবার সন্ধ্যেয় সকালে সুতৃপ্তিতে বড় ভিড় হয়। খুব গোলমেলে ভিড়।

মনোহরপুকুরের বাড়িতে থাকার সুবাদে একদিন বুঝে কিংবা না বুঝে এই ভিড়ে ইপিনও মিশে গিয়েছিলো।

কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

সেদিন আট-বি বাস থেকে ইপিন-বিপিন যখন দেশপ্রিয় পার্কের মোড়ে নেমেছিলো, বৃষ্টি থেমে গেছে, সন্ধ্যেও হয়ে গেছে। দেশপ্রিয় পার্কের মধ্যে কয়েকটা ব্যাঙ ডাকছে। রবিবারেব সন্ধ্যা, রাস্তাঘাট একটু ফাঁকা-ফাঁকা। দেশপ্রিয় পার্কের চারপাশ ঘিরে তখনো স্টলগুলো গড়ে ওঠেনি। রাসবিহারী এভিনিউটাও বাজার হয়ে ওঠেনি। বৌবাজার-শেয়ালদার দিক থেকে এলে কেমন মফঃস্বল-মফঃস্বল মনে হয়।

ছুটির দিন বলেই রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া লোকজন কম। অলস গতিতে কয়েকটা ট্রাম এদিক থেকে ওদিক যাচ্ছে।

বাস থেকে রাস্তার মোড়ে নেমে বিপিন ইপিনকে বললো। 'এই খানেই কোথায় যেন কয় বছর আগে জীবনানন্দ দাশ ট্রামে কাটা পড়েছিলেন।'

কবি বা কবিতা বিষয়ে ইপিনের তেমন কোনো উৎসাহ নেই। তবে ছোট বয়েস থেকেই বিপিনের একটু কবি-কবি, খামখেয়ালি ভাব আছে, সেটা ইপিন জানে। এ বয়েসে, কলকাতায় এসে সেই ভাবটা আরো বেড়েছে, সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

মোড় পার হয়ে দুই ভাই ওপারে সুতৃপ্তি রেঁস্তোরার সামনে এলো। রাস্তাঘাট ফাঁকা হলেও সুতৃপ্তির ভেতরটা লোকে গিজগিজ করছে, ভিড় উপচিয়ে এসে রাস্তায় পড়েছে।

একটু এগিয়ে গিয়ে লা কাফে। সেখানেও খুব ভিড়। ভিতরে ঢুকে সিগারেটের ধোঁয়া, ভিড়, চেঁচামেচির মধ্যে ইপিন নৃপেনবাবুকে খুঁজে পেলো না।

সাড়ে ছয়টার সময় ইপিনকে নৃপেনবাবু আসতে বলেছিলেন। ইপিন হাতঘড়িতে দেখলো

পৌনে সাতটা হয়েছে, খুব একটা কিন্তু দেরি হয়নি। নৃপেনবাবু কি অপেক্ষা না করেই চলে গেলেন। কিন্তু তাতো হবার কথা নয়, নৃপেনবাবুর নিজেরও প্রাপ্তিযোগ আছে আজকে।

বিপিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলো। ইপিনকে একাই বেরিয়ে আসতে দেখে বিপিন জিজ্ঞাসা করলো, 'ভিতরে নেই।' ইপিন মাথা নেড়ে না জানালো। তখন বিপিন ইপিনকে জিজ্ঞাসা করলো, 'নৃপেনবাবু কেমন দেখতে?' ইপিন অবাক হয়ে বিপিনের দিকে তাকালো।

বিপিন নিজেই বললো, 'রোগা, কালোমতন! ধুতি আর হাফশার্ট পরে?'

বর্ণনা মিলে যাওয়ায় ইপিন অবাক হতে বিপিন অঙ্গুলি নির্দেশ করে সামনের দিকে দেখালো। সত্যিই তাই, পাশে পুরানো রাসবিহারী এভিনিউয়ের ডাকঘরের সামনে এক সুবেশ যুবকের সঙ্গে নৃপেনবাবু নিবিষ্ট মনে কথা বলছেন আর এরই মধ্যে সন্ধানী দৃষ্টিতে ইতিউতি এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন।

ইপিন-বিপিন এগিয়ে আসতে তারা নৃপেনবাবুর নজরে এসে গেলো। নৃপেনবাবু হেসে এগিয়ে এলেন, বললেন, 'এই ভদ্রলোক সঙ্গে একটু কাজের কথা বলছিলাম। একটা পাসপোর্ট করে দিতে হবে একে। লা কাফের মধ্যে এত ভিড় এত হৈ-চৈ, কথা বলতে পারছিলাম না। কাজের কথা কি অত গণ্ডগোলে বলা যায়।

তারপর উঁকি দিয়ে পোস্টাফিসের কোলাপশিবল গেটের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে ডাক বিভাগের দেয়াল ঘড়িটা সেই সঙ্গে নিজের হাতঘড়িটাও মিলিয়ে দেখে নিয়ে নৃপেনবাবু বললেন, 'আপনারা একটু আগেই এসে গেছেন।' সাতটা বাজতে এখনো দশ মিনিট বাকি।'

'সাতটা নয়, আপনি সাড়ে ছয়টায় আসতে বলেছিলেন,' ইপিন বলতে পারতো, কিন্তু এত ছোট ব্যাপারে কথা না বাড়িয়ে সে বিপিনকে দেখিয়ে তাকে নৃপেনবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো। 'আমার ছোটভাই বিপিন।'

নৃপেনবাবু পাশের যুবকটির সঙ্গে ইপিন-বিপিনের আলাপ করিয়ে দিলেন, 'ইনি বিপিন, মিস্টার বিপিন দত্ত। ইঞ্জিনিয়ার। ওঁকে ধরে রেখেছি। ইপিনবাবুর সঙ্গে ওঁর একটু কাজ আছে।'

ইপিন ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না গলার বোতাম খোলা, গোলাপি হাওয়াই শার্ট, কালো ফুলপ্যান্ট আর জরির কাজ করা নাগরা জুতো পরা এই যুবকটির তার সঙ্গে কি কাজ থাকতে পারে?

আপাতদৃষ্টিতে একে মোটেই তার নিজের রুচির বা মনের লোক বলে মনে হয় না।

অবশ্য একটু পরেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো।

ভাড়াটে ফ্ল্যাটটায় দুটো ঘর আছে আর একশো পঁচিশ টাকা ভাড়া। এটা জানার পর ইপিনের মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিলো হয়তো বিপিন মেস ছেড়ে এখানে উঠে আসবে। তা হলে দুজনে মিলে ভাড়াটা গা-সহা হয়ে যাবে।

এ ছাড়াও ঠিকে লোক রেখে নিজের রান্না, চা-জলখাবারের বন্দোবস্ত করে নিলে খুব সুরাহা না হলেও মেস-হোটেলের খাবারের চেয়ে সে অনেক ভালো।

কিন্তু বিপিন একসঙ্গে থাকতে রাজি হয়নি। কেন বলা কঠিন, তবে সে মুখে বলেছিলো ওখান থেকে অফিসে, কলেজে যাতায়াত কঠিন হবে।

আজ সকালেই আইডিয়ালের আড্ডায় ইপিন নৃপেনবাবুকে বলেছিলো, 'ভাড়াটা আমার পক্ষে একটু বেশি হয়ে গেলো। ছোটভাই সঙ্গে থাকবে ভেবেছিলাম। কিন্তু সে থাকছেনা।'

নৃপেনবাবু বলেছিলেন, 'সন্ধ্যাবেলায় তো ফ্ল্যাটটার চাবি নিতে আসছেন। দেখা যাক এর মধ্যে কি করা যায়।'

ইপিনের আরো দু চারদিন পরে গেলেও আপত্তি ছিলো না। বিপিনের মেসে ভালই লাগছিলো।

কিন্তু নৃপেনবাবুই বলেছিলেন, 'জুন মাস থেকেই যখন ভাড়া দিচ্ছেন, পয়সা নষ্ট করে লাভ কি? যত তাড়াতাড়ি পারুন চলে যান।'

আজকেই আসা হবে এমন কথা নেই। তবে নৃপেনবাবুর সঙ্গে গিয়ে আজ সন্ধ্যায় ফ্ল্যাটের চাবিটা বাড়িওয়ালার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়ার কথা হয়েছে। জুন মাসের ভাড়া, এক মাসের অগ্রিম ভাড়া দিতে হবে। নৃপেনবাবুর মজুরি পরে অল্প অল্প করে দিলেই হবে।

ইপিনের হাতে শখানেক টাকা ছিলো। তাছাড়া টাঙ্গাইল থেকে পোস্টকার্ড এসেছে, বড়বাজারে চারশো নম্বর বাড়িতে পোস্টকার্ড নিয়ে দেখা করতে। সামনের সপ্তাহ নাগাদ সে টাকাটা পাওয়া যাবে। সেই ভরসায় সপ্তাহে টাকায় এক আনা সুদের হারে স্কুলের ক্যাশিয়ারবাবু নগেন্দ্র ভদ্রের কাছ থেকে দুশো টাকা ইপিন ধার করেছে। ইস্কুল বন্ধ, কিন্তু বোধহয় সুদের কারবারের জন্যেই প্রত্যেকদিনই দুপুরে নগেনবাবু স্কুলে বসেন, এমনিতে বলেন অবশ্য ইস্কুলের খাতাপত্র, হিসেব কিতেব ঠিক করি।

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে নৃপেনবাবু ইপিনের আর্থিক সমস্যার একটা আংশিক সমাধান সংগ্রহ করেছেন।

এই সমাধান হলো এই মিস্টার বিপিন দত্ত, এঞ্জিনিয়ার।

দেশপ্রিয় পার্কের পাশ ধরে দক্ষিণমুখী প্রায় দু ফারলং রাস্তা গেলে মনোহরপুকুর রোড। মনোহরপুকুর খুব পুরনো আর লম্বা রাস্তা। কালীঘাটে বসুশ্রী সিনেমার সামনে আরম্ভ হয়েছে, রাসবিহারীতে ত্রিকোন পার্ক পর্যন্ত চলে গেছে এঁকে বেঁকে। আগে আরো আঁকাবাঁকা ও লম্বা ছিলো। অশ্বিনী দত্ত রোড, পূর্ণদাস রোড সবই মনোহরপুকুরের মধ্যে ছিলো।

পূর্ণদাস রোডে এখনো যে ডাকাত-কালী রয়েছে, সেই ডাকাত-কালীর ডাকাত হলো মনোহর, তারই নামে পুকুর মনোহরপুকুর সেই থেকে মনোহরপুকুর রোড।

মনোহরপুকুর রোডের মাঝামাঝি জায়গায় একটা পুরনো দোতলা বাড়ি একতলার রাস্তার ওপরের দুটো ঘর। ফ্ল্যাট বলা যায় না। উঠোনের ওপাশে আরো তিনটে ঘর। কাঠের পার্টিশন দিয়ে আলাদা করা। উঠোনে একটা রান্নাঘর বাঁশের বেড়া দিয়ে আধাআধি ভাগ করা। ভিতরের বারান্দার দুপাশে দুটো বাথরুম।

যিনি ভাড়া দিচ্ছেন, তিনি সপরিবারে ওদিকের তিনটি ঘরে থাকেন। তিনি বাড়িওলা নন, একজন রিটায়ার্ড সরকারি কর্মচারী। অনেকদিনের পুরনো ভাড়াটে। পুরো একতলাটা দেড়শো টাকা ভাড়া দেন। এখন সামনের ঘর দুটো সোয়াশো টাকায় ভাড়া দিলে, একটু সাশ্রয় হয়। একটু বে-আইনি বটে কিন্তু বাড়িওয়ালা কোনো আপত্তি করে না।

রিটায়ার্ড ভদ্রলোকের নাম মনিলালবাবু। তিন মেয়ে, সবারই বিয়ে দিয়েছেন, স্বামী-স্ত্রী দুজনের পক্ষে ভিতরে তিনটি ঘরই যথেষ্ট। এদিকে জিনিষপত্রের দাম যা হয়েছে, পেনসনের টাকায় সংসার চালানো বেশ কষ্ট হয়ে উঠেছে।

বাড়িটা কিন্তু অন্য অর্থে ভালো। এমনিতে দক্ষিণমুখী।তাছাড়া পূবপাশেও একটা প্যাসেজ রয়েছে। ফ্ল্যাটবাড়ির তুলনায় আলো-হাওয়া যথেষ্টই বেশি। তবে এপাড়ায় চিরদিনই জলের একটু টানাটানি।

সেই তিনযুগ আগে ইপিন সোয়াশো টাকায় বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলো।কত কি বদল হয়ে গেলো। কলকাতা শহর বদলিয়ে গেলো। ইপিন বদলালো। বিপিন বদলালো। সে সময় ইপিনের ওজন ছিলো পঞ্চাশ কেজি এখন আশি কেজি।

সস্ত্রীক মনিলালবাবু বহুকাল গত হয়েছেন। একতলায় ওপাশের তিনটে ঘরও ইপিনই ভাড়া নিয়েছে।

আসল বাড়িওয়ালা কাশীতে না বৃন্দাবনে থাকতেন, দোতলা সারা বছরই প্রায় তালাবন্ধ হয়ে পড়ে থাকতো। এখনো তাই থাকে। তিনি একবার এসে পুরো একতলাটা ইপিনকে সাতশো টাকায় ভাড়া দিয়ে গেছেন।

সেই বাড়িওয়ালা বছর দেড়েক আগে মারা গেছেন। তিনি নাকি উইল করে কি এক আশ্রমকে বাড়িটা দান করেছেন। প্রত্যেক মাসের তিন তারিখে এসে সেই আশ্রমের স্বামীজিরা রসিদ দিয়ে ভাড়া নিয়ে যান। আজ কিছুদিন হলো আশ্রম ইপিনের ওপর একটা চাপ সৃষ্টি করেছে, বাড়িটা ছেড়ে দেওয়ার জন্যে। তারা নাকি এখানে স্টুডেন্টস ডে-হোম করবেন।

ইপিন জানে এ সব বাজে কথা। আসলে এ বাজারে দক্ষিণ কলকাতায় পুরো একতলা পাঁচখানা ঘর। ভাড়া অন্তত চারহাজার টাকা হবে, সঙ্গে সেলামি এক লাখ টাকা তো বটেই। আশ্রমিক সন্ন্যাসীরা টাকার ব্যাপারে গৃহীদের চেয়ে অনেক বেশি হিসেবি হয়, তাঁরা নিয়মিতই বিরক্ত করে যাচ্ছেন ইপিনকে।

তবে ইপিন সহজে বাড়ি ছাড়বে না। আর সেই বা যাবে কোথায়? তারও বয়েস হলো, রিটায়ার করার দিন খুব দূরে নয়। টাঙ্গাইলে ফেরার কোনো উপায় নেই। এদিকে এপারেও কোথাও বাড়িঘর কিছু নেই।

মনোহরপুকুরের এই ফ্ল্যাটের সঙ্গে ইপিনের জীবন জড়িয়ে আছে। সেদিন সেই দেশপ্রিয় পার্কের পাশ দিয়ে এ বাড়িতে প্রথম আসার সময় সে একবারো ঘুনাক্ষরেও ভাবেনি যে তার জীবন এ বাড়িতেই কাটবে।

লা কাফে থেকে আসার পথে, সঙ্গে বিপিন, নৃপেনবাবু আর নৃপেনবাবুর মিস্টার বিপিন দত্ত, আবার এক পশলা বৃষ্টি এলো।

ল্যান্সডাউন রোডের একটা গাড়ি বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে প্রস্তাবটা নৃপেনবাবুই দিলেন, ইপিন যদি অল্প কিছুদিনের জন্য ফ্ল্যাটটায় বিপিন দত্তের সঙ্গে ভাগাভাগি করে থাকে।

নৃপেনবাবু বললেন, 'মিস্টার দত্তের আপাতত কোনো থাকার জায়গা নেই। উনি মাস দুয়েকের মধ্যে পশ্চিম জার্মানিতে চলে যাচ্ছেন। টাকা পয়সা আধাআধি দেবেন। ভাড়ার রসিদ আপনার নামেই হবে।'

ইপিন মনে মনে একটা ব্যাপারে মজা পাচ্ছিলো। ছোট ভাই বিপিন তার সঙ্গে থাকতে রাজি হলো না। এদিকে অন্য এক বিপিন তার সঙ্গে থাকার জন্যে জুটেছে।

আপাতত বিপিন দত্তের সঙ্গে ভাগেই বাড়িটা নিয়ে নিলো ইপিন। মণিলালবাবু অবশ্য ইপিনের

মাসেই ভাড়ার রশিদ দিলেন।

টাকা মিটিয়ে বাড়িওয়ালার কাছ থেকে চাবি নিয়ে ইপিন ঘর দুটো খুলে ফেললো।

ঘরে আসবাবপত্র কিছু নেই। একপাশে দেয়ালে একটা পুরনো তক্তপোষ খাড়া করে দাঁড় করানো আছে। মনিলালবাবু বললেন, 'আপনি ইচ্ছে করলে ওটা ঘর থেকে বার করে উঠোনে নামিয়ে দিতে পারেন। পাঁচ ঘরের জিনিষ তিন ঘরে ঢোকাতে গিয়ে আমার ওদিকে আর জায়গা নেই। তারপর একটু থেমে মনিলালবাবু ইপিনকে বললেন, 'আপনি ইচ্ছে করলে প্রয়োজনমত ওটা ব্যবহারও করতে পারেন।'

আলাদা ইলেকট্রিক মিটার নেই। মাসের শেষে বিল এলে দুজনে ভাগ করে দিতে হবে। আপাতত একটা হোলডারে একটা পঁচিশ পাওয়ারের বালব জ্বলছে।

বালবটা জ্বালিয়ে, দরজা-জানলা খুলে দিয়ে মনিলালবাবুর তক্তপোষটা বাইরের ঘরের মধ্যেখানে পাতা হলো। সেদিন সন্ধ্যায় বেশ অনেকক্ষণ ঐ তক্তপোষে বসে নানারকম কথাবার্তা হযেছিলো। উলটো দিকের মিষ্টির দোকান থেকে দুকাপ চা এসেছিলো।

ঝড়ের মত বাতাস বইছিল। গরমের দিনের সন্ধ্যাবেলায় কলকাতাব এই বাতাসে একটা নেশা আছে। একবার বাতাসমুখী কোথাও বসে পড়লে আব উঠতে ইচ্ছে করে না।

মিষ্টার বিপিন দত্তের সঙ্গে পরিচয় হলো। ভদ্রলোকের বয়েস ইপিনের থেকে অনেক বেশি হবে। বিপিন দত্ত ঠিক সাধারণ পর্য্যায়ের লোক নন। কোথায় একটা গোলমাল আছে।

একটু কথাবার্তার পরই বিপিন দত্ত ইপিনকে বললেন, 'আমি আবার কখনো একটু মদটদ খাই, আপনার অসুবিধে হবে না তো।'

অসুবিধে হলেও এখন আর কোনো উপায় নেই। একটু আগেই দত্তের কাছ থেকে দেড়শো টাকা নিয়েছে ইপিন, সুতরাং ইপিন বললো, 'ওরকম দোষ আমারো একটু আধটু আছে। তা ছাড়া আপনি তো আর বেশি দিন এখানে থাকছেন না।'

কথায় কথায় প্রকাশ পেলো মিস্টার দত্ত পুরো এঞ্জিনিয়ার নন, ডিগ্রি বা ডিপ্লোমাও নেই। তবে গড়িয়াহাটে সরকারি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে ফিটারের কাজের ট্রেনিং নিয়েছেন। দক্ষ শ্রমিকের বিশেষ করে ফিটার, টারনার এই জাতীয় কাজ জানা লোকের জার্মানিতে বিশেষ চাহিদা রয়েছে।

মিস্টার দত্ত একটু চালিয়াৎ হলেও, মন খোলা কথাবার্তা বলেন। হঠাৎ প্রস্তাব দিলেন একটু হুইস্কি খেলে হতো। গৃহপ্রবেশ সেলিব্রেট করি।'

ইপিন সাহস পেলো না। একেবারে নতুন বাড়িতে ঢুকে প্রথম দিনেই মদ্যপান, তা ছাড়া পানীয় সংগ্রহ করা, জল, গেলাস—অনেক হাঙ্গামা রয়েছে।

বাড়িতে ঢোকার পবেই একটু পরেই বিপিন চলে গিয়েছিলো। কলেজস্ট্রিটে বন্ধুর কাছে যাবে, সেখান থেকে দশটা নাগাদ মেসে চলে যাবে। বলে গেলো, 'দশটার মধ্যে মেসে ফিরে আসিস। আজ কিন্তু ফিস্ট।'

সে সময়কার মেসগুলোতে ফিস্টের ব্যাপারটা খুব মজার ছিলো। সারা মাস ধরে ডাল-ভাত কুচো মাছ। প্রতি মাসে একজন করে ম্যানেজাব হতো। এর মধ্যে যে যতটা সাশ্রয় করতে পারতো তাই দিয়ে মাসের শেষে ফিস্ট, মহাভোজ। পোলাও, মাংস, দই, মিষ্টি।

রাত দশটায় ফিস্টের সময়। সেদিন ইপিন মেসে ফিরতে পারেনি। কিন্তু তার আগে তার একটা নতুন অভিজ্ঞতা হলো। এই প্রথম ইপিন কোনো পানশালায়, অর্থাৎ বারে মদপান করলো।

বিপিন চলে যাওয়ার একটু আগেই নৃপেনবাবু চলে গিয়েছিলেন। দক্ষিণ দিক থেকে সমুদ্রের

বাতাস আসছিলো, একটু আগের বৃষ্টির ভেজাঠাণ্ডা ভাব সে বাতাসে জড়ানো।

বিপিন দত্ত নামক সদ্যপরিচিত ভদ্রলোকটি, যিনি আগামী কিছুদিন তাঁর ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হবেন, তাঁর সঙ্গে অন্ধকার ঘরে একটা পুরনো ভগ্নপ্রায় তক্তপোষের ওপরে বসে একটু গল্পগুজব করতে ভালোই লাগছিলো ইপিনের।

হঠাৎই মিস্টার দত্ত প্রস্তাব দিলেন, 'চলুন কোথাও গিয়ে বসা যাক, বাসায় যখন হচ্ছে না।'

যারা নিয়মিত মদ্যপান করে তাদের মধ্যে সন্ধের পরে কিংবা ছুটির দিনে দুপুরে, 'কোথাও গিয়ে বসা যাক', কথাটার একটা অন্য রকম মানে আছে। মানেটা হলো, চলো কোথাও গিয়ে মদ খেতে বসি, কোনো বারে, বন্ধুবান্ধবের আড্ডায় কিংবা বাংলা ভাটিখানায়।

ইপিন সে সময় এই বাক্যবন্ধের বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলো না, সুতরাং সে বিপিনের অনুরোধ শুনে বললো, 'কোথায় যাবো? এখানেই তো বেশ বসে আছি।'

ইপিনের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন বিপিন দত্ত। বললেন, 'দূর মাস্টারমশায়। তুমি দেখছি একেবারে শিশু। এখানে অন্ধকার ঘরে বসে কি হবে? চলো কোথাও গিয়ে একটু দারুশিল্পের চর্চা করা যাক।'

ইপিন এবার বুঝলো। দারু মানে মদ। হিন্দি সিনেমায় দারুর ছড়াছড়ি, সে আবার হিন্দি সিনেমার ভক্ত, মধুবালা-নার্গিস তার বাল্যসহচরী, দিলীপকুমার-রাজকাপুরের সঙ্গে ইপিন বড় হয়েছে। সেই স্কুলে পড়ার সময়ে টাঙ্গাইলে কালী সিনেমায় শুরু তারপর কলকাতা এসে ধর্মতলায় প্যারাডাইস, ওরিয়েন্ট কিংবা বাড়ির কাছে ওয়েলসলিতে ক্রাউন, ম্যাজেস্টিক। সব জাতের হিন্দি বই ইপিন দেখে। এখন হিন্দি সিনেমায় মদের প্রতিপত্তি খুব বেশি, সবচেয়ে জনপ্রিয় সহ অভিনেতা ও কমেডিয়ানের নামকরণই হয়েছিলো বিখ্যাত বিলিতি মদের নামে 'জনিওয়াকার।'

সুতরাং বিপিনের প্রস্তাব অনুধাবন করতে ইপিনের কষ্ট হলো না। দারুশিল্প চর্চা মানে মদ্যপান, বিপিন দত্ত কোথাও গিয়ে বসতে বলছেন। দেখাই যাক, কোথায় নিয়ে যায়, দশটা নাগাদ মেসে ফিরতে হবে এখনো হাতে দেড় ঘণ্টা সময় আছে। বাড়ি ভাড়ার ব্যাপারে বিপিন দত্ত অংশীদার হওয়ায় তাঁর অংশটা তিনি মিটিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নৃপেনবাবুর দস্তুরিও সম্পূর্ণ বিপিন দত্ত দিয়েছেন। ফলে এই মুহূর্তে ইপিনের পকেটে সামান্য কিছু টাকাও আছে। হঠাৎ কোথাও গিয়ে বেকায়দায় পড়ার মত অবস্থা নয়।

এছাড়া মিস্টার দত্ত লোকটাকে খুব আকর্ষণীয় বোধ হচ্ছে ইপিনেব। ঠিক এই চরিত্রের লোকের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ তার হয়নি। ইনি ইপিনের জগতের বাইবের লোক।

মিস্টার দত্ত ইপিনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। দেখা গেলো তিনি খুব বিত্তশালী ব্যক্তি, অন্তত ইপিনের তখনকার আর্থিক অবস্থার তুলনায়। রাস্তা বেরিয়েই একটা ট্যাক্সি ধরলেন মিস্টার দত্ত। সরাসরি ধর্মতলার মোড়ে, মেট্রোর উলটো দিকে। চৌরঙ্গির রাস্তা পেরিযে দত্তের সঙ্গে মেট্রোর পাশের গলি দিয়ে একটু এগিয়ে বাঁ দিকে গেলে রেডিয়ো, গ্রামোফোনের দোকানগুলোর মধ্যে একটা পানশালা। বাইরে কোনো সাইনবোর্ড নেই কিন্তু বে-আইনি নয়। খদ্দেররা বলে ছোট ব্রিষ্টল, আসলে ব্রিস্টল হোটেলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, সামনের দিকে চৌরঙ্গিতে পুরনো ব্রিস্টল হোটেলটা ছিলো তারই নামে ডাকনাম।

বিশাল হলঘর। কফিহাউসের তিনগুন হবে। লোকে-লোকারণ্য, টেবিলে টেবিলে সবাই কথা বলছে, কারো কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে না। হাটে কিংবা মেলায়, যেরকম হয় সেই রকম একটা গমগমে শব্দ, সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর ছেয়ে গেছে। গাঁজারও গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, কেউ

কেউ হয়তো সিগারেটের মধ্যের তামাক ফেলে দিয়ে তার মধ্যে গাঁজা ঢুকিয়ে টানছে। ঘরে আলো তেমন জোরালো নয়। তবে জায়গা তেমন খারাপ নয়, ইপিন যা ভয় করেছিলো সেরকম নয়। কোনো মহিলাকে বারের মধ্যে দেখা গেলো না।

আবছা আলোয় ঘরের পশ্চিম প্রান্তে দুজনের মত একটু জায়গা পাওয়া গেলো। দেয়াল জোড়া কাঠের বেঞ্চির এক পাশে দুটো সিট।

তখন কলকাতায় জিন খাওয়ার খুব চল। দত্ত দুটো জিনের অর্ডার দিলেন, লেবু বা লেমনেড নয়, শুধু সাদা জল আর জিন। সোড়া বা লেমনেড নিলে অতিরিক্ত তিন-চার আনা লাগবে। তবে পানীয়ের সঙ্গে আদাছোলাভেজা, ঝুড়িভাজা বাদাম ফ্রি।

দত্ত বললেন, 'এটাই আইন? লোকে যাতে খালি পেটে মদ না খায়, লিভার পচিয়ে না ফেলে তাই দোকানীকে বিনি পয়সায চাট জোগাতে হয়।

জিনের পেগ দু টাকা করে। অল্প কিছুদিন আগেও নাকি পৌনে দুটাকা ছিলো। শ্যামাপ্রসাদ বর্মন ডুবিয়েছে।

বিপিনের কথা শুনে ইপিন প্রশ্ন করলো, 'শ্যামাপ্রসাদ বর্মন কে?'

দত্ত বলেন, 'আবগারি মন্ত্রী। দিনাজপুরের লোক। প্রতিবছব ট্যাক্স বাড়িয়ে যাচ্ছে। এবারেও বাড়িয়েছে।'

কম-কম কবে ইপিন তিন পেগ এবং দত্ত পাঁচ পেগ জিন খেলো। জিন খেলে কেমন একটা মন খারাপ করা ভাব হয়। ইপিন চুপচাপ ঝিম মেরে বসে ছিলো। কিন্তু অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিলো দত্ত।

ইপিন লক্ষ্য করলো, সে ইতিমধ্যে দত্তের কাছে 'তুমি' এবং 'মাস্টারমশায' হয়ে গেছে। অবশ্য এতে তার আপত্তির কিছু নেই, দত্ত তার থেকে বযসে অনেক বড়ো, অন্ততঃ আট-দশ বছর বড় হবে। আর, মাস্টারমশায়, ইস্কুলের ছাত্রেরা শুধু নয়, তাদেব অভিভাবকেরা, ইস্কুলের পাড়ার লোকজন, রিক্সাওয়ালা, দোকানদারেরা সবাই তো মাস্টারমশায় বলছে তাকে।

এসব বাদ দিয়েও দত্তের গলায় একটা হৃদ্যতার সুর আছে, সেটাও ইপিনের ভালো লাগছিলো। পিসি-ঠাকুমা মরে যাওয়ার পরে এই অনাত্মীয় রুক্ষ শহরে নিজেকে কেমন পরগাছার মত মনে হচ্ছিলো ইপিনের। দত্তের আন্তবিকতায় সে যথেষ্টই খুশি হলো। তিন পেগ জিনের নেশাব মাথায় স্মৃতি ও বেদনাভরা মনে দত্তকে তার বেশ ভালো লাগছিলো।

সেদিন রাতে ছোট ব্রিস্টলের টেবিলে দত্ত কত কি কথা বলেছিলেন। ইপিনের আবছা আবছা মনে আছে।

দত্তের বাপ খুলনা জেলার ঝিনাইদহে ডাক্তারি করতেন। সাধারণ এল এম এফ ডাক্তার, পুরনো দিনের সেই রংপুর কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের পাশ করা লাইসেন্সিয়েট ডাক্তার।

বিপিন দত্তের বাপ ডাক্তার চিন্তামণি দত্তের ডাক্তারি ডিগ্রিতে খামতি ছিলো কিন্তু তাঁর বুদ্ধি ও বিবেচনা ছিলো, প্রচুর হাতযশ হয়েছিলো ঝিনাইদহে। সদর খুলনা থেকে পর্যন্ত রোগী আসতো

তাঁকে দেখাবার জন্যে, রোগীরা আত্মীয়েরা বলতো, ঝিনিদার চিন্তা ডাক্তারের হাতে না বাঁচলে ডাক্তার বিধান রায়ও বাঁচাতে পারতো না।

উনিশশো সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগষ্ট সকালে ঝিনাইদহ বাজারে বহু পুরনো পারিবারিক ওষুধের দোকন 'দত্ত ফার্মেসী'-র টিনের চালার চূড়ায় ভারতের তেরঙা পতাকা উড়িয়ে দিলেন চিন্তামণি ডাক্তার।

দত্ত ফার্মেসীর প্রতিষ্ঠাতা চিন্তামণির বাবা নয়নমণি দত্ত তখনো বেঁচে। তিনি ছিলেন সেকালের পাশ করা কম্পাউণ্ডার, চুটিয়ে ডাক্তারিও করেছিলেন।

প্রচুর বন্দেমাতরম, জয় হিন্দ, তেরঙা পতাকা ওড়ানোর পর স্বাধীনতার তৃতীয় দিবসে জানা গেলো ঝিনাইদহ-সহ খুলনা পুরোপুরি পাকিস্তানে পড়েছে। তার বদলে মুর্শিদাবাদ জেলা নাকি হিন্দুস্থানে গেছে।

খবরটা শোনামাত্র নয়নমণি সিদ্ধান্ত নিলেন, পাকিস্তানে থাকবো না, আর যেতে যখন হবেই মুর্শিদাবাদে যাবো, খুলনার বদলে যে জেলাটা হিন্দুস্থান হয়েছে।

কেউ কিছু টের পাওয়ার আগে 'দত্ত ফার্মেসী' গুটিয়ে মুর্শিদাবাদে চলে গেলেন নয়নমণি ডাক্তার। কাশিমবাজারে গিয়ে নতুন করে ডাক্তারখানা খুললেন, নাম 'দি নিউ দত্ত ফার্মেসী' তার নিচে লেখা

'কাশিম বাজার
মুর্শিদাবাদ
হিন্দুস্থান।'

হিন্দুস্থান শব্দটা নয়নমণির মাথার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে এই অজুহাতে একদিন থানা থেকে ছোট দারোগা এসে সাইনবোর্ড থেকে 'হিন্দুস্থান' কথাটা মুছে দিতে বললেন।

পাকিস্তানে সব খুইয়ে, সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে নয়নমণি এখানে এসেছেন, তিনি সহজে ছাড়ার পাত্র নন। দারোগাকে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'হিন্দুস্থান লিখবো নাকি পাকিস্তান লিখবো ?'

বচসা, চিৎকার, চেঁচামেচি প্রচুর হয়েছিলো। নয়ণমনিকে থানায় ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়, শাসিয়ে দেওয়া হয় যদি তিন দিনের মধ্যে সাইনবোর্ডে 'হিন্দুস্থান' মুছে না দেওয়া হয়, থানা থেকে সাইনবোর্ড বাজেয়াপ্ত করবে।

নয়নমণিকে অবশ্য সাইনবোর্ড মুছতে হয়নি। তিনি থানার মধ্যেই রাগারাগি করতে করতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে যান। হতবাক পুলিশ কর্মচারীরা ধরাধরি করে তাঁকে থানার গাড়িতে করে লালবাগ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই পরের দিন সকালে নয়নমণির মৃত্যু হয়।

এসব উনিশশো সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ সালের কথা।

নয়নমণি দত্ত 'নিউ দত্ত ফার্মেসি'তে বসতে শুরু করেছিলেন। প্রথম প্রথম ওষুধ কিছু কিছু বিক্রি হতো। কিন্তু রোগী বিশেষ আসতো না, যা বা দুয়েকজন আসতো তারা বিনি পয়সার রোগী।

স্থানীয় লোকেরা বেশিরভাগ অতি দরিদ্র মুসলমান। নিতান্ত খেতমজুরি করে অথবা জন খেটে সংসার চালায়। দু'বেলা পেটের অন্ন সংগ্রহ করাই কঠিন, অসুখ বিসুখে ওষুধ বা ডাক্তার এদের কাছে বিলাসিতা। মারাত্মক কোনোরকম অসুখে আক্রান্ত হলে বহরমপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে

যাওয়া হয়।

দু'চার ঘর বনেদি ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার কাছাকাছির মধ্যে ছিল। কিন্তু তারা অনেকেই পাকিস্তানে চলে গেছে কিংবা যাওয়ার মুখে আছে। বেশ একটু এগিয়ে গঙ্গার ওপারে রাজশাহী জেলা, সেদিক থেকে হিন্দু মধ্যবিত্তেরা এদিকে চলে আসছে। তাদের সঙ্গে জমি ও সম্পত্তি বিনিময় করে অনেকেই চলে যাচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে।

নয়নমণি দত্ত অবশ্য ঝিনাইদহ থেকে বিষয়, সম্পত্তি দোকান যতটা সম্ভব বিক্রি ও বিলিব্যবস্থা করেই চলে এসেছিলেন। চলে আসার হিড়িক ভাল করে আরম্ভ হওয়ার আগেই বিক্রিবাটা হয়েছিল বলে মোটামুটি ন্যায্য দামই পেয়েছিলেন। কিছুদিন পরেই ভারত-পাকিস্তান দু দেশেই দাঙ্গা শুরু হলে অনেককে সর্বস্বান্ত হয়ে উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল। বিক্রি করার সুযোগ মেলেনি, সাহসও হয়নি।

এ সব পুরনো কথা। সেইসব দুঃখ, কষ্ট ও গ্লানি যারা সহ্য করেছিলো আজ তাঁদের অধিকাংশেরই ঠিকানা পরলোক।

চিন্তামণি ডাক্তারকে অবশ্য খুব একটা কষ্ট করতে হয়নি। বাবার মৃত্যুর পর ক্রমশ তাঁর পশার হয়েছিল, ঝিনাইদহে যে রমরমা পশার তিনি ফেলে এসেছিলেন তার চেয়েও বেশি বিস্তৃত পশার হয়েছিল মুর্শিদাবাদে। গঙ্গার এপারে-ওপারে, এমনকি লালবাগ, বহমরপুর থেকে তাঁর কল আসত।

ডাক্তার চিন্তামণি দত্তের পশারের সুবাদে পুত্র বিপিন দত্তের হাতে উপযুক্ত বয়েসে যথেষ্ট কাঁচা পয়সা এসেছিল। এবং বলাবাহুল্য বিপিন দত্ত সে টাকার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করেছিলেন। এদিন সন্ধ্যাতেও বিপিন দত্ত পৈতৃক অর্থের সুন্দর সদ্ব্যবহার করলেন, ইপিনকে একটি পয়সাও দিতে দিলেন না। শুধু পানীয় নয়, চমৎকার খাবারও এল।

একটি লোক ঘুরে ঘুরে টেবিলে টেবিলে আলুভাজা দেয়, এক ঠোঙা ভর্তি ব্যসন দিয়ে ভাজা আলু, দাম আট আনা, এক টাকা। চমৎকার ঝাল-নুন ছেটানো বেসনে ভাজা মুচমুচে আলুভাজা। মানুষের জিভের জন্যে এমন লোভনীয় খাদ্য খুব কম আছে।

এছাড়াও খাওয়া হলো শুকনো মাংস আর পরটা। সেটাও বারের বাইরে থেকে একজন বেয়ারা নিয়ে এল। শুকনো মাংসের সঙ্গে একটু ঝাল সস্, ঝাঁঝালো সাদা কাসুন্দি, এক টুকরো লেবু, আদার কুচি, কাঁচা লঙ্কা।

মদের নেশার মুখে এসব খাবার খুব ভাল লাগে। ইপিনের এত ধারণা ছিলো না। সে পিসি ঠাকুমার ওখানে সাদা জল দিয়ে এক আউন্স ব্র্যাণ্ডি চুকচুক করে খেতো। চাট খাওয়া ব্যাপারটা সম্পর্কে বোধ ছিল না।

আজ ইপিনের এত ভালো লাগলো এই ছোট ব্রিস্টলে। সে একদম জমে গিয়েছিলো খেয়ালই করে নি রাত দশটা বেজে গেছে। মেসের ফিস্টে যাওয়ার সময় চলে গেল।

সাড়ে দশটার সময় একটা ঘণ্টা বাজলো। বিপিন দত্ত ইপিনকে বললেন, 'এবার বার বন্ধ হবে। এরপরে আর ড্রিঙ্ক দেবে না।' ইপিন কিছু বলার আগেই বেয়ারাকে তুড়ি দিয়ে ডেকে বিপিন দশ টাকার নোট দিয়ে বেয়ারাকে কি অর্ডার দিলেন। ছোট ব্রিস্টলে এটাই দস্তুর, অর্ডার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিয়ে দিতে হয়।

একটু পরে বেয়ারা দুটো গেলাস হাতে করে এল। দুটোতেই আধ গেলাস করে পানীয়। প্রথমে ইপিন বুঝতে পারেনি, এটা হল দুটো ডাবল পেগ, একটা বিপিন দত্তের নিজের জন্যে, অন্যটা ইপিনের জন্যে আনিয়েছে।

অল্প সময়ের মধ্যে তিন গেলাস জিন খেয়েছে ইপিন, তার পক্ষে এর চেয়ে বেশি সামাল

দেওয়া কঠিন। একটু আগে বাথরুমে গিয়েছিল। তখন টের পেয়েছিল মাথাটা একটু ঘোরাচ্ছে, পা দুটোও কাঁপছে। বাথরুম করে বেরোনোর মুখে প্রায় পড়েই গিয়েছিল। খুব সাবধানে টেবিলে ফিরে এসেছে।

এখন তার ওপরে এই দু পেগ খেতে হলে কেলেঙ্কারি কাণ্ড ঘটে যেতে পারে। একটু আপত্তি করলো ইপিন, দত্ত সেটা পাত্তা দিলেন না। তবে বিপিন গেলাস থেকে একটুখানি ঢেলে নিজের গ্লাসে নিয়ে নিলেন।

এরই মধ্যে পানশালার সমস্ত আলোগুলো হঠাৎ নিবে গিয়ে, দুটো আবছা আলো জ্বলে উঠলো। লোডশেডিংয়ের যুগ হলে ইপিন ভাবতে পারতো তাই হয়েছে। কিন্তু তা নয়, দত্ত ইপিনকে বোঝালেন, প্রথমে ঘণ্টা, তারপর আলো নেবানো, এসব হলো বার বন্ধ করার নোটিশ। মাতালদের হঠাৎ কোনো এক সময়ে বার করে দিতে গেলে গোলমাল হয় তাই এই রকম নোটিশের আয়োজন।

এরপর দত্ত বললেন, 'এবার উঠতে হয়, নিন তাড়াতাড়ি শেষ করুন।'

এই সময় দরজার কাছে বিরাট একটা হট্টগোল শোনা গেল, একটা ভরা গলায় ধমকও শোনা গেল।

বিপিন দত্ত সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'সেরেছে।'

ইপিন কিছু না বুঝে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন? কি ব্যাপার? পুলিশ-টুলিশ এল নাকি?' সে অনেকবার শুনেছে রাতের দিকে খারাপ জায়গায় অনেক সময় পুলিশ হানা দেয় দাগি আসামীর খোঁজে, কিংবা বেআইনি কিছু হচ্ছে কিনা দেখার জন্যে।

বিপিন দত্ত অবশ্য আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে, 'না, না। পুলিশ টুলিশ নয়। শক্তিবাবু খালাসিটোলা সেরে এখানে এলেন। একটু আগেই আমাদের ওঠা উচিত ছিলো।'

নেশার মাথায় ইপিন এ ধরনের কথার কোনো মাথামুণ্ডু ধরতে পারলো না। ইতিমধ্যে শক্তিবাবু টলতে টলতে তাদের টেবিল পর্যন্ত চলে এসেছেন। অদ্ভুত দৃষ্টিশক্তি ভদ্রলোকের, ওই আলো-আঁধারিতেও বিপিনকে একবার দেখেই চিনতে পেরেছেন।

আর সেকি চেনা, কি আহ্লাদ। শক্তিবাবু বিপিন দত্তকে জাপটিয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলেন। শক্তিবাবুর চোখ থেকে চশমাটা পড়ে গিয়েছিলো, সেটা মেঝে থেকে তুলে নিলো ইপিন না হলে শক্তিবাবুর পায়ের চাপেই ভেঙে চুরমার হয়ে যেতো।

আলিঙ্গন পর্ব আর শেষ হতে চায় না। অবশেষে বিপিন দত্তই শক্তিবাবুকে টেনে পাশের একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

ঠিক চেয়ারে বসার অবস্থায় তিনি আর তখন নেই। একদিক কাত হয়ে যাচ্ছেন। এরই মধ্যে খরদৃষ্টিতে একবার টেবিলের ওপরে দেখে নিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ইপিনের জিনভর্তি গেলাসটা তুলে এক চুমুকে খেয়ে নিলেন, মুখে একটা পরিতৃপ্তির শব্দ উঠলো, 'আঃ।'

ইপিনের পানীয়টা শেষ করে গেলাসটা নামিয়ে শক্তিবাবু তাকে খুব ভালভাবে নিরীক্ষণ করলেন। ইপিন তখন চশমাটা শক্তিবাবুকে এগিয়ে দিল।

বিপিন দত্ত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ইপিন চৌধুরীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই নেশার মধ্যেও শক্তিবাবুর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রবল। চশমা খুলে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ইপিনের দিকে, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা ইপিন-বিপিন দুই ভাই না।'

ইপিন বললো, 'সেটা ঠিক। কিন্তু ইনি বিপিন দত্ত, আমার ছোট ভাই বিপিন আলাদা। সে অনেক ছোট। তাকে চিনলেন কি করে?'

'কি করে?' শক্তি একটু থামলেন, তারপর বললেন, 'বিপিন তো খুব ভালো ছেলে। আমার কাছে উল্টোডাঙ্গায় গিয়েছিলো, কফি হাউসেও দেখা হয়। তুমি তো যাদবপুরে মাস্টারি পেয়েছো?'

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কথা শুনে তাজ্জব হয়ে গেল ইপিন। এই বেসামাল লোকের এমন স্মৃতিশক্তি অকল্পনীয়। কবে বিপিন কি বলেছে, সেটা মনে রেখে দিয়েছেন।

বার থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। তখন আর মেসে ফেরা যায় না। তাছাড়া শক্তি সঙ্গে রয়েছেন। শক্তি আরো মদ খাবেন বলে বায়না করছিলেন। কিন্তু বিপিন দত্ত শক্তি এবং ইপিনকে ট্যাক্সিতে করে মনোহরপুকুরের নতুন বাসায় নামিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন। শক্তিদা, এখানে থাকুন। আমি যাই, রাত হয়ে গেছে। আমার আরো ভালো যাওয়ার জায়গা আছে।' এই বলে বিপিন দত্ত ট্যাক্সির মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন।

বিপিন দত্তের কল্যাণেই জীবনের অন্য একটা দিকের সঙ্গে ইপিনের পরিচয় হয়েছিল।

ইপিনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এবং এক সঙ্গে বাড়ি ভাড়া নেওয়ার পরে বড় জোর মাস তিনেক বিপিন দত্ত কলকাতায় ছিলেন। বোধহয় সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ দেশ ছেড়ে চলে গেলেন।

এমনিতে অমায়িক, সজ্জন ভদ্রলোক। দিলদরিয়া। কিন্তু দত্তের চরিত্রদোষ ছিল। দত্ত মদ্যপ এবং লম্পট দুইই ছিলেন। সাধারণত মাতালেরা লম্পট হয় না। লাম্পট্য খুবই সূক্ষ্ম ব্যাপার, সে বেহেড মাতালদের কর্ম নয়। লম্পটেরা মদ খায় না তা নয়, কিন্তু তারা মেপে খায়, মাতাল হয় না। তবে এর ব্যতিক্রমও নিশ্চয়ই আছে। বিপিন দত্ত, তেমনই একটি ব্যতিক্রম।

প্রথম দিকে ইপিন ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। সে বয়েস বা অভিজ্ঞতা তার ছিল না। বিপিন কদাচিৎ এ বাড়িতে রাত্রিবাস করেছেন। রিপন স্ট্রিটের একটা ভাড়ার দোকান থেকে খাট-বিছানা বিপিন দত্ত ভাড়া করে এনেছিলেন। বলেছিলেন, 'এটা স্ট্যাণ্ডবাই। আমার অন্য একটা থাকার জায়গা আছে।' তবে তাঁর কাছে ডুপ্লিকেট চাবি ছিল, যখন ইচ্ছে আসতে পারতেন। ইপিনকে বলেছিলেন, 'মাঝে মধ্যে দুপুরের দিকে একটু রিল্যাক্স করার জন্যে আসতে পারি।'

'আমার ঠাকুমা আমার নাম রেখেছিলেন ভাগ্যবতী,' বলে ফর্সা মেয়েটি একটু করুণ হাসলো, তারপর বললো, 'তবে সবাই আমাকে কাজল বলে ডাকে।'

একদিন বিকেল বেলা স্কুল থেকে ফিরে ইপিন দেখে বিপিন দত্তের বিছানায় একটি মেয়ে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

দরজা খোলার শব্দে মেয়েটি উঠে বসে বুকের আঁচল ঠিক করে মাথায় এলো চুলের গোছা জড়াতে জড়াতে একটা হাই তুলে বললো, 'আমি বিপিনের মাসতুতো বোন, আমার নাম কাজল।'

কাজল যেমন রোগা, তেমনি ফর্সা। দুই চোখের কোনায় কালি। তবু শরীরটা আঁটসাট। সারা মুখে বেদনা নাকি মমত্ব মাখানো। দেখলেই মায়া হয়। সেদিন কাজল রান্নাঘরে গিয়ে নিজের হাতে চা বানালো। ইপিনের সঙ্গে বসে চা খেয়ে, পেয়ালা ধুয়ে রেখে বাথরুমে স্নান করে কাজল সেদিন নিজের বাড়ি থেকে যেভাবে বেরোয় সেভাবে বেরিয়ে গেল। ইপিন দরজা পর্যন্ত

এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আবার আসবেন।' কাজল বলল, 'আসতেই হবে।'

বিপিন দত্ত যাওয়ার আগে কিন্তু কাজলের সঙ্গে আর ইপিনের দেখা হয়নি।

দেখা হল বিপিন দত্ত যে সপ্তাহে জাহাজে চড়লেন, তার পরের সপ্তাহের শুক্রবার সন্ধ্যায়। স্কুল থেকে বাসায় ফিরে ইপিন দেখে বাড়ির সামনের ফুটপাথে কাজল দাঁড়িয়ে।

ইপিন তাড়াতাড়ি দরজা খুলে কাজলকে ভিতরে নিয়ে বসাল।

কাজল ঘরে ঢুকেই অতি রুক্ষভাবে ইপিনকে জিজ্ঞাসা করলো, 'বিপিনদাব কি শরীর খারাপ করল ?'

ইপিন বলল, 'শরীর খারাপ করবে কেন ? বিপিনবাবু তো জার্মানিতে চলে গেছেন।'

একটু থমকিয়ে গিয়ে, একটু অন্যমনস্কভাবে কাজল বললো, 'কবে গেল ?'

ইপিন জবাব দিল, 'এই তো গত শনিবার।' তারপর বলল, 'আমি, আবো অনেকে, ওকে হাওড়া স্টেশনে সি-অফ করে এলাম। ভেবেছিলাম আপনিও আসবেন।'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো কাজল, 'শুক্রবারও দেখা হয়েছে, এই ঘবে এই বিছানায়। আমাকে কিছু বলেনি।' তারপর শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললো, 'জানেন আমি বিপিনের মাসতুতো বোনটোন কিছু নই। সপ্তাহে দু'দিন দুপুরে ওর কাছে আসতাম। মাসে দুশো করে টাকা দিতো।'

ইপিন রীতিমত ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলো এসব কথা শুনে, সে বলল, 'মিস্টাব দত্ত এক হাজার টাকা রেখে গেছেন আমার কাছে। আপনার কাছে কি একটা ধার করেছেন, সেটা শোধ দিয়ে দেওয়ার জন্যে।' এই বলে ইপিন সামনের ড্রয়ারটা খুলে দশ টাকার নোটের হাজার টাকার একটা বাণ্ডিল বার করে কাজলের হাতে দিল।

কাজল সামান্য একটু দ্বিধা করে তারপর নোটের গোছাটা নিয়ে হাতের বহু ব্যবহৃত ভ্যানিটি ব্যাগটার মধ্যে সেটা রেখে ইপিনকে জিজ্ঞাসা করল, 'তা হলে মিস্টার বিপিন দত্তের ধার শোধ হয়ে গেল।'

আবার বোধহয় ঝরঝর করে কাঁদতে যাচ্ছিল কাজল, তার আগেই ইপিন উঠে গিয়ে বলল, 'সেদিনের মতো একটু চা করবেন ? দুজনায় মুখোমুখি বসে খাই।'

সেদিন ছোট ব্রিস্টল থেকে বেরোনোর পর প্রায় জোর করেই বিপিন দত্ত শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে এসেছিলেন।

শক্তি প্রথমে ক্ষীণ আপত্তি কবেছিলেন, তারপর ট্যাক্সিতে ওঠেন। ট্যাক্সিতে উঠেই তিনি ঝিমিয়ে পড়েন। তবে একটু পরে সামান্য চাঙ্গা হয়ে জোর করতে থাকেন, 'ট্যাক্সি থামাও।' বক্তব্য হলো, নেমে আরো কোথাও পান করতে হবে, এখনও অনেক জায়গা খোলা আছে।

কিন্তু পার্ক স্ট্রিট অঞ্চল পেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি বুঝতে পারলেন আজ রাতে তাঁকে বিপিন আর পান করতে দেবে না। তখন কর্কশ কণ্ঠে বিপিনকে বললেন, 'তুমি আমাকে এখানে নামিয়ে দাও। তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো ? এই ট্যাক্সি রোকো।'

ট্যাক্সিওয়ালা থামেনি, সে সওয়ারিকে চেনে, বহুবাব এই অবস্থায় দেখেছে। ট্যাক্সি মনোহরপুকুরের সদ্য ভাড়া করা বাসাবাড়িতে এসে থামলো। ইতিমধ্যেই শক্তি কেমন যেন ঝিমিয়ে গিয়েছিলেন। ইপিন নামতে শক্তিও বিনা ব্যাক্যব্যয়ে ইপিনের সঙ্গে নেমে এলেন। নতুন বাড়িতে সেই প্রথম রাত্রি বাস, ইপিনের সঙ্গী প্রমত্ত শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

যা ভয় করা গিয়েছিলো, তা কিন্তু হয়নি। শক্তি গাড়ি থেকে নামার পর একদম হৈ চৈ,

গোলমাল করেননি। সরাসরি ঢুকে শূন্য তক্তাপোশটার ওপরে জুতোমোজা না খুলে হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে পড়েন। এবং মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন। বোধহয় খুব ক্লান্ত ছিলেন, কিংবা অবসাদ।

দরজা বন্ধ করে রাস্তার দিকের জানালাগুলো খুলে দিলো ইপিন। সুন্দর বাতাস আসছে। মেঘ কেটে গিয়ে, গ্রীষ্মের আকাশ ঝলমল করছে হাজার হাজার তারা।

পাশের ঘরের খালি মেঝেতে শুয়ে পড়লো ইপিন। বিছানা নেই, বালিশ নেই, বন্ধ ঘর ঝাঁট দেওয়াও হয়নি কতকাল। ধুলোর আস্তর পড়ে আছে। তার মধ্যেই হাতের ওপরে মাথা দিয়ে শুয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো ইপিন। তারও বেশ নেশা হয়েছে।

যখন ঘুম ভাঙলো চোখ খুলে দেখে সারা ঘর রোদে ভরে গেছে। হাত ঘড়িতে দেখলো সাড়ে আটটা বাজে।

মাথাটা কেমন ভারভার। শরীরটাও ম্যাজম্যাজ করছে। রোদের আলোটা চোখে লাগছে। মুখটা শুকনো বিস্বাদ।

হঠাৎ ঘরের চার পাশে তাকিয়ে ইপিনের কেমন খটকা লাগলো, এটা কোন জায়গা, সে এখানে কেন? এই ধুলোভরা অচেনা ঘরে মেঝেতে সে শুয়ে কেন?

অবশ্য একটু পরেই তার গতকাল সন্ধে বেলার কথা মনে পড়লো। বিপিন দত্ত, ছোট ব্রিস্টল, শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সহসা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বাঁ দিকের ঘরটায় ঢুকে দেখলো, তক্তাপোষটা ফাঁকা, সামনের দরজা খোলা, শক্তি চট্টোপাধ্যায় কখন নিঃশব্দে চলে গেছেন। খোলা দরজা দিয়ে রোদ ঢুকে ঘরে ফটফট করছে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেই প্রথম এবং শেষ দেখা ইপিনের, সে তো আর পদ্যের লাইনের লোক নয়। পরে গল্পে-গুজবে আড্ডায়, খবরের কাগজে নানা সূত্রে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু ইপিন কখনোই শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে কাউকে কিছু বলেনি, এমন কি সে যে তাকে চেনে, অন্তত এক রাত্রির চেনা সে কথাও বলেনি।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ইপিনকে বিস্মৃত হননি। সেই ঘটনার পরে তিন-চার দশক, এখনো বিপিন এসে বলেছে, 'শক্তিদা তোর কথা জিজ্ঞেস করছিলো?' শুধু জিজ্ঞাসা করা, যমজ ছেলেরা কেমন আছে, তারা কত বড় হয়েছে, কি করছে, মেনকার খবর কি, সে কি আরো মোটা হয়ে গেছে—এই সব পারিবারিক খবর শক্তি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনেছেন। বিপিনের বিয়ের সময় মেনকা গিয়েছিলো, সেই সূত্রে মেনকাকেও দেখেছিলেন। যমজ দুটির কথাও জানেন এবং কিছুই ভোলেন না। আশ্চর্য লোক।

কিছুই না বুঝে, নিতান্ত বেকায়দায় পড়ে মনোহরপুকুরের এই ভাড়াবাড়িতে এসেছিলো ইপিন। সেই ষাটের দশকের গোড়ায়। তারপর কতকাল হয়ে গেলো। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর, একটা মানুষের জীবনে কম কথা নয়।

এ পাড়ায় একজন অপিরিচিত যুবক হয়ে ইপিন প্রবেশ করেছিলো। এখন একজন প্রবীণ প্রৌঢ়। এই বাড়িতেই সে সংসার করেছে। এখান থেকেই বিয়ে। এ বাড়িতে থেকেই ছেলেরা হাসপাতালে জন্মালো। স্কুলে-কলেজে পড়লো। চাকরি নিয়ে এখন তারা অন্য জায়গায়।

চৌষট্টি সালের গোড়ায় দাঙ্গার সময় এ পাড়ার পিছন দিকে হাজরার রাস্তায় একটা মসজিদে কারা আগুন ধরিয়ে দিলো। তখন ইপিনের সদ্য বিয়ে হয়েছে। ইপিন আর মেনকা বাড়ির ভিতরের

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আগুনের লেলিহান শিখা দেখেছিলো।

আরেকবার একাত্তর সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় মা-বাবা, টাঙ্গাইলের বাড়ির সবাই এই বাড়িতে প্রায় ছয় মাস। এটুকু ছোট বাড়িতে গাদাগাদি ভিড়, মেঝেতে বিছানা করে শোয়া, আব সে কি টাকার টানাটানি।

সাতাত্তর না আটাত্তর সালে যখন সবাই ভেবেছে বর্ষা শেষ হয়ে গেছে, পাড়ায় পাড়ায় পুজোর ম্যারাপ বাঁধা হচ্ছে, সেই সময় হঠাৎ সেপ্টেম্বরের শেষে টানা তিন দিন ধরে অঝোরে বৃষ্টি। বাজার বন্ধ, অপিস বন্ধ রাস্তায় ট্রাম বাস বন্ধ, অধিকাংশ রাস্তা জলে ডোবা। মনোহরপুকুরও জলে ডুবে গিয়েছিলো। একদিন শেষ রাতে ইপিনদের ঘরেও জল ঢুকেছিলো। দুদিন পরে জল নামে।

এত দিন পরে চলচ্চিত্রের মত টুকরো টকরো ছবি ভেসে আসে ইপিনের মনে। খুব বেশি কবে মনে পড়ে সত্তর-বাহাত্তর সালের কথা।

ইপিনদের সদর দরজার পাশের দেয়ালে দুটি ছেলে সারা রাত জেগে আলকাতরা আর পাটের তুলি দিয়ে মাও-সে-তুংয়ের ছবি আঁকলো, তার নিচে লেখা, 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়াবম্যান,' আর একটু দূরে লেখা, 'পুলিশ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশো বারো।' যাবা দেয়ালে আঁকছিলো, তাদের পাহারা দিচ্ছিলো আরো তিন-চারটি ছেলে। তাদের প্রত্যেকের বাঁ হাতে একটা করে ছোট রেশনের থলে। মেনকা জানালার ফাঁক দিয়ে দেখে ইপিনকে বলেছিলো, 'বেরিয়ো না। ওই সব ব্যাগের মধ্যে বোমা আছে।'

ইপিন বেরোয়নি। বেরোতো না। কোনো রকমে ঘাড় গুঁজে সংসার পালন দিনযাপন করছে সে। ছেলেদের বড় করেছে। বাজার করেছে, রেশন এনেছে, অফিসে মন দিয়ে কাজ করেছে। ভোট এলে ভোটের সময় সকাল বেলায় সাত তাড়াতাড়ি উঠে মেনকাকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে পাড়ার বুথে গিয়ে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়ে এসেছে।

* * *

মনোহরপুকুরের এই নতুন বাসায় আসার পর ইপিন মোটামুটি নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছিলো। গরমের ছুটির পর স্কুল খুলে গেলো। তখন জীবনটা স্কুলের রুটিনের মত ধরাবাঁধার মধ্যে চলে এলো। যদিও একক সংসারহীন জীবন, যুবক বয়েস ইচ্ছে করলে একটু এলোমেলো জীবন যাপন করতে পারতো ইপিন। দুয়েকবার যে বেচাল হয়নি, সঙ্গীসাথী, বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে, সে তো যাকে বলে বয়সের দোষ।

প্রথম দিকে বাড়িতে কোনো কাজের লোক রাখার দরকার পড়েনি। কখনো কখনো দুপুরের দিকে বিপিন দত্ত এলেও ঘর দিনের বেলায় অধিকাংশ সময়ই বন্ধ থাকতো, জানলা দরজা দুইই। ফলে ধুলো ময়লা খুব একটা পড়তো না, তার মানে ইপিনের ঘর ঝাঁট দেওয়ার বালাই ছিলো না। তেমন দরকার হলে পাড়ার একটা ঠিকে ঝিকে ডেকে মাসে দুয়েকবার ঘর ঝাঁট দিয়ে মুছিয়ে নিতো। তারও একটা মুশকিল ছিলো ইপিনের কোনো ঝাঁটা ছিলো না। অবশেষে যে বুড়ি ঘর মাঝেমধ্যে ঝাঁট দিয়ে যেতো সেই আট আনা না কত দিয়ে একটা ফুলঝাড়ু কিনে এনেছিলো।

পূর্ব্ববঙ্গের ছেলে ইপিন সেই প্রথম ফুলঝাড়ু শব্দটা শুনেছিলো। আশ্চর্য, ঝাঁটারও এমন সুন্দর নাম হতে পারে।

ঘরে খাওয়ার জলের জন্য একটা মাটির কুঁজো কিনেছিলো ইপিন। নিজেই সকালবেলা রাস্তার

টিউবওয়েলের থেকে কুঁজোয় জল ভরে নিতো।

একটা সুবিধে হয়েছিলো এ পাড়ায় জামাকাপড় কাচবার জন্যে সাজু ধোপা ছিলো। সাজু কাচা ব্যাপারটাও ইপিন জানতো না। দিনেদিনে নিয়ে গিয়ে সেদিনই সন্ধ্যায় ধোপা এসে কাচা কাপড় দিয়ে যায়। ইস্ত্রির ব্যাপার নেই। সাধারণ ঘরোয়া কাপড় কাচার সু-বন্দোবস্ত, শতকরা হিসেব। বালিসের ওয়াড়, চাদর, ধুতি, পাজামা, গেঞ্জি সব কিছুই সাজু কাচা হতো।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ পাইস হোটেল থেকে ভাত খেয়ে, রাত বারোটা পর্যন্ত দেশপ্রিয় পার্কের মোড়ে দাঁড়িয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ঘরে ফিরে একটু বই পত্রে চোখ বুলিয়ে ঘুমোতে ইপিনের প্রায় একটা হয়ে যেতো।

ফলে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠতে সাড়ে আটটা থেকে নটা। ঘুম চোখে বিছানায় শুয়ে সেদিনের খবরের কাগজের হেডলাইনগুলোর ওপরে চোখ বুলিয়ে নিতো ইপিন। এর পরে ধীরে সুস্থে বাথরুমে গিয়ে স্নান করে, দাড়ি কামিয়ে, জামা-কাপড় পরে একেবারে বেরিয়ে পরতো ইপিন দরজা বন্ধ করে ঘরে তালা দিয়ে। একার জন্যে চা করতে যেত না।

তখনো সকালের চা বা জলখাবার কিছুই খাওয়া হয়নি। তিনটে বিকল্প ছিলো ইপিনের। ইচ্ছে করলে মোড়ে বাস স্ট্যাণ্ডে গিয়ে সুতৃপ্তিতে বা লা কাফেতে দুটো টোস্ট, সেই সঙ্গে-পয়সার টানাটানি না থাকলে একটা ওমলেট আর এক কাপ চা খেয়ে বাসে উঠতে পারতো। যেদিন ঘুম থেকে উঠতে দেরি হতো বা স্কুলে তাড়াতাড়ি থাকতো, এ ব্যবস্থা ছিলো সেই সব দিনের।

আবার যেদিন হাতে সময় থাকতো কিংবা ঢিলেঢালা ছুটির সকাল ডান দিকে কিছুটা এগিয়ে 'কেরালা কফি শপ।' একটা সাদা দোসা কিংবা এক থালা ইদলি, ঝকঝকে স্টেনলেস স্টিলের গেলাসে গন্ধঘন ধূমায়িত কফি। সামনের রাস্তা, সারা পাড়া কফির সুবাসে ছয়লাপ। সে সময়ে একরকম কালো ঝোল মেশানো চিনি দেওয়া হতো কফিতে, তার স্বাদ ছিলো অসামান্য।

তবে সবচেয়ে সোজা এবং সবচেয়ে প্রিয় প্রাতরাশ ইপিন পেতো, তার আস্তানা থেকে দশ কদম এগিয়ে 'সত্যনারায়ণ মিস্টান্ন ভাণ্ডারে।' আলুর দম সহযোগে দুটো রাধাবল্লভি কিংবা ছোলার ডাল আর লুচি, শীতে কড়াইশুঁটির কচুরি কিংবা নতুন ফুলকপির সিঙ্গারা। একেবারে গরম, অবশেষে বড় মাটির ভাঁড়ে এক পোয়া আদা মেশানো চা—আসল কলকাতার স্বাদ ইপিন সত্যনারায়ণে পেতো।

সবাই ভুলে যাওয়ার আগে একথা লিখে রাখা ভালো যে তখনো এইসব রাজকীয় প্রাতরাশের জন্যে কোনো দিনই ইপিনের আট আনার খুব বেশি ব্যয় হতো না। হিসেবটা এই রকম, দুটো টোস্ট চার আনা, ওমলেট তিন আনা, চা দেড় আনা। কেরালা কফিতে দোসা পাঁচ আনা, কফি তিন আনা। তবে সেখানে একটা উপরি ব্যয় ছিলো। বেয়ারাকে এক আনা বখশিস দিতে হতো। সে বালাই ছিলো না সত্যনারায়ণে, হিসেবেও সস্তা, চারটে লুচি বা সিঙ্গারা কি কচুরি, কিংবা দুটো রাধাবল্লভি বড় জোর চার আনা সঙ্গে চা দেড় আনা।

ইপিন স্কুলের দিনে দুপুরে স্কুলের মাস্টার মশায়দের মেসে খেতো। স্কুলের পাশেই একটা ভাড়াবাড়িতে মেস করে চার পাঁচজন মাস্টারমশায় এখানে থাকেন। এখানেই ইপিনের মধ্যাহ্ন ভোজন, সাধারণ খাবার, ভাত-ডাল-ভাজা একটুকরো মাছ, তবে খরচও কম। তেমন ছুটি ছাটা না থাকলে মাসে গোটা পঁচিশেক মিল হতো, গড় হিসেব করে এর জন্যে ইপিনকে মাসে বড় জোর পনেরো টাকা দিতে হতো। প্রতিদিন থার্ড পিরিয়ড ইপিন অফ নিয়েছিলো। সাড়ে

বারোটা নাগাদ থার্ড পিরিয়ড পড়তো, সেই সময় ইপিন গিয়ে খেয়ে আসতো।

বিকেলের জল খাবারের কোনো ঠিকঠাক ছিলো না। খিদে লাগলে যা হয় কিছু খেয়ে নিতো। সে রাস্তার ঝালমুড়ি, আলুকাবলি থেকে সাধ হলে মোগলাই পরটা পর্যন্ত সবই ভালোবাসতো। রেস্তোঁরায় বসে চপ-কাটলেট খেতেও তার খুব ভালো লাগতো।

একটা টিউশনি জোগাড় হয়েছিলো গোল পার্কের কাছে। স্কুলেরই ছাত্র অতীন, সপ্তাহে পাঁচদিন সব বিষয়। ছেলেটি আগে ভবানীপুরে একটা ভাল স্কুলে পড়তো, সেখানে বার কয়েক ফেল করে যাদবপুরে ভর্তি হয়েছে। বড়লোকের ছেলে, কিন্তু বখা নয়। একটু সরল প্রকৃতির বোকা ধরণের ছেলে, ভালো মানুষ গোছের। অতীনদের বাড়িতে প্রায় প্রতিদিনই খুব ভালো জলখাবার দিতো, তাতেই প্রায় রাতের খাওয়া হয়ে যেতো। তবু অভ্যেসবশত রাত দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ দেশপ্রিয় পার্কের কাছাকাছি একটা হোটেলে খেয়ে নিতো।

একটা নিয়ম নিজের জন্যে করেছিলো ইপিন। টিউশনির পরে আড্ডা দিতে বা কোনো প্রয়োজনে যেখানেই যাক দশটার মধ্যে পাড়ায় ফিরত এবং বারোটার পরে বাড়ির বাইরে থাকবে না।

এই ভাবে দিন চলে যাচ্ছিলো।

* * *

মনোহরপুকুরের বাসায় তখন প্রায় ছয়মাস কেটে গেছে। একটা বড় বর্ষার শেষে পুজো, তারপর শীতও এসে গেছে। এর মধ্যে বিপিন নাইট বি কমে ভর্তি হয়েছে আমহার্স্ট স্ট্রিটের সিটি কলেজে, কিন্তু কিছুতেই বৌবাজারের মেস ছেড়ে এ বাড়িতে আসতে চায়নি।

ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে বিপিন এলো একটা সরকারি খাম হাতে। ইপিনের নামে ইন্টালিতে ভৌমিক নিবাসের ঠিকানায় এসেছিলো। ইপিনের ঠিকানা না জানায় ও বাড়ির একজন কর্মচারী বিপিনের মেসে পৌঁছে দিয়ে গেছে।

খামটা বিপিন আগেই খুলেছিলো। ভেতরের চিঠিটা ইপিনের হাতে দিয়ে বললো, 'নে, তোর একটা ভালো কাজ হয়ে গেছে।'

চিঠিটা হাতে নিয়ে ইপিনের খেয়াল হলো যে সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো যে একটা সরকারি চকরির পরীক্ষা দিয়েছিলো।

কাজলের সঙ্গে ইপিনের একধরনের একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো। দৈহিক সম্পর্ক নয়, একটি দেহজীবিনী মেয়ের সঙ্গে সেটাই স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু ইপিনের সে মানসিকতা ছিলো না। নারী-পুরুষের দৈহিক সম্পর্ক বিষয়ে ইপিন সম্পূর্ণ অনাধুনিক, এ ব্যাপারে তার সংস্কার প্রবল। বিবাহিত দম্পতির বাইরে এরকম ব্যাপারে তার মনের বাধা আছে। আশেপাশে চেনা শোনার মধ্যে এরকম ঘটনা যখনই ঘটেছে ইপিন প্রায় অকারণেই নিজের মধ্যে কীরকম একটা সঙ্কোচ এবং অস্বস্তি বোধ করেছে।

যদিও দু'জনের মধ্যে গোলমাল কখনও হয়নি, কাজলের সঙ্গে ইপিনের সম্পর্কটা ছিলো গোলমেলে। কাজল কে, কাজল কী করে সেটা ইপিন জানে, কাজল তাকে নিজেই বলেছে। সে নিয়ে কাজলের মনে গ্লানি আছে কিনা তাও বোঝা যায় না। ইপিনও খুব একটা মাথা ঘামায় নি।

এ ধরনের ব্যাপারে ইপিন খোলামেলা মনের লোক নয়। কিন্তু প্রথম থেকেই কাজলের ওপরে কীরকম একটা মায়া, একটা দুর্বলতা ইপিনের মনে দেখা দিয়েছিলো। সেটা ক্রমশ গভীর হয়েছে।

তার মধ্যে কাজলের যৌনতার টানও ছিলো।

কখনও কখনও কাজলের সঙ্গে দেখা হয়েছে। লেকের মুখোমুখী সাদার্ন এভিনিউয়ের কোনও গাছের ছায়ায় সন্ধ্যার অন্ধকারে আলগাভাবে একা একা অথবা দু'একজন সঙ্গিনীসহ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কালীঘাট পার্কের পাশে ট্রামডিপোর কাছে নিরালা ফুটপাতেও ইপিন যাতায়াতের পথে কাজলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। সে দেখেছে কাজলকে লক্ষ্য করে হঠাৎ রাস্তায় গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে, কাজল ফুটপাত থেকে নেমে গিয়ে গাড়ির জানলায় মুখ দিয়ে কথাবার্তা বলেছে। একদিন বেশ রাতে প্রায় শূন্য রাস্তা থেকে একটা গাড়িতে কাজলকে উঠে যেতেও দেখেছে। একই রাস্তায় যাতায়াতে এসব দৃশ্য চোখে পড়বেই। তবে এনিয়ে ইপিন মাথা ঘামায় নি। তার মাথা ঘামানোর বিষয় নয়। কিন্তু খারাপ লেগেছে।

দু'একবার মুখোমুখি দেখাও হয়ে গেছে কাজলের সঙ্গে। কাজল মোটেই অপ্রতিভ বোধ করেনি। বরং এগিয়ে এসে কথা বলেছে। বলেছে, 'ভাবি একদিন সময় করে যাবো।' ইপিন বলেছে, 'আসেন না কেন? আসলেই পারেন।' 'আপনি তো দেখি আমার মতই সন্ধ্যেবেলায় রাস্তায় রাস্তায় ঘোরেন দেখা হয়,তাই যাওয়া হয় না,' কাজল বলেছে, 'তাছাড়া এসব দিকে অনেকে আমার মুখ চেনে। আমি বাসায় যাতায়াত করলে আপনার কিন্তু অসুবিধে হতে পারে।'

সে কথা ইপিন জানে। বিপিন দত্ত যে তাকে না বলে কাজলকে দুপুরে আসতে বলতেন সেটা ইপিনের ভালো লাগে নি। কিন্তু মুখ ফুটে আপত্তি বা প্রতিবাদও করেন নি।

বিপিন দত্ত চলে যাওযার মাস দেড়েক পরে দুটো চিঠি দিয়েছিলেন মনোহরপুকুরের ঠিকানায়। একটা ইপিনকে আর একটা কাজলকে কেয়ার অফ শ্রী ইপিন চৌধুরী। কি করে বিপিন দত্ত ধরে নিয়েছিলেন কাজলের সঙ্গে ইপিনের যোগাযোগ থাকবে। হাজার হলেও বুদ্ধিমান লোক তো।

ইপিনকে লেখা চিঠিটা নেহাতই মামুলি। পিকচার পোস্টকার্ড একটা। সাদা-কালো। তখন রঙিন ছবি, রঙিন ফটোর রমরমা দিন আসেনি। তবে ছবিটা ভালো, কেমন বিষাদাচ্ছন্ন। নদীর ধারে একটা রেলিং ঘেরা রাস্তায় কুয়াশার মধ্যে অস্পষ্ট একটা ওভার কোট পরা লোক হেঁটে যাচ্ছে। আকাশ মেঘলা, লোকটার হাতে একটা বন্ধ ছাতা। সাদা-কালো ফটো একটা, এখনো স্পষ্ট মনে আছে। অনেকদিন পোস্টকার্ডটা ইপিনের কাছে ছিল, খুঁজলে এখনো হয়তো কোথাও পাওয়া যাবে।

একাধিক কারণে বিপিন দত্তের চিঠিটা ইপিন যত্ন করে রেখে দিয়েছিলো।

প্রথম কারণটি হাস্যকর। তবে এরকম হাস্যকর বহু কারণে ইপিন জীবনে অনেক তুচ্ছ-বৃহৎ কাজ করেছে। বিপিন দত্তের চিঠিটা ইপিনের জীবনে পাওয়া প্রথম পিকচার পোস্টকার্ড। প্রথম বিদেশি চিঠি। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তান থেকে টাঙ্গাইলে মা-বাবা এবং অন্য জায়গার থেকে অন্যান্যদের চিঠি বাদে। উনিশশো ষাট-একষট্টি সালেও পূর্ব-পাকিস্তানকে বিদেশ ভাবা হতো না। তখনও যাতায়াত ছিলো, যোগাযোগ ছিলো। শিয়ালদায় ট্রেনে উঠে সরাসরি সিরাজগঞ্জ বা গোয়ালন্দ ঘাটে চলে যাওয়া যেতো।

সে যা হোক, বিপিন দত্তের পশ্চিম বার্লিনের শহরতলী থেকে পাঠানো সেই সাদা-কালো ফটোওয়ালা মামুলি পত্রের মধ্যে পৌঁছানোসংবাদ এবং কুশল জিজ্ঞাসা ছাড়াও আরও কিছু ছিলো, যেটা ইপিনকে বিচলিত করেছিলো।

ছোট চিঠিটায় লেখা ছিলো,

জুলাই ১৩, ১৯৬১

ইপিন মাস্টার,

জুন মাসের গরমে ভাজা ভাজা হয়ে, (সমুদ্র এতো গরম) অবশেষে লণ্ডন হয়ে আসল জায়গায় এসেছি। চমৎকার আছি। আমি বোধহয় আগের জন্মে জার্মান ছিলাম।

কলকাতার কথা একদম ভাবছি না। যদিও মনে পড়ছে। আশা করি কাজলসহ তুমি ভাল আছো। ভালো থেকো, কাজল বড় ভাল মেয়ে। কাজলের চিঠিটা সাবধানে দেবে। সোনার টুকরো মেয়েটা আমার ওপরে বিনা করণে খুব খেপে আছে। ইচ্ছে হলে চিঠি দিয়ো

ইতি

With Deep Affection

and

Great Regards

B. Dutt.

দ্বিতীয় চিঠিটা কাজলের, সেটা খামের চিঠি। সেই চিঠিটা পকেটে নিয়ে সাদার্ন এভিনিউ থেকে কালীঘাট পার্ক পর্যন্ত কাজলের বিচরণ ক্ষেত্রে চষে বেড়ালো ইপিন বেশ কয়েকদিন। কোথাও কাজল নেই।

শেষের দিনে, রাত তখন দশটা, কালীঘাট পার্কের উল্টোদিকে শোভা রেস্টুরেন্টেব সামনের ফুটপাতে রেস্টুবেণ্ট বন্ধ হওয়াব পরও প্রায় আধঘণ্টা পর্যন্ত ইপিন কাজলের জন্যে দাঁড়িয়েছিলো। হঠাৎ ওপাশে কালীঘাট প্যার্কের পাশ থেকে একটি ফ্রক পরা মেয়ে চকিতে ট্রামলাইন পার হয়ে এসে ইপিনকে জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনি কি কাজুকে খুঁজছেন?' কাজু কথাটার সঙ্গে পূর্বপবিচয় না থাকায় ইপিন থতমত খেয়ে বললো, 'কে কাজু?'

সেই ফ্রকপরা বালিকা সুলভ মেয়েটি হেসে বললো, 'কাজল বললে বুঝতে পারবেন।'

ইপিন বললো, 'আমি কাজলকে খুঁজছি।'

মেয়েটি বললো, 'আপনাকে দেখেছি আগে, কাজলের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করেন। কিন্তু কাজলকে তো এখন পাবেন না। সে এখানে নেই।'

ইপিন প্রশ্ন করলো, 'কাজল কি কলকাতার বাইরে গেছে?'

মেয়েটি বললো, 'মা তারা সুইটসের উমেশ ঘোষের সঙ্গে কাজল দার্জিলিং বেড়াতে গেছে। সেখান থেকে আরও সব কত জায়গায় যাবে। কবে ফিরবে ঠিক নেই।'

'কোথায় মা তারা সুইটস, কে উমেশ ঘোষ,' ইপিন কিছু বোঝার আগে দ্রুতগতিতে কাজলেব বান্ধবী রাস্তার ওপারে চলে গেলো, সেখানে কালীঘাট পার্কের গেটের কাছে দু'জন সম্ভাব্য খরিদ্দার ঘুরঘুর করছে।

সেদিন রাতে হোটেলে খাওয়া সেরে কাজলের কথা ভাবতে ভাবতে ইপিন বাড়ি ফিরলো, অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘুম হলো না।

এরপরে আর কাজলের খোঁজ নিতে যায়নি ইপিন।

সপ্তাহ তিনেক পরে কাজল নিজেই এলো। সকাল বেলায় স্নানটান সেরে ঘরের দরজা বন্ধ করে ইপিন স্কুলের জন্যে বেরোচ্ছে এমন সময় কাজল এলো। কাজল কি আরেকটু রোগা হয়ে গেছে। দিনের আলোয় কাজলকে কেমন ক্লান্ত, রুগ্ন দেখাচ্ছিলো। সদ্য স্নান করেছে। চোখের কোণায় একটু কাজল টেনেছে, গলায় হালকা পাউডারের ছোপ।

জিজ্ঞাসু চোখ ইপিন তাকাতে কাজল বললো, 'কাল রাতে কাছেই ছিলাম। সেখান থেকেই স্নান করে বেরোলাম। আমাদের পাড়ায় কলতলায় দশ জনের সঙ্গে স্নান করতে ঘেন্না করে।' একটু থেমে কাজল বললো, 'আপনি নাকি আমার খোঁজ করছিলেন? আমি পরশুদিন ফিরেছি।' তারপর যেন এ ব্যাপারে ইপিনের কোনও দায়িত্ব আছে, সেই রকম ভাবে অভিযোগ জানালো, 'উমেশ ঘোষ লোকটা কি শয়তান। আমাকে একা শিলিগুড়িতে রেখে পালিয়ে এলো।'

হতবাক ইপিন কাজলের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিলো। কাজল কথা থামাতে বললো, 'আপনার একটা চিঠি ছিলো আমার কাছে।'

আগ্রহভরে কাজল হাত বাড়ালো, 'দিন, দেখি।'

চিঠিটা সঙ্গে নেই। ঘরের মধ্যে রয়েছে।

ইপিন ঘরে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো। পিছনে পিছনে কাজল ঢুকে পাখাটা চালিয়ে দিয়ে বললো, 'রোদ্দুরে হেঁটে এসেছি একটু বসি।'

অল্প ইতস্তত করে ইপিন বললো, 'আমার স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে। সকালের চা খাওয়াও হয়নি। চলুন একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসি।'

একটা হাই তুলে কাজল ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, বললো, 'তাই চলুন।'

দরজা বন্ধ করে রাস্তায় নেমে ইপিন কাজলের হাতে জার্মানির চিঠিটা তুলে দিলো। খুবই আগ্রহভরে কাজল চিঠিটা নিলো। তারপর খামের ওপরে নিজের নাম, প্রেরক বিপিন দত্তের নাম খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লো। অবশেষে খামটা না খুলে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিলো।

এরপরে আরও অনেকবার কাজলের সঙ্গে দেখা হয়েছে ইপিনের, তবে শারীরিক বা বাণিজ্যিক সম্পর্ক হয়নি। অনেক ওঠাবসা হয়েছে, কিন্তু শোয়া হয়নি। কোথাও একটা রুচি বা সংস্কারের দেয়াল ছিলো, বন্ধুত্ববোধ ছিলো।

পুজোর ছুটিতে সেবার পাকিস্তানি ভিসার খুব কড়াকড়ি। দু'রাত্রি লাইন দিয়েও ভিসা যোগাড় করতে পারলো না ইপিন। তার পুজোয় বাড়ি যাওয়া হলো না।

পুজোর মধ্যে একদিন দুপুরবেলায় কাজলের সঙ্গে চিড়িয়াখানায় গেলো ইপিন। পরামর্শটা কাজলেরই। পুজোর হৈ হল্লার মধ্যে চিড়িয়াখানার নিরিবিলি খুব ভালো লাগলো ইপিনের।

একদিন কাজলের সঙ্গে ধর্মতলায় আমিনিয়ায় গিয়ে মাটন-রেজালা আর তন্দুরি রুটি খেয়ে এলো। একদিন গেলো সিনেমায় সোফিয়া লরেনের একটা সিনেমা দেখতে। এসবের জন্য খরচের পয়সা ইপিনই দেওয়ার চেষ্টা করতো। কখনও কখনও জোর করে কাজলও দিতো, বলতো, 'আপনার থেকে আমি অনেক বেশি উপার্জন করি।'

অনেক বেশি যে কত সেটা ইপিন জানতে চায়নি। যেমন ঠিক জানতে চায়নি সে থাকে কোথায়, তার ঠিক দায়দায়িত্ব কি, কে কে আছে। এমনকি সম্পর্কটা খুব বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে

আপনি থেকে তুমির পর্যায়ে নেমে আসে নি।

পুজোর সময় দুই ছেলের কেউই বাড়িতে আসতে পারেনি। মুড়কির পাক দিতে দিতে, লক্ষ্মীপুজোর আর বিজয়া দশমীর জন্যে তিলের তক্তি বানাতে বানাতে আনমনা হয়ে গেছেন স্মৃতিকণা।

মহালয়ার আগের দিন থেকে কালীবাড়িতে জোরকাঠিতে ঢাক বেজেছে। রাস্তার ওপাশেই কালীবাড়ি, সেখানেই বারোয়ারি দুর্গাপুজো, বহুদিনের পুরনো বারোয়ারি। এক সময়ে এই শহরে ওটাই একমাত্র পুজো ছিলো।

কালীবাড়ি থেকে ঢাকের শব্দ, কাঁসির বাজনা ভেসে আসে। পুজোর মধ্যে আসেজন বসেজন বাড়িতে যাতায়াত করছে। গ্রাম থেকে নৌকোয় করে নারকেল এসেছে, গুড় এসেছে।

স্মৃতিকণার কিছুই ভালো লাগে না। ইপিন-বিপিন পুজোতে বাড়ি এলো না। তাঁর কেমন ছাড়া ছাড়া লাগে।

প্রভাসকুমারের আইন-আদালত, মামলা-মক্কেল নিয়ে দিন কেটে যায়। শেষ রাত থেকে ব্যস্ততা, গ্রামের মক্কেল ঘুমভাঙার আগেই, 'উকিলবাবু, উকিলবাবু' করে ডেকে তোলে ঘুম থেকে। তখন থেকেই ব্যস্ততা শুরু। তারপর কোর্ট। কোর্ট থেকে ফিবে সামান্য বিশ্রামের পর আবার সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কাছারি ঘরে লণ্ঠন জ্বেলে নথিপত্র, আইনেব বই। সারা সকাল, সারা সন্ধ্যা এমন কি ছুটিব দিনেও গমগম করে কাছারিঘর।

ইতিমধ্যে প্রভাসকুমার ধীরে ধীরে টের পাচ্ছেন তিনি ক্রমশ আত্মীয়বান্ধবহীন হয়ে পড়ছেন পূর্ব পাকিস্তানে, তাঁর জন্মভূমিতে। পার্টিশনের সময় হিন্দু অফিসারেরা প্রায় সবাই চলে গিয়েছিল। পুবনো উকিল, ডাক্তার, শিক্ষকেরা যাঁরা ছিলেন তাঁরাও হয় পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন অথবা দেশছাড়া হয়েছেন। পুবনো শহরের বাসিন্দারা যাঁদের তিনি বাল্যে-যৌবনে দেখেছেন, যাঁদের সঙ্গে বড় হয়েছেন, বসবাস করেছেন, তাঁদের এখন আব প্রায কোন অস্তিত্বই নেই। এ পাড়ায় ও পাড়ায় পুরনো দুচারজন যাঁরা আছেন ছড়িয়ে, ছিটিয়ে তাঁদের সঙ্গেও যোগাযোগ কমে গেছে।

মধ্যবয়সের কর্মব্যস্ততায় প্রভাসকুমার খেয়ালই করেন নি কবে সব বদলে গেল। ছেলেরা দূরে চলে গেছে। মাঝে মধ্যে তাদের চিঠি আসে, খবর আসে। তারা এখন আর নিয়মিত বাড়ি আসতে পারে না। তাদের নিজেদের কাজ আছে। পাসপোর্ট-ভিসার অসুবিধে রয়েছে।

পাসপোর্টের ঝামেলা প্রভাসকুমার ও স্মৃতিকণারও রয়েছে। দুবছর আগে পুরনো পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। নতুন পাসপোর্টের জন্য দুজনেই দরখাস্ত করেছেন। মাস ছয়েক আগে একটা পুলিশি তদন্তও হয়ে গেছে। তদন্তকারী অফিসার দশটি সবুজ রঙের পাকিস্তানি একশো টাকার নোট নিয়ে গেছেন, তহুরি ও নজরানা বাবদ কিন্তু এখনো পর্যন্ত পাসপোর্ট মেলেনি।

পাসপোর্ট দেওয়া হয় জেলা সদরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তর থেকে। খুব কড়াকড়ি সেখানে, বিশেষ করে হিন্দুদের ছাড়পত্র দেওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের মনোভাব খুবই অনুদার। আইন অনুসারে, দেওয়া হবে না' একথা বলা যায় না, কিন্তু কায়দাকানুন করে নানা অজুহাতে আটকিয়ে রাখা হয়।

পুজোর পরে স্মৃতিকণা একেবারে হাঁফিয়ে উঠলেন। টাঙ্গাইলের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে তার দম বন্ধ হয়ে উঠেছে। এই বাড়িতে প্রায় তিরিশ বছর আগে ষোল বছর বয়েসে তিনি নতুন 'বৌ' হয়ে এসেছিলেন। এই তিরিশ বছরে এই বিরাট পুরনো দালানওলা বাড়িটা তাঁর নিতান্ত আপন হয়ে গেছে। এ বাড়ির অর্ধেক গাছপালা তাঁর নিজের হাতে লাগানো। রান্নাঘর, শোয়ার

ঘর, বারান্দা, উঠোন, ইঁদারার পাড় তিনি চোখ বুজে যাতায়াত করতে পারেন। এ বাড়িতে তাঁর ছেলেরা বড় হয়েছে। এখান থেকে পরীক্ষায় পাশ করে কলকাতায় পড়তে গেছে। এ বাড়িতেই তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ি দেহরক্ষা করেছেন। তাঁর স্বামীর ওকালতিতে পশার হয়েছে, নামডাক হয়েছে। এই বাড়িতেই স্মৃতিকণা সলজ্জা নববধূ থেকে ভারিক্কি গৃহিণীতে পরিণত হয়েছেন।

যুদ্ধের দুর্দিন, দুর্ভিক্ষের ঝাপটা, বন্যা, দাঙ্গা কত ঝড় বয়ে গেছে। এই বাড়িটা অটল দুর্গের মত রক্ষা করেছে। উঠোনের একপাশে কামিনী ফুলের ঝোপে সুখে-দুঃখে, সুদিন-দুর্দিনে ফুল ফুটেছে, আমগাছে মুকুল, কাঁঠাল গাছে বৎসরান্তে মুচি এসেছে। লাউমাচা ছেয়ে গেছে সবুজ লকলকে লতায়। নারকেল গাছের ডালে বসে সারা সকাল ঘুঘু ডেকেছে, 'ঠাকুর গোপাল ওঠো-ওঠো,' যথাকালে বউ কথা কও পাখি ফিরে এসে গন্ধরাজ ফুলগাছের ডালে দোল খেয়েছে।

বৃষ্টিতে পুরনো দালানের, ছাদ দিয়ে জল পড়েছে। বারবার সারিয়েও সুবিধে হয়নি। শীতে জানলার ফাঁক দিয়ে নদী থেকে ভেসে আসা ঠাণ্ডা, উত্তুরে বাতাস ঘরে ঢুকেছে। ভরা বর্ষায় পুকুরের ঘোলা জল ঘাট উপচিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেছে।

গত তিরিশ বছরে এ বাড়ির সঙ্গে, তাঁর নিজের এই সংসারের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছেন স্মৃতিকণা। কিন্তু এখন আর তাঁর ভাল লাগছে না। ইপিন-বিপিনের জন্যে সব সময়েই মন কেমন করে, একটা উৎকণ্ঠায় থাকেন।

এতকাল বিপিনকে নিয়েই বেশি চিন্তা ছিল, সে সাধারণ ছেলেদের থেকে একটু অন্যরকম, তার মেজাজ-বুদ্ধি একটু আলাদা ধরনের। সব কাজ ভেবে চিন্তে করে না।

সেদিক থেকে ইপিনের ব্যাপারে খুব মাথা ঘামাননি স্মৃতিকণা। ইপিন শান্ত মাথা, চটকবে কোন কিছুর মধ্যে জড়িয়ে পড়ে না। খুব বেশি খামখেয়ালিপনা নেই।

কিন্তু ইপিন চাকরি পেয়েছে। প্রথমে মাস্টারি করছিলো, তারপর এখন মোটামুটি ভাল একটা সরকারি চাকরি পেয়েছে, প্রায় শ চারেক টাকা মাইনে। ভৌমিক-নিবাস থেকে ইপিন আলাদা বাসাভাড়া করে চলে এসেছে। আগে পিসি ঠাকুমা অভিভাবিকা ছিলেন, এখন আর কোন অভিভাবক নেই।

এদিকে ইপিনের ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়েস হল, বিয়ের বয়েস হয়েছে। ইপিনের বাবা প্রভাসকুমার যখন বিয়ে করেছেন তখন তাঁর একুশ বছরও পূর্ণ হয়নি।

তা ছাড়া কলকাতা থেকে টাঙ্গাইলের একজন পুরনো লোক একটা খারাপ খবর পাঠিয়েছে।

ইপিনের নাকি স্বভাব চরিত্র ভাল নেই। তাকে নাকি অনেক সন্ধ্যাতেই একটি খারাপ মেয়ের সঙ্গে দেখা যায়। তার খালি বাড়িতেও অনেক সময়েই মেয়েটি আসে। বলা বাহুল্য, পুরো সত্যি না হলেও খবরটিতে কিঞ্চিৎ সত্যতা আছে। ইপিনের এক বন্ধু আড্ডায় এই নিয়ে রসালাপ করছিল, সেখানে এমন একজন হিতৈষী ছিলেন যিনি ইপিনকে টাঙ্গাইল সূত্রে চেনেন, স্মৃতিকণা-প্রভাসকুমারকেও চেনেন। লোক মারফৎ তিনিই টাঙ্গাইল বাড়িতে খবরটা পাঠিয়েছেন।

স্মৃতিকণা উতলা হয়ে পড়েছেন কলকাতায় যাওয়ার জন্যে, কিন্তু পাসপোর্ট ছাড়া তো যাওয়া যাবে না। প্রতিদিন দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর বাইরের বারান্দায় স্মৃতিকণা একটা বেতের মোড়ার ওপরে বসে থাকেন যতক্ষণ না ডাকপিয়ন যায়।

এক সময়, এই বছর পনেরো আগে পর্যন্ত ভেতরের বারান্দা ছিল অন্দর মহল। বাইরের বারান্দা ছিল বধূজীবনে নিষিদ্ধ অঞ্চল, কবে নিজের অজান্তেই নিঃশব্দে বধূকালের লক্ষণরেখা অতিক্রম করে গৃহিনী জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছেন স্মৃতিকণা।

দুপুরবেলায় স্মৃতিকণা বাইরের বারান্দায় অধীর আগ্রহে বসে থাকেন। বিকেলের ডাকে রেজিস্ট্রি

চিঠি, মানি অর্ডার এই সব বিলি হয়। স্মৃতিকণা আশা করেন পাসপোর্টটা ডাকে এসে যাবে। সেটাই নিয়ম, পাসপোর্ট তৈরি হয়ে গেলে, রেজিস্ট্রি করে প্রাপককে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু স্মৃতিকণার কাছে পাসপোর্ট এসে পৌঁছায় না। দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো চলে গেল। প্রভাসকুমারের আদালত খুলে গেল। মুহুরি, মক্কেল, ঝি, চাকর ভর্তি নিজের বাড়িতে স্মৃতিকণার নিজেকে কেমন পরপর, অনাত্মীয়া মনে হয়। সারা দুপুর বাড়িটা, পুরো পাড়াটা হেমন্তের রোদে ঝিম ঝিম করে। ছাদের কার্নিসে একটা গম্বুজের ছায়ায় বসে একটা দাঁড়কাক মোটা গলায় কা-কা করে ডাকে। রান্নাঘরের পেছনের ডোবার পাশের বেতঝোপ থেকে একটা গোসাপ জিব বার করে হিস্ হিস্ করতে করতে পোকা-মাকড়ের খোঁজে বাইরের উঠোনটা দুবার ঘুরে যায়। স্মৃতিকণার কিছু ভাল লাগে না। বহুদিন আগে সেই গত জন্মে, তিনি যখন এবাড়িতে নতুন প্রথম এসেছিলেন সেই ষোল বছর বয়সে, প্রথম, মনের মধ্যে যেরকম হত প্রভাসকুমার তখন কলকাতায় এম এ আর ল পড়ছেন, গাদাগাদি ভিড়ে ভরা বাড়িতে স্মৃতিকণার মনের মধ্যে যে রকম হুহু করে উঠতো—সেই ভাবটা আবাব এতদিন পরে ফিরে এসেছে।

প্রত্যেক সপ্তাহেই প্রভাসকুমাবের সেবেস্তার মুহুরিবাবুদের কেউ ময়মনসিংহ জেলা সদরে যান আপিলের মামলার তদ্বির তদারকি করতে। জুনিয়ার উকিলেরা কেউ কেউ যায়। একবার প্রভাসকুমার নিজে গেলেন ভাষানী মৌলানার আশ্রমের একটা জমিজমার আপিলের মামলায় মৌলানা সাহেবের অনুরোধে ঢাকার এক তরুণ ব্যারিস্টারকে সহায়তা করার জন্যে ময়মনসিংহের জেলা আদালতে।

তরুণ ব্যারিস্টারটির বযেস তিরিশ-পঁয়তিরিশেব বেশি নয়। রোগা, কালো কিন্তু প্রখর বুদ্ধি। নাম এ বি সিদ্দিকি, তবে সিদ্দিকি বানানটা কেমন যেন, ইংরাজিতে এস দিয়ে আরম্ভ না হয়ে সি দিয়ে আরম্ভ। CIDDIQUE শব্দটা কেমন পর্তুগীজ বা স্প্যানিশ পদবি মনে হয়। যদিও নামটা আবুবকর।

আদালতে মধ্যাহ্ন বিরতির সময়, একথা সিদ্দিকিকে জিজ্ঞেস করলেন প্রভাসকুমার, 'আপনার নামের বানানটা? আপনারা কি খ্রীষ্টান?' সিদ্দিকি হেসে বললেন, 'না। আমি খাঁটি বঙ্গজ, ঢাকাই মুসলমান। ইস্কুলে পড়ার সময় নামের আদ্যাক্ষরগুলো এ বি সি করার জন্য সিদ্দিকি বানান সি দিয়ে লিখি। বাবা এনিয়ে খুব আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই। মাধ্যমিক পরীক্ষার দরখাস্তে CIDDIQUE লিখে দিয়ে এসেছি। তারপর থেকে তাই চলছে।

দুই সমতলের দুই অসমবয়সী ব্যবহারজীবীর মধ্যে চমৎকার বন্ধুত্ব হয়েছিল। পরবর্তীকালে আবুবকর বহুবার প্রভাসকুমারদের টাঙ্গাইলের বাসায় এসেছেন। প্রভাসকুমারের বিপক্ষ দলের মামলা নিয়ে এসেও বাসায় থেকেছেন।

প্রভাসকুমারকে কাকাবাবু এবং স্মৃতিকণাকে কাকীমা বলে সম্বোধন করতেন আবু। আপদে বিপদে ঢাকা থেকে খোঁজ খবর নিতেন।

স্মৃতিকণা ও প্রভাসকুমার কলকাতা যাতায়াতের পথে ঢাকা গেলে আবুবকরের বাসা হয়ে যেতেন। পারলে দুদিন থেকেও আসতেন।

পরবর্তীকালে কলকাতায় গেলে আবুবকরব নিজেও ইপিন-বিপিনের খোঁজ নিতেন। কখনও পদ্মার ইলিশ মাছ, কখনও কাগমারির দই, বা চারাবাড়ির চমচম এবং তেমন কিছু সংগ্রহ না হলে অন্তত ঢাকার কালাচাঁদের সন্দেশ কিংবা আদি বস্ত্রখানি হাতে করে মনোহরপুকুরের ইপিনের ভাড়া বাড়িতে যেতেন।

মোট কথা এই দুই পরিবারের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। একবার কি একটা মামলার কাজে আবুবকরকে করাচিতে দিন পনেরো থাকতে হয়েছিল। সেসময় আবুবকরের বৌ জেসমিনকে স্মৃতিকণা সাতদিন নিজের কাছে এনে রেখেছিলেন। সেই আদর যত্নের কথা জেসমিন কখনও ভোলেনি।

সেবার আবুবকরের সাহায্যেই পাসপোর্ট পেয়েছিল প্রভাসকুমার। কথায় কথায় তাঁকে পাসপোর্ট পাচ্ছেন না বলে ছেলেদের কাছে যেতে পারছেন না একথা বলায়, সেদিনই মামলার ফাঁকে আবুবকর প্রভাসকুমারকে সরাসরি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যান। জেলাশাসক আবুবকরের সমবয়সী এবং পূর্বপরিচিত, সেদিনই অফিস ছুটির আগে পাসপোর্ট দুটো হাতে পেয়ে গেলেন প্রভাসকুমার, দেখা গেল পাসপোর্ট দুটো তৈরি হয়ে শুধু সই সাবুদের জন্য পড়ে ছিল। পৌষমাস পড়ার আগে অঘ্রাণের শেষাশেষি স্মৃতিকণা কলকাতা গেলেন। পরে প্রভাসকুমার মাঘমাসে যাবেন। স্মৃতিকণার ইচ্ছে মাঘমাসের মধ্যে ইপিনের বিয়ে ঠিক করে, বিয়ে দিয়ে তবে ফিরবেন।

ইপিনের বাসাটা স্মৃতিকণার ভালই লাগলো, কলকাতার পক্ষে যথেষ্ট। বাড়িতে পৌঁছেই এধার ওধার ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন।

জার্মানি থেকে পাঠানো বিপিন দত্তের পিকচার পোসকার্ডটা ভিতরেব ঘরের কাঠের টেবিলের ওপর রাখা ছিল। জিনিসপত্র, চমচমের হাড়ি, ঘিয়ের বয়াম, সব সাজিয়ে রেখে পাশের বাথরুম থেকে স্নান সেরে এসে স্মৃতিকণা ইপিনকে বললেন, 'আমি এবেলা কিছু খাবনা। দ্যাখতো মিষ্টির দোকানে এক গেলাস দুধ পাওয়া যায় কিনা। তাতেই আমার হয়ে যাবে।'

মিনিট ত্রিশ পরে একটা মাটির ভাঁড়ে করে প্রায় আধসের ঘন জ্বাল দেওয়া দুধ বসুশ্রী সিনেমার ওপাশে পূর্ণঘোষের দোকান থেকে ইপিন নিয়ে এলো।

ততক্ষণে টেবিলের ওপরে বিপিন দত্তের চিঠিটা ইপিনের বুদ্ধিমতী মা পড়ে ফেলেছেন।

স্মৃতিকণা বললেন, 'দুধ এনেছিস? রান্নাঘরে রেখে আয়।'

রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে এক অস্বস্তিকর অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াল ইপিন।

স্মৃতিকণা প্রশ্ন করলেন, 'এই যে এই চিঠিটা তুই এত যত্ন করে রেখেছিস, যাতে বি দত্ত লিখেছে, 'আশা করি কাজলসহ ভাল আছ। কাজল বড় ভাল মেয়ে।' তা এই কাজল মেয়েটা কে? আমাকে তো তার কথা কোনদিন চিঠিতে জানাস নি।'

স্মৃতিকণার সে বছর প্রায় তিনমাস কলকাতায় থাকা হয়ে গেল। এসেছিলেন অঘ্রাণের শেষে, কলকাতা থেকে ফিরতে ফিরতে ফাল্গুনের মাঝামাঝি হয়ে গেল।

স্মৃতিকণা যা স্থির করে এসেছিলেন তা অবশ্য করে গেলেন। তিনি নিজে ঠিক করে ইপিনের বিয়ে দিয়ে গেলেন, তবে মাঘ মাসের মধ্যে সম্ভব হলো না, বিয়ের দিন ঠিক হলো দোসরা ফাল্গুন। শেষ রাতে ধনু লগ্নে সুতহিবক যোগে বিবাহ।

প্রভাসকুমার এলেন বিয়ের মাত্র তিন-চার দিন আগে। সেও অনেক চেষ্টা করে। ওকালতিতে

কোনও ছুটি নেওয়া যায় না। আদালতে মামলা-মোকদ্দমা একদিন, একবেলাও বাদ পড়ে না। একজন ব্যস্ত উকিলের অনেকগুলো আদালতে কাজ থাকে। অনেক দায়দায়িত্ব জড়িয়ে আছে অনেক মানুষের। অনেক পরিবারের উদ্বেগ, আকাঙ্খা জড়িয়ে আছে, অনেক নির্ভরতা। পুরুষানুক্রমে ব্যবহারজীবী বংশের সন্তান প্রভাসকুমারের পক্ষে আদালত ফেলে আসা কঠিন।

আইন ব্যবসায়ের প্রথম যুগে যখন তাঁর বাবা বেঁচে ছিলেন কখনো কখনো দু চারদিন আদালত কামাই করে কিংবা গরমে বা বড়দিনের ছুটিতে কয়েকদিনের জন্যে প্রভাসকুমার ঢাকা বা কলকাতায়, নিদেনপক্ষে ময়মনসিংহে গিয়েছেন। তখন ইস্টারেরও ছুটি হতো, গুড ফ্রাইডে, চৈত্র সংক্রান্তি মিলিয়ে মাঝারি মাপের ছুটি একটা কিন্তু সে সময় গ্রামের বাড়িতে, একদিন যেতে হতো, চৈত্র সংক্রান্তির শিবপুজোয়, গৃহদেবতার বাৎসরিক অনুষ্ঠানে।

স্মৃতিকণা কলকাতায় আসার দু মাস পরে প্রভাসকুমার কলকাতায় এলেন। বিয়ের পরে প্রায় তিন দশকে প্রভাসকুমারকে ছেড়ে এতদিন স্মৃতিকণা কোথাও থাকেননি। বিয়ের পর প্রথম কয়েক বছর অল্প সময়ের জন্যে বাপের বাড়ি যেতেন, তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হতো বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ির জন্যে। পরে ফিরতে হতো ইপিন-বিপিনের ইস্কুলের জন্যে। পুজো বা গরমের ছুটিতে কিছুতেই যাওয়া হতো না, যেতেন বছরে ওই একবার ছেলেদের বার্ষিক পরীক্ষার পরে অঘ্রাণ মাসের শেষে। তারপর পৌষ মাস পরার আগেই দেশাচার মেনে ফিরে আসতেন।

এখানে বলে রাখা ভাল যে শুধু প্রভাসকুমারকে ছেড়ে নয়, টাঙ্গাইল বাড়ি ছেড়েও এত দীর্ঘকাল বাইরে থাকেননি স্মৃতিকণা। যে বাড়িতে বাস শেষের দিকে তাঁর অসহ্য হয়ে উঠেছিল, কলকাতায় ছেলের বিয়ের ব্যস্ততার মধ্যেও সে বাড়ির জন্যে মন কেমন করতো। সে বাড়ির উঠোনের এক পাশে কয়েকটা বুনো গোলাপের গাছ আছে। স্মৃতিকণাই লাগিয়েছিলেন ফরেস্ট অফিসের এক চৌকিদারের কাছ থেকে কিনে।

অনেককাল আগে এক বর্ষার দিনে লোকটা ছেঁড়া খাকি শার্ট আর লুঙ্গি পরে বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতে ছোট শহরটা এক গুচ্ছ গেলাপচারা নিয়ে বেচার জন্যে ঘুরপাক খেয়েছিল।

মাত্র এক টাকা দিয়ে স্মৃতিকণা চৌকিদারের কাছ থেকে চারাগুলো কিনেছিলেন। লোকটা নিজের হাতে চারাগুলো উঠোনে পুঁতে দিয়েছিল। দুপুরে ও রাতে ভাত খেয়ে কাছারি ঘরের বারান্দায় রাত্রিবাস করে পরদিন সকালে একটা পুরনো গামছা আর এক জোড়া পুরনো জুতো চেয়ে নিয়ে লোকটা বিদায় নেয়।

প্রভাসকুমার অবশ্য স্মৃতিকণাকে হেসে বলেছিলেন, 'লোকটা ফরেস্ট অফিসের চৌকিদার নয়। এটাই ওর ফুলগাছের চারা বেচার কায়দা।'

সে যা হোক, সেই লোকটা স্মৃতিকণাকে বুঝিয়েছিল, এই জাতের গোলাপ খুব কম, এর পাতাগুলো সাধারণ গোলাপের পাতার চেয়ে অনেক বড় আর ঘন সবুজ, এ গাছের কাঁটাগুলোও অনেক বড় আকারের কিন্তু তীক্ষ্ণ নয়, ভোঁতা। এর ফুলের রঙ হবে কালো, ফুলগুলো হবে ছোট ছোট।

তা অবশ্য হয়নি। শীতের মধ্যভাগে গাছগুলোয় কলিতে ছেয়ে গেছে, কিন্তু অধিকাংশই ফুল ফুটবার আগে ঝরে গেছে। আর সেগুলো কাল রঙের নয়, কেমন পাণ্ডুর বর্ণ, কালচে গোলাপি। প্রভাসকুমার দেখে বলেছিলেন, 'বুনো গোলাপ।'

প্রথম দিকে যত্ন-আত্তি করা হতো, গাছের গোড়ায় নিয়ম করে জল দেওয়া হতো। এখন আর কিছুই করা হয় না। গাছগুলো নিজেদের মনের আনন্দে বেঁচে আছে, বুনো গোলাপের জঙ্গলে ছেয়ে আছে উঠোনের এক পাশ।

এই শীতের শেষে নিশ্চয় বেশ কয়েকটা ছোট ছোট রুগ্ন ক্ষীণজীবী ফুল ফুটেছে সেই বুনো গোলাপের ঝোপে। মনোহরপুকুরে ইপিনের বাসায় এত দূরে বসে আপনমনেই স্মৃতিকণা সেই ফুলগুলোর ম্লান সৌরভ নাকে পেতেন।

*　　　　*　　　　*

অনেকদিন পরে আরেকবার এরকম হয়েছিল।

সেটা উনিশশো একাত্তর সাল। বাংলাদেশ লড়াইয়ের বছর। ইপিনের এই কলকাতার ছোট বাসায় সে বছর প্রায় ছয় মাস থাকতে হয়েছিল। সেবারও হঠাৎ হঠাৎ বিছানায় শুয়ে, ঘরের মধ্যে ঘুরতে ফিরতে গোলাপগুলোর ক্ষীণ সুবাস পেতেন স্মৃতিকণা।

জানুয়ারির মাঝামাঝি বাহাত্তর সালে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার মাস খানেক পর যখন প্রভাসকুমার সবাইকে নিয়ে দেশে ফিরলেন স্মৃতিকণা মনে মনে হিসেব করে ভেবে রেখেছিলেন বাড়ি ফিরে উঠোনে বেশ কয়েকটা বুনো গোলাপ ফুটে আছে দেখবেন।

কিন্তু বাড়ি ফিরে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা ফিরে আসছেন খবর পেয়ে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা সমিতি স্বতঃপ্রবৃত্ত বাড়িঘর পরিষ্কার করে রেখেছে। সেই পরিষ্কার করার সময় দালানের দুপাশের উঠোনও সাফ করা হয়েছে। ঝোপ-ঝঙ্গল-আগাছা সঙ্গে বুনো গোলাপের ঝাড়টাও উপরিয়ে তুলে চারদিক পরিষ্কার কবা হয়েছে।

এসব সাত বছর পরের কথা।

ইপিনের বিয়ে হলো চৌষট্টি সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

চৌষট্টি সাল বছরটা ভাল শুরু হয়নি। কাশ্মীরে হজরতবাল মন্দিরে রক্ষিত হজরত মোহাম্মদের চুল চুরি যাওয়ার গুজবে হানাহানি, মারামারি। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা তার ধাক্কা এসে পৌঁছালো পূর্ব-পাকিস্তানে, পশ্চিম বাংলায়। ধর্মীয় পাগলামিতে প্রাণ গেলো, ভিটে পুড়লো অসংখ্য মানুষের।

টাঙ্গাইলে অবশ্য কোনোকালেই দাঙ্গা হয়নি। কিন্তু কলকাতা যাওয়ার পথে স্টিমার, রেলগাড়ি। দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় এগুলোর কোনোটাই নিরাপদ নয়, বিশেষত বিদেশ বিভুঁয়ে।

ভাগ্য ভাল। স্মৃতিকণা দাঙ্গা লাগার অনেক আগেই এসে গিয়েছিলেন। পরে প্রভাসকুমার যখন এলেন বিয়ের ঠিক আগে তখন অবশ্য হানাহানি প্রায় থেমে এসেছে। এদিকে ওদিকে একটু আধটু ধিকি ধিকি থাকলেও তেমন ভয়ের কিছু নয়।

কলকাতায় আসার পরে প্রতিদিন দুপুরবেলায় বাংলা খবরের কাগজ আর চিঠি লেখার কাগজ-কলম নিয়ে বসতেন স্মৃতিকণা। দশ টাকার খাম-পোস্টকার্ড কিনিয়ে এনেছিলেন ইপিনকে দিয়ে।

ইপিন শুধু একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এত চিঠি কাকে লিখবে ?'

স্মৃতিকণা বলেছিলেন, 'তোর শ্বশুর-শাশুড়িকে।'

খুব ছোটবেলায় ইপিনকে স্মৃতিকণা খ্যাপাতেন এই বলে যে, 'তোর শাশুড়ি এখন কলেজে পড়ে।' ইপিন খুব চিন্তায় পড়ে যেতো। কলেজের পড়া শেষ করবে, তার পর পাশ করবে। তারপর বিয়ে হবে। বিয়ে হওয়ার পরে মেয়ে হবে। সেই মেয়ে বড় হবে, পাশ করবে। তারপর ইপিনের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। কবে ? কতকাল পরে ?

ছোট থেকে ইপিন ভেবে ভেবে কোনো কূলকিনারা পেত না।

স্মৃতিকণা দুপুরবেলা মনোযোগ দিয়ে পেন্সিল দিয়ে দাগিয়ে দাগিয়ে খবরের কাগজের দ্বিতীয়

পৃষ্ঠায় পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন বাছতেন। পথম দিকে সাঙ্কেতিক ভাষার জন্যে একটু আধটু খটকা লাগতো। ধীরে ধীরে ধরে ফেললেন, হাঃ সেঃ ফেঃ মানে হায়ার সেকেণ্ডারি ফেল, দঃ রাঃ মানে দক্ষিণ রাঢ়ী পূঃ বঃ মানে পূর্ববঙ্গীয়।

মিটার সেন্টিমিটারে দেওয়া পাত্রীর উচ্চতার ব্যাপারটাও জটিল মনে হয়েছিল। বিপিন এক রবিবারে এসে মিটার সেন্টিমিটারের সঙ্গে ফুট ইঞ্চির সম্পর্কের হিসাবটা বুঝিয়ে দিয়ে গেল।

স্মৃতিকণা নিজে লম্বা নন, একটু বেঁটের দিকেই বলা চলে। ছেলে দুজনও তেমন লম্বা হয়নি। স্মৃতিকণা ছেলের বৌ আনতে চান একটু লম্বা মেয়ে দেখে। বংশটা যাতে বেঁটে না হয়ে যায়।

উচ্চতা, গোত্র পালটা ঘর দেখে আত্মপরিচয় এবং পাত্রের বিবরণ দিয়ে স্মৃতিকণা পাত্রী পক্ষকে চিঠির নিচে লিখতেন, 'পাত্রের পিতা বর্তমানে পাকিস্তানে থাকায় আমি পাত্রের মাতা এই চিঠি দিলাম।'

প্রথমে দুই সপ্তাহে গোটা পনেবো চিঠি দিয়েছিলেন স্মৃতিকণা, সাত-আটটা উত্তর এসেছিল। বিপিনকে সঙ্গে করে তিনটি মেয়ে দেখেছিলেন স্মৃতিকণা, তৃতীয়টি মেনকা, তাকেই পছন্দ করেন এবং তার সঙ্গেই ইপিনের বিয়ে হয়।

কৌতুক এবং কৌতূহলভরে বিপিন মায়ের সঙ্গে মেয়ে দেখতে যেত। ইপিনকেও সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন স্মৃতিকণা, তারই জন্যে পাত্রী, তারই দেখা উচিত।

কিন্তু ইপিন রাজি হয়নি। বিয়ের আগে ইপিন মেনকাকে দেখেনি। প্রথম দেখলো শুভদৃষ্টির সময়।

ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি ইপিনের বিয়ের অষ্টমঙ্গল, দ্বিরাগমন সব মিটিয়ে কলকাতা থেকে ফিরে এলেন প্রভাসকুমার ও স্মৃতিকণা।

আবার আগের দিন চৈত্রমাস পড়ার আগেই মেনকাকে বাপের বাড়ি দিয়ে এসেছেন স্মৃতিকণা। এ বংশে নতুন বউদের বিয়ের প্রথম বছরে চৈত্রমাসে, ভাদ্রমাসে বাপের বাড়িতে থাকতে হয়।

খুব অসম্ভব না হলে এ রকম দেশাচার একটু আধটু মেনে চলতেন স্মৃতিকণা, সেই ঘোর পাকিস্তানী আমলেও। যে কৃষিসমাজে এই সব ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল, সেই কালও ছিল না, সেই কারণও ছিল না কিন্তু প্রথা থেকে গিয়েছিল।

ছেলের বিয়ে দিয়ে মনে মনে খুশি হয়েছিলেন স্মৃতিকণা। এবং অতি অবশ্যই প্রভাসকুমার।

ছেলে একটা সরকারি কাজ পেয়েছে, আহামরি না হলেও খাওয়া-পরা চলে যাবে। একটা বাসাও হয়েছে, ছোট ভাড়াটে বাসা। তবু পাড়াটা ভাল, বাড়ির দক্ষিণটা খোলা, আলো বাতাস আছে। তাছাড়া বাসাটা একতলায়, সেটা স্মৃতিকণার খুব পছন্দ, সিঁড়ি ভেঙে দোতলা, তিনতলায় উঠতে হয় না।

একবার বছর কয়েক আগে টাঙ্গাইল বাড়ির উঠোনে বৃষ্টির মধ্যে পা পিছলিয়ে পড়ে গিযে কোমরে চোট পেয়েছিলেন স্মৃতিকণা। প্রায় পনেরো দিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন নি। ব্যথাটা এখন নেই, কিন্তু একতলা-দোতলা করতে গেলে কোমরে লাগে, একটু যন্ত্রণা হয়।

মেনকার বাপের বাড়ি থেকে জিনিষপত্র খারাপ দেয়নি। কন্যাপক্ষের কাছ থেকে পণ নেওয়া হয়নি তবে তত্ত্বসামগ্রী ইত্যাদি নেওয়ায় বিপিনের যথেষ্ট আপত্তি ছিল।

স্মৃতিকণা বলেছিলেন, 'ঠিক আছে, এবার হল না, তোর বিয়েতে না হয় দানসামগ্রী বাদ থাকবে, শুধু শাঁখা-সিঁদুর দিয়েই বৌ বরণ করে নেবো।' বিপিনের কাঠ কাঠ উত্তর, 'আমার বৌ, শাঁখা সিঁদুর পরা মেয়ে হবে না।'

সবে ইপিনের বিয়ে দিয়ে কাজল-জনিত চিন্তা থেকে অব্যহতি পেয়েছেন স্মৃতিকণা, বিপিনের

কথায় মনে আবার ধন্দ দেখা দিল।

এবং এ কথাও স্মৃতিকণা খুব ভালভাবে জানেন বিপিন ইপিন নয়। বিয়ে ঠিক করলেই সে ভাল ছেলের মত টোপর মাথায় দিয়ে 'মা তোমর জন্যে দাসী আনতে যাচ্ছি' বলে বৌ আনতে চলে যাবে, তা নয়।

সে যাই হোক বিপিন নিজে থেকেই পছন্দমত বিয়ে করুক কিংবা সম্বন্ধ করেই বিয়ে দেওয়া হোক, বিপিনের বিয়েটাও বেশি দেরি করা উচিত হবে না। এ বয়েসী ছেলেদের পক্ষে, বিশেষ করে যারা বাড়ির বাইরে একলা থাকে তাদের জন্যে কলকাতা শহরটা ভাল জায়গা নয়।

কাজলের মত মেয়ে এ শহরে অনেক। তবু তো কাজল রাস্তায় দাঁড়ায়, তাকে চেনা যায়। আরও কত খারাপ মেয়ে আছে বাড়ির মধ্যে, সংসারের মধ্যে।

কাজলকে একবার দেখেই স্মৃতিকণা বুঝেছিলেন কাজল খাবাপ মেয়ে। ঠিক বোঝানো যাবে না, কোথায় যেন কি একটা ছাপ থাকে, অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যায়।

কাজল এসেছিল স্মৃতিকণা মনোহরপুকুরের বাসায় আসার দিন তিনেকের মাথায় একদিন বিকেল বেলায়। তখন স্মৃতিকণা বাসায় একা। বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। এমন সময় বাইরের দরজায় খুটখুট শুনে দরজা খুলে কাজলকে দেখেন।

স্মৃতিকণা গত তিনদিন ধরে পোস্টকার্ডে কলকাতায় যত আত্মীয়স্বজন আছে, টাঙ্গাইলেব পুরনো চেনাশোনা লোক আছে তাদের চিঠি দিয়ে তাঁর আগমন সংবাদ জানিয়েছেন এবং অনুরোধ করেছেন, তিনি একলা যাতায়াত করতে পারেন না, যদি তারা এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে।

স্মৃতিকণা ভেবেছিলেন, তাঁর চিঠি পেয়েই নিশ্চয় কেউ দেখা করতে এসেছে। কিন্তু দরজা খুলে দেখলেন তা নয়, একটি অচেনা মেয়ে।

কাজলই প্রথম কথা বলল, একবার স্মৃতিকণার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাল করে দেখে বলল, 'আপনি নিশ্চয় ইপিনের মা।'

এইরকম যুবতী বয়েসী একটি মেয়ে ইপিনকে ইপিনদা কিংবা ইপিনবাবু বলে উল্লেখ না করে সরাসরি ইপিন বলছে, এটা নিয়ে খটকা লাগল স্মৃতিকণার। তবুও বললেন, 'হ্যাঁ, আমি ইপিনের মা। কিন্তু তুমি বুঝলে কি করে?'

কাজল একটু মুচকি হেসে বলল, 'ইপিনের মুখের আদল একদম আপনার মত।'

কথাটা সত্যি। স্মৃতিকণা কাজলকে ভিতরে আসতে বলে তাকে নিয়ে বাইরের ঘরে দুটো মোড়ায় মুখোমুখি বসলেন, তারপর বললেন, 'তোমার নাম কি? ইপিন কি তোমাকে বলেছিল আমি আসব।'

কাজল বলল, 'আমি কাজল, ইপিনের নতুন বন্ধু। ইপিন অবশ্য আপনি যে কলকাতায় আসছেন সে কথা কিছু বলেননি। ইপিন তো তেমন বেশি কথা বলেন না।'

স্মৃতিকণার আবার খটকা লাগল, এদিকে ইপিন বলছে আবার আপনিও বলছে। তবে একটা কথা ঠিক বলেছে ইপিন বেশি কথা বলে না, চিরকালই একটু মুখচোরা, চুপচাপ থাকতে পছন্দ করে।

সেদিন অল্প কিছুক্ষণ টুকটাক কথা হল কাজলের সঙ্গে। স্মৃতিকণা এরই মধ্যে মনে মনে ভাবছিলেন, এই তাহলে কাজল? ইপিনের কি কাজল সম্পর্কে দুর্বলতা আছে? তা তো মনে হয় না। আর তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই। এ রকম দুর্বলতা এ বয়েসে দেখা দিতেই পারে। এক সময়ে মোহ কেটে যাবে। যায়।

ইপিনের বিয়ে প্রসঙ্গ সেই বিকেলে কাজল নিজেই তুলেছিল, বলেছিল, 'মাসীমা, এবার আপনি যখন এসেছেন, ইপিনের বিয়ে দিয়ে যান। কোথায় খান, কি খান তার কিছু ঠিক নেই। অনেক রাত পর্যন্ত রাস্তায় টো টো করে ঘোরেন, আড্ডা দেন, আপনি ওঁর বিয়ে ঠিক করুন, মাসীমা।'

যাওয়ার সময়ে কাজল বলে গেল, 'মাসীমা, তা হলে মেয়ে দেখতে লেগে যাই।'

কাজলের সম্পর্কে মনে মনে যা ভেবেছিলেন কিংবা টাঙ্গাইলে বসে যা শুনেছিলেন স্মৃতিকণা তার প্রায় কিছুই মিললো না। খুব নরম মেয়ে কাজল, খুব দুঃখী মেয়ে। কাজলের জন্যে খুব মমতা হল স্মৃতিকণার।

কিন্তু জেনেশুনে এই রকম মেয়ের সঙ্গে তো আর ছেলের বিয়ে দেওয়া যায় না।

ইপিনের বিয়ের আগে আরও দু চারবার এসেছে কাজল। খোঁজ খবর নিয়ে গেছে।

ইপিনের সঙ্গে অবশ্য দেখা হয়নি। সে এসেছে এমন সময়ে যখন ইপিন বাসায় থাকে না। বিয়ের বিজ্ঞাপনের চিঠির উত্তরে যে সব মেয়েদের ফটো এসেছিল সেগুলোও কাজল মন দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে, তবে মতামত কিছু দেয়নি। স্মৃতিকণা এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করলে কায়দা করে এড়িয়ে গেছে। বুদ্ধি আছে মেয়েটার।

ইপিনের সঙ্গে কাজলের বাসায় দেখা হয়নি। কিন্তু আগের মতই রাতবিবেতে রাস্তাঘাটে দেখা হয়ে গেছে, সাদার্ন এভিনিউয়ে, লেকের পাশে, দেশপ্রিয় পার্কের সামনে, কালীঘাটের মোড়ে।

আলোছায়ার মধ্যে মোহিনীমায়া ছড়িয়ে কাজল দাঁড়িয়ে আছে। যেন ম্লান দীপশিখা থির থির করে কাঁপছে, এদিক ওদিক থেকে দুয়েকটি পতঙ্গ এগিয়ে আসছে, পিছিয়ে যাচ্ছে, ইতস্তত করছে।

কাজল আজ ডবল বিনুনি করেছে। চোখের সুরমা অনেকদুর টেনেছে। তার কপালে ময়ূরকণ্ঠী রঙের কাঁচপোকার টিপ চলমান গাড়ির আলোয় ঝিক ঝিক করছে।

কাজলের আশে পাশে আরও কয়েকটি কাজলের মত মেয়ে। তারাও জ্বলছে। কাজলের খুব কাছে জাহানাবা নামে একটি বিহারী মেয়ে, ভাল বাংলা বলতে পারে না, উর্দু বলে। মুখশ্রী ভাল নয়, আলো আধাঁরিতে সেটা নজরে পড়ে না। কিন্তু দুধে আলতায় মেশানো রঙ, হালকা নীল রঙের সালোয়ার কামিজ পরে। সেটাই জাহানারার প্রধান আকর্ষণ। তখনও সালোয়ার-কামিজ চল হয়নি বিশেষ।

এই জাহানারার ভরসা কাজল। সে কাজলের কাছে কাছে থাকে, যতক্ষণ না তার খদ্দের জোটে। কাজলের খদ্দের আগে এসে গেলে সে জাহানারাকে সঙ্গে নেওয়ার চেষ্টা করে, যদি খদ্দের রাজি হয়।

কাজলের সূত্রে জাহানারাও ইপিনকে চেনে। রাসবিহারীর মোড়ে আড্ডা দিয়ে সেদিন রাতে কালীঘাট পার্কের পাশের রাস্তা দিয়ে শর্টকাট করে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে এগোচ্ছে ইপিন, রাত হয়ে গেছে, মা জেগে আছে।

এমন সময় জাহানারা ইপিনকে দেখতে পায়। সে একটু এগিয়ে গিয়ে কাজলের গায়ে ধাক্কা দিয়ে ইপিনকে দেখায়।

ইপিন বেশ দূরে ছিল। কাজল দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল ইপিনের দিকে, তারপর ইপিনের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ থেকে স্বৈরিণীর মুখোশটা খুলে ফেলে বলল, 'গুড ইভিনিং, ইপিন।'

কাজলের মুখে বিলিতি কথা শুনে ইপিন হেসে ফেললো।

কাজল বলল, 'হাসার কি হল? মেয়ে পছন্দ হয়েছে?'

ইপিন আবার হাসল।

কাজল বলল, 'আমি জানি আপনার পছন্দ অপছন্দ বলে কোন ব্যাপার নেই। শুধু শুধু প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করলাম।'

ইপিন এবার হাসল না, প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'মা জেগে আছে। বাড়ি যাই।'

ইপিন চলে গেল। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাজল স্বস্থানে ফিরে এল। ঠিক সেই সময়ে পার্কের ওপাশ থেকে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে উচ্চগ্রামে ইপিনের ভারি গলার স্বর ভেসে এল, 'গুড নাইট, কাজল।'

চকিতে পাশ ফিরে কাজল দেখতে পেল কালীঘাট পার্কের ওপারে রেলিংয়ের পাশে একটা অস্পষ্ট মানুষ হাত তুলে বিদায়বার্তা জানিয়ে চলে যাচ্ছে।

সেই বাত্রির পর কাজলের সঙ্গে আর বিশেষ দেখা হয়নি ইপিনের।

তবে বিযেব নিমন্ত্রণপত্র ছাপা হযে আসার পবে স্মৃতিকণা একটা কার্ড ইপিনেব হাতে দিয়ে বলেছিলেন, 'কাজল কবে আসে না আসে তার ঠিক নেই, একটু চেষ্টা করে এই কার্ডটা ওকে পৌঁছে দিয়ে আমাব নাম কবে বলবি, বৌভাতেব দিন যেন নিশ্চয় আসে।'

কিন্তু কাজলকে ইপিন খুঁজে পায়নি। চেনা জায়গাগুলোয সন্ধ্যাব পবে দেখলো কিন্তু কোথাও কাজল নেই।

এদিকে বিয়ের দিন এগিয়ে আসছে। বাড়িতে ভিড়, টাঙ্গাইলের লোকজন আসছে, তাদের অনেককে ইপিন চেনে না, আত্মীয় স্বজন আসছে, তাদেরও সবাইকে ইপিন ভালো কবে চেনে না।

তা ছাড়া নতুন কুটুমবাড়ির লোকজন মানে ইপিনের শ্বশুড়বাড়ির লোকেরা যাতাযাত শুরু করেছে। অবশেষে প্রভাসকুমারও এসে গেলেন।

পাশের বাড়িতে দুয়েকটা খালি ঘর রয়েছে। স্মৃতিকণা গিয়ে একদিন তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে এলেন। তাঁরা ভদ্রতা কবেই দুটো ঘর বিয়ের কযেকদিনের জন্যে ছেড়ে দিলেন। স্মৃতিকণা আকারে-ইঙ্গিতে কিছু টাকা ভাড়া হিসেবে দেবেন বললেন, কিন্তু তাঁবা ভদ্রতাবশত টাকা নিতে রাজি হলেন না। বরং বৌভাতের দিন নতুন বৌকে চমৎকার একটা রূপোর সিঁদুরের কৌটো উপহার দিলেন।

মায়ের কথামত ইপিন নিমন্ত্রণপত্রটা নিয়ে বেশ কয়েকবার কাজলের খোঁজ করেছিল। কিন্তু কাজলের দেখা পায়নি। শেষ পর্যন্ত একদিন জাহানারাকে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে দেখতে পেয়ে তার হাতে চিঠিটা দিয়ে এসেছিল। চিঠিটা দিতে গিয়ে খামের ওপরে কাজলের নাম লিখতে হলো। কিন্তু কাজলের পদবীটা কিছুতেই খেয়াল করতে পারলো না। শুধু 'কাজল' না লিখে একটু রসিকতায় ছোঁয়া মিলিয়ে খামের ওপরের 'স্নেহের কাজল' লিখে চিঠিটা জাহানারার হাতে দিয়ে দিল।

জাহানারা বলল যে দেখা হলেই চিঠিটা কাজলদিকে দিয়ে দেবে। তবে সে নিজেও বেশ

কয়েকদিন কাজলদিকে দেখছে না। অসুখ-বিসুখ হল নাকি, চারদিকে খুব জ্বরজারি হচ্ছে।

বলা বাহুল্য, কাজল ইপিনের বৌভাতে আসেনি। তবে ইপিন-মেনকার বিয়েতে বেশ ধুমধাম হয়েছিল। মনোহরপুকুর রোডের বাড়ির সামনের ফুটপাথ দিয়ে বিরাট ম্যারাপ বেঁধে আমন্ত্রিতদের বসার বন্দোবস্ত হয়েছিল। ফুটপাথ ব্যবহার করার অনুমতি ডেকরেটারই কর্পোরেশন থেকে নিয়েছিল। ছাদে ত্রিপলের তাঁবু টাঙ্গিয়ে খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছিল।

বহু পুরনো আত্মীয় স্বজন টাঙ্গাইলের লোক, ভুলে যাওয়া মানুষজন বিয়েতে এসেছিল। অনেকে সাবেকি মতে কাঁচাটাকা দিয়ে নতুন বৌয়ের মুখ দেখেছিলেন।

প্রভাসকুমার আসার সময় গাওয়া ঘিয়ের জন্যে বিখ্যাত গ্রাম টাঙ্গাইলের দান্না থেকে পাঁচসের ঘি নিয়ে এসেছিলেন। দর্শনা বর্ডারে তখন প্রভাসকুমারের এক মক্কেলের ছেলে শুল্ক অফিসার, সে শুধু পাকিস্তানী সীমান্তই পার করে দেয়নি ওপারে বানপুরে ভারতীয় অফিসারদের অনুরোধ পাঠিয়েছিলো এই ঘি যেন না আটকানো হয়। পৃথিবীর সব সীমান্তেই এ ধরনের পারস্পরিক অনুরোধ রক্ষা করার রীতি আছে। এ ক্ষেত্রেও অনুরোধ রক্ষিত হয়েছিল।

সেই ঘি বড় একটা কাঁসার জামবাটিতে নিয়ে বহুকালের পুরনো ভৌমিক নিবাসে গয়নার বাক্সের মধ্যে রেখে দেওয়া রুপোর চামচে প্রত্যেক নিমন্ত্রিতের পাতায় গরমভাতের ওপর মেনকা পরিবেশন করেছিল। সেটাই বৌভাতের নিয়ম, নতুন বৌ পাতে পাতে ঘি দেবে।

ভৌমিক নিবাস থেকেও নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বেশ কয়েকজন এসেছিল। একদা এদের কারো কারো কাছে ইপিন অপমানিত হয়ে ভৌমিক নিবাস ছেড়ে চলে এসেছিল। তবে এখন আর ইপিনের মনে কোন রাগ ছিল না। তা ছাড়া ইপিন-বিপিন দু'ভাই মনে মনে যে আশঙ্কা করেছিল, ভৌমিক-নিবাস থেকে গচ্ছিত গয়নাগুলো কখনো উদ্ধার করা যাবে না, সেটাও সত্যি হয়নি।

স্মৃতিকণা কলকাতায় পৌঁছেই পরের সপ্তাহে ভৌমিক নিবাসে গিয়েছিল। ইপিন সঙ্গে যায়নি। বিপিন গিয়েছিল। স্মৃতিকণাকে কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে হয়নি, তিনি না চাইতেই সিন্দুক খুলে স্মৃতিকণার নাম পিসিঠাকুমার হাতে লেখা লেবেল দিয়ে সাঁটা কালো মেহগনির নক্সাকাটা বাক্সটা স্মৃতিকণার হাতে তুলে দিয়েছিলেন ভৌমিক নিবাসের নতুন প্রজন্মের বড় কর্তা। বাক্সটা হাতে নিয়েই স্মৃতিকণা বুঝেছিলেন, সব গচ্ছিত জিনিষ ঠিকঠাক আছে, তালা খুলে মিলিয়ে দেখার কোনো দরকার নেই।

সেই মেহগনি বাক্সের ভিতর থেকে বেরিয়েছিল কবেকার রুপোর চামচে, প্রভাসকুমারের বড় ঠাকুমার, স্মৃতিকণার দিদিশাশুড়ির বিয়ের যৌতুক, সেই কবেকার মোহরবালা।

মোহরবালা ভদ্রমহিলার গায়ের রং বেশ কাল ছিল। বিয়ের সময় তিনি মহিলা ছিলেন না। নিতান্ত বালিকা, মাত্র সাড়ে নয় বছর বয়েস। দেলদুয়ারের গজনভি বাড়ির জ্যোতিষী আর কবিরাজ মধু রায়ের নাতনি, মোহরবালা।

অশীতিপর বৃদ্ধ তৃতীয় গজনভি তখনো বেঁচে ছিলেন, মীর মোশাররফ হোসেন তাঁরই জমিদারি সেরেস্তায় বসে তখন 'বিষাদ সিন্ধু' লিখছেন। আর খাজনার হিসেবে গোলমাল করছেন।

বুড়ো গজনভি উদারহৃদয় মানুষ ছিলেন। তাঁর ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য ছিলো না। চৌদ্দ বছর বয়েসে তাঁর যৌবন শুরু হয়েছিল। যৌবন শেষ হয়েছিল চুয়াত্তর বছর বয়েসে।

দীর্ঘ ষাট বছরের বিস্তারিত যৌবন। নীল চোখ, দুধে-আলতায় মেশানো গায়ের রঙ, দীর্ঘকায়। বৃদ্ধ বয়েসেও সাবলীল এবং আত্মবিশ্বাসী, তিনি মোহরবালার বিয়েতে রুপোর বাসন উপহার দিয়েছিলেন।

মোহরবালার গায়ের রঙ বেশ কালো ছিলো, রুপোর সামগ্রীর ঔজ্জ্বল্যে সেই গাত্র বর্ণ কিছুটা

আড়াল দিয়েছিলেন।

গজনভি সাহেবের সেই রুপোর বাসনের আর সামান্য কিছুই অবশিষ্ট আছে। তার মধ্যে এই একটা চামচ রয়েছে। গত কয়েক পুরুষ ধরে এ বাড়ির নতুন বৌয়েরা এই একই চামচে দিয়ে বৌভাতে পাতে পাতে ঘি পরিবেশন করে আসছে।

দেশ থেকে নিয়ে আসা ঘি ছাড়াও আর একটা দেশি ব্যাপার করেছিলেন প্রভাসকুমার। টাঙ্গাইল থেকেই চিঠি লিখে বন্দোবস্ত করেছিলেন বাংলা বাজনার।

টাঙ্গাইল থেকে কিছু দক্ষিণে, ধলেশ্বরী নদীর তীরে একটা বাদ্যকরদের গ্রাম ছিল, নাটা পাড়া নাম। নাটা শব্দটা সম্ভবত নাট্য শব্দের অপভ্রংশ। নাটা পাড়ার খ্যাতি ছিল বাংলা বাজনায়। ঢাক, ঢোল, কাঁসি, মৃদঙ্গ, সানাই, তাব-সানাই এমনকি খঞ্জনী, মাটির হাঁড়ির সঙ্গে ছোট আকারের বেহালা বাঁশি, যত রকম গ্রামজ বাদ্যযন্ত্র আছে, সেগুলো বাজানোয় সিদ্ধহস্ত ছিল নাটাপাড়ার বাজনদারেরা।

পাকিস্তান হওয়ার পরের বছর উনিশশো আটচল্লিশ সালের চৌদ্দই আগস্ট পাকিস্তান দিবসে টাঙ্গাইলের পুলিশ সাহেবের মাঠে বাজনা বাজানোর পর জাত যায় বাজনদারদের।

পাঠান পুলিশ সাহেব বাজনা শুনে এত প্রীত হয়েছিলেন যে সকালে পতাকা উত্তোলনের পব দুপুরে বাদ্যকরদের খেয়ে যেতে বলেন।

বাদ্যকবেবা মনের আনন্দে ভরপেট ভাত মাংস খেয়ে মজুরি ও বকসিশ নিয়ে ফিরে আসে। [illegible] থোক, পবে তাবা শুনতে পায় সেদিনের সেই মাংস নাকি গোমাংস ছিল।

এর পরে পরেই বাদ্যকবদল চিবকালেব মত পিতৃপুরুষের ভিটে নাটাপাড়া ছেড়ে ভারতে চলে যায়। এখানে এসে চাকদহের কাছে এক সদ্য গড়ে ওঠা রিফিউজি কলোনিতে তারা আস্তানা বাঁধে।

প্রভাসকুমার খববটা জানতেন। তিনি চাকদহে এক পুরনো সহপাঠীকে চিঠি লিখে বাজনদারদের ঠিকানা সংগ্রহ করেন।

বাজনদারেরা দেশেব লোকের ডাক পেয়ে খুব খুশিমনে ইপিনের বিয়েতে বাজাতে আসে। কিন্তু তাদের বাজনায় আর সে পুরনো জলুষ ছিল না। বাদ্যযন্ত্রগুলিও পুরনো হয়ে গিয়েছিল। পুরনো বাজনদারেরা প্রায় কেউই ছিল না। নতুনেরা ভাল করে হাত পাকায়নি। শেষ পর্যন্ত বাজনার ব্যাপারটা বেশ খাপছাড়া মনে হয়েছিল।

দেশে থাকতে বাজনাদারেরা বিয়ে বাড়িতে এলে দিন সাতেক থেকে যেতো।

কিন্তু কলকাতায় বিযে। বাদ্যকরেবা পরের দিনই চলে গেল। তারা থাকতেও চায়নি। তাদের নিজেদের কাজকর্ম আছে। কেউ কেউ চাকরি-বাকরি করে। একজনের আনাজ-তরকারির দোকান। একজনের পান-বিড়ির দোকান।

আত্মীয় স্বজনরা সকলেই প্রায় বিয়ের দিন সন্ধ্যাতে এসে রাতেই খাওয়ার পর ফিরে যায়। দুয়েকজন যারা ছিল, তারাও কয়েকদিনের মধ্যে চলে গেল।

চৈত্রমাস পড়ার আগে মেনকাকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিয়ে টাঙ্গাইলের নিকট প্রতিবেশিনী এবং তখনো বর্তমান, আত্মীয়াদের জন্যে পাওয়া ইপিনের বিয়ের প্রণামীর শাড়ি ট্রাঙ্কে গুছিয়ে স্মৃতিকণা ও প্রভাসকুমার দেশে ফিরে গেলেন।

যাওয়ার আগে স্মৃতিকণা কালীঘাট মন্দিরে মানত করে গেলেন, 'সামনের বছর যেন এইভাবে এসে বিপিনের বিয়ে দিয়ে যেতে পারি।'

কলকাতা থেকে ফেরার দিনক্ষণ জানিয়ে প্রভাসকুমার বাড়ির মুহুরিবাবুকে চিঠি দিযেছিলেন। বাড়িঘর পরিষ্কার করে রাখতে বলেছিলেন। কিন্তু মুহুরিবাবু সে চিঠি পাননি। স্টিমারে বিকেলেব দিকে চারাবাড়ি ঘাটে নেমে ঘোড়ার গাড়িতে করে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় টাঙ্গাইলের বাসায় এসে পৌঁছালেন।

কলকাতা থেকে, হৈ হৈ উৎসবের মধ্য থেকে চলে আসায় এমনিতেই কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল স্মৃতিকণার।

বাড়ি পৌঁছে দেখেন নিঝুম অন্ধকার, অত বড় বাড়িতে বাইরের কাছারিঘবে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। বাড়ির সামনের আর পিছনে উঠোন কচুগাছে আগাছার জঙ্গলে ছেয়ে আছে।

স্মৃতিকণার মন খারাপ হয়ে গেল।

টাক ডুমাডুম। টাক ডুমাডুম॥
খামু যামু। আসুম বসুম॥
রাত্রে ঘুম। দিনে ঘুম
ইষ্টিকুটুম। ইষ্টিকুটুম॥

আজ কয়েকদিন হলো একজোড়া ইষ্টিকুটুম পাখি রান্নাঘরের পিছনে ডোবার ধারে কলাপাতি আমগাছের ডালে ভরদুপুর বেলায় এসে চেঁচামেচি করে স্মৃতিকণার ভাতঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে চলে যায়।

স্মৃতিকণা রেগে যান না। সেই কবেকার ছোট বয়েসের ছড়া মনে পড়ে। 'দিনে ঘুম, রাত্রে ঘুম। ইষ্টিকুটুম-ইষ্টিকুটুম।' স্মৃতিকণা শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে টানা বারান্দায় শেষ প্রান্তে রান্নাঘরের দিকটায় এসে দাঁড়ালেন।

ইষ্টিকুটুম পাখিগুলো বড় চঞ্চল। বড় ভিতু। একদম মানুষের মতো গলায় কথা বলে, কিন্তু মানুষ দেখেই চমকিয়ে যায়।

স্মৃতিকণা বারান্দার শেষ প্রান্তে পৌঁছানোর পরে তাঁর পায়ের শব্দ শোনা মাত্র পাখি দুটো উড়ে যায়। আধো নীল আধো হলুদের মধ্যে ঘন সবুজের ঝলক, বর্ষাব দিনে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো স্মৃতিকণা দেখেন জোড়া ইষ্টিকুটুম উড়ে যাচ্ছে। উত্তরের দেয়ালের পাশের তেঁতুলগাছের মাথা পার হয়ে, কালীবাড়ির জোড়া নারকেল গাছের ঝিরিঝিরি পাতার মধ্য দিয়ে সোনা-সবুজ পাখি উড়ে যাচ্ছে।

দিগন্তে বিলীয়মান বিহঙ্গম দম্পতির উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে নমস্কার জানালেন স্মৃতিকণা। বহুকালের অভ্যেস এটা তাঁর। অনেকদিন আগে বালিকা বয়েসে মামার বাড়িতে শিখেছিলেন। কাক-চড়ুই এইরকম ঘরোয়া আটপৌড়ে পাখি বাদ দিলে অন্য যে কোনো পাখি জোড়ায় দেখলে তিনি নমস্কার করেন।

এই ইষ্টিকুটুম পাখি দুটো এদিককার নয়। কাছাকাছি কোনো জঙ্গল বা আমবাগান থেকে উড়ে আসে। সাধারণত এই ফাল্গুন-চৈত্র মাসে, তাও প্রত্যেক বছর আসে না।

এ বছর ইপিনের বিয়ে হয়েছে। সেই জন্যে ইষ্টিকুটুমের জোড়া কুটুমবাড়ির খবর নিয়ে আসে।

কিন্তু কুটুমবাড়ি তো এখানে নয়, অত দূর থেকে ওরা আসে না। তবে কোনো বাড়িতে নতুন কুটুম হলে কুটুম পাখি এমনিতেই খবর পেয়ে যায়, হাওয়ায় সে খবর ভেসে আসে, তারই তত্ত্ব দিতে আসে গৃহস্থ বাড়িতে।

শুধু ইষ্টকুটুম পাখি নয়, এবার পাখির ভিড় খুব। রবিশস্য মাঠে মাঠে কাটা শুরু হয়ে গেছে। মাঝে-মধ্যেই সবুজ টিয়ার ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে বাড়ির ওপর দিয়ে। খালে বিলে জল নেমে এসেছে। বকেরা সকাল-সন্ধ্যা সারি বেঁধে যাতায়াত করছে।

খুব সকাল বেলায় কাক ডাকা শুরু হওয়ায় একটু পর থেকেই ঘুঘু সুর করে ডাকতে থাকে, 'ঠাকুর গোপাল ওঠো ওঠো।' বেলা বাড়তে শালিকেরা ঝগড়া, মারামারি শুরু করে। ছাতারে পাখিগুলোও খুব ঝগড়াটে। একেকদিন পড়ন্ত বিকেলে ঝলমল করতে করতে বৌ-কথা-কও পাখি উড়ে আসে, সোজা অশোক গাছের ঘনপাতার আড়ালে চলে গিয়ে নিরন্তর ডেকে যেতে থাকে।

আজ কয়েকদিন হলো প্রভাসকুমার স্মৃতিকণা কলকাতা থেকে ফিরেছেন।

কলকাতার হৈ হট্টগোলে, বিয়ে বাড়িতে কয়েক সপ্তাহ বাস করে ফিরে একটু ফাঁকা লাগারই কথা। কিন্তু ধীরে ধীরে সয়ে আসছে। অল্প বয়েসে স্মৃতিকণা এ বাড়ির বৌ হয়ে এসেছিলেন। তারপর দীর্ঘ যুগ কেটে গেছে। খোলামেলা বিশাল বাড়িতে হাত পা মেলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার অভ্যাস তাঁর। সেদিক থেকে মনোহরপুকুরের দুটো খুপরি ঘরে তাঁর একটু অসুবিধেই হয়েছিলো। এটা সেখানে থাকায় সময়ে টের পান নি, হৈচৈ করে দিন কেটে গেছে। এখন এখানে ফিরে এসে বুঝতে পারছেন।

ফিরে আসার পর প্রথম সন্ধ্যায় ঘোড়ার গাড়ি থেকে শূন্য বাসায় মালপত্র নামিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে স্মৃতিকণার একটু খটকা লেগেছিলো, যেন এ কোথাও এলাম?

কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে কাজের লোকজনেরা, প্রতিবেশীরা লণ্ঠন নিয়ে, কুপি নিয়ে হৈ চৈ করে চলে এলো। মুহুরিবাবু কাছারি ঘরে আলমারি খুলে পুরনো হ্যাজাকটা বার করে দালানের ভিতরের বারান্দায় জ্বালিয়ে দিলেন। বারান্দার মধ্যের থামের মাথায় একটা ঝুলন্ত আংটা আছে সেখানে হ্যাজাক ঝুলিয়ে দিতে পুরো বাড়িতে আলো ছড়িয়ে পড়লো। আলো দেখে রাস্তা থেকে লোকজন যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, 'উকিলবাবু, ফিরলেন নাকি?' 'প্রভাসদা ছেলের বিয়ে ভালোমত মিটলো?' পুকুরঘাট থেকে প্রতিবেশিনীরা জানতে চাইলো, 'ও ইপিনের মা, সব ভালো তো? ইপিনের বৌ ভালো হয়েছে তো?'

কেউ কেউ বাড়ির মধ্যে চলে এলো খোঁজখবর নিতে। সেদিন রাতে বাড়ির মধ্যে জমাটি আড্ডা। কথায়-কথায়, গল্পে-গুজবে অনেক রাত পর্যন্ত গড়ালো।

পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে বারান্দার থামে গা এলিয়ে দিয়েছিলেন স্মৃতিকণা। এরই মধ্যে বাক্স খুলে একটি খাম বার করে তার মধ্যে থেকে অনেকগুলো ফটো বার করলেন।

ইপিনের বিয়ের সব ছবি। বিপিন বন্ধুর ক্যামেরা চেয়ে এনে তুলেছে।

সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে ইপিনের আশীর্বাদের ছবি, বরযাত্রার ছবি, মালাবদলের ছবি দেখলো। খুঁটিনাটি প্রশ্ন করতে লাগলো।

মেনকার ফটো দেখে, সবাই বললো, 'না। বৌ বেশ ভালো হয়েছে।' হয়তো এটা তাদের সবার মনের কথা নয়, তা ছাড়া ফটো দেখে তো তেমন কিছু বোঝা যায় না।

এতদিন বিয়ের হট্টোগোলে তেমন করে খুঁটিয়ে বিবেচনা করে দেখেন নি তিনি, আজ এই

এতজনের প্রশ্নের সামনে স্মৃতিকণার মনে হলো, না বৌ খারাপ হয়নি।

হয়তো একটু বেশি লম্বা, ইপিনের সঙ্গে প্রায় মাথায় মাথায়, গায়ের রংও একটু মাজা। কিন্তু মুখশ্রী ভালো, গড়ন ভালো, চালচলনও খারাপ মনে হলো না। পাল্টা ঘর, বংশ ভালো। লেখাপড়া জানে। ইতিহাসে এম এ পাশ।

প্রভাসকুমারও ইতিহাসে এম এ। ছেলের বৌয়ের শ্বশুরের সমান বিদ্যা, এটা কম কথা নয়। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা, বিবেচনার বিষয় ছিলো মেনকার বাবা। কলকাতার মত জায়গায় ইপিন-বিপিনের জন্য একজন ভাল অভিভাবক খুঁজছিলেন প্রভাসকুমার-স্মৃতিকণা।

অভিভাবক হিসেবে মেনকার বাবা বিশ্বনাথ রায় যথেষ্টই উপযুক্ত।

ভদ্রলোক বিপত্নীক। মেনকার দু'বছর বয়েসে তার মা মারা যান। বিশ্বনাথবাবু আর বিয়ে করেননি। নিজে নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে চেয়েছেন। তবে মেনকাকে যত্ন করে মানুষ করেছেন, একটু বড় হলে হোস্টেলে রেখে পড়াশুনো করিয়েছেন।

মেনকা মা-মরা মেয়ে। সেই জন্যে স্মৃতিকণা তাকে একটু বেশি স্নেহের চোখে দেখেছেন। বিয়ের পরে এই যে কয়দিন মেনকা তাঁর কাছে ছিলো তিনি নিজের হাতে তার মাথায় তেল লাগিয়ে দিয়েছেন, বিকেলে চুল আঁচরিয়ে শক্ত করে খোঁপা বেঁধে দিয়েছেন।

হস্টেলে বড় হয়েছে, রান্নাবান্না বিশেষ শেখেনি মেনকা। তাকে টুকটাক ডাল, ভাত, মাছের ঝোল রান্না শিখিয়ে দিয়ে এসেছেন স্মৃতিকণা।

আসলে স্মৃতিকণার একটা মেয়ের ইচ্ছে ছিলো বহুদিন। ইপিন-বিপিনের পরে একটা মেয়ে হয়েও ছিলো। কিন্তু আঁতুড় ঘরেই সেটা মারা যায়। সেই শিশুকন্যার মুখ স্মৃতিকণার স্পষ্ট মনে নেই। মনে থাকার কথাও নয়। কিন্তু মেনকার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অনেক সময় স্মৃতিকণা ভাবতেন আমার মেয়েটা বেঁচে থাকলে অনেকটা এই রকমই দেখতে হতো। এ চিন্তার অবশ্য কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক ছিলো না।

কথায় কথায় বেশ রাত হয়ে গেলো।

*　　　*　　　*

আসার একটু পরেই জামাকাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে এক কাপ চা আর একটা মিষ্টি খেয়ে প্রভাসকুমার কাছারি ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলেন।

বেশ কয়েকদিন আদালত কামাই গেছে। ফিরে এসেই চলতি মামলার খোঁজ খবর নিয়ে, মুহুরিবাবুদের সঙ্গে নথিপত্র নিয়ে এসেছেন। দুয়েকজন জুনিয়ার উকিলও এসেছে।

ঘোড়ার গাড়িতে করে স্টিমার ঘাট থেকে আসার সময় স্মৃতিকণার সঙ্গে ঠিক হয়েছিলো, রাতে রান্না করার প্রয়োজন নেই। পোড়াবাড়ি স্টেশন থেকে দই আর চমচম কিনে নিয়ে আসা হয়েছে। তাই খেয়ে রাতে শুয়ে পড়লেই হবে।

এ কথা বাসায় এসে বলার পরে সবাই আপত্তি করেছিলো। হারাধনের মা রান্নাঘরে উনুন ধরাতে যাচ্ছিলো, স্মৃতিকণা বাধা দিয়ে বলেছিলেন, 'ভাত রাঁধতে হবে না। স্টিমারে ওঠার আগেই সিরাজগঞ্জ ঘাটে অবেলায় হোটেলে ভাত খেয়েছি। কি নোংরা জায়গা, আমার এখনো গা গোলাচ্ছে।'

জিনিসপত্র গুছিয়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ স্বামী-স্ত্রী শুতে গেলেন। অনেকদিন পরে পুরোনো বাড়িতে একই বিছানায়। বিছানায় শুয়ে ইপিন-বিপিন-মেনকার কথা ভাবতে গেলেন স্মৃতিকণা। কিন্তু হঠাৎ অকারণেই কাজলের কথা মনে পড়লো। ফটোর প্যাকেটের

মধ্যে জার্মানি থেকে পাঠনো বিপিন দত্তের পিকচার পোস্টকার্ডটাও কি করে এসে গিয়েছিল, সেই যে পোস্টকার্ডে কাজলের কথা লেখা ছিলো, যা নিয়ে ইপিনকে জেরা করেছিলেন স্মৃতিকণা।

এমন হতে পারে পিকচার পোস্টকার্ডটা ভুলবশত চলে আসেনি। ইপিন নিজেই স্মৃতিকণার ফটোর প্যাকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। কাজলের প্রসঙ্গ এখন বিয়ের পরে ইপিন সরিয়ে দিতে চাইছে।

পিকচার পোস্টকার্ডটা হারাধনের মা'র চোখে পড়েছিলো, সে স্মৃতিকণার খুব নেওটা। স্মৃতিকণার জিনিসপত্র গুছিয়ে বাক্সে তোলার সময় ওই পোস্টকার্ডটা ফটোর প্যাকেটে তোলার সময় হারাধনের মা জিজ্ঞাসা করেছিলো। 'এই বুড়ো লোকটা কে?'

স্মৃতিকণা বললেন, 'ও কিছু নয়, এটা একটা চিঠি।' হারাধনের মাকে কাজল সম্পর্কে কিছু বলতে হলো না। কিন্তু চোখের সামনে কাজলের মুখটা ভাসতে লাগলো।

আশেপাশের বাড়ি থেকে যারা এসেছিলো, ইপিনের বিয়ের গল্প শুনে, ইপিনের বৌয়ের আর বিয়ের ছবি দেখে তারা চলে গেলো।

হারাধনের মা কয়েকবার ভাত রাঁধার প্রস্তাব দিয়ে এবং রাতে ভাত না খাওয়া যে মোটেই ভালো নয়, ভিটেয় ফিরে এসে উপোস দিতে নেই, এই সব উপদেশে স্মৃতিকণা কর্ণপাত না করায় অবশেষে বেশ বড় একটা হাই তুলে নিজের ঘরে ঘুমোতে চলে গেলো। দুবার ছেলে হারাধন এসে ঘুরে গেছে, তার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। মা বাসায় না গেলে কে খেতে দেবে।

হারাধনের শুকনো মুখ দেখে স্মৃতিকণা ঠিকই অনুমান করেছিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাকে বিরক্ত করছিস কেন? খিদে পেয়েছে?'

সেই ছোটবেলা থেকে হারাধন স্মৃতিকণার ন্যাওটা। খুব ছোটবেলায় হারাধন কেমন গোলগাল, বেঁটেখাটো ছিলো। স্মৃতিকণার মনে আছে। সারা বাড়ি জুড়ে উদোম, দামাল হারাধন দৌড়াদৌড়ি করছে, সম্পূর্ণ নিরাবরণ শুধু কোমরে কালো সুতোয় গিট দিয়ে বাঁধা তামার পয়সা সেই যুদ্ধের যুগের রাজমুকুটের ছাপ ফুটো পয়সার কপালে।

স্মৃতিকণার মনে হয় এই তো এই সেদিনের কথা, হারাধন তেমন বাড়ছে না দেখে বিপিন তাকে লম্বা করার জন্য দুটি শিশু মুষ্টি নিজের হাতে শক্ত করে পাঁই পাঁই করে পাক খাওয়াতো উঠোনে।

কয়েকপাক খাওয়ার পর ছেড়ে দেওয়া মাত্র হারাধন মাথা ঘুরে উঠোনে পড়ে গিয়ে ধুলোয় গড়াগড়ি খেতো। বিপিনও অনেক সময় মাথা ঘুরে পড়ে যেতো।

আজ সন্ধ্যায় হাঁড়ি থেকে বার করে একটা চমচম দিলেন হারাধনকে স্মৃতিকণা। বালক হারাধন সেটা হাতে নিয়ে ভেঙে ভেঙে চেটেপুটে খেয়ে নিলো।

এরপর কি যেন মনে হতে স্মৃতিকণা কলকাতা থেকে নিয়ে আসা ঝুড়িটা খুলে একটা কাগজের প্যাকেট ছিঁড়ে দুটো চিনিওলা মুচমুচে নাইস বিস্কুট দিলেন হারাধনকে।

টাঙ্গাইল শহরে জন্মে গরিব বাড়ির ছেলে হারাধন কালেভদ্রে চারাবাড়ি বা পোড়ো বাড়ি কিংবা টাঙ্গাইল সদর বাজারের মিঠাই পট্টির চমচম খাওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু চিনিচর্চিত নাইস বিস্কুটের স্বাদ সে এর আগে আর কখনো পায়নি।

ওই সব সুখাদ্য অম্লান বদনে গলধঃকরণ করে হারাধন স্বগৃহে ফিরে গিয়েছিলো। কিন্তু ভাতের খিদে এভাবে মেটে না।

তা ছাড়া হারাধনের মা অনেকদিন পরে স্মৃতিকণাকে পেয়ে একটু বেশি দেরি করছিলো।

কাজলের প্রসঙ্গ ওঠায় একটু আনমনা হয়ে স্মৃতিকণা উঠে পড়লেন। জিনিসপত্র গুছিয়ে

ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন।

হারাধনের মা চলে গেলো। একটু আগেই কাছারি ঘর থেকে প্রভাসকুমার এসে হাতমুখ ধুয়ে নিয়েছেন।

অনেকদিন পরে ভিতরের বারান্দায় কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িতে মুখোমুখি বসে দই মিষ্টি দিয়ে স্বামী-স্ত্রী নৈশভোজ সমাপন করলেন।

স্মৃতিকণা কলকাতার কথা ভাবছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই কাজলকে বারবার মনে পড়ছিলো।

কাজল ইপিনের বিয়েতে আসেনি, আসার কথা নয়। তবে পরে একদিন দুপুরবেলায় এসে খুব সুন্দর সোনালি আর নীল সুতো দিয়ে রঙিন এমব্রয়ডারি করা ছয়টা রেশমের রুমাল মেনকাকে উপহার দিয়ে গিয়েছিলো।

দুপুরে বাড়িতে কেউ ছিলো না। প্রভাসকুমাব স্মৃতিকণাকে নিয়ে বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন। দুপুরবেলায় ভাতঘুম দিয়ে জেগে উঠে খালি বাসায় মেনকার আর সময় কাটতে চাইছিলো না। বিয়েতে অনেকগুলো বই পেয়েছে, ইপিনের বন্ধুবান্ধবরা প্রায় সবাই বই উপহার দিয়েছে, সেগুলো নাড়াচাড়া করছিলো।

এমন সময় দরজায় কলিং বেলটা বেজে উঠলো। ওটা নতুন লাগানো হয়েছে, বিয়ের আগে। তাই বেশ কড়া শব্দ।

মেনকা উঠে গিয়ে দরজা খুলতে কাজল হেসে বললো, 'আমি কাজল, ইপিনের বন্ধু। মাসীমা নেই।'

মেনকা কাজলকে ভেতরে আসতে বলে, স্মৃতিকণা বেলুড় মঠে গেছে জানালো।

'ঘুম ভাঙালাম বুঝি?' কাজল প্রশ্ন করলো, 'তোমার বর তোমাকে আমার কথা কিছু বলেছে?'

মেনকা ঘাড় নেড়ে বললো না। সত্যই ইপিন তাকে কিছু বলেনি।

কাজল তাব হাতব্যাগ খুলে একটা সেলোফেন কাগজের মোড়াকে জড়ানো রুমালগুলো মেনকাকে দিলো, 'আমি তোমার বিয়েতে আসতে পারিনি। এটা তোমার বিয়ের উপহার। আমি নিজের হাতে বুনেছি।'

রুমালগুলোর কারুকার্য দেখে মেনকা মুগ্ধ মুখে বললো, 'খুব সুন্দর।'

কাজল উঠতে যাচ্ছিলো, মেনকা বললো, 'বসুন। চা খেয়ে যান।'

কাজল বললো, 'না যাই। তাড়া আছে।'

বেরোনোর মুখে মেনকা হঠাৎ বলে ফেললো, 'রুমালগুলো না দিলেই পারতেন।'

কাজল ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'কেন?'

মেনকা বললো, 'শুনেছি রুমাল উপহার দিলে বিচ্ছেদ হয়। ছাড়াছাড়ি হয়।'

কাজল রহস্যময় হেসে মেনকার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে মেনকার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে নরম গলায় বললো, 'আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়াই তোমার পক্ষে ভালো।'

রাস্তায় নেমে কাজল চলে গেলো।

ফাল্গুনের বিকেলের রোদে নতুন ঝাঁঝ লেগেছে। ল্যান্সডাউনের মোড়ে বুড়ো বকুল গাছটা গন্ধভরা ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছে দক্ষিণের বাতাসে।

কাজলের মাথার চুলে বোধহয় একটা ফুল ঝরে পড়েছিলো, ডান হাত তুলে আলতো করে ফুলটা ঝেরে ফেলে দিয়ে একটু পিছন ফিরে তাকিয়ে কাজল মোড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

মেনকা দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে চলে এলো।

এত কথা স্মৃতিকণা জানেন না। ইপিনও জানে না। শুধু কাজল এসেছিলো, রুমাল উপহার দিয়ে গেছে এই কথাটা শাশুড়ি ও বরকে মেনকা বলেছিলো।

প্রভাসকুমার অবশ্য কাজলের কথা মোটেই জানেন না। স্মৃতিকণা তাঁকে কিছু বলেন নি। বলার মত কোনো ব্যাপার নয়। এ রকম কত ব্যাপার প্রভাসকুমার জানেন না, প্রভাসকুমারের মত পুরুষ মানুষেরা জানেন না, খোঁজ রাখেন না।

আজ প্রায় মধ্যযামে ক্ষীণ লণ্ঠনের আলোর মুখোমুখি খেতে বসে স্মৃতিকণা ঠিক করলেন এসব কথা প্রভাসকুমারকে বলার কোনো প্রয়োজন নেই, মানেও হয় না।

প্রবাসফেরত সেই রাত, স্মৃতি-বেদনায়, সুখে-আয়েশে প্রভাসকুমারের গলায় হাত দিয়ে জড়িয়ে সদ্য প্রৌঢ়া স্মৃতিকণা তন্দ্রা, স্বপ্ন আর ঘুমের মধ্যে সারা রাত আধো জাগা আর আধো না জাগায় কাটিয়ে দিলেন। গভীর ঘুম এলো শেষ রাতে। পথের ক্লান্তি, সেইসঙ্গে আগের দিন রাতে ট্রেনে না ঘুমানো, সকালবেলায় ঘুম ভাঙলো অনেক বেলায়।

নতুন বৌ হয়ে এ বাড়িতে আসার পর স্মৃতিকণা বেশ কয়েকবার দেরি করে উঠে বিড়ম্বিত হয়েছিলেন। সে সব বহুদিন আগের কথা। তারপর বহুকাল চলে গেছে। এখন বহুকাল তিনিই সংসারের কর্ত্রী।

আজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে স্মৃতিকণা দেখলেন শোয়ার ঘরের দেওয়াল ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজে। জানালা দিয়ে রোদ সারা ঘরে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

ধড়মড় করে বিছানা থেকে নেমে কোনো রকমে শাড়িটা শরীরে জড়িয়ে তেতো বাসি মুখে ভেতরের বারান্দায় গিয়ে স্মৃতিকণা দেখলেন কামলারা কাজ শুরু করেছে। এক সঙ্গে দশবারো জন কামলা, বাড়ির চারপাশে কাজ করছে।

কামলা মানে জন-মজুর, দৈনিক হারে এরা কাজ করে। এরা অনেকেই পুরানো লোক, কেউ কেউ স্মৃতিকণাকে 'মা' বলে। এটাই এদিকের রীতি, বয়স্কা গৃহিনীস্থানীয়াকে 'মা' বলে সম্বোধন করা। এটা এক ধরনের সামাজিক সম্মান জানানো।

এই সম্মানটা খুব উপভোগ করেন স্মৃতিকণা। তাঁর দুই ছেলে বিদেশে। এই কামলাদের অনেককেই তিনি শিশুবেলা থেকে চেনেন। কেউ কেউ ইপিন-বিপিনের সমবয়সী। দু-একজন ইপিন-বিপিনের সঙ্গে স্কুলেও গিয়েছে, ওই নীচু ক্লাস পর্যন্ত, গরীবের ঘরের ছেলে, লেখাপড়া চালাতে পারেনি, কাজকর্মও যোগাতে পারেনি। এখন গৃহস্থ বাড়িতে জন খাটে।

স্মৃতিকণাকে বারান্দায় আসতে দেখে বারান্দার গোল সিঁড়ির সামনে দুজন ঘাস জঙ্গল পরিষ্কার করছিলো তারা মুখ তুলে হাসলো। একজন রিয়াজ, অন্যজনের নাম স্মৃতিকণা জানেন না।

রিয়াজ বিপিনের সঙ্গে পড়তো, স্মৃতিকণার মন-মর্জি, রুচির খবর সে রাখে। উঠোনের গোলাপলতার পরিচর্যা ঋতু ও প্রয়োজন অনুসারে সেই করে।

এই দেড় মাসে গোলাপলতার ঝাড় পুরো বুনো চেহারা নিয়েছে। বারান্দার থাম বেয়ে দোতলার ছাদে উঠে গেছে কয়েকটা ডাল, আর বাকি লতাগুলো উঠোন আধাআধি জুড়ে, বারান্দায়, রান্নাঘরের থামে ঘন সবুজ জঙ্গল রচনা করেছে।

খুব সাবধানে গাছের গোড়া ঠিক রেখে উপরের দিক থেকে লতা ছেঁটে গোলাপ ঝাড়টাকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করছে রিয়াজ আর তার সহযোগী। একজন ঝোপ থেকে লতা ছাড়িয়ে উঁচু করে ধরছে অন্যজন দা দিয়ে সেখানটা ছেঁটে দিচ্ছে।

কঠিন কাজ। দুজনারই হাত দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে, গোলাপের কাঁটা ফুটে।

স্মৃতিকণাকে দেখে রিয়াজ খুশিমুখে ইপিনদার বিয়ে কেমন হলো, বৌ কেমন হলো খোঁজ নিলো।

স্মৃতিকণা রিয়াজের কথার জবাব দিয়ে বাথরুমে চলে গেলেন। আগে বাথরুমটা ইঁদারার কাছে ছিলো। শহরে কলের জল আসার পরে একটা লাইন বারান্দার পাশে নিয়ে এসে চারদিক ঘিরে দালানের মধ্যেই বাথরুম করা হয়েছে। রাতবিরেতে দালান থেকে নামতে হয় না।

রান্নাঘরে ঢুকে দু-কাপ চা করে এককাপ কাছারি ঘরে প্রভাসকুমারকে পাঠিয়ে দিলেন, নিজে এক কাপ খেলেন। প্রভাসকুমার অবশ্য সকাল থেকে আরো দু-তিনকাপ চা খেয়েছেন। হারাধনের মা করে দিয়েছে।

কাছারি ঘর এখন জমজমাট। জুনিয়র উকিল, টাউট, মুহুরি আর মক্কেলের ভিড় উপছিয়ে পড়ছে।

কাছারি ঘরের থেকে একটু এগিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার পাশে এক সারি নারকেল গাছ বয়েছে। অনেক কালের বুড়ো নারকেল গাছ। স্মৃতিকণা এ বাড়িতে বৌ হয়ে আসা ইস্তক দেখছেন। বছর পঁচিশেক আগে তাঁর শাশুড়ির আমলে একটা নারকেল গাছের মাথায় শকুন বসেছিল। যেদিন সকালে শকুনটা এসে বসেছিল সেদিন বিকেলের মধ্যে প্রভাসকুমারের মা দু'জন কামলা ডাকিয়ে গাছটা কাটিয়ে ফেলে দিলেন। এক সারি নারকেল গাছের মধ্যে সেই কেটে ফেলা গাছটা যেখানে ছিল আকাশের সেদিকটায় তাকালে এখনও কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

স্মৃতিকণার শ্বশুর-শাশুড়ি কেউই পাকিস্তানী আমল দেখে যাননি। দু'জনের কেউই খুব গোঁড়া ছিলেন না। তবে এর মধ্যে যেমন হয়, শাশুড়ি ঠাকরুণের নানারকম সংস্কার একটু বেশি ছিল। তিনি যদি সেই উনিশশো চৌষট্টি সালে তাঁর সাধের সংসারে তাঁর পুরনো দালানে ফিরে আসতেন, দেখতেন কিছুই মিলছে না। সামাজিক বাধা-নিষেধের, সংস্কারেব দেওয়াল ভেঙে গেছে।

অন্যদিকে একটা দেওয়াল। বিশাল দেওয়াল উঠেছে দেশের মধ্যখান দিয়ে। নদীয়ার নবদ্বীপের নায়েব দুহিতা এবং টাঙ্গাইলের উকিলবাড়ির বধূ সেই মহিলা কখনও ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারতেন না পিত্রালয় থেকে শ্বশুরালায় আসতে ছাড়পত্র লাগবে, মধ্যপথে বাক্স-তোরঙ্গ খুলে দেখাতে হবে, ভেতরে যা সঙ্গে আছে তা নিষিদ্ধ জিনিস নয়।

আগে বাড়িতে কাজের লোক রাখতে গেলে খোঁজ নেওয়া হবে লোকটি কোন্ বর্ণের, সে জলচল কি না মানে তার হাতে জলগ্রহণ করা যাবে কি না। তা না হলে সে রান্নাঘরে ঢুকতে পারবে না। হাঁড়ি-কড়াই ছুঁতে পারবে না, সে ইঁদারা ছুঁতে পারবে না, তাকে দিয়ে খাওয়ার জল আনানো যাবে না।

মহিলা কিংবা পুরুষ, অজলচল লোকটিরও কাজ আছে। সে উঠোন ঝাঁট দেবে, কাঠ কাটবে, বাসন মাজবে। অবশ্য তার হাতে মাজা বাসন সরাসরি রান্নাঘরে ঢুকবে না, সেগুলোকে জলচল কাজের লোক কিংবা বাড়ির মহিলা কেউ স্বহস্তে জল দিয়ে ধুয়ে তারপর রান্নাঘরে ঢুকতে দেবে।

মুসলমানরা ছিল সেই সমাজের বাইরে। স্মৃতিকণার মনে আছে তাঁর বিয়ের সময় তাঁর শ্বশুরমশায়ের বন্ধু খানচৌধুরী সাহেব ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী থাকাতে বৌভাতে নববধূর মুখ দেখতে আসতে পারেননি। এসেছিলেন পরের রবিবারের দুপুরবেলায়।

প্রভাসকুমারের বাবার অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন খানচৌধুরী সাহেব। দুজনে অর্ধ শতাব্দীকাল পাশাপাশি আদালতে প্র্যাকটিস করেছেন। প্রভাসকুমারের বাবা ওকালতি করতেন দেওয়ানি আদালতে। আর ফৌজদারি আদালতের ডাকসাইটে মোক্তার ছিলেন খানচৌধুরী।

স্মৃতিকণার মনে আছে। একখানা বাজিতপুরী তাঁতের নীলাম্বরী শাড়ি উপহার দিয়েছিলেন খানচৌধুরী সাহেব। নতুন বৌয়ের মুখ দেখায় তখন রূপোর কাঁচা টাকা দেওয়াই রীতি ছিল। নীলাম্বরী শাড়ি পেয়ে স্মৃতিকণা খুশি হয়েছিল।

শ্বশুরমশায়ের ইঙ্গিতে স্মৃতিকণা বাড়ির মধ্যে গিয়ে একটা প্লেটে দুটো মিষ্টি আর একটা কাঁসার গেলাসে জল নিয়ে এসেছিলেন খানচৌধুরী সাহেবের জন্যে। ভর দুপুরে শাশুড়ি ঠাকরুণ এবং বাড়ির কাজের লোকেরা দিবানিদ্রায় মগ্ন থাকায় কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে স্মৃতিকণা স্বহস্তে আতিথ্যের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

শ্বশুরমশায়ও কিছু খেয়াল করেননি।

আপত্তি জানিয়েছিলেন খানচৌধুরী সাহেব নিজে। কাঁসার গেলাসটা হাত দিয়ে না ছুঁয়ে স্মৃতিকণাকে বলেছিলেন, 'বৌমা তুমি নতুন মানুষ। বিরাট্ ভুল করে বসে আছো। কাঁসার গেলাসে মুসলমানদের জল দেওয়া হয় না, আমাদের জন্যে কাঁচের গেলাস আছে। সেই গেলাসে জল নিয়ে এসো।' কোন তিক্ততা ছিল না খানচৌধুরী সাহেবের কণ্ঠে, যেন কথার কথা, এই ভাবেই বলেছিলেন।

মাত্র তিরিশ বছর আগের কথা।

কিন্তু দিন বদলের সঙ্গে, রাজনৈতিক পালা বদলের সঙ্গে সেই সমাজ, তার রক্ষণশীল চেহারা সব পালটিয়ে গেছে। জলচল অজলচল দূরের কথা, হিন্দু-মুসলমান নিয়ে, বেজাত-কুজাত বলে এর সঙ্গে ওর পার্থক্য করবার সুযোগ আর নেই।

দিনকাল এমন হয়ে গেছে, কয়েকটা বড় বড় ধাক্কায় ভেদাভেদ এতটা দূর হয়ে গেছে, এখন আর খেয়ালই থাকে না কে বামুন আর কে বামুন নয়। বাইরের লোককে জল দেওয়ার সময়ে খেয়াল রাখতে হয় না, লোকটা জল চেয়েছে না পানি চেয়েছে, লোকটা হিন্দু না মুসলমান, তাকে কাঁচের নাকি কাঁসার গেলাসে জল দিতে হবে।

তার মানে এই নয় যে সমাজ থেকে ঘৃণা, বিদ্বেষ, দূর হয়ে গেছে, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর হয়ে গেছে।

স্মৃতিকণা সব সময় টের পান না কিন্তু কোর্ট, কাছারিতে, বাজার, হাটে প্রভাসকুমার একটা চাপা আগুনের আঁচ টের পান। মাত্র কয়েকমাস আগেই ইপিনের বিয়ের অল্পদিন আগে একটা গুজবের ধাক্কায় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে, আদমজী জুট মিলে, ওপারে বিহারে, কলকাতায় অসহায় মানুষের প্রাণ গেছে ধর্মের কারণে।

স্মৃতিকণা এসব নিয়ে ভাবেন কিন্তু ভয় পান না। খুব একটা মাথাও ঘামান না। সংসারে নানা ব্যস্ততায় তাঁর দিন কেটে যায়। তবে দুপুরবেলায় খালি বাসায় আনচান লাগে।

বারান্দায় বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে সারা দুপুর স্মৃতিকণার কত কথা মনে পড়ে যায়। রাস্তার ধারের নারকেল সারির ছায়া বারান্দা দিয়ে ঘুরে উঠোনে নামে।

শীতের বাতাসে, চৈত্রের ঘূর্ণিতে, তারও পরে বর্ষার দামাল হাওয়ায়, আশ্বিনের ঝড়ে বড় নারকেলগাছগুলোর মাথা থরথর করে কাঁপে। একটা শীতলপাটি পেতে স্মৃতিকণা বারান্দায় বসে দেখেন নারকেল শীর্ষের ওঠানামা। কেমন যেন জড়িয়ে আছে ওই গাছগুলো এ বাড়ির সঙ্গে।

ঝড়-বৃষ্টি, হাওয়া-বাদল ঘুরে-ফিরে আসে, একদিন বাতাস শান্ত হয়ে যায়। তারও পরে একদিন বুড়ো নারকেলের চূড়ায়, ঝিরি ঝিরি পাতার নিচে সোনালি মঞ্জরী ফুটে ওঠে, দুয়েকদিনের ব্যবধানে সবগুলো গাছে।

বরফের গুঁড়োর মত সাদা পরাগ ছড়িয়ে যায় সারা উঠোনে। বাড়ির চার পাশে। কাছারি ঘরে টিনের চালের ছাদে। তারপরে একদিন নারকেল গাছে মুচি ধরে, ছোট ছোট সবুজ রঙের

ডাব ঝরে পড়ে গাছের নিচে। পাড়ায় বাচ্চা মেয়েরা পুতুল খেলার জন্যে কুড়িয়ে নিয়ে যায়। লোক ডেকে গাছ থেকে ডাবের কাঁদি নামানো হয়। তারপরেও কিছু নারকেল গাছে শুকোয়।

বিপিন খুব ডাবের জল খেতে ভালবাসত। নিজেই নারকেল গাছে উঠতে পারত।

এবার ইপিনের বিয়ে দিতে কলকাতায় গিয়ে স্মৃতিকণার মনে হয়েছে বিপিনের কেমন যেন ছাড়া ছাড়া ভাব। সব কিছুই করেছে, সব কিছুর মধ্যেই জড়িয়েছে কিন্তু একটু যেন দূর থেকে।

বিপিন চিঠিপত্র কম লেখে। সে যা যা করার ইপিনই করে। এখন ইপিনের বৌ মেনকাও চিঠি দেয়, বেশ নিয়ম করে সপ্তাহে সপ্তাহে চিঠি দেয়।

নির্দিষ্ট সময়ে চিঠি না এলে প্রভাসকুমার খুব অস্থির হয়ে পড়েন। স্মৃতিকণাও খুব চিন্তা করেন কিন্তু স্বামীর মত অত অস্থিব হন না।

দিন যায়।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনে কলকাতা থেকে ফিরেছিলেন আগের বাংলা বছরের একমাস থাকতে। তারপরে একটা বিরাট গ্রীষ্মকাল গেল, একটা লম্বা বর্ষাকাল গেল।

যদিও তাঁর মনে সংশয় ছিল স্মৃতিকণা ভেবে রেখেছিলেন, একবছরের মধ্যে কলকাতায় ফিরে এসে বিপিনের বিয়ে দিয়ে যাবেন।

কিন্তু সেটা সম্ভব হল না। ভাল কারণেই সম্ভব হল না।

আগস্টের শেষে বিপিনের চিঠি সুসংবাদ নিয়ে এল।। বিপিন বি কম পরীক্ষায় পাশ করেছে, খুব ভাল রেজাল্ট করেছে, সেকেণ্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে। দিনের বেলায় চাকরি করে, রাতে ক্লাস করে, তার ওপরে হট্টগোলে ভরা মেসবাড়িতে থেকে এরকম ফল করা খুব সোজা কাজ নয়।

মাস দেড়েক পরে আরও একটু সুখবর এল। ইপিনই জানালো ব্যাপারটা।

বিপিনের তামিল বন্ধুর বাবা যিনি তাকে অডিট ফার্মে কাজটা সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন, যার মেয়েকে বিপিন বাংলা শেখাতো তিনি সরকারি চাকরি ছেড়ে একটা পুরনো মাদ্রাজি ব্যাঙ্কে বড় কাজে যোগদান করেছেন।

তিনি বিপিনকে সেই ব্যাঙ্কে একটা চাকরি দিয়েছেন। তিন মাসের ট্রেনিং নিতে বিপিন মাদ্রাজ চলে গেছে।

চৌষট্টি সালটা আরম্ভ হয়েছিল দাঙ্গাহাঙ্গামা দিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালই গেল।

স্মৃতিকণা-প্রভাসকুমারের পক্ষে যথেষ্টই ভাল। এক ছেলের বিয়ে হল, এক ছেলে পাশ করল, চাকরি পেল।

দেশের অবস্থাও ভাল। তেমন কোন গোলমাল নেই। পরের বছর প্রভাসকুমার ইপিন আর মেনকাকে গরমের সময় টাঙ্গাইল আসার জন্যে চিঠি দিলেন, পাসপোর্ট ভিসা করতে বললেন। গরমে একটু কষ্ট হয়ত হবে কিন্তু এ বাড়ির এতগুলো গাছের আম, কাঁঠাল, অন্তত একটা বছর ছেলে আর বৌ খেয়ে যাক।

মেনকা আর ইপিন মে মাসে এল। তখন মেনকা অন্তঃসত্ত্বা, পাঁচমাসের গর্ভবতী।

স্মৃতিকণা এ খবর আগে পাননি।

দেশ যখন ভাগ হয়ে পাকিস্তান হয়ে গেলো, সে সময় শহরে বেশ কয়েকজন ভালো চিকিৎসক ছিলেন। অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার, কবিরাজ, হেকিম—সব জাতের চিকিৎসক ছিলেন।

এত সব চিকিৎসক শুধু টাঙ্গাইল শহরে চার-পাঁচশো মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ওপরে নির্ভরশীল হলে টিঁকতে পারতেন না।

কাছাকাছি ধলেশ্বরী-যমুনার তীর ধরে পাট কোম্পানিগুলো ছিলো। সেখানে সাহেব-মেমসাহেব, খাঁটি ইংরেজ কিংবা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। তাছাড়া আশেপাশে নদীর তীরে তীরে, খালের ধারে, বিলের কিনারে রাজাবাদশাদের বসবাস, সন্তোষের মহারাজা থেকে করটিয়ার নবাব, দেলদুয়ারের গজনভী পর্যন্ত এবং তাঁদের কর্মচারী পারিষদেরা যাঁরা বসবাস করতেন, তাঁদের আদিব্যাধি, অসুখে বিসুখে কথায় কথায় কলকাতা বা ঢাকা যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁরা টাঙ্গাইলের চিকিৎসার ওপরেই নির্ভরশীল ছিলেন, এখানকার চিকিৎসকদের হাতেই জন্মমৃত্যুর ভার সঁপে দিয়েছিলেন।

সাতচল্লিশ সালের ব্যবস্থা অবশ্য আঠারো বছর পরে পঁয়ষট্টি সালে ছিল না।

প্রভাস চৌধুরীদের উপাধি নবাব প্রদত্ত। প্রাচীন পূর্বপুরুষ ছিলেন নবাবী আমলা। সেই সূত্রে চৌধুরী বাড়িতে হেকিমি চিকিৎসার প্রচলন ছিল। প্রভাসকুমার নিজে আর তাঁর ভাইবোন, খুড়তুতো—জ্যেঠতুতো সবাই স্থানীয় হেকিম সাহেবের বিধবা বোন ছোট সাহেবার হাতে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দেখাশোনা করতেন হাকিম সাহেব।

পাকিস্তান হওয়ার অল্প কিছুদিন পরে সপরিবারে হেকিমসাহেব দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলত, হেকিমসাহেব হিন্দুস্থানে চলে গিয়েছেন। কিন্তু মুসলমান হয়েও হেকিমসাহেব কেন পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাবেন, প্রভাসকুমার তা ভেবে পাননি।

এরপরে আরো দু-চারজন এ শহরে হেকিমি চিকিৎসা করেছে। একজন তো পুরনো হেকিম সাহেবের দোকানেই এখনও বসে। কিন্তু প্রভাসকুমার এঁদের ওপর মোটেই ভরসা করতে পারেন না।

পুরনো হেকিমসাহেব প্রকাশ্যে না হলেও মনে মনে সূক্ষ্ম রাজনীতি করতেন। তিনি প্রথমে সুভাষ বোসের এবং পরে ফজলুল হকের অনুগামী ছিলেন।

চল্লিশের দশকের বাংলাদেশে নলিনীবিধানের কংগ্রেসী রাজনীতি কিংবা সুরাবর্দী, নাজিমুদ্দিনের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি কিছুই তাঁর মনোমত ছিল না।

সবচেয়ে বড় কথা মহাত্মা গান্ধীর বা কায়েদে আজম জিন্নার ওপরে বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না তাঁর। তাঁর ধারণা হয়েছিল পাকিস্তান হলে সে এক ঘোর অরাজক দেশ হবে।

এসব কথা তিনি প্রভাসকুমারের সঙ্গে কখনো কখনো আলোচনা করেছেন।

প্রভাসকুমারের বাল্য, কৈশোর, যৌবন কেটেছে রাজনীতির তরঙ্গসঙ্কুল নদীর তীরে দাঁড়িয়ে। সেই খিলাফত আন্দোলন, অসহযোগ থেকে ডু-আর-ডাই উনিশশো বিয়াল্লিশ, অবশেষে সাতচল্লিশের দেশভাগ। এই সব সময়ে তাঁর ভূমিকা ছিল ব্যগ্র দর্শকের, প্রভাসকুমার কখনো রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়েননি।

প্রভাসকুমার হেকিমসাহেবকে বলতেন, 'নিয়তি ও ইতিহাস আমাদের মানতেই হবে।' হেকিমসাহেব বলতেন, 'তাই বলে ঠাণ্ডা মাথায় টেবিল চেয়ারে ম্যাপ নিয়ে বসে দেশভাগ হবে? ইতিহাস, ভূগোল মানবে না, ম্যাপ মানবে না?'

কিন্তু এসবের পরেও হেকিমসাহেব কেন যে কোনো খবর না দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন

সেটা বুঝে উঠতে পারেননি প্রভাসকুমার। তবে শুনেছিলেন ধুবড়ির কাছাকাছি কোথায় ব্রহ্মপুত্রের চরে চলে গেছেন।

পাকিস্তান হওয়ার সময়ে দু'জন দিগ্বিজয়ী ডাক্তার ছিলেন শহরে, দু'জনেই অ্যালোপাথ।

প্রথম জন গঙ্গাধর মৈত্র। সেকালের এম বি। ডাক্তার বিধান রায়ের দু ইয়ারের সিনিয়র। তাঁকে কেউ একথা বললে তিনি বলতেন, 'মাত্র দু ইয়ার। বিধানের সব ইয়ারেরই আমি সিনিয়র।'

বাজারের মোড়ে গঙ্গাধর ডাক্তারের চেম্বার ছিল, যাকে বলা হত ডাক্তারখানা। ভিতরে তিনজন কম্পাউণ্ডার প্রেসক্রিপসন অনুযায়ী ওষুধ বানাতো। দাগ কেটে শিশির গায়ে লাগিয়ে লিখে দিত, 'খাইবার পূর্বে ঝাঁকিবেন।'

একটু এগিয়ে নদীর ধারে খেয়াঘাটের পাশে বিরাট দোচালা টিনের ঘরে ধনী ডাক্তারের চেম্বার, পুরো নাম ধনিকলাল সিংহ। লোকমুখে তিনি ধনী ডাক্তার হয়েছিলেন। পাটনার এল এম এফ, বাঁকিপুরে প্র্যাকটিস করতেন। কি যেন বড়লোকের বাড়ির কেলেঙ্কারির ব্যাপারে একটা মিথ্যা ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে ধরা পড়ে যান, তারপরে জামিন পেয়ে ফেরার। তখন টাঙ্গাইল থানায় ধনিকলালের মামা জমাদার, তাঁর কাছেই এসে ধনিকলাল আশ্রয় নেন। তারপর এখানেই প্র্যাকটিস শুরু করেন। রেজিস্ট্রেশন নম্বর-টম্বর কিছুই ছিল না। সে কালে এসব খুব প্রয়োজন পড়তো না।

খুব ভাল পশার হয়েছিল ধনিকলালের। চেম্বারে একটাকা ফি, কলে গেলে দূরত্ব অনুযায়ী দু'টাকা থেকে চারটাকা। একটা সযত্নলালিত হারকিউলিস সাইকেলে মাথায় শোলার টুপি দিয়ে হাফপ্যাণ্ট পরে ধনী ডাক্তার রোগী দেখতে বেরোতেন। অনেক সময়েই তাঁর সাইকেলের সঙ্গে একটা পোষা কুকুর ছুটতো। শহরের কোনো বাড়ির বাইরে কুকুরটাকে দেখলে লোকেরা বুঝতো কারো অসুখ হয়েছে, ধনী ডাক্তার রোগী দেখতে এসেছেন।

পার্টিশন হওয়ার পরেও ধনী ডাক্তার চলে যাননি। চেম্বারের কাছে নদীর ধারে একটা ছোট বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন। এক ব্রাহ্মণের বিধবা তাঁর রান্নাবান্না করে দিতেন। পরে তাঁর সঙ্গেই বসবাস করতেন। এত টাকা কি করতেন, কে জানে?

পাকিস্তান হওয়ার পরে পরেই গঙ্গাধন ডাক্তার দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ধনীডাক্তারকেই প্রভাসকুমার কল দিতেন। উনিশশো পঁয়ষট্টিতে অবশ্য রুহুল ডাক্তার প্র্যাকটিশ শুরু করেছে। রুহুলকে স্মৃতিকণার খুব পছন্দ, সে ভিজিট নেয় না। কিন্তু যাতায়াতের পথে প্রায় দু'বেলাই খোঁজ নেয়, রান্নাঘরের বারান্দায় বসে স্মৃতিকণাকে বলে, 'কাকিমা, এক কাপ চা খেতাম।'

ইপিন ও মেনকা বাড়ি আসার পরের দিনই মেনকার সন্তান সম্ভাবনা দেখে ধনীডাক্তারকে কল দিলেন প্রভাসকুমার। রুহুলকেও ডাকতে পারতেন, তবে এসব ব্যাপারে যুবক ডাক্তার না ডাকাই ভাল, মেয়েরা অনেক কথা বলতে চায় না।

ধনীডাক্তার সেই দিনই বিকেলে এলেন। এখন আর সাইকেল চড়েন না। সর্বক্ষণের জন্যে একটা সাইকেল রিকশা বাঁধা আছে। কুকুরটাও আর নেই।

আগে এদিকে সাইকেল রিকশা ছিল না। অল্প কিছুদিন আগে এই উপসর্গ যোগ দিয়েছে।

উঠোনের ওপাশে টিনের দরজা। সেখানে পরপর দু'বার রিক্শার ঘণ্টি বাজাতে ইপিন এগিয়ে গিয়ে ধনী ডাক্তারকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এলো।

ধনী ডাক্তারের এখন বয়েস হয়েছে, কিন্তু বয়েসের ছাপ পড়েনি চেহারায়। ঘোমটা দিয়ে

বারান্দা থেকে নেমে এসে, 'আসুন ডাক্তারবাবু' বলে স্মৃতিকণা তাঁকে শোয়ার ঘরে নিয়ে বসালেন।

মেনকা এলো, তাঁকে বিছানায় শুইয়ে ধনী ডাক্তার খুব খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, 'সন্তানসম্ভবা। তবে কোন জটিলতা নেই। একটু রক্তাল্পতা আছে।' বলে খসখস করে একটা প্রেসকৃপশন লিখলেন।

স্মৃতিকণা কাঠের আলমারির দেরাজ খুলে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে ডাক্তারবাবুকে দিতে যাচ্ছিলেন, সেটাই তাঁর এ বাড়ির রেট, কিন্তু বৃদ্ধ ধনিকলাল হাত তুলে স্মৃতিকণাকে টাকা দিতে নিবৃত্ত করে বললেন, 'নতুন বৌকে দেখে গেলাম, মুখ দেখানি আমাকেই তো দিতে হবে।'

বুকপকেটে হাত দিয়ে দু'টো চাঁদির টাকা বার করলেন ধনী ডাক্তার, রাণী ভিকটোরিয়ার আমলের।

এরও দু'দিন পরে এক সকালে ধনী ডাক্তারের রিকশা এসে বাইরের দরজায় দু'বার টিং টিং করে দাঁড়ালো। ডাক্তারবাবু আসেননি। কিন্তু একগোছা তরকারি পাঠিয়ে দিয়েছেন। তরকারি মানে শুধুই দু'রকম, দুটোই কলাগাছের, গোটা কুড়ি এক হাত, দেড় হাত লম্বা থোড়, আর সমপরিমাণ মোচা। রক্তাল্পতার সুপথ্য। সেদিনই দুপুরবেলায় থোড়ের ঘণ্ট হল। মেনকাকে স্মৃতিকণা রান্নাঘরে ঢুকতে দেননি। গর্ভবতী বধূ, যার পেটে রয়েছে বংশের সন্তান, তাকে উনুনের আঁচের কাছে পাঠানো যায় না।

সুতরাং মেনকার একটু দুশ্চিন্তা ছিল থোড়ের মত জিনিষ দিয়ে ঘণ্টা কিভাবে হবে, বড় জোর ছেঁচকি হতে পারে।

খেতে বসে মেনকা আবিষ্কার করল থোড় হল মোচা, আর সে যাকে থোড় বলে জানে তা এখানে ভাদাইল বলে পরিচিত। এইরকম নানা আঞ্চলিক শব্দ, সেই সঙ্গে খামু-যামু ইত্যাদি ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখে মেনকা কৌতুক বোধ করে। সে কলকাতার উত্তর শহরতলীর পুরোপুরি ঘটি অঞ্চলে জন্মেছে, বড় হয়েছে। কলকাতায় বাঙাল ভাষা সে যথেষ্টই শুনেছে কিন্তু এখানে সে ছাড়া আর সবাই বাঙাল ভাষায় কথা বলছে। সে অনেক সময়ে বুঝতে পারছে না, কে কি বলছে।

ইপিন-মেনকার জীবনে অমর হয়ে আছে ঊনিশশো পঁয়ষট্টি সালের গ্রীষ্মকালের সেই কয়েকটা দিন।

সকালে-বিকেলে, সন্ধ্যায় এমনকি অনেক রাতে দলে দলে লোক আসছে উকিলবাবুর ছেলের বৌ দেখতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধুই কৌতুহল, কলকাতার মেয়ে, কেমন দেখতে শুনতে এই আর কি।

পাড়ার বৌ-ঝিরা প্রায় সব সময়েই মেনকাকে ঘিরে রয়েছে। বারে বারে স্নো-পাউডার মাখাচ্ছে, চুল আঁচড়িয়ে খোঁপা বেঁধে দিচ্ছে, সিঁদুর আলতা পরাচ্ছে, মেনকা যেন কোনো পুতুল। মেনকার অস্বস্তি হচ্ছে, আবার কেমন যেন ভাল লাগছে।

সন্ধ্যার পর অন্ধকার গাঢ় হলে আবরু বাঁচিয়ে গোঁড়া মুসলমান বাড়ির মেয়েরা একেকদিন আসেন অন্দরবহলের পথ দিয়ে। তাঁরা বড় রাস্তা এড়িয়ে এ বাড়ির উঠোন, ও বাড়ির কুয়োতলা দিয়ে আসেন। এসব পথে বুনো আগাছা, ঝোপ-ঝাড় রয়েছে, সাপ-খোপের ভয় আছে। সেটা তাঁরা জানেন। লণ্ঠন ঝুলিয়ে, হাততালি দিতে দিতে তাঁরা সদলবলে যাতায়াত করেন।

প্রথম দিনে মেনকা রান্নাঘরের পিছনে মজা ডোবার ওদিক থেকে কামরাঙা গাছের তলা দিয়ে হঠাৎ এক মহিলাকে আসতে দেখে বোকা বনে গিয়েছিল।

মহিলাদের অনেকেরই ইপিন পুত্রস্থানীয় কারো কারো পৌত্রস্থানীয়।

এই তো সেদিনের ইপিন। টলমল পায়ে এ বাড়ির বাইরের উঠোনে হাঁটতো। একবার একটু এগিয়ে নিয়ে সামনের পুকুরটায় পড়ে গিয়েছিল। রাস্তা দিয়ে একটা গরুর গাড়ি যাচ্ছিল, সেই গাড়ির গাড়োয়ান এক ছুটে লাফিয়ে পড়ে সুগভীর পুকুরের জল থেকে সেই শিশুকে তুলে মাথার ওপরে কয়েক পাক দিয়ে পেট থেকে জল বার করে সামনের কাছারি ঘরের সিঁড়িতে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে গরুর গাড়িতে উঠে চলে গেল।

প্রভাসকুমারের বাবা, ইপিনের পিতামহ তখনো বেঁচে। তিনি ক্ষমতাবান লোক ছিলেন, অনেক খোঁজ করেছিলেন, কিন্তু সেই গাড়োয়ানের খবর পাননি। সেই গাড়োয়ানের জন্যে কেনা একটা কাঁসার থালা বহুদিন চৌধুরী বাড়িতে ছিল। যদি লোকটা কখনো আসে থালাটা পুরস্কার দেওয়া হবে।

বাড়ির সামনের পুকুরটার যে ঘাটটায় ইপিন শিশু বয়েসে ডুবে গিয়েছিল এবং দৈবক্রমে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে ফিবে এসেছিল, সে ঘাটটা এখনও আছে।

সাধারণত বর্ষাকালে টইটুম্বুর জলের চাপে পুকুরের পাড় ভেঙে যায়, সেই সঙ্গে ঘাটও এদিক ওদিক হয়ে যায়, একটু এগিয়ে-পিছিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে সরে যায়। অবশ্য মাটির কাঁচা ঘাটেই এরকম হয়।

এ পুকুরে এই ঘাটটা আর উল্টো দিকে আরেকটা ঘাট শান দিয়ে বাঁধানো, তাই বর্ষায় জলের তোড়ে এখনও অক্ষত আছে।

দুটো ঘাটের মধ্যে ওপারের ঘাটটা বড় রাস্তার ধারে পুকুর কাটার সময়েই মিউনিসিপ্যালিটি সেটা বানিয়ে দিয়েছিল।

এদিকে চৌধুরী বাড়ির দিকের ঘাটটা প্রথমটির বহুকাল পরে তৈরি হয়েছিলো স্মৃতিকণার বিয়ের সময়। প্রভাসকুমারের বাবা নিজের পযসায় ঘাটটা তৈরি করে দিয়েছিলেন। বাড়িতে নববধূ আসছে, সে কাঁচাঘাটে স্নান করে পায়ে, শাড়ির পাড়ে কাদা মেখে আসবে কেন, আর ওপারের বাঁধানো ঘাটে গেলে নতুন বৌ স্নান সেবে পুরো পাড়া প্রদক্ষিণ করে আসবে ভিজে কাপড়ে—স্মৃতিকণার শ্বশুরমশায় বাড়ির উঠোনের মুখে ঘাট বাঁধিয়ে নিয়েছিলেন।

একটু দেরি হয়ে গিয়েছিলো, তখন বরকনে এসে গেছে। বাসি বিয়ের দিন সন্ধ্যাবেলায় স্মৃতিকণার শ্বশুরমশায় সিদ্ধান্ত নিলেন, 'বাড়ির সামনের ঘাট বাঁধাতে হবে। বৌমা কাঁচা ঘাটে নামবেন না। ওপারের বাঁধা ঘাটেও যাবেন না।'

প্রভাসকুমারের বাবাও নাম করা উকিল ছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন। শহরের মানগণ্য লোক ছিলেন। প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিলো। তাঁর যেমন ভাবা তেমন কাজ।

বাজারের রাস্তার পাশে ব্যাঙ্কের মোড়ে তখন নতুন মসজিদ তৈরি হচ্ছিলো, তার মোতোয়ালি এ সেরেস্তার পুরনো মক্কেল। সেই রাতেই সেখান থেকে ইঁট-মশলা, রাজমিস্ত্রি ধার করে নিয়ে এসে সারা রাত হ্যাজাক জ্বালিয়ে কাজ হলো। পরদিন বেলা বারোটা নাগাদ ঘাট শেষ।

তখন ওপরের চাতালটায় সবে পলেস্তারা দেয়া হয়েছে, বেশ নিঝুম নিঝুম ভোরবেলা, স্মৃতিকণার শাশুড়ি-ঠাকরুণ নতুন বৌকে নিয়ে ঘাট বাঁধানো দেখতে গেলেন। শাশুড়ি-বৌ দু'জনে সদ্যনির্মিত চাতালের ওপরে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে তাঁদের দুজোড়া পায়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে আছে, এতদিনেও মুছে যায়নি।

এবার মেনকাকে নিয়ে ইপিন আসার পরে নতুন বৌকে পুকুর ঘাটে স্নান করতে যেতে হয়নি। বহুদিন আগেই স্মৃতিকণা বাড়ির মধ্যে বড় চৌবাচ্চা করে বাথরুম বানিয়ে নিয়েছেন।

কিন্তু নিজের নববধূ জীবনের প্রথম দিনের ভোরবেলার সেই পদছাপের কথা স্মৃতিকণার মনে ছিলো। সিঁড়ির চাতালে ফাটল ধরেছিলো, আগেকার পায়ের ছাপের জায়গাটা বাদ দিয়ে বাকি অংশটুকু রাজমিস্ত্রি ডেকে এনে মেরামত করে নতুন করে পলেস্তারা করালেন। তারপর নতুন বৌকে নিয়ে পুকুরে ঘাটে সেই কাঁচা পলেস্তারার ওপরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। আগের বারের মতই পঁয়ত্রিশ বছরের ব্যবধানে চমৎকার ছাপ উঠলো।

পাশাপাশি দুই-দুই করে চার জোড়া পায়ের ছাপ। দুই নববধূর, দুই শাশুড়ির।

প্রথমবারের ঘটনাটা অসতর্কভাবে হয়ে গিয়েছিলো। দ্বিতীয়বারেরটা ইচ্ছাকৃত। স্মৃতিকণার এক ধরনের ছেলেমানুষি, কেউ অনেক সময় কিছু টেরও পায় না। শুধু প্রভাসকুমার হয়তো অনুমান করতে পারেন।

যখন ইপিন আর মেনকা এসেছিলো সে সময়টায় ভরা গ্রীষ্মের সবে শুরু। লিচু পেকেছে, জামরুল পাকছে, কাঁঠাল দেরি আছে। আমগাছের ডালে ডালে ঝুলন্ত সবুজ কাঁচা আম হাওয়ায় দুলছে।

ভিতরের বারান্দায় গোল সিঁড়িটার ওপরে একটা জলচৌকিতে বসে এত বড় বাড়িটা চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো মেনকা। সন্তানসম্ভবা বলে স্মৃতিকণা তাকে বিশেষ নড়াচড়া করার সুযোগ দিতো না।

সিঁড়ির মুখে একটা সিঁদুরে আমের গাছ। ঘন সবুজের মধ্যে ক্ষীণলাল আভা দেখা দিলো কয়েকদিনের মধ্যে আমের গায়ে। ধীরে ধীরে সেগুলোর মধ্যে সিঁদুরের আভাস দেখা দিলো। আরো গাঢ়, গাঢ়তর লাল আমগুলো একটা একটা করে পেকে উঠোনে পরতে লাগলো।

যেমন হয়, এর মধ্যে পর পর দু'দিন বিকেলে কালবৈশাখির ঝড় এলো। কলকাতার ঝড় আর এখানকার ঝড়ের চেহারা আলাদা। কলকাতায় অনেক বড় বড় ঝড় হয়ে যায়, বস্তির টিনের চালা উড়ে যায়। বড় বড় গাছ উপরে পড়ে রাস্তা আটকিয়ে যায় কিন্তু ঘরের মধ্যে বসে তা টের পাওয়া যায় না।

এখানকার ঝড়ের চেহারা অন্যরকম। প্রথমে আকাশ অন্ধকার করে কালো মেঘ বিকেলবেলাতেই অন্ধকার করে এলো, চারদিকে একটা থমথমে ভাব। কাক-চিল, গরু-বাছুর সবাই টের পেয়ে গেছে ঝড় আসছে। তাদের চালচলনে সেটা পরিষ্কার। সবাই নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে।

একটু পরে ধুলিঝড় উঠলো, শুকনো পাতা, ঘাসকুটো উড়তে লাগলো বাতাসে। তারপরে

একটু বৃষ্টি বড় বড় ফোঁটায়, দ্বিতীয় দিন তো রীতিমত শিলাবৃষ্টি। সেই কঠোর গ্রীষ্মের বিকেলে টুকরো টুকরো বরফকুচি পড়ে উঠোন, সিঁড়ি সব ছেয়ে গেলো। স্মৃতিকণা বললেন, 'আমের সর্বনাশ হয়ে গেলো।'

সে যা হোক, মেনকা নিজে কিন্তু খুব মজা পেয়েছিলো। স্মৃতিকণাকে আড়াল করে বাইরের বারান্দায় এসে সামনের উঠোনে নেমে মুঠোভরে বরফকুচি কুড়িয়ে এনেছিলো।

অবশেষে এলো প্রলয়ঙ্কারি ঝড়। গমগম করে শব্দ করে, বিদ্যুতের ঝিলিক তুলে অন্ধকার রাতের রেলবাড়ির মত তুফান। গাছের ডাল ভেঙে ফুল-ফল ছত্রভঙ্গ করে প্রবল বেগে বাতাস বইতে লাগলো। বড় বড় নারকেল গাছগুলো হাওয়ার তোড়ে প্রায় নুয়ে পড়ে উঠতে লাগলো। পুকুরের ওপারের একটা বাড়ি থেকে ঢেঁকিঘর কিংবা গোয়ালঘরের টিনের চালা উড়ে এসে পুকুরের জলে পড়লো।

মাত্র ঘণ্টা খানেকের ব্যাপার। ফোঁস ফোঁস করতে করতে ঝড় থেমে গেলো। শেষে মিনিট পনেরো ঝির ঝির করে বৃষ্টি। সেও থামলো। ঝোড়ো হাওয়া আকাশের সমস্ত মেঘ ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলে গেলো।

ঝড় বৃষ্টি থামলে বোঝা গেলো তখনো বিকেল ফুরোতে বাকি আছে। ঝকঝকে নীল আকাশের পশ্চিমে সূর্য সোনার থালার মত ঝলমল করছে। সোনালি আলোয় বৃষ্টি ভেজা, ঝড়ে এলোমেলো পৃথিবী কেমন যেন, কেমন মায়াময়, রহস্যময় মনে হচ্ছিলো।

আম গাছগুলোর নিচে এবং জামরুল তলায় প্রচুর ফল পড়েছিলো। পাড়া-বেপাড়ার ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে সেগুলো কুড়োচ্ছে। স্মৃতিকণা নিজে উঠোনে দাঁড়িয়ে থেকে কাজের লোকদের দিয়ে পড়ে যাওয়া আম তোলাচ্ছিলেন।

ইপিনের সঙ্গে মেনকাও একটা পেতলের বালতি হাতে করে আম কুড়োতে নেমেছিলো কিন্তু স্মৃতিকণা মেনকাকে আম কুড়োতে দিলেন না, তাকে বারান্দায় ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

এর মধ্যে একদিন চারচাকার জোড়া ঘোড়ার পালকি গাড়ি করে স্মৃতিকণা ইপিন আর মেনকাকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি থেকে একবেলা ঘুরে এলেন। ধলেশ্বরী নদীর ধারে মাইল দশেক দূরে বনেদী পুরনো গ্রাম, সেখানে চৌধুরীদের ভদ্রাসন, গৃহদেবতা শিবের মন্দির। প্রায় ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাওয়া সাবেকি বাংলা ইঁটে গাঁথা বাসভবন বহুদিনই পরিত্যক্ত হয়ে রয়েছে। বাঁশবন, আমবাগান, নারকেল-সুপুরি গাছ দিয়ে ঘেরা দীঘির মত জলাশয়, এদিক ওদিকে কয়েকটা পোড়ো ভিটে, দুয়েকটা নড়বড়ে টিনের ঘর। গ্রীষ্মের বিকেলে সির সির করে ধলেশ্বরীর জলে ভেজা বাতাস বইছে। একটা বুড়ো বাদাম গাছের ডালে দুটো ঘুঘু গলা মিলিয়ে ডাকছে। স্মৃতিকণা বললেন, ঐ দ্যাখো, ওরা কেমন বুঝতে পেরেছে। দু'জনে গলা মিলিয়ে ডাকছে, 'বৌ ঠাকরণ এসো এসো।'

মেনকারও মনে হলো সত্যিই পাখি দুটো তাকে স্বাগত জানাচ্ছে, 'বৌ ঠাকরণ এসো এসো।' প্রথমম পাখিটা যদি দুবার 'এসো এসো' বলছে দ্বিতীয়টা বলছে তিনবার চারবার। 'এসো এসো এসো।' গলার দম ফুরিয়ে যাচ্ছে, আওয়াজও কমে যাচ্ছে। না হলে হয়তো আরো কয়েকবার এসো-এসো বলতো।

ঘোড়ার গাড়ি পৌঁছানোর অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই পোড়ো বাড়ির উঠোন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেলো।

চারপাশে পুরনো প্রজাদের বাড়ি। যদিও তালুকদারি পনোরো বছর আগে, উনিশ শো পঞ্চাশ

সনে বিলুপ্ত হয়েছে, এখনো টানটা রয়ে গেছে।

কোথা থেকে কে যেন একটা নতুন পিতলের ঘটি নিয়ে এলো। সেটা ভর্তি কাঁচা দুধ। বোধহয় শিবমন্দিরেরই জিনিস হবে সেটা, শিব ঠাকুর গঞ্জিকা বিলাসী, নিয়মিত দুধ লাগে তাঁর। পান করতে না পারলেও স্নান করেন দুধে। অনেকের মানত থাকে, গ্রাম-গ্রামান্তরে মানুষ নতুন ঘটি করে সদ্য দোয়ানো দুধ মন্দিরে দিয়ে যায়।

মন্দিরের পাশের গোয়ালেও দুটো গরু আছে। আর কিছু না হোক মন্দিরের এখনো দেখাশোনা, রক্ষণাবেক্ষণ হয়। একজন পুরুতঠাকুর পাশের পাড়াতেই থাকেন। দেখাশোনার কাজটা পাড়াগাঁয়ের পক্ষে মোটামুটি লাভজনক, এতে তাঁর সংসার চলে যায়।

কাঁচা দুধের ঘটিটা মেনকার হাতে এগিয়ে দিতে সে ভয় পেয়েছিলো এই ভেবে এটা বুঝি তাকে খেতে হবে। এমনিতে সে দুধ খেতে চায় না, তার ওপরে এক ঘটি কাঁচা দুধ, এখুনি হর হর করে বমি হয়ে যাবে।

স্মৃতিকণাই উদ্ধার করলেন, ঘটিটা নিজের হাতে নিয়ে একজন চেনা লোককে দিয়ে বললেন, 'ঠাকুরদাস, ঘটিটা ঘোড়ার গাড়িতে দিয়ে এসো।'

ঘোড়ার গাড়িতে আরো কিছু উঠলো। সেই অবেলায় পুকুরে জাল ফেলে দুটো দুসেরি-আড়াই সেরি কালবাউশ মাছ ধরা হলো। গাছ থেকে কিছু আম পাড়ানো হলো। তারপরে শিবমন্দিরে সন্ধ্যারতির পর নতুন বৌমাকে নিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করে ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

সারাক্ষণ ইপিন কেমন স্তব্ধ, আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। এই গ্রামে সে কখনো রাত্রিববাস করেনি, কিন্তু বাল্য ও কৈশোরের বহুস্মৃতি বিজড়িত এই শিবমন্দির, শূন্য ভিটে, এই মানুষজন, পড়ন্তবেলায় ঘুঘুর ডাক কোথায় যেন জন্ম-জন্মান্তরের একটা টান পড়ে রয়েছে এখানে, এক অদৃশ্য সুতোর কারসাজি।

যাওয়ার দিন এসে গেল। নতুন চাকরি, অল্প দিনের ছুটি। তাও ছুটি দুদিন বাড়াতে হলো। ইপিন ঠিক করেছিল পরের শনিবারে রওনা হয়ে, রবিবার সকালে কলকাতায় পৌঁছাবে। কিন্তু তা হল না। স্মৃতিকণা পঞ্জিকা খুলে দেখলেন, শনিবার মঘা না অশ্লেষা, কি যেন, ত্র্যহস্পর্শও হতে পারে, সেদিন বাড়ি থেকে কোথাও যাওয়া অসম্ভব। পরের দিন রবিবার, ইপিনের জন্মবার, সেদিনও যাত্রা নাস্তি। জন্মবারে বাড়ি ছেড়ে বেরোনো যায় না।

ইপিনের নিজের এসব কুসংস্কার নেই, আবার আছেও। বুদ্ধি মানে না, কিন্তু মন ভয় পায়, মন টুকটুক করে।

এর মধ্যে একদিন ঘোর দুপুর বেলায় হৈ চৈ করে লৌহজং নদীর কূল উপচিয়ে প্রথম বর্ষার ঘোলাজল শহরের শুকনো খালে প্রবেশ করল, তার পিছে পিছে পানসি, ঢাকাই, ডিঙি অবশেষে মানোয়ারি বজরা খালের এপারে ওপারে পুরো শহরটা ভরপুর হয়ে গেল।

স্টিমার অবশ্য এতটা ভিতরে আসতে পারে না। ছোট নদী লৌহজঙে কিংবা শহরের খাল পর্যন্ত আসা সম্ভব নয়। তার দৌড় যমুনা পর্যন্ত।

তবে আসার সময় ইপিন-মেনকা যমুনার ঘাটে নেমে ঘোড়ার গাড়িতে করে বাড়িতে এসেছিল, যাওয়ার সময় কাছারির ঘাট থেকে নৌকোয় উঠে যমুনার ঘাটে এল।

কয়েকদিন স্টিমার আসছে না, কি যেন খারাপ হয়েছে, মেরামতি চলছে। তার বদলে লঞ্চ আসছে, লঞ্চে গিজগিজ করছে ভিড়।

কাছারির ঘাট থেকে শৌখিন ঢাকাই নৌকো ভাড়া করে ছেলে-বৌকে লঞ্চে তুলে দিতে এলেন প্রভাসকুমার। সঙ্গে স্মৃতিকণা এবং আরও অনেকে।

মাত্র এক-দেড় ঘণ্টার নৌকাযাত্রা। কাগমারির হাটের পাশ দিয়ে, গ্রামের গৃহস্থবাড়ির উঠোন ঘেঁষে, ছায়াছন্ন বাঁশবনের নিচ দিয়ে দুই ধানক্ষেতের মধ্যের পথ দিয়ে তরতর করে বয়ে চললো ঢাকাই নৌকো।

গ্রাম পেরিয়ে বড় নদীর কাছাকাছি এসে খোলা জায়গায় পড়ল নৌকো। চারদিকে ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, ছোটবড় বিল আর হাওর। হু হু করে পুবালি বাতাস বইছে। স্মৃতিকণা মেনকাকে বললেন, 'কোনদিন পাল তোলা নৌকোয় চড়েছো ? মেনকা ঘাড় নাড়লো। স্মৃতিকণা প্রভাসকুমারকে বললেন, 'মাঝিদের, বাদাম খাটাতে বল। বৌমা দেখতে চাইছে।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাঝিরা ময়লা, শতচ্ছিন্ন, জোড়াতালি পাল নৌকোর পাটাতন সরিয়ে বার করলো। তারপর মাস্তুল লাগিয়ে সেই পাল খাটানো হল, সঙ্গে সঙ্গে সেই ঢাকাই নৌকো ময়ূরপঙ্খী হয়ে গেল।

প্রথম শ্বশুরবাড়ি ভ্রমণের এসব কথা কোনোদিন ভুলবে না মেনকা। তার কাটছাঁট শহুরে জীবনে এই ছায়া ভরা গাছ, এই পাখিডাকা দিন, এই সব ভুলভাল মানুষেরা কোথাও ছিল না।

এখানেও দশটা-পাঁচটা আছে, কিন্তু সেটা মাত্র দু'চার জনের। মেনকার শ্বশুরমশায়ও কাছারি করেন, কিন্তু তার মনে হতো সবই কেমন ছুটি ছুটি। আদালত কক্ষে কিংবা বাড়ির বাইরের কাছারি ঘরে যখন আইনের জটিল, জটিলতর বিন্যাস চলছে, তখন গোলাপায়রার দল ডেকে চলেছে আয় ঘুম, আয় ঘুম। আদালত বাড়ির অশত্থ গাছের মাথায় চিলের বাচ্চাগুলো চিঁচিঁ করে কাঁদছে। আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টিতে বাড়ির উঠোন, ভিতরে-বাইরে, পুকুরের চারধার, পাড়া-বেপাড়া, যতদূর চোখ যায় সব সবুজে সবুজ হয়ে গিয়েছিলো।

এত সবুজ মেনকা জন্মেও দেখেনি।

একেকদিন মেনকা ছাদে উঠে যেতো। বিরাট ছাদ। দালানের সিঁড়িটা বাইরের দিক থেকে দরজা, চওড়া সিঁড়ি। একেক ধাপে প্রায় ছয়জন লোক বসতে পারে। এ বাড়িতে ছাদে ওঠার খুব একটা রেওয়াজ নেই। এত খোলামেলার মধ্যে ছাদের খুব একটা প্রয়োজন পড়ে না। তবে ডালের বড়ি দেওয়ার জন্যে, আমসত্ত্ব শুকোনোর জন্যে ছাদ কাজে লাগে।

প্রতিবেশিনী ননদস্থানীয়া যারা মেনকার চারপাশে ঘুরঘুর করতো তাদেরই সঙ্গে নিয়ে দল বেঁধে ছাদে উঠতো। বিকেল পেরিয়ে যাওয়ার পর তখন শ্বশুরমশায় কোর্ট থেকে ফিরে সান্ধ্যভ্রমণে বেরোতেন। আর ইপিন টাউন ক্লাবে চলে যেতো পুরনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তাস খেলতে। খুব ভাল না খেললেও, ইপিন তাস খেলতে খুব ভালবাসে। কলকাতায়, সুযোগ বা সময় হয় না, শখটা এখানে এসে কিছু মিটিয়ে নিচ্ছে।

ছাদের পিছনের দেয়াল ঘেঁষে আমগাছ, কাঁঠাল গাছ। তার ওপাশে সুপারি গাছের সারি। একটা ফজলি আমের গাছ আছে। অনেককাল আগে মালদহ থেকে নিয়ে আসা কলমি গাছ। এই গ্রীষ্মশেষে সে গাছ বোলে ছেয়ে গেছে, ফল পাকতে পাকতে ভাদ্রমাস।

মুকুলিত আমাগাছের ডালের ফাঁক দিয়ে পশ্চিমে দেখা যায় সূর্যাস্ত হল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যাতারা ফুটে উঠছে। নিচ থেকে স্মৃতিকণার হাঁক শোনা যায়, 'নিচে নেমে এসো। ভর সন্ধ্যেয় ছাদে থেকো না।' এখনো, এতদিন পরেও, অল্প অল্প মনে পড়ে মেনকার।

এত সব কিছুর সঙ্গে দুটি তুচ্ছ ঘটনা, তার সেই প্রথমবার টাঙ্গাইলে যাওয়ার সঙ্গে জড়িত দুটি ঘটনা অনিবার্য কারণেই মেনকা ভোলেনি।

চলে আসার দু-চারদিন মাত্র আগে একদিন কোর্ট থেকে ফেরার পথে প্রভাসকুমার এক

ব্যক্তিকে সঙ্গে করে বাড়িতে এলেন।

এসেই যেমন ডাকেন, 'মা মেনকা, মা মেনকা।' মেনকাকে ডাকাডাকি করে বাইরের বারান্দায় নিয়ে গেলেন। স্মৃতিকণা রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন, তিনি প্রভাসকুমারের হাঁকাহাঁকি শুনেছিলেন, কিন্তু নতুন বৌ বাইরের বারন্দায় বাইরের লোকদের সামনে হুটহাট করে চলে যাবে এ ব্যাপারটা তাঁর মোটেই পছন্দ নয়। আগে বুঝতে পারেননি, এখন শাশুড়ি হওয়ার পরে টের পাচ্ছেন একটা রক্ষণশীলা মনোভাব তার মধ্যে আগে থেকেই রয়েছে।

শ্বশুরমশায় বাইরের বারান্দায় যেতে ডাকছেন আর রান্নাঘরের দরজা থেকে শাশুড়ি নিষেধ করছেন, মেনকা একটা দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেল।

ততক্ষণে প্রভাসকুমার বাড়ির মধ্যে এসে বউমাকে নিয়ে বাইরের বারান্দায় চলে গেলেন। উনুন থেকে রান্নার কড়াইটা মেঝেতে নামিয়ে মাথায় একটু ঘোমটা টেনে স্মৃতিকণাও বাইরের বারান্দায় গিয়ে বৌয়ের পাশে দাঁড়ালেন।

প্রভাসকুমারের যত উদ্ভট কাণ্ড। তিনি বাজার থেকে শান্তিপুর শাল রিপেয়ারিং অ্যাণ্ড ওয়াশিং কোম্পানির বুড়ো মালিক ওয়াসিমুলকে নিয়ে এসেছেন।

ওয়াসিমুল শান্তিপুরের লোক, এ শহরে দীর্ঘকাল আছেন। তিনি দক্ষিণদেশী ভাষায় মানে মেনকার মত গঙ্গাতীরের ভাষায় কথা বলেন। এতকাল থেকেও তাঁর উচ্চারণে বাঙাল টান আসেনি।

ওয়াসিমুলকে প্রভাসকুমার এনেছেন মেনকার সঙ্গে কথা বলার জন্য। মেনকার সঙ্গে দেশের ভাষায় কথা বলবে।

নতুন বৌয়ের সঙ্গে কথা বলার জন্যে, শালকর ভদ্রলোক যথেষ্ট সুসজ্জিত হয়ে এসেছেন। মাথায় জরির টুপি, নীল নকশা কাটা সাদা আদ্দির মিহি পাঞ্জাবি, পরনে শান্তিপুরি জরির পাড় ধুতি। তখন পর্যন্ত টাঙ্গাইলে যে সামান্য কয়েকজন মুসলমান ধুতি পরতেন ইনি তাঁদের অন্যতম।

কিন্তু বাদ সাধলেন স্মৃতিকণা। প্রভাসকুমারের ধারণা হয়েছিল নিজের ভাষায় কথা বলতে না পেরে মেনকার কষ্ট হচ্ছে এবং বলতে পারলে সে খুশি হবে। স্মৃতিকণা সেটা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামালেন না। মাত্র দু'চার কথার পরেই তিনি স্মৃতিকণাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলেন।

সেদিন দুপুরে প্রভাসকুমারকে এ নিয়ে যথেষ্ট কটূক্তি শুনতে হয়েছিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ফেরার দিনের। লঞ্চ ঘাটে নৌকো পৌঁছোনোর পর দেখা গেল লঞ্চের একতলা, যেটা প্যাসেঞ্জার ক্লাস, যাত্রীতে ভর্তি হয়ে আছে, লোকে লোকারণ্য।

লঞ্চের দোতলায় সারেং সাহেবের ঘরের পাশে ছোট একটা কাঁচের ঘর, সস্তার পর্দা টানা। সেটা ফার্স্ট ক্লাশ। কিন্তু সেখানে এক দারোগা সাহেব দু'তিন জন লোক আর কনেস্টবল নিয়ে বসে আছেন। নদীর ওই দিকের চরে কি একটা বড় দাঙ্গা হয়েছে, তারই তদন্ত করতে যাচ্ছেন।

প্রভাসকুমারের নৌকো ঘাটে ভিড়তে, তাঁকে দেখে সারেং সাহেব লঞ্চের ওপর থেকে নেমে একতলায় গলুইয়ের ওপর নৌকোর কাছে এলেন, 'কি ব্যাপার উকিলবাবু? কলকাতায় যাচ্ছেন?'

প্রভাসকুমার চিনতে পারলেন, সারেং সাহেব তাঁর পুরনো মক্কেল। এখানেই জমি-জায়গা কিনে, বিয়ে করে সংসার পেতে থিতু হয়ে গেছেন। আট চল্লিশ সালের দাঙ্গার সময় বিহার থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। টাঙ্গাইলে শহরের এক পাশে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকেন। সেই বাড়ি নিয়েই ভাড়াটে মালিকের মামলা। প্রভাসকুমার সারেং সাহেবের পক্ষের উকিল।

সারেং সাহেবের প্রশ্ন শুনে প্রভাসকুমার জানালেন, 'না আমি কোথাও যাচ্ছি না, ছেলে-বৌ কলকাতা থেকে এসেছিল, আজ ফিরছে।' তারপর বললেন, 'কিন্তু যাবে কি করে? আপনার লঞ্চ তো ভর্তি দেখছি।'

ততক্ষণে সারেং সাহেব স্মৃতিকণা এবং মেনকাকে দেখতে পেয়েছেন। তিনি কিছু না বলে সোজা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে দারোগা সাহেবের কামরায় গিয়ে ঘোষণা করলেন, 'আপনার এ কামরায় যাওয়া হবে না। উকিলবাবুর ছেলে-বৌ যাবে।'

দারোগা সাহেব ভিন্ন জেলার লোক। অল্প কিছুদিন আগে এখানে বদলি হয়ে এসেছেন, তিনি একটু ইতস্তত করে সপারিষদ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ব্যাপারটা কিছু পরিমাণ অনুমান করতে পেরে প্রভাসকুমার নিচ থেকে চেঁচিয়ে বললেন, 'ওঁরা থাকুন। আমার ছেলে-বৌ কামরার একপাশে বসে যাবে, কোনও অসুবিধা হবে না।'

দারোগাসাহেব কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। অল্পদিন আগে এলেও দারোগাসাহেবের সঙ্গে মুখ চেনা আছে প্রভাসকুমারের তিনি একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন, 'দারোগাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছিলেন?'

দারোগাসাহেব বললেন, 'ঐ সাকিনার চরে গত জুম্মাবারে একটা দাঙ্গা হয়েছে না।'

প্রভাসকুমার বললেন, 'কিন্তু সাকিনার চর তো পাবনা জেলায়। আমাদের এলাকার মধ্যে পড়ে না, গত সনে ঢাকা হাইকোর্টের রায়ে তাই বলেছে।'

প্রভাসকুমারের মত বিচক্ষণ আইনজীবীর কাছে এমন সুসংবাদ পেয়ে, বাজে ঝামেলার মধ্যে যেতে হল না এই স্বস্তিতে, দারোগাসাহেব লঞ্চ থেকে নেমে প্রভাসকুমারকে একটা আদাব জানিয়ে লোকজন সহ পাশের ঘাটে বাঁধা পুলিশের লাল ডিঙিতে করে থানায় ফিরে গেলেন।

পথে কোনো অসুবিধে হয়নি। লঞ্চ ঠিক সময়েই সিরাজগঞ্জের ট্রেন ধরিয়ে দিয়েছিলো। ট্রেন ঠিকঠাক কলকাতায় পৌঁছে গেল। মধ্যে দর্শনা-বানপুরে সীমান্ত চৌকি, পাসপোর্ট-কাস্টমস সেখানে বিশেষ কোনো ঝামেলা হলো না। প্রভাসকুমারের এক মক্কেলের ভাই তখন কুষ্টিয়ার এস পি। মকবুল আলম। পাকিস্তান পুলিস সার্ভিসের। মকবুলকে ইপিনও চিনতো, একই শহরের একই স্কুলের ছেলে, ইপিন যে বছর ইস্কুলের নিচু ক্লাসে ভর্তি হলো, সে বারেই কিংবা তার পরের বছর ম্যাট্রিক দিয়ে বেরিয়ে যায়।

ভরা পাকিস্তানি জমানা সেটা। সামরিক শাসন। পুলিশ সাহেবদের তখন প্রচুর ক্ষমতা।

পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত স্টেশন দর্শনা। চিনির কল আর শ্বেতাঙ্গিনীদের প্রিয় জিন নামক সুরার জন্যে অনেককাল ধরেই বিখ্যাত। বলা যায় ইক্ষু রাজ্যের রাজধানী।

তবু লোক দর্শনার নাম বিশেষ জানতো না। দর্শনার খ্যাতি বিস্তৃত হলো পাকিস্তান হওয়ার পরে। খ্যাতি মানে কুখ্যাতি। পাসপোর্ট-ভিসা-কাস্টমস এই সব নিয়ে বহু নিরীহ যাত্রীর হয়রানির স্থল হয়েছিলো। সামান্য সব ব্যাপার, কেউ হয়তো দুটো নতুন ধুতি এনেছে। একটা কেড়ে রেখে দিলো। একটা জল খাওয়ার পুরনো কাঁসার গেলাস। এক সের ঘি বা মিষ্টি এগুলো পর্যন্ত নিয়ে নিয়েছে দর্শনার সেপাই-দারোগারা। বাক্স-প্যাঁটরা সমেত সমস্ত যাত্রীর আপাদ-মস্তক সার্চ করা হতো।

হিন্দু যাত্রীদের পক্ষে দর্শনার হয়রানি একটা দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। পাসপোর্টে এক ফোঁটা কালি ঢেলে দিয়ে, কিংবা ভিসার সিলের ছাপ্পা ঠিক মত হয়নি, এই রকম সব অজুহাতে ঘুষের নামে রীতিমত লুঠতরাজ চলতো।

অবিকল না হলেও প্রায় কাছাকাছি ব্যাপার হতো এপারের সীমান্ত স্টেশন বানপুরে মুসলমান

যাত্রীদের ক্ষেত্রে। তবে তাঁদের যাতায়াত কম ছিলো। মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত হিন্দুরাই বেশি যাতায়াত করতো। বানপুরের পর সীমান্ত স্টেশন হয় গেদেতে। এখন তো রেল চলাচল বন্ধ, তবে এখনো হরিদাসপুর-বেনাপোল সীমান্ত সড়ক পথে একই রকম রাহাজানি, সীমান্তের দু-দিকেই অব্যাহত রয়েছে।

আলম সাহেবেব সদর কুষ্টিয়ায়। তিনি নিজে থেকে স্টেশনে এসে সেপাই দিয়ে রেলের কামরায় ইপিন ও মেনকাকে খুঁজে বার করে স্টেশনের প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে আদর-আপ্যায়ন করেন। সার্চ ইত্যাদির কোনো প্রশ্নই ওঠেনি।

কলকাতায় এসে আবার ধরাবাঁধা জীবনে জড়িয়ে পড়লো ইপিন-মেনকা।

ইপিন ঘুম থেকে ওঠে একটু দেরি করে। উঠে হাত মুখ ধুয়ে চা খেয়ে বাজারে যায়। বাজার থেকে ফিরে খবরের কাগজ পড়ে, দাড়ি কামায়, স্নান করে, ভাত খায়। ভাত খেয়ে অফিস যায়। দশটা-পাঁচটা অফিস। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায বাড়ি ফেরে। মেনকা চা-জলখাবার দেয়। খবরের কাগজটা আরেকবার পড়ার চেষ্টা করে। তারপর পুরনো অভ্যাস বশত একবার দেশপ্রিয় পার্কের দিকে যায়। এখন আর আড্ডায় তেমন মন বসে না। পুরানো বন্ধুরা কেমন ছাড়া ছাড়া হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আনমনা বসে থেকে বাড়ি ফিরে আবেক কাপ চা। মেনকার সঙ্গে একটু টুকটাক কথাবার্তা। ভাত ডাল মাছেব ঝোল। শয়ন ইত্যাদি। ঘুম।

মেনকার ছোট সংসার। একটা তোলা উনুন। একটা ছোট জনতা স্টোভ। সকালের দিকে একটা ঠিকে ঝি। লক্ষ্মীর মা, বোবা। তাতে মেনকার অসুবিধে হয় না। লক্ষ্মীর মার বাঁধা কাজ। খাওয়ার জল রাস্তার টিউবওয়েল থেকে নিয়ে আসা। বাসন মাজা, কাপড় কাচা, উনুন ধরানো, ঘর ঝাড় দেওয়া, মোছা আর মাছ কোটা। কাজ অনেকগুলো হলেও, সব কিছু করতে লক্ষ্মীর মার ঘণ্টা দেড়েক লাগে।

বিকেলের আগে মিনিট দশেকের জন্যে লক্ষ্মীর মা একবার এসে দুপুরের এঁটো বাসনপত্র মেজে দিয়ে যায। এর পরেও সংসারে যেটুকু কাজ বাকি থাকে সেটা হলো রান্না করা, চা জলখাবার বানানো এই সব। সেগুলো মেনকা টুকটাক করে, করে ফেলে।

বাড়িব কাছে ফুটপাথে একটা বাজার বসে। একেকদিন ইপিন ঘুম থেকে উঠতে দেরি করে। ইপিনকে আর জাগায না মেনকা। বাজারের ব্যাগটা নিয়ে নিজেই বাজার করে নিয়ে আসে। সদর দরজায় একটা তালা দিযে যায়। এর মধ্যে লক্ষ্মীর মা এলে একটু বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে।

দৈনিক বাজারের জন্যে বরাদ্দ কমবেশি আড়াই টাকা। এর মধ্যে সকালের চায়ের জন্যে বিস্কুট আছে। ইপিনের জন্যে এক প্যাকেট চার্মিনার সিগারেট আছে। তবুও মোটামুটি হয়ে যায়।

দুজনের দুটো-দুটো চারটে থিন এ্যারারুট কিংবা সার্কাস বিস্কুটের দাম পড়ে দু আনা। নয়া পয়সায় বারো পয়সা। এক প্যাকেট সিগারেট পনেরো পয়সা।

একটা পুরনো হিসেবের খাতা আছে মেনকার, সংসার খরচের হিসেব রাখা স্মৃতিকণাই মেনকাকে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজে অবশ্য টাঙ্গাইল বাড়িতে হিসেব রাখেন না। সেখানে

প্রভাসকুমারের অঢেল আয়। কিন্তু মেনকার হলো মাস মাইনের সংসার, তাকে হিসেব করে চলতে হত।

মোটামুটি টায়ে-টুয়ে, ইপিন-মেনকার সংসার ভালোই চলে যেতো। জিনিসপত্রের দাম তখনো বিশেষ বাড়তে শুরু করেনি।

মেনকার এখনো মনে আছে তার বিয়ের সময় গয়নার সোনা ছিলো একশো টাকা ভরি। তার বাবা দু হাজার টাকার সোনাব গযনা দিয়েছিলেন। প্রায় পনেরো ভরি সোনা।

সেবার পে কমিশন হযে ইপিনের মাইনে বেড়ে গিযে হলো প্রায় চারশো টাকার মত। বছরে পাঁচ হাজার টাকা। এখন মাসে পাঁচ হাজার টাকা উপার্জন করলে লোক আয়কর দেয় না। ইপিনের বাৎসরিক আয় পাঁচ হাজার টাকা হতেই মাসে মাসে অফিসে তার মাইনে থেকে আয়কর বাবদ কুড়ি টাকা কাটা হতো।

মেনকার হিসেবের খাতাটা খুলে দেখলে মনে হয় যেন কত যুগ আগের। অন্য কোনো শতকেব ব্যাপার।

ঠিকে ঝি লক্ষ্মীর মার মাস মাইনে দশ টাকা। মাসকাবারি ধোপা খরচ কোনো মাসে সাড়ে তিন টাকা, কোনো মাসে বড় জোর চাব টাকা।

বাজাবের খাতায় কোনো কোনো সপ্তাহ শেষে শনি-রবিবার, যেমন আলু, বেগুন, মাছ, ডিম লেখা থাকে, তেমন ভাবেই লেখা আছে সিনেমার টিকিট আড়াই টাকা। একেক দিন এর নিচেই লেখা আছে ট্যাক্সি। সিনেমা হল থেকে বাসা পর্যন্ত ট্যাক্সিতে আসার খরচা এক টাকা।

আরো অনেক কিছু আছে বাজাবের খাতায় যা এতদিন পবে প্রায অবিশ্বাস্য মনে হয়, মনে হয় যেন প্রবাদেব সেই সায়েস্তা খাঁব আমল :—

সরযের তেল ১ সের তিন টাকা

ময়দা ১/২ সের একত্রিশ পযসা

মাংস এক পোয়া পঁচাত্তর পযসা

নয়া পয়সা, পুরনো চোষট্টি পয়সায় টাকার বদলে একশো পয়সায় টাকা তখন বেশ চালু হযে গেছে, তবে বাজারে-দোকানে দাঁড়িপাল্লায় গ্রাম-কিলোগ্রাম তখনো কিছুটা ইতস্তত করছে।

মেনকার সংসাব খুব স্বচ্ছলভাবে না চললেও বিশেষ টানাটানি ছিলো না। মাঝে মধ্যে প্রভাসকুমার হুণ্ডি করে দু-চারশো টাকা পাঠাতেন। তবে ইপিন সরকারি কাজ করে বলে বে-আইনী টাকাটা আসতো মেনকার নামে। অবশ্য টাকাটা আনতে বড়বাজারের গদিতে যেতে হতো ইপিনকে।

টাকা ছাড়াও টাঙ্গাইল শাড়ি, ঘিয়ের টিন, চমচম, ইলিশ মাছ, এ সব প্রভাসকুমার লোক মারফত অনবরতই পাঠাতেন। অবশ্য ভরসা ছিল কুষ্ঠিয়ার এস পি মকবুল আলম।

বিপিন এমনি এমনি কোনো কারণ না দেখিয়ে মাসে-দুমাসে পঁচিশ-পঞ্চাশ টাকা বৌদিকে তার কর্মস্থল থেকে মানি অর্ডার করে পাঠাতো। নতুন গেরস্থালির অনেক উপকারে আসে ওরকম হঠাৎ আসা টাকা।

গ্রীষ্ম শেষ হয়ে বর্ষা এসে গেলো। বর্ষার মাঝামাঝি বিপিন কলকাতায় ফিরে এলো। মাদ্রাজে তিনমাসের ট্রেনিং শেষে ওখানেই ব্যাঙ্কের হেড অফিসে শিক্ষানবিশি করছিলো। তার কাজকর্ম ভালো দেখে বছর না ঘুরতেই তাকে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গে শ্রীরামপুর পাঠিয়ে দিলেন।

বিপিন এসে কলকাতায় ইপিনের বাসায় দুদিন থেকে শ্রীরামপুরে ব্যাঙ্কে জয়েন করে কাছেই ভদ্রেশ্বর স্টেশনের পাশে সুন্দর একটা পুরনো একতলা বাড়ি ভাড়া করে ফেললো। বাড়িওলা বিপিনদের ব্যাঙ্কেরই কর্মচারী, তখন কটকে পোস্টেড, একতলার চারখানা ঘরের মধ্যে নিজের

জন্যে দুটি ঘর রেখে, বাকি দুটি বিপিনকে ছেড়ে দিলেন।

মেনকার পেটের ভিতরে বাচ্চা বড় হচ্ছে। অল্পদিনের মধ্যে ডাক্তারেরা বলে দিলেন যে পেটে যমজ বাচ্চা আছে। ব্যাপারটা বেশ ভাবিয়ে তুললো ইপিনকে।

ইপিনের ধারণা ছিলো যে মেনকার বাপের বাড়ি থেকে বাচ্চা হওয়ার আগে মেনকাকে এসে নিয়ে যাবে। কিন্তু মেনকার বাবা প্রভাসকুমারকে একটা চিঠি দিয়ে জানালেন যে তাঁদের বাড়িতে সন্তান জন্মানোর সময় মেয়েদের আসা অমঙ্গলজনক, এ বিষয়ে বহু প্রাচীন একটা কুসংস্কার রয়েছে তাঁদের। তা ছাড়া সে বাড়িতে গর্ভবতী মেয়ের দেখাশোনার কেউ নেই।

টাঙ্গাইলে এ চিঠি পৌঁছানোর পর স্মৃতিকণা স্থির করলেন মেনকার দেখাশোনা করতে তিনিই যাবেন। ইপিন-বিপিনকে চিঠি লিখলেন দু ভাইয়ের যে কেউ এসে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাক।

ব্যাপারটা নিয়ে ইপিন-বিপিন এবং মেনকা অনেক আলোচনা করে ঠিক করলো, বিপিন মাকে আনতে যাবে। জন্মাষ্টমীর ছুটির সঙ্গে পাঁচদিন ক্যাজুয়াল লিভ নিলে আটদিনের ছুটি হয়ে যায়, সেই ছুটি নিয়ে বিপিন গিয়ে স্মৃতিকণাকে নিয়ে আসবে।

বড় ভাইয়ের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ইপিন জিজ্ঞাসা করলো, 'ব্যাঙ্কের কাজে অসুবিধা হবে না?'

বিপিন বললো, 'ওখানে উমা এসে জয়েন করেছে। আমি না থাকলেও ও কাজ চালিয়ে নিতে পারবে।

উমা বিপিনের প্রণয়িণী, প্রাক্তন ছাত্রী। উমার বাবার সুবাদেই ব্যাঙ্কের চাকরি একথা ইপিন ও মেনকা দুজেনই জানে।

তবে এখনো তারা কেউ উমাকে চোখে দেখেনি।

এক অস্থাবর পৃথিবীর এলোমেলো সময়ের এই কাহিনী। স্মৃতি ও বাস্তব, অনুমান ও অভিমান, স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের এই অস্বচ্ছ, অসম্বদ্ধ প্রতিলিপি, এই উপন্যাসের ঘটনামালার সঙ্গে আমি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বলা বাহুল্য, সব আরও একটু কম জানলে ভাল হয়, চোখের দেখার বদলে মনের কথা হলে লেখার সুবিধে হয়।

সে যা হোক, এখন অকুস্থলে ফিরে যেতে হয়।

মেনকার সন্তান হওয়ার সময় স্মৃতিকণা কলকাতায় ছেলের বৌয়ের কাছে থাকতে পারলেন না। বিপিন তাঁকে আনতে গিয়ে পাকিস্তানে যুদ্ধবন্দি হয়ে মুক্তাগাছায় মহারাজার বাড়িতে বন্দি নিবাসে কয়েকমাস কাটিয়ে ছিলো।

স্মৃতিকণার খুব মন খারাপ। নিজের হাতে রাত জেগে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে নাতির জন্য কাঁথা বুনেছেন। আচার, আমসত্ত্ব যা কিছু মেনকা-ইপিন আসার সময় তৈরি করেছিলেন, সেগুলোও সঙ্গে নিয়ে যাবেন বলে বড় বড় কাঁচের কৌটোয় ভরে বেতের ঝুড়ির মধ্যে ভরেছেন। ভরবার আগে আরও একবার ছাদের রোদে শুকিয়ে নিয়েছিলেন। বর্ষাকালে ছাদের রোদে আচার আমসত্ত্ব শুকানোও বেশ কঠিন কাজ। কখন বৃষ্টি নামবে তার কিছু ঠিক নেই। এই বর্ষার দেশে বছরের এই সময়ে প্রায় সর্বদাই আকাশ মেঘলা থাকে, কখন যে বৃষ্টি আসবে ঝিরঝির করে কিংবা তুমুল হল্লোড়ে কিছু ঠিক নেই।

তাছাড়া কাকের উৎপাত লেগেই আছে। এ সবের জন্যে বালক হারাধনকে নিয়োগ করেছিলেন স্মৃতিকণা, সকালবেলায় স্কুলের বই খাতা নিয়ে সে ছাদে উঠে যেতো। একটা ছোট পাটকাঠি থাকতো তার হাতে তাই দিয়ে কাক তাড়াতো। বৃষ্টি এলে আচার, কাসুন্দি সরিয়ে চিলে কোঠার

ঘরে তুলে দিতো। বিনিময়ে স্মৃতিকণা তাকে প্রতিদিন একটা করে সিকি দিতেন। দুপুরে টিফিনের সময় ইস্কুল থেকে এসে হারাধন বা হারু এ বাড়ির রান্নাঘরের বারান্দায় বসে কাজের লোকেদের সঙ্গে ভাত খেয়ে নিতো।

জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা শেষ, বিছানা-বাক্স তৈরি এমন সময়ে যুদ্ধ লেগে সব পরিকল্পনা বানচাল করে দিলো।

কলকাতায় পূর্ণগর্ভা পুত্রবধূর কাছে যাওয়া হলো না। এদিকে বিপিন তাকে নিতে এসে গ্রেপ্তার হয়ে গেলো। মহাদুশ্চিন্তায়, দুর্ভাবনায় দিন কাটে স্মৃতিকণা ও প্রভাসকুমারের। মেনকার বাচ্চা হওয়া নিয়ে চিন্তা তো ছিলোই। তার ওপরে বিপিনকে নিয়ে ভাবনা যোগ হয়েছে।

এই যুদ্ধ কতদিন চলবে, এর পরে কি হবে, কেউ কিছু বলতে পারছে না। কারও পক্ষে কিছু অনুমান করাও কঠিন।

বিপিনের ব্যাঙ্কে নতুন চাকরিই প্রায় বলা যায়। এভাবে পাকিস্তানী বন্দিনিবাসে আটকিয়ে থাকলে সে চাকরির কি করা যাবে।

মেনকাকে নিয়েও খুব ভাবনা স্মৃতিকণার। এই প্রথম গর্ভ। বিপিন একটা গোলমেলে খবর এনেছে, মেনকার পেটে যমজ বাচ্চা রয়েছে। সেটাও একটা বড় চিন্তার কারণ।

সবচেয়ে অসুবিধা হয়েছে, কোনও খবরই পাওয়া যাচ্ছে না। যুদ্ধ বাধার দিন পনেরো আগে থেকে ডাক চলাচল বন্ধ। টেলিগ্রামও যাচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। টেলিগ্রাম অফিসে তার নিচ্ছে বটে কিন্তু সেগুলো যাচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। প্রভাসকুমার খবর নিয়ে জেনেছেন ওদিক থেকে কোনও তার এদিকে আসছে না।

কিছুই প্রায় করার নেই। নিরুপায় অসহায় দিনযাপন। ভয়, উদ্বেগ ও চিন্তায় দিন কাটে তো রাত কাটে না।

পাকিস্তান সরকার এটা সঠিকভাবেই জানতেন যে একজন হিন্দুও তাদের পক্ষে নয়, সব হিন্দুরই টান হিন্দুস্থানের দিকে। ধর্মের হিসেবে যে দেশ তৈরি হয়েছে, সে দেশের বিধর্মীরা, নিজ বাসভূমে পরবাসীরা মনে মনে পাকিস্তান হওয়াটা মহাপাপের কাজ হয়েছে বলে মনে করে, পাকিস্তানের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র মমতা বা সহানুভূতি নেই।

পাকিস্তান সরকার এটা জানতেন। সেই জন্য তাঁরা প্রতিটি হিন্দুকে ভারতের গুপ্তচর মনে করতেন, হিন্দুদের মধ্যে যারা একটু বিশিষ্ট, মান্যগণ্য তাঁদের ওপর কড়া নজর রাখা হতো।

কখনও কখনও প্রভাসকুমারকেও গোয়েন্দা দপ্তর বা পুলিশের গোপন খুঁজিলদারেরা নজরে রেখেছে। কিন্তু প্রভাসকুমারের খোলামেলা জীবনযাপন, উচ্চ বংশ এবং সরল, ভাল মানুষ বলে সুখ্যাতি তাঁকে কখনও বেকায়দায় ফেলেনি। তাছাড়া, বিপদের সময়ে যদিও এতে খুব কাজ হয় না, বহু প্রভাবশালী মুসলমান ভদ্রলোক প্রভাসকুমারের ব্যক্তিগত সুহৃদ ছিলেন।

এর চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজনে লাগতো ওই খুঁজিলদারদের, যাদের মধ্যে অনেকে পুরুষাণুক্রমে প্রভাসকুমমারদের সেরেস্তার মক্কেল। একটা গ্রাম্য আনুগত্য ছিলো ওই সব মানুষদের, যাদের মধ্যে কেউ কেউ আনসার হয়েছিলো, পরবর্তীকালে বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় রাজাকার হয়ে গিয়েছিলো। যখন আইনের শাসন বলতে কিছু নেই, বিধি ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে, চতুর্দিকে সম্পত্তি ও জীবন বিপন্ন। দাঙ্গার দুর্দিনে, রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে এরা অনেকে বুক দিয়ে রক্ষা করেছে, নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়েছে প্রভাসকুমারদের।

পুজো এসে গেলো। এ বছর পুজো খুবই আগে আগে। আশ্বিন পড়তে না পড়তে পুজো।

এরকম সাধারণত হয় না।

আকাশ কয়েকদিন ধরে খুব মেঘলা। সেই মহালয়ার আগের দিন থেকেই, যেদিন বিপিনকে পুলিশ ভারতীয় বলে ধরে নিয়ে গেলো রাতের বেলায়। মাঝে মাঝে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে, কখনও অল্প রোদ উঠছে, কখনও হালকা ছায়া ঢাকা দিন, ভাদ্র-আশ্বিনের আকাশের এই পুরনো স্বভাব।

এর মধ্যে পঞ্চমীর দিন দুপুর বেলায় আকাশ ভেঙে আঝোরে বৃষ্টি নামলো, দিন অন্ধকার করা বৃষ্টি, এক হাত দূরের জিনিস বৃষ্টির ধারার ঘন পর্দার আড়ালে নজরে আসে না।

পুরনো দালানের ছাদ দিয়ে জল পড়ছে। এবার বর্ষার আগে ছাদ সারাই হয়নি। বর্ষা শেষ হয়ে গেলো, এখন আর না সারালেও কিছুদিন চলবে। এ বাড়িতে, এ দেশে থাকা যাবে কিনা কিছু ঠিক নেই।

ব্ল্যাক-আউট চলছে। আলো জ্বালানো চলবে না। সন্ধ্যাবেলা আরতি দেওয়া যাবে না। পূজা মণ্ডপে হিন্দুদের সমাবেশ পাকিস্তান সরকারের মোটেই পছন্দ নয়। মালাউনদের মানে হিন্দুদের বেসরকারিভাবে রাজনৈতিক স্তরে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে পুজো না করার জন্য।

প্রভাসকুমার কালীবাড়ি পুজো কমিটির সভাপতি। তিনি কমিটি মিটিং না ডেকে সভ্যদের সবাইকে আলাদা আলাদা করে জানিয়ে দিয়েছেন, এ বছর পুজো করা যাবে না। সবাই ব্যাপারটা বোঝে, কেউ কোনও প্রশ্ন তোলেনি।

বারান্দার এক পাশে বৃষ্টির ছাঁট বাঁচিয়ে স্মৃতিকণা পান সাজছিলেন। ঘরের মধ্যে খাটের ওপর বসে বাইরের অঝোর বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে প্রভাসকুমার স্মৃতিকণাকে প্রশ্ন করলেন, 'ডাক্তাররা বৌমার বাচ্চা হওয়ার তারিখটা যেন কি দিয়েছে?' পান সাজতে সাজতে স্মৃতিকণা বললেন, 'হিসেব ঠিক থাকলে আজকালের মধ্যে প্রসব হয়ে যাবে।'

শুকনো কুয়োর মধ্যে বাসা বেঁধেছে খেঁকশেয়াল, শূন্য তুলসীমঞ্চে উইয়ের ঢিবি, সামনের পুকুর থেকে উঠে আসা বাতাস বয়ে যাচ্ছে পুরনো দিনের মত ঠাণ্ডা জলের আভাস নিয়ে, ফাঁকা ভিটেয় বড় বড় মুথোঘাস আর তার মধ্যে চলাফেরা করছে মেঠো ইঁদুর।

কিছুই চেনা যায় না। শুধু একটা হেলে পড়া কামরাঙা গাছ ছাড়া। গাছে হলুদ রঙের অজস্র ফল এসেছে। এক সময়ে এই ফলের জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো, পাড়ার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কামরাঙা কুড়ানো নিয়ে অনেক মারামারি হয়েছে ইপিন-বিপিনের। একালের ছেলে-মেয়েরা বোধহয় কামরাঙা ভালবাসে না।

নাকি এ পোড়া ভিটেয় আসতে সাহস করে না।

বছর দেড়েক আগে, অফিসের একটা কাজে ঢাকা গিয়ে ইপিন কয়েকদিন আগে নিজেদের ভিটের চেহারা দেখে এসেছে।

তারপর থেকে তার খুব মন খারাপ।

মন খারাপের কথা আপাতত থাক। মূল কাহিনীটা আগে শেষ হোক। পঞ্চমীর দিন বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে মুষলধারে বৃষ্টি কলকাতায়ও।

হাওয়া অফিসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে এ কয়দিন খবরের কাগজগুলো ঘোষণা করেছিলো, 'সূর্য করোজ্জ্বল মহাপুজা। বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নাই।' তিরিশ বছর আগের কথা এসব। তখনো

চলিত ভাষা সংবাদপত্রের অন্দর মহলের বাইরে আসেনি। সেসব ভবিষ্যৎ বাণী বিফলে গেলো। তৃতীয়ার রাত থেকেই আকাশ মেঘলা, চতুর্থীর বিকেল থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি। তারপরে পঞ্চমীর সকালটা একটু ছাড় দিয়ে দুপুরের একটু আগে তুমুল বৃষ্টি এলো।

চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের উত্তর দিকের গেটটার ভিতরে পুরনো আমাগাছটার নিচে ইপিন একা একা উদাসভাবে বৃষ্টিতে ভিজছিলো। রোদে পুড়লে, বৃষ্টিতে ভিজলে ইপিনের বিশেষ কিছুই হয় না। সে ছাতা ব্যবহার করে না। হঠাৎ বৃষ্টি এলে কোথাও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার মত ধৈর্যও তার খুব নেই। রোদ নিয়েও সে খুব একটা মাথা ঘামায় না। এসব তার গা সহা।

তৃতীয়ার দিন রাত প্রায় একটার সময় মেনকার প্রসব-বেদনা উঠলো। সন্ধ্যা থেকেই মেনকা কেমন অস্বস্তি বোধ করছিলো, ব্যথা-ব্যথা ভাব।

এমনিতেই মেনকা একটুও ব্যথা-যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না। সামান্য মাথা ধরলে সঙ্গে সঙ্গে একটা স্যারিডন খেয়ে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। সামান্য পেটের গোলমাল হলে বাড়ি থেকে দু-পা বেরোতে সাহস পায় না। কতদিন এমন হয়েছে সেজে গুজে বাড়ি থেকে বেড়াতে বেরিয়ে গলির মোড় থেকে ফিরে গেছে, কি জানি হঠাৎ যদি পেট মুচরিয়ে ওঠে।

আজো সেই জন্যে মেনকার ব্যথাটাকে খুব গুরুত্ব দেয়নি ইপিন। তবে সন্ধে বেলা আড্ডা দিতে অন্য দিনের মত বেরোয়নি। রাত দশটা নাগাদ খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে। সাধা ঘুম তার, যখনই বিছানায় যাক শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ে।

তা ছাড়া আজ রাতের খাওয়া তার খুব পছন্দসই ছিলো।

আজ মেনকা রান্না করেনি। পিসি আসার পর থেকে মেনকা বিশেষ রান্না করে না। তবে তিনি বিধবা মানুষ। ছোট একটা তোলা উনুনে হবিষ্যি রান্না করেন। মেনকা তাঁকে আমিষ ছুঁতে দিতে চায় না।

কিন্তু নীরবালা মুক্তমনা মানবী, শুধুমাত্র নিজেকে বাদ দিয়ে সব বিষয়ে তিনি সংস্কারহীনা। নিরামিষ-আমিষ, আত্মীয়-অনাত্মীয়, মানুষ-অমানুষে তাঁর কোনো বাছবিচার নেই।

নিজস্ব বৈধব্য বিষয়ে ষোলো আনার উপরে আঠারো আনা খাঁটি কিন্তু অন্যের, অন্যদের সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আধুনিকা। আমিষ রান্না করতে তাঁর কোনো ঘেন্না বা সংস্কার নেই। ছেলে-মেয়েদের, ভাইপোদের অসংখ্যবার তিনি ইলিশপাতুরি, পাবদার ঝাল কিংবা কিসমিস-দই মাখা ডিমের ডালনা করে দিয়েছেন। তাঁর রান্নার হাত ছিলো স্বর্গীয়।

আজ অবশ্য আমিষ হয়নি। দুপুরের রান্না ডাল ছড়ানো পাঁচমিশেলি তরকারি আর আচারের তেল, ভাজা শুকনো লঙ্কা, সৈন্ধব লবণ দিয়ে নীরবালার নিজের হাতে যত্ন করে মাখা স্পেশ্যাল প্রিপেরেশান আলুভাতে ছিলো। স্বাদে-গন্ধে অসাধারণ এই সব খাবারের মধ্যে ইপিন-বিপিনের বাল্য ও কৈশোর জড়িয়ে রয়েছে।

মেনকা ভাত খায়নি। ওই রকম রগরগে আলুসেদ্ধ আজ তার খাওয়া উচিত হতো না, সে খেতেও চায়নি। নীরবালা তাকে ঘরে তৈরি একটা সন্দেশ আর এক গেলাস হরলিকস দিয়েছিলেন। মেনকা কিন্তু প্রায় কিছুই খেতে চায়নি। এদিকে নীরবালা সব সময় ভাবছেন মেনকার ভালোমত যত্ন আত্তি হচ্ছে না। স্মৃতিকণা আসতে পারলে কত কি করতো। তিনি ঠিকমত দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না।

বেশ আয়েস করে ঘুমোচ্ছিলো ইপিন একটা পাশ-বালিশ জড়িয়ে। পিসি ইপিনকে ঘুম থেকে তুললেন, 'আমার মনে হচ্ছে বৌমার ব্যথা উঠেছে। হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।'

ঘুমে ভরা চোখ কচলাতে কচলাতে ইপিন বললো, 'এখন? এই এত রাতে?'

নীরবালা বললেন, 'সন্ধ্যা থেকেই ব্যথা-ব্যথা বলছিলো, তখনই তোমার নিয়ে যাওয়া উচিত ছিলো।'

কথাটা সত্যি, কিন্তু ইপিন ভেবেছিলো আজকের রাতটা কেটে যাবে। ব্ল্যাক-আউটের ঘুটঘুটে রাত, ভোর হলেই হাসপাতালে নিয়ে গেলেই হবে।

মেনকাকে প্রথম দিকে কালীঘাটের নামকরা মহিলা ডাক্তার অনিলা দেবী দেখছিলেন। কাঠখোট্টা, চিরকুমারী, বিলেত ফেরত মহিলা, এক বিন্দু প্রসাধন নেই, গায়ে এক টুকরো গয়না নেই, এমন কি কানে পর্যন্ত একটা দুল নেই। কাটকাট কথাবার্তা, সেই সঙ্গে ধমক—মেনকার প্রথম থেকেই অনিলা ডাক্তারকে পছন্দ হয়নি।

তবে এর চেয়ে একটা বড় কারণ ছিলো এই যে অনিলা দেবীর নার্সিং হোম ছিলো পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে। ইপিন বিচার-বিবেচনা করে দেখলো এই যুদ্ধের বাজারে ব্ল্যাক-আউটের মধ্যে যদি রাতেবিরেতে মেনকার ব্যথা ওঠে তা হলে মনোহরপুকুর থেকে অতদূরে মেনকাকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে।

এবং আজ সত্যিই তাই হলো। এই রাত একটায় যখন নিষ্প্রদীপ শহর জুড়ে ঘুটঘুটে ভুতুড়ে অন্ধকার, যখন রাস্তাঘাটে কোথাও কোনো পথচারী বা গাড়ি নেই, কোনো দোকান খোলা নেই, সেই সময়ে নীরবালা এবং ইপিনের দুই কাঁধে হাত দিয়ে ভর দিয়ে আসন্নপ্রসবা মেনকা গোঙাতে গোঙাতে রাস্তায় বেরলো।

এই সব ভেবেই বাড়ির কাছে চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে মেনকাকে দেখিয়ে মাসখানেক আগে থেকে একটা পেয়িং বেড ইপিন ঠিক করে রেখেছিলো, তা ছাড়া চিত্তরঞ্জনের ডাঃ বিশ্বনাথ দাসের সঙ্গে আড্ডার সূত্রে একটু হালকা বন্ধুত্বও ছিলো ইপিনের।

অবশ্য পাশেই রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানেও চেষ্টা করা যেতো সিটের জন্যে কিন্তু তা করা হয়নি চিত্তরঞ্জনে সহজেই হয়ে গিয়েছিলো বলে।

আজ খুব কাজে লাগলো ব্যাপারটা। এই রাতে হেঁটে হেঁটে পার্ক স্ট্রিটে পৌঁছানো যেতো না। হয়তো রাস্তায়ই বাচ্চা হয়ে যেতো।

মেনকাকে ধরে ধরে বেশিক্ষণ হাঁটতে হলো না। মনোহরপুকুরের পিছনেই হাজরা রোডে একটা পাঞ্জাবিদের রুটি-তরকারির দোকান। দোকানের দরজা বন্ধ কিন্তু ভিতরে আলো জ্বলছে। ট্যাক্সিওলারা রাতের কাজ সেরে আগে খেতে আসে।

এক বুড়ো সর্দারজি হঠাৎ দরজার ফাঁক দিয়ে স্ফীতোদর মেনকা এবং ইপিন ও নীরবালাকে দেখে ব্যাপারটা অনুমান করে তাড়াতাড়ি খাবার রেখে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। তাঁর ট্যাক্সি পাশেই রাস্তার ওপরে ছিলো। সেই ট্যাক্সিতে দু-মিনিটের মধ্যে বকুলবাগানের মধ্য দিয়ে চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে। ইপিনের সে সময় মানসিক অবস্থা এমন ছিলো যে ট্যাক্সি ভাড়া দিয়েছিলো কিনা সেটকুই মনে নেই।

মেনকা কিন্তু স্বামীকে এবং পিসিশাশুড়িকে মিথ্যে মিথ্যে ভুগিয়েছিলো। তার ব্যথাটা সত্যি ব্যথা ছিলো না। যাকে বলে ফল্স পেন, এ ব্যথাটা পরদিন সকালে কেটে গিয়েছিলো। কিন্তু মেনকাকে ডাক্তার বিশ্বনাথ বেডে রেখে দিয়েছিলেন। কেসটা জটিল, এক্সরে করে দেখা গেছে পেটে যমজ বাচ্চা এবং তারা ঠিক ভাবে পেটের মধ্যে নেই।

দুদিন দেখার পর তৃতীয় দিনে দুপুরবেলা মেনকাকে সিজারিয়ান করা হলো। যমজ ছেলে দুটি পৃথিবীর আলো দেখলো বেলা দেড়টা নাগাদ।

তখন অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে টাঙ্গাইলে, স্মৃতিকণা-প্রভাসকুমার মেনকার কথা ভাবছেন। অঝোরে

বৃষ্টি হচ্ছে কলকাতায়, সেবাসদনের সামনের আমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে উদ্বেগ ব্যাকুল মনে ইপিন উদাসীন ভাবে ভিজছে। সুখবরটা আধঘন্টা বাদে পাওয়া গেল।

সিজারিয়ান করে হলেও যমজ ছেলে ভালোভাবেই হয়েছে, মেনকাও ভালোই আছে। ইপিনকে এসব খবর টাঙ্গাইলে মা-বাবাকে পাঠাতে হবে। তারা নিশ্চয় খুব চিন্তায় রয়েছেন।

টাঙ্গাইল থেকে বিপিনেরও কোনো খবর আসেনি। কি যে করা যায়। সদ্য পিতৃত্বের আনন্দ বা গৌরব ইপিন কিছুই বোধ করছে না। সে শুধু ভাবছে কি ভাবে মা-বাবাকে খবর পাঠানো যায়, কি ভাবে মা-বাবার কাছ থেকে বিপিনের খবর আনানো যায়।

এখনো যুদ্ধ চলছে। খড়গপুরের কাছে কলাইকুণ্ডায় বোমা পড়েছে। ঢাকা রেডিয়ো বলছে, 'পাকিস্তানী বোমারু বিমান হাওড়া ব্রিজ ধ্বংস করে দিয়েছে, হাওড়া-কলকাতার মানুষজন পাগলের মত শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। হালকা বরিশালি টানেব বাঙাল উচ্চারণে ফবিদা কবির নামে এক সুকণ্ঠী ঘোষিকা নিয়মিত তিনবেলা এই কথা বলে যাচ্ছেন।

পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যাতায়াত, ডাক-তার পুনবায় খুব সহজে চালু হবে বলে মনে হয় না। তবুও ইপিন প্রথমে বাড়িতে ফিরে পিসিকে যমজ ছেলে হওয়ার খবব দিয়েই ছুটলো ডালহৌসি স্কোয়ারে সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসে। যদি কিছু উপায় জানা যায়।

কিন্তু তারা ইপিনকে হতাশ করলো। ডাকের মতই তার চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ। অদূর ভবিষ্যতে চালু হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এলো ইপিন। মেনকার যমজ ছেলে ভালো ভাবে হয়ে গেছে এ খবরটা টাঙ্গাইলের বাড়িতে পাঠাতে না পেরে ইপিনের খুব খারাপ লাগছিলো। মা-বাবা কত খুশি হতো, আনন্দ পেতো, উৎসব শুরু হয়ে যেতো যেখানে।

কি করে খবরটা পাঠাবে কিছুই ভেবে পাচ্ছিলো না ইপিন। এদিকে বাড়ি ফেরা মাত্র নীরবালাও ঐ একই প্রশ্ন কবলেন, 'প্রভাসকে খবরটা পাঠাতে পারলি ?'

ইপিন সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলো, 'না।'

নীরবালা আবার বললেন, 'পারলি না ?'

ইপিন বললো, 'কোনো উপায় নেই।'

নীরবালা তোলা উনুনে ইপিনের জন্যে সুজির হালুয়া তৈরি করেছেন। যদিও ইপিন সন্ধ্যা করে বাড়ি ফিরেছে, এটা বিকেলের জলখাবার, ইপিনকে খেতেই হবে। 'খাবো না। পেট ভরা আছে। বাইরে খেয়েছি।'...এসব বলে নীরবালার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়। খেতেই হবে, রাতের ভাত খাওয়ার পনেরো মিনিট আগে হলেও খেতেই হবে।

হালুয়ার ছোট পেতলের কড়াইতে একটু জল ঢেলে নীরবালা আবার তাঁর প্রশ্নে ফিরে গেলেন, 'ভালো করে চেষ্টা করেছিলি।'

ইপিন খুব বিরক্ত বোধ করছিলো, তার ওপরে ক্লান্ত, কোনো জবাব দিলো না।

নীরবালা আপন মনে বলতে লাগলেন, 'প্রভাস অস্থির হয়ে যাবে। আর তোর মা নিশ্চয় এতদিন কাঁদাকাটি শুরু করে দিয়েছে।'

এ সমস্তই ইপিন জানে, খুব ভালো করে জানে। কিন্তু পিসির কথায় সে অস্থির হয়ে উঠেছিলো। পিসির এই একটা খারাপ স্বভাব, অপ্রীতিকর, অস্বিস্তিকর পরিস্থিতিকে আরো অসহ্য করে তোলেন প্রসঙ্গটা বারবার উত্থাপন করে, ভাঙা রেকর্ডের মত ঘুরে ঘুরে সেই একই কথা। অক্ষমতাকে খোঁচানো, খুঁচিয়ে ঘা করা।

নীরবালা ব্যাপারটা বোঝেন না। এগুলো তিনি স্বগতোক্তির মত করে যান, কেউ শুনুক কিংবা না শুনুক, তাঁর প্রতিক্রিয়া তিনি ব্যক্ত করেন।

বিরক্ত মনে সুজির হালুয়াটা কোনো রকমে গলাধঃকরণ করে নীরবালাকে এড়াতে ইপিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো।

রাত প্রায় নটা বাজে, নীরবালা পেছনে চেঁচিয়ে বললেন, 'এত রাতে, এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে কোথায় যাচ্ছিস?'

সিঁড়ি দিয়ে নেমে ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারে নেমে যেতে যেতে ইপিন জানালো, 'আর একটু চেষ্টা করে দেখি টাঙ্গাইলে খবরটা পাঠানো যায় কি না। আমি এখনই ফিরবো, তুমি ভাত বেড়ে রাখো।'

এই ব্ল্যাক আউটের মধ্যে, ইমার্জেন্সিব দুর্দিনেও দুর্গাপুজোর কোনো কমতি নেই, বরং যুদ্ধের উত্তেজনায় একটু ধুমধাম বেশিই। তবে আলোকসজ্জা করা যায়নি। মণ্ডপগুলো একটু বেশি ঢেকে, ফাঁকফোকর না রেখে পুজো হচ্ছে। তাতে অবশ্য পুজোর আনন্দ কিছুটা মাটি হয়েছে।

আজ দুপুরে জোর বৃষ্টি হয়েছে। তাবপরে সারাদিন ধরেই আকাশ মেঘলা ছিলো, ঝিরঝির করে বেশ কয়েকবার বৃষ্টিও হয়েছে। এখন অবশ্য বৃষ্টি নেই। মনে হচ্ছে মেঘটাও একটু কেটে গেছে। আকাশে জ্যোৎস্না জ্যোৎস্না ভাব। একেকবার ভাসমান মেঘের মধ্যে থেকে পঞ্চমীর চাঁদ ফুটে বেরোচ্ছে।

ল্যান্সডাউন ধরে হাঁটতে হাঁটতে মোড়ের দিকে এগোচ্ছিল ইপিন। দেশপ্রিয় পার্কের একটু আগে একটা বাড়িব গাড়ি বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে কযেকজন আড্ডা দিচ্ছিলো। এদের মধ্যে একজনকে ইপিন চেনে, সুতৃপ্তিতে বহুবার দেখেছে।

একজন হলেন কবি শংকর চট্টোপাধ্যায়, শৌখিন, সুপুরুষ। খুব আড্ডাবাজ। এই গাড়িবারান্দাওয়ালা বাড়িতেই থাকেন। যাতায়াতের পথে বহুবার ইপিন দেখেছে নিচতলার বাইরের ঘরে জোর গল্পগুজব, হৈ চৈ হচ্ছে। আজ বোধহয় আড্ডা ভেঙেছে, তবুও রাস্তায় দাঁড়িয়ে যতক্ষণ কথা বলা যায়।

শংকরবাবু খুব মিশুকে ভদ্রলোক। তিনি ইপিনের নাম না জানলেও মুখ চেনেন। একবার ইপিনকে আলাদা করে ডেকে কাজলের সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলেন, 'ও সব বাজে মেয়ে, তুমি তো দেখছি ভালো ছেলে, মিশতে যেয়ো না, একেবারে মারা পড়বে।'

আজ ইপিনকে দেখে নিজে থেকেই হাত ধরে ইপিনকে শংকর বললেন, 'এই যে আজকাল তোমাকে তো আর দেখি না, ভালো আছো তো।'

এ সব প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। তাছাড়া আজ দুপুরে যে সিজারিয়ান করে তার যমজ ছেলে হয়েছে, ইপিন ভাবলো ও কথা এখানে বলার কোনো মানে হয় না।

পাশে কয়েকজনের মধ্যে জোর তর্ক হচ্ছে। বিষয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, কে জিতবে কে হারবে, কার কতটা লাভ ক্ষতি হবে, চীন-রাশিয়া-আমেরিকা কে কার পক্ষে?

যাঁরা তর্ক করছিলেন তাঁদের মধ্যে আরো দুজনকে ইপিন মোটামুটি চেনে।

একজন হলেন রবীন্দ্র বিশ্বাস। কবিতা লেখেন, অধ্যাপনা করেন। ঋজু, দীর্ঘকায়, শ্যামবর্ণ বুদ্ধিমান চেহারা। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা, ব্যাকব্যাশ করা ঘন কালো চুল, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবি, কাঁধে হ্যাণ্ডলুমের পথিক ব্যাগ। ইপিন শুনেছে, রবিবাবু অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের মেয়ের গৃহশিক্ষক, বন্ধুমহল এই একটা কারণে অন্তত তাকে বেশ সমীহ করে।

অন্যজন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। পরিষ্কার কাচা আদ্দির পাঞ্জাবি, মিলের মিহি ধুতি, পামসু। নিপাট বাঙালি ভদ্রলোকের চেহারা। গল্প লেখেন, বেশ নাম হয়েছে। নানা রকম ব্যবসা করার খুব ঝোঁক কিন্তু ব্যবসা করেন না। আনন্দবাজারে কাজ করেন। খুবই কল্পনা প্রবণ।

সবাইকে থামিয়ে দিয়ে শ্যামলবাবু কথা বলছিলেন। যুদ্ধে ভারত জিতছে শুধু নয়, জিতেই গেছে-এ বিষয়ে শ্যামলবাবু নিশ্চিত। লাহোর তো দখল হয়েই গেছে, ঢাকাও আর দুয়েকদিনের মামলা।

জানা গেলো, আজ সকালেই শ্যামলবাবু অফিস যাওয়ার পথে ফেয়ারলি প্লেসে রেলের হেড অফিসে লাহোরের টিকিট কাটতে গিয়েছিলেন। বুকিং কাউন্টারের যে ক্লার্ক তিনি খুব সম্ভব কুমিল্লা অঞ্চলের লোক, শ্যামলবাবুর প্রশ্ন বুঝতে তাঁর অসুবিধে হয়নি, তিনি ত্রিপুরা টানের বাঙাল ভাষায় বলেছিলেন, 'আজ দিতে পারলাম না সামনের সপ্তাহে একবার খোঁজ নেবেন।'

শ্যামল বলছিলেন, 'এ বছর একটু দেবি হয়ে গেলো। না হলে এবারই লাহোরে দুর্গাপুজো করা যেতো। তবে ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দিরে কালীপুজোর জন্য এখনই চাঁদা তোলা আরম্ভ করা উচিত।'

রবীন্দ্র বিশ্বাস প্রতিবাদ করলেন, 'ঢাকেশ্বরী মন্দির কি আছে? আজকের কাগজেই আছে ঢাকায় ঢাকেশ্বরী মন্দির পাকিস্তানী সৈন্যেরা ভেঙে সমান করে দিয়েছে।'

এ সব আলোচনা সহজে শেষ হওয়ার নয়। এ রকম অনাহুতভাবে আড্ডার পাশে দাঁড়িয়ে থাকাও সমীচীন নয়।

শংকরবাবু অন্যমনস্কভাবে নিকট জনের মতো ইপিনের হাত ধরে শ্যামলবাবুব কথা মন দিয়ে শুনছিলেন। কিন্তু এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে ইপিনের অস্বস্তি হচ্ছিলো। শংকরবাবুও বোধ হয় সেটা টের পেয়েছিলেন, ইপিনের মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'ঠিক আছে কালীপুজোর দিন রাতে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে দেখা হবে। এসো কিন্তু, শ্যামল ভূতের নাচ দেখাবে।'

সুতৃপ্তি রেঁস্তোরায় পাশের টেবিলে বসে আগেব অভিজ্ঞতা থেকে ইপিন জানে এর পর ঝগড়া, কথা কাটাকাটি হবে, তারপর আজকের মত আড্ডা ভাঙবে।

তার আগেই ইপিন দেশপ্রিয় পার্কের মোড়ের দিকে এগিয়ে গেলো। রেঁস্তোরাব দরজা ভেজানো, তবে ভেতরে দোকান খোলা। লোকজন বিশেষ নেই, অধিকাংশ টেবিলই খালি। কোণার দিকে একটা চেয়ারে বসতেই বিজয় এক পেয়ালা চা এগিয়ে দিলো। বিজয় এ দোকানে বহুদিন আছে। তাকে কোনো অর্ডার দিতে হয় না। কে কখন কি চায় সে ভালোভাবে জানে।

কথা বলার বিশেষ কেউ নেই। একটু পরে চা খেয়ে ইপিন রাস্তায় বেরিয়ে এলো। রাত দশটা বাজতে চলল, এবার বাসায় যেতে হবে। পিসি ভাত নিয়ে জেগে বসে আছে।

ফেরার পথে আর ফুটপাথ ধরে এগোলো না, আবার শংকরবাবুদের সঙ্গে যোগ হয়ে যেতে পারে। দেশপ্রিয় পার্কের মধ্য দিয়ে কোনাকুনি ভাবে একটা শর্টকার্ট আছে, সেই পথে আধাআধি এগিয়ে গিয়ে ইপিনের খেয়াল হলো, কাজটা ভালো করেনি।

মাঠের মধ্যে একটু একটু ফাঁক দিয়ে জোড়ায় জোড়ায় স্ত্রী-পুরুষ। অনেকেই প্রেমিক-প্রেমিকা বা স্বামী-স্ত্রী, বাসায় নির্জনে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ নেই। এ ছাড়াও পথিকললনা বা রাস্তার মেয়ে ও তাদের খদ্দেররাও নিশ্চয়ই আছে। পাশাপাশি অন্তরঙ্গ হয়ে বসে, এমনকি জড়াজড়ি করে শুয়েও আছে কেউ কেউ। ব্ল্যাক আউটের অন্ধকারের সদ্ব্যবহার করছে। হালকা মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে পঞ্চমীর চাঁদ মাঝে মাঝে রসভঙ্গ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এরা নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত যে অন্য কিছুই খেয়াল করছে না।

ইপিন কোনো দিকে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে মাঠটা পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলো।

হঠাৎ আলিঙ্গন বিচ্ছিন্ন করে একটি রমনী তার শাড়ি-জামা ঠিক করতে করতে ইপিনের দিকে এগিয়ে এলো।

ইপিন থমকে দাঁড়াল। কাজল ? কতদিন পরে দেখা।

কাজল সামনে এসে দাঁড়িয়ে ইপিনকে জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি এই পথে ?'

কাজলের কথার ইঙ্গিত বুঝতে পারলো, খুব গম্ভীর হয়ে বললো, 'বাড়ি ফিরছি।'

কাজল মুচকি হেসে বললো, 'আজকাল বুঝি এই সব পথেই বাড়ি ফিরছো ? বৌ বাসায় নেই ?'

ইপিন আবার হাঁটা শুরু করা দিয়ে বললো, 'না বাসায় নেই। হাসপাতালে।'

কাজল সঙ্গ ছাড়েনি, পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বললো, 'অসুখ-বিসুখ নয় নিশ্চয়।'

ইপিন বললো, 'না।' শুকনো, ছোট জবাব।

কাজল প্রশ্ন করলো, 'বাচ্চা হতে গেছে ?'

ইপিন বললো, 'হ্যাঁ।'

কাজল খিলখিল করে হেসে উঠলো, 'তাই বলো। পুরুষ মানুষগুলো এই সব সময়ে খুব গোলমেলে হয়।' তারপর একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলো, 'বাচ্চা হয়েছে ?'

ইপিন জানালো, 'হ্যাঁ।'

মাঠ পার হয়ে দুজনে গেটের পাশে চলে এসেছে, গেট পেরোবার মুখে হাত ব্যাগ থেকে একটা চিরুনি বার করে মাথার চুলগুলো ঠিক করতে করতে কাজল জানতে চাইলো, 'ছেলে না মেয়ে ?'

ইপিন বললো, 'যমজ ছেলে।'

আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো কাজল। তারপর হাসি থামিয়ে বললে, 'জয় জওয়ান।' যুদ্ধের বাজারের নতুন শ্লোগান এটা। এই মোটা রসিকতাটা ইপিনের পছন্দ হলো না। সে এবার দাঁড়িয়ে পড়লো, জিজ্ঞাসা করলো, 'আর কিছু বলবে ? আর কিছু জানার আছে।'

কাজলের আর জানার কি থাকবে ? সে আবার ইয়ার্কি করলো, 'যমজ ছেলে হওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়। তুমি নিশ্চয় কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা মানত করেছিলে।'

অবশেষে এবার ইপিনকে হাসতে হলো, তারপর কাজলকে লজ্জা দেওয়ার জন্যেই হয়তো বললো, 'তুমি এবার তোমার কাজে যাও। মাঠের মধ্যে ওই ভদ্রলোককে রেখে চলে এলে। সে নিশ্চয় খুব ছটফট করছে।'

রাস্তার ওপর অনেকটা থুতু ফেলে কাজল বললো, 'ভদ্রলোক না ছাই। দশ টাকার খদ্দের।'

কাজল মুখে এ কথা বললো বটে, কিন্তু মাঠের দিকে ফিরে যেতে যেতে ইপিনকে বললো, 'কাল সকালে বাসায় যাবো, থাকবে তো ?'

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে চোখ না খোলার আগেই কাজলের কথা মনে পড়লো ইপিনের।

বেলা করেই ঘুম ভেঙেছিল তার। আগের দিন রাতে ঘুম আসতে আসতে খুব দেরি হয়ে গিয়েছিল। ক্লান্ত শরীরে বিছানায় শুয়ে তারপর ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছে কিন্তু এলোমেলো চিন্তায় ঘুমের জট ছিঁড়ে গেছে।

কি একটা দিন গেছে কাল আমরণ মনে থাকবে। ঝড়-বাদল, দুর্যোগ, যুদ্ধ, ব্ল্যাক আউট এরই মধ্যে দুপুরবেলায় ইপিন বাবা হয়েছে, এক সঙ্গে দুই ছেলের বাবা। মেনকাকে অজ্ঞান করে অপারেশন করা হয়েছে। বিকেলে যখন ইপিন সেবাসদনে দেখতে গিয়েছিল তখনও ভাল করে জ্ঞান ফেরেনি। সঙ্গে নীরবালাও ছিলেন। মেনকার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে নীরবালা ফেরার আগে নাতিদের দেখতে চেয়েছিলেন।

আজকেই ছেলেদের মুখ দর্শন করার ইচ্ছে ইপিনের খুব একটা ছিল না। তার পিতৃস্নেহ তখনো জাগ্রত হয়নি। তাছাড়া সদ্যোজাত সমস্ত শিশুই প্রায় একরকম দেখতে, তাদের চেহারায় কিংবা মুখশ্রীতে আলাদা কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে না।

তবে বাচ্চাদের ঘরে গিয়ে ইপিনের একটা নতুন অভিজ্ঞতা হল। সারিবন্দি দোলনার মত ছোট ছোট খাট। প্রায় সবগুলিই ভর্তি। তাতে নিস্তেজ, নিমীলিত নয়ন, অসহায় আগামী যুগের মানুষেরা নিঃসার, নিস্তব্ধ শুয়ে আছে। কচিৎ-কদাচিৎ দুয়েকজন ট্যাঁ-ফোঁ করছে।

নম্বর মিলিয়ে নিজের বাচ্চাদের খুঁজে বার করল ইপিন। প্রতিটি প্রসূতির হাতে হাওড়া স্টেশনের কুলির মত পেতলের নম্বর দেওয়া একটা তাগা বেঁধে দেওয়া আছে। সেই রকমই আরেকটা ছোট তাগা শিশুর কোমরে ঘুনসির মত করে বাঁধা। ইপিনের যমজ ছেলে বলে একজন পেতলের তাগা পেয়েছে, অন্যজনের কোমরের ঘুনসিতে পিচবোর্ডের টুকরো করে নম্বর ঝোলানো।

দুজনেই চোখ বুজে নিঃসাড় শুয়েছিল। এই জগতে তাদের বয়েস তখনো ছয় ঘণ্টাও হয়নি। যার হাতে পিতলের তাগা বাঁধা তার গালে নীরবালা ছোট একটা ঠোনা দিয়ে বললেন, 'এটাই বোধহয় বড়।'

গালে ঠোনা খেয়ে ইপিনের বড় ছেলে একটুখানি চোখ খুলল। পাশেই পশ্চিমের জানালার কাঁচের মধ্য দিয়ে বাদল দিনের পড়ন্ত বিকেলের হালকা রোদ হঠাৎ মেঘ সরে গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো রোদ চোখে পড়তে বাচ্চাটি আবার চোখ কুঁচকিয়ে বন্ধ করল। জানালায় একটা লম্বা পর্দা রয়েছে। নীরবালা বলায় ইপিন গিয়ে সেই পর্দাটি টেনে দিল।

আশ্বিনের বিকেলের পর্দা টানা ঘর, বেশ একটু অন্ধকার। বিশাল ঘর এটা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়ির দোতলায় এটা বোধহয় তাঁর হলঘর ছিল।

হলঘর থেকে বেরিয়ে মেনকাকে আরেকবার দেখে নীরবালাকে বাড়ি পৌঁছে দিল ইপিন। তারপর বেরিয়েছিলো কিভাবে টাঙ্গাইলে খবরটা পাঠানো যায় তার খোঁজ করতে। এরপরেও বাড়ি এসে জলখাবার খেয়ে আবার বেরিয়েছিল। কিছুটা পিসিকে এড়ানোর জন্যে, কিছুটা নিজের ছটফটানির জন্যে।

সেই ছটফটানির জন্যেই কাল রাতে মোটেই ঘুম হয়নি ইপিনের। ঘুম বারবার ভেঙে গেছে। হাজারো চিন্তা এসে ঘুম তাড়িয়ে দিয়েছে।

আজ বেশি বেলায় ঘুম ভেঙে জেগে প্রথমেই ঢাকের বাজনা কানে গেল ইপিনের। তখন খেয়াল হল আজ ষষ্ঠী, বোধন হচ্ছে।

এরপরেই কাজলের কথা মনে পড়ল। কাল রাতে কাজল বলেছিল আজ সকালে আসবে। কি জানি এসে ঘুমন্ত দেখে ফিরে গেল কি না।

নীরবালা ঘরের সামনের ছোট বারান্দায় বসে মালা জপ করছিলেন, ইপিন সেদিকে তাকিয়ে

জিজ্ঞাসা করল, 'সকালবেলা আমার কাছে কি কেউ এসেছিল।'

নীরবালা হাত নেড়ে ইঙ্গিত জানালেন, 'না, কেউ আসেনি।'

এবার ইপিন তার মাথার বালিশের নিচে হাত গলিয়ে রিস্ট ওয়াচটা বার করে সময় দেখল, প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে।

*   *   *

বেলা হয়ে গেছে, কিন্তু আজ অফিস যাওয়া নেই। কাল থেকে অফিস চারদিন বন্ধ, বিজয়া পর্যন্ত। তবে আজ খোলা ছিল। ইপিন মেনকার ব্যাপারে পুরো সপ্তাহটাই ছুটি নিয়ে রেখেছিল।

অফিস যেতে হবে না এই কথা ভাবার সময় ইপিনের মেনকার কথা, তার সদ্যোজাত সন্তানদের কথা, টাঙ্গাইল বাড়িতে খবর পাঠাতে না পারার কথা, গতকালের সব সমস্যাগুলো মাথার মধ্যে হানা দিল।

ঘুমের ফাঁকে এগুলো সব মনের আড়ালে আবডালে চলে গিয়েছিল। সেখানে কাজল এসে জায়গা করে নিয়েছিল।

এখন একরাশ চিন্তা মাথায় নিয়ে ঘুম থেকে উঠে বিছানা ছেড়ে হাত মুখ ধোয়া, প্রাতঃকৃত্য শেষ করল ইপিন। নীরবালা মালা জপ করা বন্ধ করে উঠে চা করে দিলেন।

দশটা নাগাদ চা খাওয়া শেষ করে ইপিন বেরোতে যাচ্ছিল, হাসপাতালে একবার খোঁজ নিতে হবে মেনকা আর বাচ্চারা কেমন আছে।

বেরোবার মুখে মনে পড়ল, কাজল বলেছিল আসবে। কথাটা মনে পড়ায় ইপিন আটকিয়ে গেল। তার কাজলের কথার ওপরে খুব ভরসা বা আস্থা নেই, সে যে আসবেই এমন কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবু ইপিন এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর সেবাসদনে খোঁজ নিতে গেল।

সকালবেলা ভিতরে ঢুকতে দিল না। তবে জানা গেল তিনজনেই ভাল আছে। যদি সব ঠিক থাকে সপ্তাহ খানেকের মাথায় মেনকার অপারেশনের সেলাই খুলে দিলে তাদের বাসায় নিয়ে যাওয়া যাবে।

যমজ বাচ্চা হলেও এদিকটা মোটামুটি ঠিকই আছে। আসল সমস্যা দাঁড়িয়েছে জন্ম সংবাদটা টাঙ্গাইলে পাঠানো নিয়ে। সে সমস্যার কোনও সমাধান ইপিনের পক্ষে বার করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

দুপুরে বাড়ি ফিরে টানা চারঘন্টা মড়ার মত ঘুমোল ইপিন। তার আগে মধ্যাহ্ন ভোজনও খুব ভাল হয়েছিল।

আজ সকালে ঘুম থেকে দেরি করে ওঠায় ইপিন বাজার করতে পারেনি। নীরবালা কাজের মেয়েকেও বাজার করতে পাঠাননি।

যুদ্ধের জন্যে প্রভাস ইপিনকে কিছু টাকা-পয়সা সাহায্য পাঠাতে পারবে না। এদিকে ইপিনের দুই বাচ্চা হয়েছে। নীরবালা কাল বিকেল থেকেই ইপিনের একটু সাশ্রয় করার দিকে মন দিয়েছেন। পুরোটাই অবশ্য প্রায় তার নিজের ওপর দিয়ে। সকালে চায়ের সঙ্গে বিস্কুট খাননি। দুপুরে নিজের জন্যে আতপ চাল একমুঠো কম নিয়েছেন। ভাইপোর সংসারে যত কম খরচ হয় ততই ভাল।

বাজারে নতুন মূলো উঠেছে। দু'দিন আগে ইপিন বাজার থেকে এক আঁটি মূলো এনেছিল। সেটা তরকারির ঝুড়িতে ছিল। মটরের ডালে সেই মুলো ফেলে একটা তরকারি। সরষের তেল

আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মাখা এক টুকরো মিষ্টি কুমড়ো, সেই সঙ্গে ইপিনের জন্যে স্পেশাল একটা ডিমসেদ্ধ। শেষ পাতে শুকনো তেঁতুল, একটু লেবু, নুন, গুড়, লালমরিচের গুঁড়ো দিয়ে মাখা।

গত কালকের কঠিন দৌড়াদৌড়ির পর আজ অনেকটা ভাত নিয়ে চেটেপুটে পেট পুরে পিসির রান্না খেল ইপিন। ছোটবেলা থেকেই ইপিন-বিপিন দু'ভাই পিসির রান্নার ভক্ত। ইস্কুল থেকে এসে দুটো কাঠের পিঁড়ির ওপরে পিসির হবিষ্যিঘরের বারান্দায় দু'ভাই বসে পড়ত। অতটা অবেলা পর্যন্ত বিধবা নীরবালা না খেয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করে থাকতেন।

ইপিনের যখন ঘুম ভাঙলো তখন সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এসেছে। বাইরে বেশ অন্ধকার। এরই মধ্যে রাস্তা দিয়ে লোক আনাগোনা, পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ষষ্ঠীর সন্ধ্যা, লোকজন ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছে। বামা কণ্ঠ, শিশু কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। ব্ল্যাক আউটের অন্ধকার মানুষের স্বাভাবিক আনন্দকে মোটেই চাপা দিতে পারেনি।

আশ্বিন মাসের সন্ধ্যা। দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়ে দেশপ্রিয় পার্কের দিক থেকে শিব শির করে একটা বাতাস আসছে। ডায়মণ্ডহারবার, গঙ্গাসাগরের দিকে কিংবা বঙ্গোপসাগরেই কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টিজলের গন্ধমাখানো বাতাসটায় একটু শীত শীত করছে। আলনা থেকে পিসির পুজো করার মুগার থানটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে আপাতত সমস্যাগুলো মাথার বাঁয়ে-ডাইনে রেখে জেগে থেকেও ঘুম-ঘুম আধখোলা চোখে বালিশে মাথার নিচে হাত দিয়ে শুয়েছিল ইপিন।

সন্ধ্যা হতে পিসি এক সেকেণ্ডের জন্যে ঘরের বাল্বটা জ্বালিয়ে ঠাকুর দেবতাদের আলো দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সুইচ অফ করে দিয়েছেন। পিতৃসাহায্যহীন, এক সঙ্গে দুই সন্তানের বাবা স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রের খরচ লাঘব করতেই হবে।

অন্ধকারে ঝিম মেরে শুয়েছিল ইপিন। হঠাৎ দেখতে পেল ফুটপাথের দিকে ঘরের সামনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে আলতো করে ভেজানো বাইরের দরজাটা হাত দিয়ে একটু ঠেলে ঘরের মধ্যে উঁকি দিল।

তাড়াতাড়ি সতর্ক হয়ে উঠল ইপিন। দুপুরে খালি গায়ে, ভরা পেটে একটা লুঙ্গি ঢিল করে কোমরে বেঁধে শুয়েছিল সে। এখন কোমরের ধারে কাছে লুঙ্গিটা খুঁজে পাচ্ছে না। এমনও হতে পারে, অনেক সময়েই হয় গোড়ালি গলে পায়ের নিচে বিছানায় বা খাটের নিচে ঘরের মেঝেতে পড়ে গেছে।

ইপিন ধরে নিয়েছিল, অনুপ্রবেশকারিণী অবশ্যই কাজল। তাই সে হুকুমের স্বরে বলল, 'এ ঘরে আলো জ্বেলো না। ভিতরের বারান্দায় পিসির কাছে গিয়ে বসো। আমি দশ মিনিট পরে আসছি।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে মেয়েটি ঢুকতেই ইপিন বুঝতে পারল কাজল নয়।

অন্ধকার ঘরের মধ্য দিয়ে বেলফুলের বহমান গন্ধ বারান্দায় পিসির দিকে চলে গেল। বারান্দার দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ক্ষীণ আলোর মধ্যে নারীমূর্তি ঘোষণা করল, 'দাদা, আমি উমা।'

উমা আজ সন্ধ্যায় এ বাড়িতে প্রথম এল। ঘরদোর, চেনা নয়। কিন্তু ইপিনের নির্দেশ মান্য করে আবছায়া ঘরের মধ্যে দিয়ে সাবধানে হেঁটে উমা ভিতরের বারান্দায় চলে এল।

সেখানে নীরবালা বসে জপ করছিলেন। উমাকে তিনি আগে দেখেননি। তবু ভিতরে চলে আসতে দেখে জপ বন্ধ না করে হাতের রুদ্রাক্ষের মালা ঘোরাতে ঘোরাতে উমাকে হাতের ইঙ্গিতে বসতে বললেন।

নীরবালা একটা বড় পশমের আসনে বসে জপ করছিলেন। এটা বহুকালের জিনিষ, কাননবালার শাশুড়ি সেই কোন কালে করাচী থেকে কিনে এনেছিলেন। নীরবালার শাশুড়ির এক ভাই করাচীতে নেভি অফিসে কাজ করতেন সেই তিরিশের যুগে।

এই আসনটা নীরবালা শাশুড়ির কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। তিনি এটা কখনও কাছছাড়া করেন না। যেখানে যান সঙ্গে করে নিয়ে যান। জিনিষটা খুবই সুন্দর, এতকাল ব্যবহারেও একটু ম্লান হয়নি। একটা জোরে ঝাঁকি দিলেই ধুলো ময়লা আলগা হয়ে বেরিয়ে যায়। রৌদ্রে দিলে পুরনো ফুলো ফুলো ভাবটা ফিরে আসে।

পশমের আসনটা নিশ্চয়ই হাতে বোনা। যে বুনেছিল সে নিশ্চয়ই শিল্পী। একটা ঘন নীল রঙের ময়ূরের মাথায়, গলায়, বুকে, পেখমে মনের খুশিমত রঙের অনির্বচনীয় খেলা, সাদা জমির ওপরে।

নীরবালার সামনে একটা বেতের মোড়া ছিল, সেটা টেনে নিয়ে বসে উমা আসনটাকে দেখছিল। নীরবালা আসনটায় বসেছিলেন, বিশাল আসনটায় অল্প অংশই তাঁর ক্ষীণ, পাতলা, বৈধব্য লাঞ্ছিত দেহে ঢাকা পড়েছিল।

উমা মন দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পশমের আসনটা দেখছিল। একটু পরে নীরবালার জপ শেষ হল। হাতের মালা ঘোরানো বন্ধ হতে দেখে উমা বলল, 'আমি উমা।'

উমা কে নীরবালা সেটা জানেন, তাঁর ভিতরে একটা সংস্কারহীন, আধুনিক মন কাজ করে, বিশ্ব-সংসার কি ভাবে চলছে, কি ভাবে বদলাচ্ছে তিনি কিছুটা বোঝেন, কিছুটা মেনে নেন।

উমাকে নীরবালা হাত দিয়ে ইসারা করে ডেকে আসনের ওপরে একটু সরে বসে তাকে পাশে এসে বসতে বললেন।

উমা মোড়া থেকে উঠে গিয়ে নীরবালার পাশে বসল। কি নরম আসনটা। নীরবালার কোল ঘেঁষে বসতে নীরবালা ধীরে ধীরে উমার মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন।

ততক্ষণে ইপিন বিছানা থেকে উঠে বাথরুম হয়ে একটা পাজামা আর ফর্সা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বারান্দায় চলে এসেছে।

বারান্দায় এসে ইপিন দেখল পিসি উমার মাথায় হাত বোলাচ্ছে। এই হাত বোলানোর আরাম আশৈশব ইপিন-বিপিন জানে, পিসির হাতের আদর খুব মিষ্টি।

উমার সঙ্গে নীরবালার প্রায় কোনও কথাবার্তাই হল না। ইপিন ফিরে গিয়ে সামনের ঘরে আলো জ্বেলে দিয়েছে। উমা একটু পরে আসন ছেড়ে উঠে সেই ঘরে এল। উমার চিবুকে আলতো করে একটু চুমু খেয়ে নীরবালা উমার জন্যে লুচি ভাজতে গেলেন।

লুচি খাওয়ার সুযোগ ইপিন খুব একটা পায় না। তবে পুজোর সময় বলেই পিসির কথামত সে অল্প ঘি, ময়দা, সুজি কিনে রেখেছিল।

উমার সঙ্গে ইপিনের ইতস্তত কথা হল। মেয়েটি শুধু সুশ্রী নয়, নম্র ও বুদ্ধিমতী। বিপিনের পছন্দ আছে। উমার কাছে জানা গেল তার এক মামা ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন। সে তাঁর বাসাতেই থাকে। ফ্যাক্টরির কোয়ার্টারে, সেখান থেকে ট্রেনে ব্যাণ্ডেল হয়ে শ্রীরামপুরে ব্যাঙ্কে যাতায়াত।

এ কথা শুনে ইপিন বলল, 'এত ঝামেলা না করে তুমি সরাসরি লঞ্চে গঙ্গা পার হয়ে ওপার থেকে বাসে বা ট্রেনে যেতে পার।'

উমা বলল, 'প্রথম প্রথম সে চেষ্টা করে দেখেছি, কিন্তু কেমন ভয়-ভয় করে।'

ইপিন হেসে বলল, 'তুমি দক্ষিণী মেয়ে, নদী-সমুদ্রের দেশের লোক। তোমারতো জলকে

ভয় পাওয়ার কথা নয়।'

উমা বলল, 'আমি তো কলকাতায় বড় হয়েছি।'

ইতিমধ্যে ভিতরের বারান্দায় খুটখাট শব্দ শুনে ইপিন গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে পিসি স্টোভ ধরাচ্ছে। ইপিনের পিছে পিছে উমাও উঠে এসে দরজার চৌকাঠ থেকে এই দৃশ্য দেখে এগিয়ে গিয়ে পিসির পাশে বসে নিজেই স্টোভটা ধরাতে গেল। নীরবালা আপত্তি করলেন না। তাঁর ময়দামাখা হয়ে গেছে, এবার হাত ধুয়ে লুচি বেলতে বসলেন। স্টোভ ধরিয়ে সামনের ছোট লোহার কড়াইটা তার ওপরে বসিয়ে উমা কোনও নির্দেশ ছাড়াই ঘিয়ের শিশি থেকে ঘি ঢেলে দিল।

উমার এই নিঃশব্দ তৎপরতা দেখে নীরবালা খুব খুশি হলেন। চাকতি বেলুন দিয়ে একটা একটা করে লুচি বেলে উমার হাতে দিতে লাগলেন, উমা সেগুলো কড়াইতে ফেলে ভাজতে লাগল।

গোটা বারো-চৌদ্দ লুচি ভাজা হয়েছিল। তারপর বেগুন ভাজা হল। উমা সেগুলো নিয়ে তিনটে প্লেটে ভাগ করে নিজে একটা প্লেট নিয়ে বাকি দুটো নীরবালা আর ইপিনের দিকে এগিয়ে দিল।

নীরবালা উমার এগিয়ে দেওয়া প্লেটা ফেরত না দিয়ে সেই প্লেটের লুচি-বেগুনভাজা ওদের দুজনের পাতে তুলে দিলেন, মুখে বললেন, 'সন্ধ্যার পরে আমি কোনও. ভাজা জিনিষ খাই না।'

ইপিনের মনে পড়ল অনেকদিন আগে একবার টাঙ্গাইল বাড়িতে দুটো পানতুয়া দিয়ে এক গেলাস জল খেয়ে রাতে শুয়েছিলেন। তখন কিছু বলেনি, পরদিন সকালে বিপিন বলেছিল, 'তুমি তো রাতে ভাজা কিছু খাও না। কিন্তু কাল রাতে যে পান্তুয়া খেলে, ওটা তো ভাজা।'

বিপিন ঠিকই বলেছে এবং নীরবালার এটা খেয়াল ছিল না। নীরবালার এটা ক্ষতি করেছিল বিপিন, না বুঝে। এরপর থেকে নীরবালা আর কখনও দোকানের কোনও মিষ্টিই সূর্যাস্তের পরে খাননি।

একটু পরে উমাকে সঙ্গে করে ইপিন রাস্তায় বেরোল। দেরি হয়ে গেছে, সেবাসদনে গিয়ে মেনকার খোঁজ নিতে হবে।

হাঁটতে হাঁটতে উমার সঙ্গে সেবাসদন পর্যন্ত এল ইপিন। কিন্তু তখন সেবাসদনের গেট বন্ধ হয়ে গেছে। উমাকে নিয়ে 'বিজলী' সিনেমার স্টপ থেকে তিন নম্বর বাসে তুলে দিয়ে এল ইপিন। উমা শেয়ালদায় নেমে ট্রেনে করে চলে যাবে।

উমার সঙ্গে আজ কথাবার্তা বলে খুব ভাল লেগেছে ইপিনের। বিপিনের ব্যাপার নিয়ে সে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না, চিন্তাও করছে না। যাওয়ার সময়ে বলে গেল, কাল নিজেই একা এসে বিকালে বৌদি মানে মেনকার সঙ্গে দেখা করে যাবে। যমজ বাচ্চা দুটোকে দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। উমা যখন ইস্কুলে পড়ত, তাদের এক ক্লাস নিচে ইনি আর বিনি নামে দুটো যমজ পাঞ্জাবি মেয়ে ছিল। নয়-দশ বছর পর্যন্ত তারা হুবহু একরকম দেখতে ছিল। কে যে ইনি আর কে যে বিনি তারা নিজেরাই বোধহয় বুঝতে পারত না। পরে একটু বড় হয়ে ইনি কিংবা বিনি, একজন একটু বেশি লম্বা হয়ে যায় আর একজন স্কুলের বাৎসরিক স্পোর্টসে কলসীদৌড়ে কলসীসমেত মুখ থুবরিয়ে পড়ে গিয়ে কপালটা কেটে ফেলে। সেই থেকে পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়।

উমাকে তুলে দিয়ে সেবাসদনের পাশ দিয়ে ফিরে যাওয়ার পথে ফুটপাথে ডাঃ বিশ্বনাথ দাসের সঙ্গে দেখা। তিনি কাছেই হাজরার গলির মধ্যে থাকেন। সেবাসদনে রাউণ্ড দিতে যাচ্ছিলেন।

ইপিনকে দেখে ডাঃ দাস জিজ্ঞাসা কবলেন, 'এই যে, শুভসন্ধ্যা। আপনার স্ত্রী-পুত্ররা কেমন আছেন?'

ইপিন বলতে বাধ্য হল যে দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে সেবাসদনে ঢুকতে পারেনি।

ডাক্তাব দাস মৃদু হেসে বললেন, 'এটা তো আপনি আমাকে ভাল সার্টিফিকেট দিলেন। তাহলে সেবাসদনে নিয়মশৃঙ্খলা আছে মনে হচ্ছে।' তারপব ইপিনকে বললেন, 'আমার সঙ্গে চলুন।'

দেশবন্ধুর জীবৎকালে গান্ধীজী কলকাতায় এলে যে সিঁড়ি দিযে ওঠা-নামা করতেন, সেই সিঁড়ি দিযে ডাক্তাব দাসেব সঙ্গে দোতলায উঠে হলঘবেব মধ্যে মেনকার বেডের কাছে এল ইপিন।

মেনকা এখনও বেশ কাহিল। তবে বেশ সাব্যস্ত দেখাচ্ছে। তার খাটের দুপাশে দুটো বাচ্চাকে ববি কটে এনে জুড়ে দেওযা হযেছে।

ডাক্তার দাস মেনকাকে বললেন, 'কোনও কষ্ট নেই তো?'

মেনকা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, 'না।'

ডাক্তার দাস একটা কাঠেব টুল দেখিযে ইপিনকে বললেন, 'আপনি বসে মিসেসের সঙ্গে কথা বলুন। আমি ঘুরে আসছি।'

দুপুরে প্রচণ্ড ঘুমিয়েছিল ইপিন। রাতে ঘুম আসা কঠিন হয়ে গেল। সেবাসদনে মেনকাব সঙ্গে বিশেষ কথা হযনি। মেনকা এখনও বেশ কাহিল, দুর্বল। তবে জোড়া বাচ্চা হওয়ায় তাকে খুব চিন্তিত বা দুঃখিত মনে হয়নি।

'কাল সকালে আবার আসব' বলে ইপিন মেনকাব কাছে বিদায় নিয়ে সেবাসদন থেকে বেরিয়ে এল। পাশের বারান্দায ডাক্তাব দাস দু'জন নার্সেব সঙ্গে আলোচনা করছিলেন কি সব, তাঁকে আর বিরক্ত করল না ইপিন। সিঁড়ি দিয়ে নামাব সময় শুধু হাত তুলে 'যাচ্ছি' বলে নিচে চলে এল।

ফেরার পথে একবার দেশপ্রিয় পার্ক ঘুরে এল ইপিন। সুতৃপ্তিতে বসে এক কাপ চা খেল। বিশেষ কারও সঙ্গে দেখা হল না। পুজোব এই সময়টায় প্রত্যেক বছরই সকলেরই একটু ছাড়া-ছাড়া ভাব হয। তবে রাস্তায় বেশ ভিড আছে। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় লোকজন যুদ্ধ, ব্ল্যাকআউট উপেক্ষা কবে বেবিয়ে পড়েছে। দেশপ্রিয় পার্ক হকার্স কবনারে বেশ ভিড়, ব্ল্যাকআউট বাঁচিয়ে কেনা-বেচা চলছে।

হকার্স কবনাবে একটু ঘুরে কালকের মত কোনাকুনি বরাবর পার্কের মধ্য দিয়ে ইপিন বাড়ির দিকে এগুলো।

ইপিনেব আশা ছিল পার্কেব মধ্যে কাজলের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। যেমন কাল

হয়েছিল। কিন্তু আজ পার্কের ভিতরটা ভীষণ নির্জন। কালকের সেই উপচিয়ে পড়া ভিড় আজ নেই, এখানে ওখানে দু-চারজনকে বসে থাকতে বা হাঁটতে দেখা যাচ্ছে কিন্তু চারদিকটা কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা, শুনশান।

কাজল আজ সকালে আসবে বলেছিল, কিন্তু আসেনি। বলতে গেলে মেনকা বা সদ্যোজাত সন্তান নয়, টাঙ্গাইলে আটকিয়ে যাওয়া বিপিন নয়, মা-বাবা নয়, এখন বাড়ি ফেরার পথে কাজলের কথাই মনে পড়ছে।

বাড়ি ফিরে খেয়ে দেয়ে তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়লো ইপিন। কিন্তু তার খেয়াল ছিল না। আজ দুপুরে প্রচণ্ড ঘুমিয়েছে, রাতে সহজে ঘুম আসবে না।

বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে যখন ইপিন বুঝতে পারল সহজে ঘুম আসবে না, সে বিছানা থেকে উঠে পড়ল।

সারাদিনের শেষে সেই আসল সমস্যাটা এখন তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে, মা-বাবাকে খবরটা কি করে পাঠানো যায়।

ঘুমের মুহূর্তে কোন সমস্যা খোঁচাতে থাকলে এবং সেই সমস্যার সমাধান না থাকলে ঘুম হওয়া কঠিন। তন্দ্রা বারে বারে ভেঙ্গে যায়। ইপিনেরও তাই হল। দুবার বিছানা থেকে উঠে বাথরুম থেকে ঘুরে এল। একবার বাইরের দরজা খুলে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াল। একটু দূরে পুজোর মণ্ডপে কয়েকজন উদ্যোক্তা ফোলডিং চেয়ারে বসে তাস খেলে রাত জাগছে। রাস্তা দিয়ে দুয়েক জন লোক, পুজোর সময় বলেই বোধহয়, গভীর রাতেও যাতায়াত করছে। কিছুক্ষণ ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থেকে ইপিন আবার শুতে গেল। কিন্তু ঘুম প্রায় আসে না।

প্রায় শেষ রাতে ঠিক ঘুম নয়, একটা ঘুম-ঘুম ভাব এল ইপিনের, ঘুম না আসার ক্লান্তিতে। কিন্তু সে বেশিক্ষণ নয়। মনোহরপুকুরের মোড়ের পুজো মণ্ডপে ঢাকের বাজানায় ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইপিনের ঘুম-ঘুম ভাবটা কেটে গেল।

আজ সপ্তমী। আকাশের কাল ভাব কেটে গিয়ে হালকা তুলোর মত সাদা মেঘ উড়ে যাচ্ছে, জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি বহন করে। সকাল না হতেই অপার্থিব সোনার রোদের মায়াজাল ছড়িয়ে পড়ল গরিব শহরের ভাঙা রাস্তাঘাটে, বাড়ি ঘরে উঠোনে।

আকাশে-বাতাসে, চারপাশে কেমন একটা পুজো পুজো ভাব। বেশিক্ষণ বিছানায় শুয়ে না থেকে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল ইপিন।

আজ অনেক কাজ।

এ কয়দিন দৌড়াদৌড়ি ছুটোছুটিতে বাজার-টাজার কিছু করা হয়নি। মাসকাবারি বাজার করা ছিল তারই দৌলতে আর টুকিটাকি করে নীরবালা গত তিনদিন চালিয়েছেন, ভাইপোর খরচা সাশ্রয় করার জন্যে তিনি ভাঁড়ারে যে কিছুই নেই সে কথা একবারও মুখ ফুটে বলেননি।

আজ প্রথম কাজ হল বাজার করা। তারপর বাজার করে এসে মেনকার বাপের বাড়িতে একবার খবর দিতে হবে। অনেকটা দূর যেতে হবে সেই বরানগরে।

মেনকার মা নেই। গঙ্গার ধার ঘেঁষে পুরনো, দোতলা, প্রায় শূন্য বাড়িতে মেনকার বাবা থাকেন। মেনকার আর কোন বোন নেই, তবে দু'ভাই আছে।

এর মধ্যে একজন। মানে বড়জন, তিনি মেনকার চেয়ে প্রায় পনেরো বছরের বড়। ভদ্রলোক শান্তশিষ্ট, গোবেচারা ধরনের, মেনকার সঙ্গে তাঁর স্বভাবের মিল আছে।

মেনকার এই বড়দা সপরিবারে আন্দামানে থাকেন, কলকাতার এক টিম্বার কোম্পানির আন্দামানের বড়কর্তা। বছরে একবার শীতের সময় বাড়িতে আসেন, তিনি কয়েকবার চেষ্টা

করেছেন বাবাকে আন্দামানে নিয়ে যেতে। কিন্তু ইপিনের শ্বশুরমশায় রাজি হননি। তিনি পুরনো হার্টের রোগী, প্লেনে উঠতে চান না। এদিকে একবার জাহাজে আন্দামান যেতে গিয়ে সি সিকনেস হয়ে বমি, মাথা ঘোরায় নিতান্ত নাজেহাল হয়েছিলেন। তাছাড়া কলকাতার পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে যেতে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে নেই।

মেনকার এক ছোড়দাও আছেন। কিন্তু তাঁকে ইপিন কখনও দেখেনি, এমনকি বিয়ের সময়ও না। ইপিন মেনকাকে তাঁর সম্পর্কে কখনও কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। ইপিনের ধারণা তিনি কোনও অসামাজিক, গর্হিত কর্ম করে আত্মগোপন করেছেন। দুয়েক বার তাঁর সম্পর্কে খুচরো কথাবার্তা শুনে ইপিনের সন্দেহ হয়েছে ভদ্রলোকের নামে পুলিশের ওয়ারেন্ট থাকতে পারে।

সে যা হোক শ্বশুরবাড়িতে দু'জন পুরনো কাজের লোক নিয়ে শ্বশুরমশায় একাই থাকেন। সে বাড়িতে টেলিফোন নেই। পাশের বাড়িতে একটা ফোন আছে। শ্বশুরমশায়ের ধারণা তাদের ফোন করলে তাঁকে ডেকে দেবে। কিন্তু ইপিনের অভিজ্ঞতা অন্যরকম। দুয়েকবার বিশেষ প্রয়োজনে ফোন করতে গিয়ে সে বেশ অপমানিত বোধ করেছে।

বাজার সেরে এসে শ্বশুরবাড়িতে যেতে হবে। কাজের লোক লক্ষ্মীর মা দু'দিন আসেনি। বাজারে যাওয়ার পথে পাশের বস্তিতে লক্ষ্মীর মাব খোঁজ নিতে হবে, চারিদিকে জ্বরজাটি হচ্ছে। লক্ষ্মীর মা হয়তো বিছানায় পড়ে আছে।

তারপর শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে একবার সেবাসদনে যেতে হবে। যে কয়দিন মেনকা আছে দু'বেলাই যেতে হবে। এবং এই সবের মধ্যে টাঙ্গাইলে মা-বাবাকে খবর পাঠানোর ব্যাপারটা আছে।

আপাতত চা বিস্কুট খেয়ে ইপিন বাজারের ব্যাগ নিয়ে নীরবালার কাছে গিয়ে বলল, 'বাজারে যাচ্ছি। বিশেষ কিছু আনার আছে?'

নীরবালা বললেন, 'আজ তো সপ্তমী, তোদের বাড়িতে আজকের তিথিতে মাংস হয়। বেশি আনিস না। তুই তো একা খাবি।'

শুধু ঘি গরমমশলা দিয়ে পেঁয়াজ-রসুন ছাড়া নীরবালার রান্না মাংস, সে রকম সুস্বাদু খাদ্য এই পৃথিবীতে দুর্লভ। এবার পিসিকে ইপিন মাংস রান্না করার কথা বলতে ভুলে গিয়েছিল।

ইপিন বলল, 'তাহলে এক পোয়া মাংস নিয়ে আসি।'

নীরবালা মনে মনে কি একটা হিসাব করে বললেন, 'একজনার জন্যে এক পোয়া মাংস লাগবে কেন? আধপোয়া আনলেই হবে।'

সামনের দরজা খোলা ছিল। ইপিন পিসির সঙ্গে কথা বলছিল এমন সময় কাজল এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে। সেখান থেকেই সে বলল, 'একজন কেন? আমিও খাব। এক পোয়া মাংসই এনো।'

কাজলকে দেখে ইপিন একটু খুশিই হল। তাকে বলল, 'তুমি পিসির সঙ্গে একটু কথা বল। আমি চট করে বাজারটা সেরে আসি।'

'পিসি' শুনে কাজল এগিয়ে গিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করল নীরবালাকে। বাজারের থলে হাতে ইপিন বেরিয়ে গেল।

বাজার সেরে আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এল ইপিন। দেড় পোয়া মাংস এনেছে।

এর মধ্যে বস্তির ঘরে গিয়ে একবার লক্ষ্মীর মার খোঁজও নিয়েছে। বোবা মানুষ। কথা বলতে পারে না। ইপিনকে দেখে কেঁদে ফেললো। বাজার থেকে ফেরার পথে ওষুধের দোকান থেকে চারটে অ্যাসপিরিন কিনে লক্ষ্মীর মাকে দিয়ে এল।

বাসায় ফিরে এসে ইপিন দেখে নীরবালা জপে বসেছেন। বাইরের ঘরে বসে নিজে এক পেয়ালা চা খেতে খেতে কাজল খবরের কাগজ পড়ছে। কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় হেডলাইন। পশ্চিম রণাঙ্গনে জোর লড়াই চলছে।

রান্নাঘরে চৌকাঠের মুখে বাজারের থলেটা রেখে বাইরের ঘরে এসে ইপিন কাজলকে বলল, 'এক পোয়া নয়, রীতিমত দেড় পোয়া মাংস এনেছি। দুপুরে এখানে খেয়ে যেও।'

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে কাজল একটু হাসল। কাজলের মুখটা কেমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে, ইপিন কাজলকে মনে করিয়ে দিল, 'তুমি তো গতকাল আসবে বলেছিলে।'

করুণ করে হেসে কাজল বলল, 'উপায় ছিল না।'

ইপিন বলল, 'কেন?'

কাজল বলল, 'শুনবে? শুনতে চাও?' তারপর একটু থেমে নিয়ে বলল, 'পরশু তুমি চলে আসার পনেরো মিনিট পরে পুলিশ দেশপ্রিয় পার্কে হানা দিয়ে প্রায় সবাইকে ধরে নিয়ে দুটো প্রিজন ভ্যানে ভরে ফেলল। খবরের কাগজে সংবাদটা আছে।' ইপিনকে আঙুল দিয়ে সংবাদটা দেখাল কাজল।

'দেশপ্রিয় পার্কে পুলিশের
প্রাক্ পুজা অভিযান।'

সংবাদটা দেখে ইপিন প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে কাজলের দিকে তাকাতে কাজল বলল, 'ছোট করে বলি। পরশুদিন রাতে হাজত বাস। কাল দুপুরে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা। খালাস পেতে পেতে কাল সন্ধ্যা।'

সেদিন সারা সকাল কাজল ইপিনের বাসায়। নীরবালাকে রান্নাঘরের কাজে কাজল কিছুটা সাহায্য করল। নীরবালা এতে খুশিই হলেন। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রীতিতে কাজলকে নিয়ে কোনরকম মাথা ঘামালেন না। শুধু একবার বললেন, 'তোমাকে তো ইপিনের বিয়ের সময় দেখিনি।' কাজল ছোট করে উত্তর দিয়েছিল, 'না, থাকতে পারিনি।'

নীরবালা ধরে নিয়েছিলেন, কাজল ইপিনের সঙ্গে পড়ত, কিংবা হয়তো একসঙ্গে কাজ করে। কিন্তু এসব ব্যাপার নিয়ে ভাববার লোক নীরবালা নয়।

তবে কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে কথা হল। সবই প্রশ্নবোধক। 'তোমরা কোথায় থাকো?' 'মা-বাবা আছেন?' 'দেশ কোথায় ছিল?' 'ভাইবোন আছে?'

কাজল যথাসম্ভব গা বাঁচিয়ে উত্তর দিল। তবে সে যেটা ভয় করেছিল, বিয়ে-টিয়ের ব্যাপারে নীরবালা কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না।

নীরবালার কাজল মেয়েটিকে খুব ভাল লাগল। এই অল্প বয়েসে চেহারাটা কেমন ভেঙে গেছে, কিন্তু মুখে একটা লক্ষ্মীশ্রী আছে, চোখ দুটো কেমন ঢলঢল, মায়া মাখানো। ধরাছোঁয়ার বাইরে কোন একটা বিষণ্ণতা আছে। নীরবালা মনে মনে জানেন, অনেক দেখেছেন, এসব মেয়েরা খুব দুঃখী হয়।

কাজলের আচার-আচরণে অবশ্য দুঃখের তেমন কোন আভাস পাওয়া গেল না। হেসে, গল্প করে সে নীরবালার সঙ্গে রান্নাবান্নার টুকটাক কাজ করতে লাগল।

এদিকে খবরের কাগজটায় একটু চোখ বুলিয়ে, কাজলের হাতে তৈরি এককাপ চা খেয়ে ইপিন স্নান করতে গেল, এবার বেরবে।

প্রথমে সেবাসদন, তারপর শ্বশুরবাড়ি, অবশেষে যেভাবে হোক টাঙ্গাইলে খবর পাঠানোর একটা চেষ্টা করবে। মা-বাবা অস্থির হয়ে গেছে নিশ্চয়ই আর এমন একটা সুখবর তাঁদের কাছে

পৌঁছাচ্ছে না, ইপিনের এসব কথা ভাবলেই নিজেকে কেমন যেন বিপন্ন, কেমন যেন অসহায় মনে হয়।

সকালবেলা দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত চিত্তরঞ্জনের ভিজিটিং আওয়ার।

'ভিজিটিং আওয়ার' কথাটার মধ্যে 'আওয়ার' শব্দটা আছে, ইপিনের মনে আছে সে ছোটবেলায় 'হাওয়ার' বলত শব্দের প্রথমে এইচ শব্দটার জন্য।

টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী উচ্চ ইংবেজি বিদ্যালয়ের ইংরাজির অন্যতম শিক্ষক ছিলেন বিশ্বাস বেতকার ক্ষিতীশ বিশ্বাস। তাঁর ইংরেজি জ্ঞান ও উচ্চারণ ছিল চমৎকার। তিনিও ইপিনের উচ্চারণ সংশোধন করতে পারেননি। তাঁর একটা কথা ইপিনের আজো মনে আছে, 'তুমি গার্লকে গর্ল না বললে কিন্তু গাড়লই বা বলবে কেন?'

সে যা হোক ইপিন প্রথমে সেবাসদন হয়ে তারপর শ্বশুরবাড়ি যাওয়া ঠিক করল। প্রথমে শ্বশুরবাড়ি গেলে দেরি হয়ে যাবে, যদি সেবাসদন বন্ধ হয়ে যায়।

ইপিন ভেবেছিল কাজল বলবে সেও তার সঙ্গে সেবাসদনে মেনকা আর বাচ্চাদের দেখতে যাবে। কিন্তু কাজল নিজেই বলল, 'আমি আজ যাব না। দুয়েকদিনেরর মধ্যে একা গিয়ে তোমার বৌ-ছেলেদের দেখে আসব। আজ আমি পিসিমার সঙ্গে গল্প করি।'

বাজার থেকে মাংস আনার সময় কিছু তরিতরকারিও এনেছিল। শীতের আনাজ বাজারে অল্প অল্প আসছে। তবে খুব দাম, একটা মাঝারি সাইজের ফুলকপি ছয় আনার কমে দেবে না। পেঁয়াজকলি উঠেছে, এক পোয়া পরিমাণ আঁটির দাম এক আনা বা ছয় নয়া পয়সা।

ইপিন নীরবালার কথা ভেবে এক আঁটি পেঁয়াজকলি এনেছিল, একেবারেই খেয়াল করেনি যে পিসি পেঁয়াজ, রসুন কিছু খায় না। হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা, একাহারী, মাছ-মাংস, পেঁয়াজ-রসুনই শুধু নয় মসুর ডাল পর্যন্ত নিষিদ্ধ।

আজ কিন্তু পেঁয়াজকলি বেশ কাজে লেগে গেল। আলু ফালি করে পেঁয়াজকলি কুচিয়ে সঙ্গে ভাজা শুকনো লঙ্কা আব সামান্য নুনমশলা দিয়ে অসামান্য জলখাবার তৈরি করল কাজল।

না খেয়েই নীরবালা খুব প্রশংসা করলেন কাজলের। একবাটি মুড়ি দিয়ে সেই পেঁয়াজকলি চচ্চড়ি তারপরে আরও এক পেয়ালা চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ল ইপিন।

বেরোনোর সময় কাজলকে বলে গেল, 'একা একা খেয়ে নিয়ে চলে যেয়ো না। ফিরে এসে দু'জনে একসঙ্গে বসে খাবো।'

সকালে স্নান করেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল কাজল। দশটা নাগাদ তার হাতব্যাগ থেকে একটা নতুন জর্জেটের শাড়ি বার করে সেটা পরে পরনের শাড়িটা ছেড়ে ফেলল। তারপর নীরবালাকে বলল, 'চলুন পুজো দেখে আসি।'

নীরবালা ইতস্তত করছেন দেখে কাজল মুখ ফসকিয়ে জিজ্ঞাসা করে ফেলল, 'পুজোয় ইপিন নতুন কাপড় কিনে দেয়নি?'

প্রশ্ন শুনে নীরবালা একটু দুঃখিত হলেন, বললেন, 'তা দেবে না কেন? এবার কলকাতায় আছি বলেই নয়, প্রত্যেক বছরই ইপিন-বিপিনের বাবা ওদের টাকা পাঠায় পুজোর খরচের জন্য। আমার থানও ওই টাকা দিয়েই কেনা হয়।'

এরপর কাজল নতুন কাপড় পরে নেওয়ার জন্য জোরাজুরি করলে, নীরবালা তাঁর আপত্তির কারণটা জানলেন, 'রান্নাটা সেরে নিই।'

কাজল বলল, 'আপনার রান্না তো হয়েই গেছে দেখছি। ডাল, মিষ্টি কুমড়ো ভাজা, আমড়ার চাটনি, আলু পটলের তরকারি।'

নীরবালা বললেন, 'আসল জিনিস দুটোই তো বাদ রয়ে গেছে, ভাত আর মাংস।'

কাজল বলল, 'মাংসটা আমি রাঁধবো। আপনি ফিরে এসে ভাতটা ফুটিয়ে নেবেন। পনেরো মিনিট লাগবে বড় জোর।'

কাজল নীরবালাকে নিয়ে পাড়ার মধ্যে ঘুরে ঘুরে তিন-চারটে ঠাকুর দেখল। ব্ল্যাকআউটের অত্যাচারে দিনের বেলাতেই এবার পুজোর উৎসাহ বেশি। দেবীর রণরঙ্গিনী চেহারা এবার অনেক বেশি জোরদার। যুদ্ধের উত্তেজনা পুজোমণ্ডপেও ঢুকে গেছে।

হাজরার মোড়ের কাছে একটা প্রতিমা হয়েছে যার অসুরটা দেখতে ফিল্ড মার্শাল আয়ুবের মত, এমনকি তার মাথার চুলের ঝুঁটির ওপরে পাকিস্তানী সৈন্যের টুপি বসানো। অনেকে বলছে, যদিও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না, সিংহের মুখটা লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মত।

প্রতিমা দর্শন শেষ পরে নীরবালা আর কাজল সাড়ে বারোটা নাগাদ ফিরল। ইপিনের ফিরতে ফিরতে একটা হল। সেবাসদন, শ্বশুরবাড়ি সবই ঠিক আছে। কিন্তু টাঙ্গাইলে খবর পাঠানোর সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি।

বাড়ি ফিরে ইপিনের খেয়াল হল, একবার সুপ্রিয়দাকে ধরলে হয়। সুপ্রিয়দা কাছেই পণ্ডিতিয়ায় থাকেন। ইউ এস আই এসের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। টাঙ্গাইলে সুপ্রিয়দার মাসীর বাড়ি আর ইপিনদের বাড়ি পাশাপাশি। সুপ্রিয়দার মাসীকে ইপিন-বিপিন বড়মা বলত। সুপ্রিয়দা চেষ্টা করলে মার্কিন দূতাবাস মারফত খবর পাঠানো যেতে পারে।

ইপিন বাড়ি ঢুকেই হঠাৎ সুপ্রিয়দার কথা খেয়াল হতে, 'আসছি' বলে হুট করে বেরিয়ে গেল।

সুপ্রিয়দার বাড়ি বেশি দূর নয়। মিনিট পাঁচেকের হাঁটাপথ। কিন্তু গিয়ে লাভ হল না। বাসায় কেউ নেই। একজন কাজের লোক রয়েছে, সে বলল, 'দিল্লী গেছে। লক্ষ্মীপুজোর দিন ফিরবে।'

কাজলের মাংস রান্না এখনো শেষ হয়নি, মাংস সেদ্ধ হতে একটু দেরি হচ্ছে। ইপিন এসেই বেরিয়ে যাওয়ায় সে একটু স্বস্তি পেয়েছিল। এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে সে ভাবেনি। সে ভেবেছিল নিশ্চয় সুতৃপ্তিতে আড্ডা দিতে গেছে। অন্তত আধঘণ্টা লাগবে, দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবে ইপিন এটা কাজল ভাবেনি।

ইপিন ফিরে আসতে কাজল জিজ্ঞাসা করল, 'কোথাও গিয়েছিলে ?' টাঙ্গাইলে খবর পাঠানোর সমস্যাটা ইপিন কাজলকে বলল।

মন দিয়ে ইপিনের কথা শুনে কিছু একটা ভেবে নিয়ে কাজল বলল, 'সমস্যার সমাধান তোমার হাতেই রয়েছে।'

ইপিন বলল, 'কি রকম ?'

কাজল বলল, 'তোমার সেই ডিয়ার ফ্রেণ্ড বিপিনের ঠিকানা আছে তোমার কাছে ?'

দু'দিন আগেই বিপিন দত্তের কাছ থেকে একটা কার্ড এসেছে ইপিনের কাছে। বিজয়া গ্রীটিংস, বিদেশী চিঠি, কয়েকদিন আগেই এসে গেছে।

চিঠিটা সামনের টেবিলের ওপরে পুরনো খবরের কাগজে চাপা হয়ে পড়েছিল। খুঁজে বার করে দেখা গেল, শুধু ঠিকানা নয়, ফোন নম্বরও রয়েছে একটা।

বিপিন দত্তের গ্রীটিংস কার্ডটায় ফোন নম্বর দেখে ইপিন একটু আশার আলো দেখতে পেলো।

কাজলও ফোন নম্বরটা দেখেছে। ইপিন কাজলকে বললো, 'যদি ফোনে ভদ্রলোককে পাওয়া যায়, ওঁকে খবরটা দিয়ে টাঙ্গাইল বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে যদি বলে দেওয়া যায় বাবাকে একটা

টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিতে, মিস্টার দত্ত নিশ্চয় সেটুকু করবেন।'

কাজল বললো, 'তা করবে। বিপিনকে ফোন করতেও বলতে পারি।'

ইপিন বললো, 'তা সম্ভব নয়। টাঙ্গাইলে ফোন নেই।'

কাজল বললো, 'তা হলে এখনই বিপিনকে ফোনে ধরে টেলিগ্রাম করতে বলা হোক।'

ইপিন হাত ঘড়ি দেখলো, বেলা দেড়টা বাজে। কাজল নিজের ডান হাতের মণিবন্ধে নিজের ছোট সুন্দর দেখতে গোল ঘড়িটা দেখে নিয়ে ইপিনের কাঁধের পাশে উঁকি দিয়ে তার ঘড়িটার সঙ্গে সময়টা একটু যাচাই করে নিলো। উঁকি দিয়ে মুখটা তোলার সময় কাজলের কপালটা ইপিনের থুতনিতে একটু লেগে গেল।

একটা কাঁচপোকার টিপ লাগিয়েছিলো কাজল তার কপালে। সেটা কপাল থেকে খসে ইপিনের কোলে পড়ে গেলো।

কাজল নিঃসঙ্কোচে ইপিনের জামার ওপর থেকে টিপটা তুলে নিয়ে নিজের কপালে সট করে লাগিয়ে ইপিনকে জিজ্ঞাসা করলো, 'দ্যাখো তো ঠিক হয়েছে কি না?' ঠিকই হয়েছে কিন্তু ইপিন কাজলের কপালের দিকে একটু বেশি সময় ধরে তাকিয়ে থেকে বললো, 'একটু বাঁকা হয়েছে, কিন্তু তাতে আরো ভালো দেখাচ্ছে।'

কাজল মুচকি হেসে বললো, 'একটু বাঁকা না হলে বুঝি পছন্দ হয় না।'

ইপিন কথা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে বললো, 'টেলিফোনটা করতে হবে? কখন এবং কোন জায়গা থেকে?' অনেকটা স্বগতোক্তির মত নিজের মনে মনেই নিজেকে প্রশ্ন করলো।

কাজল ডান হাতের বুড়ো আঙুলের নখটা দাঁত দিয়ে খুঁটছিলো, সে কি সব উলটো পালটা ভাবছিলো, ভাবনাটা থামিয়ে দিয়ে ইপিনকে বললো, 'এখন তো বোধ হয় ওখানে রাত তাই না।'

ইপিন বললো, 'আমিও ভেবেছিলাম। কিন্তু এখনতো ওদের রাত নয়। আমাদের দুপুর মানে লণ্ডনের সকাল। জার্মানিতে এক-আধ ঘণ্টা এদিক ওদিক হবে।'

'তা হলে বিপিন হয়তো এখনো কাজে বেরোয়নি।' কাজল উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'চলো তা হলে এখনই একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।'

দুজনে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে নীরবালা বললেন, 'ভাত হয়ে গেছে, খেয়ে যাও তোমরা।'

ইপিন ইতস্তত করলো, কিন্তু কাজল বললো, 'দেরি করলে হয়তো কাজটা হবে না। আমরা ফোন করে এখনই ফিরে আসছি।'

নীরবালা আটকালেন না। টাঙ্গাইলে খবর জানানোর জন্যে তিনিও ব্যাকুল হয়ে রয়েছেন, মুখে বললেন, 'তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। আমি এই দরজা খুলে বসে থাকছি।'

ইপিন আর কাজল বেরিয়ে গেলো। একটু এগিয়ে লেক মার্কেটের দোতলায় টেলিগ্রাম অফিস থেকে দেশে-বিদেশে ফোন করা যায়।

যদিও আজ মহাসপ্তমী, পোষ্ট অফিস খোলা রয়েছে। বোধহয় কাল অষ্টমীতে বন্ধ থাকবে। ওরা সুতৃপ্তির পাশে রাসবিহারী পোস্ট অফিসে প্রথম যায়। সেখান থেকেই বলে দেয় ইন্টারন্যাশনাল ট্রাঙ্ক কল লেক মার্কেটের অফিস থেকে করা যাবে।

পুজোর বাজার। আকাশে একটু মেঘলা ভাব থাকলেও বৃষ্টি নেই। ভর দুপুরেই নতুন জামা কাপড় পরে বহু লোক রাস্তায় বেরিয়েছে।

লেক মার্কেটের অফিসে পৌঁছে দেখা গেলো অফিস প্রায় ফাঁকা। গ্রাহক কেউ নেই। কাউন্টারের

ওপরে জনা দুয়েক কর্মচারী রয়েছেন। প্রয়োজনটা জানাতে তাঁদেরই একজন এগিয়ে এসে ফোন নম্বরটা দেখে একটা সাইক্লোস্টাইল করা সার্কুলার মনোযোগ দিয়ে পড়ে বললেন, 'প্রথম তিন মিনিট পঁয়তাল্লিশ টাকা লাগবে। তারপর প্রতি মিনিটে পনেরো টাকা।'

ইপিনের কাছে গোটা পঞ্চাশেক টাকা ছিল, এতো টাকা লাগবে সে ভাবেনি। তাছাড়া তিন মিনিটেই সব কথা বলা যাবে তা নাও হতে পারে।

ইপিনের অবস্থাটা অনুমান করে কাজল বললো, 'তুমি ফোন করো আমার কাছে টাকা আছে।' এই বলে হাতের ব্যাগ থেকে একটা একশো টাকার নোট বের করে ইপিনের হাতে গুঁজে দিলো।

একটু বিব্রত ভাবে ইপিন বললো, 'এত টাকা সঙ্গে নিয়ে রাস্তা ঘাটে ঘুরে বেড়াও।' কাজল বললো, 'অনেক সময় টাকা খুব দরকার পড়ে যায়।'

বিপিন দত্তকে কিন্তু সহজেই পাওয়া গেলো। তাঁর দশটা-পাঁচটা জাতীয় অফিসের কাজ নয়, কারখানার চাকরি। শিফট ডিউটি, একেবারে হাড় ভাঙা খাটুনি। এখন নাইট শিফট চলছে। সকালে ডিউটি থেকে ফিরে এসে ঘরে শুয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন বিপিন।

ইপিন সমস্যাটা বললো। টাঙ্গাইলের ঠিকানাটা দিলো। বিপিন ইপিনকে যমজ ছেলের কারণে অভিনন্দন জানালেন। বললেন যে একটু পড়েই বেরিয়ে গিয়ে তিনি টেলিগ্রামটা করে দিয়ে আসবেন।

ইপিনের পাশে কাজল নির্লিপ্তের মত দাঁড়িয়ে ছিল। ইপিন হঠাৎ বিপিন দত্তকে বললো, 'এখানে আমার পাশে কাজলও রয়েছে। ওর সঙ্গে কথা বলুন।'

কাজল বোধহয় একটু বিরক্ত হলো। তবু ফোনটা ধরলো, ধরে কি শুনে বললো, 'শালা।' রিসিভার ভেদ করে বিপিন দত্তের উচ্চহাসি ইপিনেরও কানে গেলো। এরপর বিপিন কি যেন বলতে গেলো। কাজল বললো, 'মিনিটে পনেরো টাকা খরচ করে কথা বলার যোগ্য লোক তুমি নও।' এই বলে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখতে গিয়ে রীতিমত আদেশের সুরে বললো, 'যাও টেলিগ্রামটা এখনই গিয়ে করে এসো,' এবং রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ইপিনকে কাজল বললো, 'ও আমাকে ডারলিং বলেছিলো, আমি ওকে শালা বললাম, ঠিক বলিনি।'

বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। পুজো ডুবতে চলেছে। লেক মার্কেটের ছাদের নিচে লোকজন দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে আকুল আশ্বিনের বৃষ্টি। ছাতা আনলেও কোনো সুবিধে হতো না।

বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ নেই। প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেলো। লেক মার্কেটের সামনে রাসবিহারী এভিনিউয়ে জল জমতে শুরু করেছে। আরেকটু এগিয়ে দেশপ্রিয় পার্কের ওখানে দুঘণ্টার চড়া বৃষ্টিতে কোমর জল হয়ে যায়। পিসি ভাত নিয়ে বসে আছে এ কথা ভেবে ইপিন অস্বস্তি বোধ করে।

এদিকে কাজল বেশ অস্থির হয়ে উঠেছে, বারে বারে ঘড়ি দেখছে। তিনটে নাগাদ বৃষ্টিটা একটু ধরে এলো, তবে রাস্তায় ভালই জল জমেছে।

ইপিন আর কাজল দুজনে ফুটপাথে নেমে এলো। ঝিরঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। নিজের ঘড়িটার দিকে আরেকবার তাকিয়ে হাত উঁচু করে একটা ট্যাক্সি ডাকলো কাজল। প্রথমটা দাঁড়ালো না। কিন্তু দ্বিতীয়টা থামতেই কাজল সেটায় হুট করে উঠে বসে দরজটা খুলে ধরে ইপিনকে উঠতে বললো। তারপর ট্যাক্সিওয়ালাকে বললো, 'ল্যান্স ডাইন হয়ে থিয়েটার রোড।'

থিয়েটার রোড শুনে ইপিন জিজ্ঞাসা করলো, 'থিয়েটার রোড? থিয়েটার রোডে কে যাবে?'

কাজল বললো, 'তোমাকে ল্যান্সডাউনে নামিয়ে আমি থিয়েটার রোডে যাবো। আজ আর তোমাদের বাড়িতে ভাত-মাংস খাওয়া হলো না।'

ইপিন সত্যিই অবাক হলো, 'সে কি? পিসি বসে আছে ভাত নিয়ে। এই মুহূর্তে থিয়েটার রোডে যেতে হবে? একটু নেমে ভাতটা খেয়ে যাও।'

কাজল বললে, 'মনে হচ্ছে আবার খুব বৃষ্টি আসবে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। ট্যাক্সি ছেড়ে দিলে এই পুজোর বাজারে বৃষ্টির মধ্যে আরেকটা ধরা অসম্ভব হয়ে যাবে।'

বাড়ির কাছে ট্যাক্সি থেকে নামতে নামেত ইপিন বললো, 'তা হলে সত্যিই নামবে না। পিসি আমার ওপর রাগারাগি করবে।'

কাজল বললে, 'না যাই। খুব গোলমেলে পার্টি। ঠিক তিনটের সময় যাওয়ার কথা। একটু দেরি করলে হুলুস্থুল বাধিয়ে দেয়।'

খুব বড় বড় ফোঁটা ফেলে আবার আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নেমেছে। এই বিকেল বেলাতেই গাড়িগুলো হেডলাইট জ্বালিয়ে যাচ্ছে। ঝাপসা বৃষ্টির মধ্যে কাজলের ট্যাক্সিটা আবছা হয়ে মিশিয়ে গেলো।

জার্মানি থেকে পাঠানো বিপিন দত্তের সেই টেলিগ্রাম পরের দিনই টাঙ্গাইল বাড়িতে পৌঁছেছিলো। শুভ সংবাদ পাঠাতে বিপিন কার্পণ্য করেননি। যমজ বাচ্চা হয়েছে। মা-ছেলেরা ইপিন সহ সবাই ভাল আছে, জন্মদিন, জন্মসময়, প্রয়োজনীয় যা কিছু তথ্য বিপিন দত্ত প্রভাসকুমারকে তার মারফৎ জানিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর ঠিকানাও সেই সঙ্গে দিয়েছিলেন।

পরের দিনই প্রভাসকুমার ধন্যবাদ জানিয়ে বিপিন দত্তকে একটা তার পাঠালেন। তার মধ্যে বিপিন ভাল আছে এ কথাও লিখলেন যাতে ইপিনকে সেটা তিনি জানিয়ে দিতে পারেন।

সেই যুদ্ধের দুর্দিনেও যখন দুর্গোৎসব বন্ধ, যখন সামরিক আইন ও ইমার্জেন্সি, যখন এক ছেলে বন্দীশিবিরে সে সময়ে যমজ পৌত্র হওয়ার সংবাদে চৌধুরীদের বাড়িতে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গিয়েছিলো।

টেলিগ্রামের পিয়নকে, হাতের কাছে কিছু না পেয়ে নিজের ওয়েস্ট এণ্ড হাত ঘড়িটা খুলে প্রভাসকুমার পরিয়ে দিয়েছিলেন। দুপুরের দিকে তারটা এলো, স্মৃতিকণা তখন ঘুমোচ্ছিলেন। তাঁকে ডেকে প্রভাসকুমার খবরটা দিতে তিনি উচ্ছ্বাসে ও আবেগে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। বিকেলবেলায় পাড়ায় প্রত্যেক বাড়িতে এক সের করে রসগোল্লা পাঠানো হলো তেওয়ারির দোকান থেকে কিনে এনে। সে দোকানে অত মিষ্টি ছিল না, তেওয়ারি বাজারের অন্য সব দোকান থেকে রসগোল্লা জোগাড় করে পাঠালো।

সন্ধ্যাবেলা লণ্ঠন জ্বেলে প্রভাসকুমার একগাদা পোস্টকার্ড নিয়ে বসলেন। দেশের বাইরে চিঠি যাবে না। কিন্তু আত্মীয় বন্ধু এখনো পূর্ব পাকিস্তানে অনেক। তাদের যমজ নাতি হওয়ার সংবাদটা দিতে হবে। সেই সঙ্গে শারদীয় শুভেচ্ছা। এবার পুজো হয়নি, বিসর্জনও হবে না, তাই বিজয়া

নেই। নিতান্তই শারদ শুভেচ্ছা।

নাতি হোক বা নাতনিই হোক দুজনের জন্যেই একাধিক নাম ঠিক করে রেখেছিলেন প্রভাসকুমার। মহাভারত ঘেঁটে, অমরকোষ খুঁজে ভাল নাম বার করার চেষ্টা করেছিলেন। এমন কি শহরের সবচেয়ে পুরানো পাঠাগার রমেশচন্দ্র দত্তের নামে গত শতকে প্রতিষ্ঠিত রমেশচন্দ্র হল অ্যাণ্ড পাবলিক লাইব্রেরি থেকে বহুকালের পুরানো একটা শব্দকল্পদ্রুম বাসায় এনে তন্নতন্ন করে প্রাচীনগন্ধী অথচ অনাধুনিক নয় এমন নাম অনুসন্ধান করেন।

প্রভাসকুমার ছেলে এবং মেয়ের নামের দুটি দীর্ঘ তালিকাও প্রণয়ন করে ফেলেন। সে তালিকা পরবর্তীকালে অনেকেরই কাজে লেগেছিল।

কিন্তু প্রভাসকুমারের মনে কোনও নামটাই তেমন লাগেনি, এ নিয়ে তাঁর একটা খুঁতখুঁতে ভাব ছিল। এর কারণ অবশ্য ইপিন-বিপিনের নাম নিয়ে তাঁর পুরনো অস্বস্তি। তাঁর দুই ছেলে ইপিন-বিপিন এইরকম দুই প্রায় হাস্যকর ডাকনামে বড় হয়েছে, কিছুতেই নামদুটো বদলানো হয়নি।

সুতরাং সম্ভাব্য পৌত্র-পৌত্রীর ব্যাপারে আগেভাগেই সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন প্রভাসকুমার। কিন্তু এত সব প্রাচীন আকরগ্রন্থ ঘেঁটেও খুব পছন্দসই নাম পাননি প্রভাসকুমার।

কৈশোর-যৌবনে প্রভাসকুমারের প্রিয় লেখক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কলেজ জীবনে কলকাতায় কল্লোলযুগের কাছাকাছি বয়েসের ছিলেন তিনি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের চিরায়ত মেজাজ, ধ্রুপদী ভঙ্গী তাঁর পছন্দ ছিল।

অবশেষে অমরকোষ, শব্দকল্পদ্রুম শিকেয় তুলে দিয়ে প্রভাসকুমার প্রায় মনস্থির করে ফেললেন পৌত্র হলে তার নাম হবে চন্দ্রশেখর, পৌত্রী হলে শৈবালিনী কিংবা রজনী।

বাদ সাধলেন স্মৃতিকণা।

প্রভাসকুমার স্ত্রীকে ভাবী নাতি-নাতনির নামকরণ নিয়ে তাঁর চিন্তা জানাতে গিয়ে প্রথমেই বড় একটা ধাক্কা খেলেন।

স্মৃতিকণা বললেন, 'রাম না জন্মাতেই রামায়ণ। নাতি না জন্মাতেই নাতির নাম?'

এতদিনের পুরনো দুঁদে উকিল প্রভাসকুমার বেশ থতমত খেয়ে গেলেন। আমতা আমতা করে বললেন, 'দোষ হচ্ছে নাকি? শাস্ত্রে নিষেধ আছে?' স্বামীর এই দুরবস্থা দেখে স্মৃতিকণা নিজেকে শুধরিয়ে নিলেন, 'দোষ কিছু নেই। এবার নামগুলো বল?'

প্রভাসকুমার বঙ্কিমী নামগুলো বললেন, স্মৃতিকণা মন দিয়ে শুনে বললেন, 'অসম্ভব। এসব বঙ্কিমের নাম চলবে না।'

অবাক হয়ে এবং স্মৃতিকণার প্রতিবাদের ভঙ্গি দেখে প্রভাসকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?'

স্মৃতিকণা বললেন, 'বঙ্কিমের নায়ক-নায়িকারা বড় দুঃখী হয়।'

কথাটা সত্যি। শুধু উপন্যাস জীবনে নয়, বাস্তব জীবনেও সেটা সত্যি হয়েছে। স্মৃতিকণার ছোটকাকা চন্দ্রশেখর বেয়াল্লিশ সালের করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গের দিনে জগন্নাথগঞ্জের কাছে নান্দিনা স্টেশনের কাছে রেললাইন ওপরাতে গিয়ে বন্দি হয়েছিলেন। পরের বছর ময়মনসিংহ জেলে মারা যান। পুকুরের ওপারের বাড়ির প্রফুল্লদি বালবিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে ছিলেন। বাপের বাড়ির সবাই পশ্চিমবঙ্গে চলে গেছে, তিনি একলা শূন্য পিত্রালয় আগলান। স্মৃতিকণার ভাঁড়ারে অনুরূপ আরও উদাহরণ অনেক রয়েছে।

এসব অবশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগের কথা। তখন স্মৃতিকণা কলকাতা যাওয়ার জন্যে

বাঁধাছেঁদা করছেন। তারপর যুদ্ধ লেগে গেল। স্মৃতিকণাকে নিয়ে যেতে এসে বিপিন যুদ্ধবন্দী হয়ে গেল। প্রভাসকুমারও নামকরণ নিয়ে মাথা ঘামানো ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এখন জোড়া নাতির জন্মের সুসংবাদ এসে যাওয়ায় তিনি আবার নাম নিয়ে ভাবতে বসলেন।

এ অঞ্চলে যমজ ছেলের কিংবা পিঠোপিঠি সন্তানের নাম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্তিক-গণেশ কিংবা গৌর-নিতাই। কিন্তু এসব নাম প্রভাসকুমারের চলবে না। অবশেষে অনেক মাথা ঘামিয়ে তিনি পৌত্রদের নাম ঠিক করলেন অঙ্গ ও বঙ্গ। চমৎকার নাম, বড় হয়ে একজনের নাম হবে অঙ্গ চৌধুরী আর অন্যজনের নাম বঙ্গ চৌধুরী।

কিন্তু স্মৃতিকণা এই নাম দুটোকে মোটেই পাত্তা দিলেন না। হেসে উড়িয়ে দিলেন। প্রভাসকুমারকে জানালেন, 'ওই অ্যাং-ব্যাং নাম আমার নাতিদের আমি কিছুতেই দিতে দেব না।'

ঠিক আছে, নামকরণ পরে হবে। এখন ইপিন-মেনকা তাদের ছেলেদের যে নামে ডাকে ডাকুক। ভাল নাম, পোশাকি নাম অন্নপ্রাশনের সময় ঠিক করা যাবে।

দুই দেশের আরও অসংখ্য মানুষের মত প্রভাসকুমার-স্মৃতিকণা আশা করেন ততদিনে সব মিটমাট হয়ে যাবে। শান্তি ফিরে আসবে। এ বাড়িতে ছেলেদের মুখে ভাত হয় জন্মের পরের নবম মাসে। একটু দেরি করেই হয়। ততদিনে দুয়েকটা দুধের দাঁত মাড়ির মধ্যে ছোট ঝিনুকের মত উঁকি দেয়। কিন্তু কিছুই করার নেই। বহুদিনেব প্রথা।

এদিকে পুজোর দিন ক'টা শেষ হয়ে যায়। মেঘলা দিন পাড়ি দিয়ে আশ্বিনের নীল দিন ফিরে আসে। দালানের বারান্দায় দাঁড়ালে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার ধারে নয়ানজুলি ঘেঁষে সাদা কাশফুল ফুরফুর করে বাতাসে উড়ছে চোখে পড়ে। ভোরবেলা উঠোনের ও পাশটা ছেয়ে যায় শিশির ভেজা শিউলি ফুলে। এ বছরের শেষ কামিনী ফুটেছে কাছারি ঘরের সামনে পুরনো বাগানে। কেমন যেন মন খারাপ করা সৌরভে পুরনো বাড়িটা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

স্মৃতিকণা-প্রভাসকুমারের দিন কাটে উদ্বেগে আর দুশ্চিন্তায়। রাতে ঘুম আসতে চায় না, ঘুম এলেও ভেঙে যায়। স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি শুয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি ঘুমোলে নাকি?' কিছুক্ষণ পরপর একই প্রশ্ন। দুজনেই টের পান, দুজনেই জেগে আছেন।

কোথা থেকে এক জোড়া নিশাচর পাখি আসে মধ্য রাতে। নারকেল গাছের উঁচু ডালে বসে 'গেলাম,' 'গেলাম' বলে চেঁচায়। আর্ত মানুষের করুণ চিৎকারের মত শোনায়। এককে সময় কুকুরগুলোও কেমন আকাশের দিকে মুখ করে আহত কণ্ঠে শুধু শুধু কাঁদতে থাকে, কেঁদেই যায়, সে কান্না আর থামতে চায় না।

প্রভাসকুমার জানেন মহাভাবতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দিনের বর্ণনায় ঠিক এই রকম সব বিষয় আছে। তবে তিনি একথা স্মৃতিকণাকে বলেন না।

লক্ষ্মীপুজো এসে যায়। দিগন্ত প্লাবিত হিম জড়ানো জ্যোৎস্নায় ব্ল্যাক আউট আর নৈশ আইনের ঘেরাটোপে বন্দি ছোট শহর ঝিম ধরে উদাসীন পড়ে থাকে। প্রভাসকুমারের মনেই হয় না যে এই তার চিরচেনা জন্মশহর। তবু না করলে নয়, তাই একেবারে নমোনমো করে লক্ষ্মীপুজো করলেন স্মৃতিকণা। কালীবাড়ির পুরোহিত এসে পুজো করে দিয়ে গেল। সে আবার নাকি পুলিশের চর। প্রভাসকুমার স্মৃতিকণাকে বারণ করে দিয়েছিলেন তার সঙ্গে বেশি কথা না বলতে। অনেকের মত প্রভাসকুমারেরও ধারণা দুর্গাপুজো করা না করা নিয়ে কালীবাড়ির সদস্যদের আলোচনা পুরুতঠাকুরই নাকি ফাঁস করে দিয়েছিল পুলিশের কাছে। তা নিয়ে কেউ কেউ বেশ হাঙ্গামায় পড়েছিল। একজন তো পাকিস্তান রক্ষা আইনে গ্রেপ্তারই হয়ে গেছে।

পট নয়, প্রতিমা নয়। অন্যান্য বৎসরের মত মোয়া মুড়কির মহোৎসব নয়—এবার কিছুই আয়োজন করেননি স্মৃতিকণা। সামান্য ফলমুল, খিচুড়ি, বেগুনভাজা আর পায়েস। ঘরে একটা ফ্রেমে বাঁধানো লক্ষ্মীর ছবি ছিল সেটারই পুজো হল। ছবিটা দেয়ালে বহুকাল ঝুলছিল, এতদিন পরে তার কাঁচের ওপরে একটু সিঁদুর আর একটু চন্দনের ফোঁটা পড়ল।

লক্ষ্মীপুজোর পরে আরও বেশ কয়েকটা দিন কাটল উদ্বেগের মধ্যে। বিপিনের সঙ্গে একদিন পুজোর পরে মুক্তাগাছা ক্যাম্পে দেখা করতে গিয়ে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এলেন স্বামী-স্ত্রী। প্রচণ্ড কড়াকড়ি চলছে, যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে আত্মীয় পরিজনদের দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না।

গোটা পঁচিশেক টাকা ঘুষ দিয়ে প্রভাসকুমার বিপিনকে খবর পাঠালেন যে তাঁরা এসেছিলেন শুভ বিজয়ার আশীর্বাদ করতে। এ খবরও জানালেন যে মহাপঞ্চমীর দিন ইপিনের যমজ ছেলে হয়েছে। ইপিন-মেনকা-বাচ্চারা সবাই ভাল আছে। টাঙ্গাইলের বাসাতেও সবাই ভাল আছে।

বন্দি শিবিরের গেট থেকে ফিরে যখন প্রভাসকুমার ও স্মৃতিকণা বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে এগোচ্ছেন, মিষ্টির দোকানের সামনেটায় হঠাৎ দুটো ঢিল এসে আলতো করে পড়ল তাঁদের পাশে। প্রভাসকুমার কিছু টের পাননি, কিন্তু স্মৃতিকণা ঢিলের আনুমানিক গতিপথ অনুসরণ করে পিছনে ফিবে উঁচুর দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন বিপিনকে।

বিপিন তিনতলার চিলেকোঠার ছাদে উঠে হাত নাড়ছে, বোধহয় ওঁদের আসার খবরটা এখনই পেয়েছে।

স্মৃতিকণার দেখাদেখি প্রভাসকুমারও ফিরে তাকিয়ে বিপিনকে দেখতে পেলেন। তাঁর মনে আছে ওই চিলেকোঠার নিচেই মহারাজাদের নহবতখানা ছিল। নহবতখানার ম্যানেজার ত্রিপুরার দয়াময় ভট্টাচার্য ওই চিলেকোঠার ঘরেই পঁচিশ বছর আগে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। জৌনপুরি বসির সারঙ্গীর যুবতী স্ত্রী সঙ্গে কি একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল প্রৌঢ় ব্রাহ্মণের। তারই পরিণতি এই আত্মহত্যা। মহারাজদের তখনও প্রবল প্রতাপ। দয়াময় ভট্টাচার্যের শবদেহের ময়না তদন্ত হয়নি। অনেকে বলেছিল, আত্মহত্যা নয় হত্যা। এই ঘটনায় পুরো জেলায় সাড়া পড়ে গিয়েছিল। আবার যথাসময়ে চাপাও পড়ে গেছে।

একেকটা পুরনো বাড়ির ইঁট-কাঠ-পলেস্তঁরায় কত আখ্যান জড়িয়ে থাকে। জন্ম-মৃত্যু, প্রণয়-পরিণয়। কত দীর্ঘশ্বাস, কত অট্টহাসি ঘরে বারান্দায় নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ায়।

আজ বিপিনকে চিলেকোঠার ছাদে দেখে এতকাল পরে দয়াময় ভট্টাচার্যের কাহিনী মনে পড়ল প্রভাসকুমারের। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা দুর্ভাবনাও দেখা দিল। এই পুরনো বাড়ির নড়বড়ে ছাদের ওপর থেকে বিপিন পড়ে গেলে ভয়াবহ ব্যাপার। তাছাড়া কারারক্ষীরাও বুঝতে পারলে তারা বিপিনের এই কাজটা সুনজরে দেখবে না।

অবশ্য একটু পরেই চিলেকোঠার মধ্যে থেকে এক লাফে বড় ছাদে নেমে শেষবার হাত নেড়ে বিপিন সিঁড়ির মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বোধহয় বিপিন টের পেয়েছে যে তাকে রক্ষীরা কেউ দেখে ফেলেছে।

সময় বয়ে যায়।

সব যুদ্ধের মতই একদিন সেই যুদ্ধও শেষ হয়েছিল। একটু তাড়াতাড়িই বোধহয় শেষ হয়েছিল। দু পক্ষের কারোরই খুব বেশিদিন লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল না।

বিশ শতকের দুই গরিব দেশের হিংসা আর আক্রোশের সেই রক্তাক্ত সংগ্রাম, সেই যুদ্ধে কেই বা জিতেছিল, কেই বা হেরেছিল কেউ তা ভালো করে জানে না। এখনো সে বিষয়ে গবেষণা চলছে।

পাকিস্তান বলেছিল ভারতকে ধ্বংস করে দিয়েছি। ভারত দাবি করেছিল, পাকিস্তানকে শেষ করে দিয়েছি।

সব যুদ্ধে যেমন হয়। ওই যুদ্ধেও ক্ষতি হয়েছিলো সামান্য সাধারণ মানুষের। ধ্বংস হয়েছিলো কিছু প্রাচীন মূল্যবোধ। কামানের গর্জনে আমবাগানের ভিতর থেকে প্রাচীন নীড় ছেড়ে পাখি উড়ে গিয়েছিল। হেমন্ত সন্ধ্যায় আকাশ প্রদীপের শিখা কম্পিত হয়েছিল বোমারু বিমানের উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে। দেহাতি মসজিদের ভগ্ন মিনার চূড়ায় মোয়াজ্জিনের আজান মধ্যপথে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল বন্দুকের গুলির শব্দে, বারুদের অবাস্তব, নিরীশ্বর গন্ধে।

সময় বয়ে যায়।

টাঙ্গাইলের পুরানো বাড়ির ভাঙা কার্নিসে আরো একটা অশ্বত্থচারা জন্মায়, সকালবেলায় রোদে ঝলমল করে ওঠে তার নতুন সবুজ পল্লব। শীতের দুপুরে উত্তরের বাতাসে থির থির করে কাঁপে ছোট পাতাগুলি।

রাশিয়া মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে আসে। দুই জন্ম শত্রুর মধ্যে বিবাদ মেটানোর আয়োজন। সেই আয়োজনের মধ্যে মাঘের হিমশীতে তাসখন্দ শহরে বেঘোরে প্রাণ হারালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ক্ষীণদেহ, হ্রস্বকায় লালবাহাদুর শাস্ত্রীজীর শেষ যাত্রায় শববাহক হয়ে কাঁধ মেলালেন পাকিস্তানের একনায়ক ফিল্ড মার্শাল।

শীতের বরফ গলতে শুরু হয়েছে। উত্তুরে হাওয়ায় ধার কমেছে। সূর্যকিরণ ক্রমশ অনেক বেশি উষ্ণমধুর, চন্দ্রকিরণ ক্রমশ অনেক বেশি ঝলমলে মায়ামদির।

হঠাৎ যেন লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যু ভারত-পাকিস্তান দুই দেশকে খুব কাছাকাছি এনে দিল। ট্যাঙ্ক-সাবমেরিন, কামান-গোলা ফেলে রেখে দুই দেশ কাগজ-কলম আলাপ-আলোচনা নিয়ে বসল নিজেদের মধ্যে মিটমাট করতে।

যেন ভরা বসন্তে দক্ষিণের সমীরণ। কোকিল কূজন। মনে হল সব অভিমান শেষ। রাগ নেই, দুঃখ নেই।

প্রভাসকুমার আগে ডায়েরি রাখতেন।

কিন্তু স্মৃতি বিবরণীতে এখন আর তাঁর আস্থা নেই। দৈনন্দিন ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণী রচনায় এক ধরনেব একঘেঁয়েমি আছে, ক্লান্তি আছে। তা ছাড়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আপাত বৃহৎ সংবাদের চাপে নিজের ছোট ছোট কথাগুলো বাদ পড়ে যায়, নিজের কাছে সেগুলো সবচেয়ে দামি।

নিজের লেখা পুরনো ডায়েরিগুলো পড়ে দেখেছেন প্রভাসকুমার, কোন মানে নেই, কোন খবর নেই। কোন রকম একটু রেখাপাতও করে না মনের মধ্যে। স্টালিন মারা গেলেন, তার আগে ইপিনের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা আরম্ভ। ডাযেবির একই পাতায় এই সংবাদ দুটো রয়েছে—এর মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার কাছে, বুঝে উঠতে পারেন না প্রভাসকুমার।

এই তো মহাপঞ্চমীর দিন লাহোর এলাকায় জীবনপণ যুদ্ধ করল দুই দেশ, কলকাতার কাছে খড়গপুরের কলাইকুণ্ডায়' বোমা পড়ল আকাশ থেকে, এ সবই ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু ওই দিনই ইপিনের বৌ মেনকা যমজ ছেলের জন্ম দিল কলকাতার এক হাসপাতালে—এই পারিবারিক খবরটাই প্রভাসকুমারের কাছে দামি।

প্রভাসকুমার ভেবে দেখেছেন। খবরের কাগজ পড়লে বা রেডিও শুনলে ভ্রম হয় যে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা গতকালই ঘটেছে। কিন্তু তা হয় না। দিনান্তে নিশান্তে সময় সব ঝেড়েমুছে ফেলে দেয়। কালে-ভদ্রে কিছু ঘটনা টিকে যায়। তার মধ্যে কোনটা টিকবে, কোনটা টিকবে না, অতি বড় ঐতিহাসিকও সেটা হলফ করে কিছুতেই বলতে পারবেন না। শুধু সময়ই তার বিচার করবে। সেই সময়ই দশক-শতক, যুগ-মহাযুগ, মহাকাল। চিরকালের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার হবে সমকালের, সমকালীন গুরুত্বের।

অনেক বিবেচনার পর প্রভাসকুমার ডায়েরি রাখা ছেড়ে দিয়েছেন। খুচরো দিনপঞ্জীর কোন মূল্য নেই তাঁর কাছে। কত বড় বড় ঘটনা চাপা পড়ে যায় দৈনিক খবরের ভিড়ে।

আজ আমগাছে মুকুল দেখা দিয়েছে। কিংবা বসন্তের কোকিল এ বছর এখনও দেখা যায়নি, তার ডাক শোনা যায়নি। হুলো বেড়ালটা তিনদিন বাড়ি আসেনি। নিতান্ত এলোমেলো। খাপছাড়া কাঁচা কবিতার ভাষায় এখন ডায়েরি রাখেন প্রভাসকুমার।

এই ভাবে ঘটনা ও সংবাদহীন ডায়েরির পাতা ভরে যায় ধীরে ধীরে ভরে যায় বিমূর্ত স্মৃতিচিত্রে।

ব্ল্যাক-আউট উঠে গেছে। শহরের রাস্তায় আবার আলো জ্বলেছে। বিদ্যুতের আলো নয়, বিদ্যুৎ আলো এ শহরে আসেনি। দূরে দূরে ল্যাম্প-পোস্ট, সন্ধ্যাবেলা মিউনিসিপ্যালিটির লোক বাঁশের মই কাঁধে করে নিয়ে এসে কেরোসিনের বাতিতে তেল দিয়ে, আলো জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। ছয় ঘণ্টা মেয়াদি তেল। রাত বারোটার পর সব অন্ধকার শুনশান। মিউনিসিপ্যালিটির এর অধিক ক্ষমতা নেই। শুক্লপক্ষের 'শেষ কয়েকদিনও একেবারেই আলো না জ্বালিয়ে তেল বাঁচানো হয়।

যুদ্ধের সময় একটা আতঙ্ক, একটা ভুল বোঝাবুঝি শুরু হয়েছিল। হিন্দু মুসলমান কেমন যেন নিজেদের অজান্তেই আলাদা হয়ে গিয়েছিল।

এখন সে ভাবটা কেটে গেছে। সামনে সরস্বতী পুজো আসছে। প্রভাসকুমারদের বাড়ির সামনের মাঠে মঞ্চ বাঁধা হচ্ছে। পুজো হবে।

পুজোর পরে থিয়েটার হবে। শচীন সেনগুপ্তের সিরাজদ্দৌলা।

বাংলা শুধু হিন্দুর নয়। বাংলা শুধু মুসলমানের নয়, মিলিত হিন্দু-মুসলমানের...। সাহায্য যা পেয়েছি...আঘাত যা পেয়েছি...।

বাৎসরিক পরীক্ষা এবং পরীক্ষার ফল বেরোনো, প্রমোশন ইত্যাদির পর নতুন ক্লাস এখনো শুরু হয়নি। প্রভাসকুমারের দালানের বাইরের বারান্দায় দুই বেলা, সকালে সন্ধ্যায় পাড়ার ছেলে-মেয়েদের জটলা। থিয়েটারের রিহার্সাল চলছে।

ছেলে-মেয়েরা প্রভাসকুমারকে ধরেছিল নাটকটাকে ছাঁটকাট করে একটু ছোটমত করে দিতে। এক সময়ে করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের সম্পাদক ছিলেন প্রভাসকুমাব। নাট্যামোদী বলে এখনও শহরে তাঁর খ্যাতি আছে। তাই এই আবদার।

কেটেকুটে ছোট করার সময় প্রভাসকুমাব শুধু আকারেই নাটকটিকে ছোট করেননি, ছোটদের যোগ্য করে দিয়েছিলেন। 'আলেয়া' জাতীয় প্রাপ্ত বয়স্ক অংশগুলি যথাসাধ্য বাদ দিযে দিযেছিলেন।

এদিকে একদিন কলকাতা থেকে সরাসরি ইপিনের চিঠি এলো। দু দেশের মধ্যে ডাক চালু

হয়ে গেছে। প্রথম ডাক খুব তাড়াতাড়ি এসেছে। যুদ্ধের সময় আটকিয়ে যাওয়া ডাক পরে পরে আসতে লাগল।

ডাক চালু হ'ে যাওয়ায় আরও অনেকের মত স্মৃতিকণা-প্রভাসকুমার খুব খুশি। একেকটা চিঠি আসে আর তাদের মনে হয় যেন হাতে চাঁদ পেলেন।

নিতান্ত শিশু পৌত্রদের উচ্ছ্বাসভরে স্মৃতিকণা চিঠি লিখলেন, 'প্রাণনাথগণ,' সম্বোধন করে।

খবর যা আসছিল তা ভালই। মেনকা, ইপিন, বাচ্চারা কুশলে আছে। বিপিনের ব্যাঙ্কের চাকরিটারও কোন ক্ষতি হয়নি, সে ফিরে গেলেই কাজে যোগদান করতে পারবে।

বিপিনের ফিরে যাওয়ার দিনও এসে গেছে। তার যুদ্ধবন্দির দশা শেষ।

একদিন সকালবেলা প্রভাসকুমার আকাশবাণীর সংবাদে শুনলেন আন্তর্জাতিক তদারকিতে যুদ্ধবন্দিদের যে যার দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বন্দি জীবনের জন্যে তারা মার্কিন ডলারে ক্ষতিপূরণ পাবে। ডেনমার্ক প্রত্যেক বন্দিকে একটা করে দুধের কৌটো দিয়েছে, রাশিয়া দিয়েছে কম্বল। ফেরার পথে হাতখরচার জন্যে স্বয়ং পাকিস্তান সরকার প্রত্যেক বন্দিকে দুশো টাকা দেবে।

সংবাদ শুনে স্মৃতিকণাকে নিয়ে প্রভাসকুমার সেদিনই দুপুরের বাসে মুক্তাগাছা গেলেন বিপিনকে যাওয়ার আগে একবার দেখার জন্যে।

কিন্তু গিয়ে দেখলেন রাজপ্রাসাদ ফাঁকা। সেপাই-শাস্ত্রী, বন্দি কেউ কোথাও নেই। করুণস্বরে পায়রা ডাকছে কার্ণিসে। উঠোনে টুকরো-টাকরা, ছেঁড়া কাপড়, কাগজ পড়ে রয়েছে। মেলা ভাঙার পরে যেমন হয়।

সন্ধ্যোয় বাসায় ফিরে বিপেনের একটা হাত চিঠি পেলেন প্রভাসকুমার। কেউ এসে দিয়ে গেছেন। চিঠিটা সংক্ষিপ্ত, 'যাচ্ছি, কলকাতা গিয়ে চিঠি দেব।' বিপিনের চিঠির নিচে পুনশ্চ, সে অংশটা কিছুই বুঝতে পারলেন না প্রভাসকুমার। কিন্তু বিপিনের কাছে তার নিশ্চয় একটা অর্থ আছে।

'চাঁদের আলোয়
দেখেছিলাম জন্মভূমি।
একটু রোদ,
একটু বৃষ্টি একটু তুমি॥
কিন্তু তখন,
শুধুই চাঁদ শুধুই আলো॥
এমন সময়
কোথায় তুমি জন্মভূমি?'

এর নিচে আরেকটা পুনশ্চ। সেখানে লেখা, 'তাড়াতাড়িতে কবিতাটা কপি করা হল না। তুমি একটা কপি করে আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিও।'

*　　　*　　　*

ধীরে ধীরে দুই দেশের মধ্যে নৈমিত্তিক সম্পর্ক কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এলেও সাধারণ নাগরিকের যাতায়াত কিন্তু সুগম হল না।

রেলপথ বন্ধ। সিরাজগঞ্জের কলকাতাগামী ট্রেন সীমান্ত স্টেশন দর্শনা পর্যন্ত যাচ্ছে। সেখান থেকে রিক্শা আছে ওপার পর্যন্ত যাওয়ার জন্যে। অতি চড়া প্রায় অবিশ্বাস্য ভাড়া সেই রিক্শার। সে পথও খুব নিরাপদ নয়। গ্রাম্য মস্তান, আনসার, পাকিস্তানী সৈন্য, গোয়েন্দা, নানা রকমের উৎপাত, অত্যাচার।

কিন্তু আসল অসুবিধে হল পাসপোর্ট নিয়ে। ভারত-পাক যুদ্ধের পর পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দুদের পাসপোর্ট পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল।

নাতিদের দেখবার জন্য এবং বিপিনের বিয়ে দেওয়ার জন্যে স্মৃতিকণা উতলা হয়ে উঠলেন। তিনি মাঝেমধ্যেই তাঁর অদেখা নাতিদের স্বপ্নে দেখেন। তারা তাঁর কোলের ওপর উঠে ঝাঁপাঝাঁপি করছে। একদিন স্বপ্ন দেখলেন তার কোলে এক নাতি পেচ্ছাব করে দিয়েছে। খুব স্পষ্ট। জ্যান্ত স্বপ্ন। ধড়মড় করে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে স্মৃতিকণা শাড়ির কোলের কাছে হাত দিয়ে দেখেন সত্যি ভিজে গেছে কিনা।

পাসপোর্ট অফিস জেলা সদর ময়মনসিংহে। সে অফিস প্রায় বন্ধের মত। কোন ফর্ম কাউকে দেওয়া হচ্ছে না। ব্যারিস্টার আবুবকর আগেরবার পাসপোর্ট করিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু পাকিস্তান সরকার নিয়ম জারি করেছে কোন পুরনো পাসপোর্ট চলবে না। মেয়াদ থাকলেও সব পাসপোর্টকেই রিনিউ বা নবীকরণ করিয়ে নিতে হবে।

নবীকরণের জন্য নতুন ফর্ম তৈরি হয়েছে। কিন্তু সে ফর্ম নাকি গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস থেকে ছাপা হয়ে আসে নি। আবার আড়ালে-আবডালে উৎকোচ দিয়ে কেউ কেউ সে ফর্ম জোগাড় করছে, এমন খবরও আছে।

যুদ্ধের পর থেকে আবুবকর ব্যারিস্টারের খবর নেই। সে নাকি ঢাকায় পাট উজিয়ে লণ্ডনে চলে গেছে।

শিবনাথ কর্মকার নামে আদালতের এক মুহুরি আছে, সে পাসপোর্ট-ভিসার টাউটের কাজ করে। এতকাল শিবনাথকে পাত্তা দেয়নি প্রভাসকুমার।

কিন্তু লোক পাঠিয়ে স্মৃতিকণা শিবনাথকে বাড়ির মধ্যে ডেকে পাঠালেন। শিবনাথ বলল, ফর্ম আনাতে অসুবিধে হবে না। পাসপোর্টটা জমা দিতে হবে আর প্রত্যেক ফর্মের সঙ্গে একশো টাকা করে খরচ করতে হবে।

নিরুপায় প্রভাসকুমার এর মধ্যে মাথা গলালেন না। শিবনাথ প্রভাসকুমার ও স্মৃতিকণার পাসপোর্ট দুটো আর সেই সঙ্গে দুশো টাকা নিয়ে চলে গেল।

এবং সত্যি সত্যিই দু'সপ্তাহের মাথায় শিবনাথ দুটো রিনিউয়াল ফর্ম নিয়ে এল। তবে পাসপোর্ট দুটো আসেনি। সেটা নাকি জেলা অফিসে জমা রয়েছে।

প্রভাসকুমার, ফর্ম দুটি দেখে বললেন, 'ফর্ম তো হল। কিন্তু পাসপোর্ট দুটো না পেলে এই ফর্ম পূরণ করব কি করে? পাসপোর্ট নম্বর লাগবে, তারিখ লাগবে।'

শিবনাথ অবশ্য অবিচল। সে বলল, 'ফর্মের নিচে আপনারা দু'জনে দু'টো সই করে দিন। আমি জেলা অফিসে গিয়ে ফিল-আপ করিয়ে নেব।' তারপর একটু ইতস্তত করে শিবনাথ বলল, 'পাসপোর্ট প্রতি দেড় হাজার করে টাকা লাগবে, মোট তিন হাজার টাকা।'

প্রভাসকুমার অবাক হয়ে বললেন, 'এত টাকা?'

শিবনাথ বলল, 'এটাই এখন রেট হয়েছে। এ বাজারে এর চেয়ে কমে পাসপোর্ট হচ্ছে না। আমি কি আর আপনাদের কাছ থেকে লাভ নিচ্ছি।'

উনিশ'শো ছেষট্টি সালের পূর্ব-পাকিস্তানে তিন হাজার টাকা অনেক টাকা। গ্রামাঞ্চলে ওই

টাকায় ছয় বিঘে জমি কেনা যায়। কিন্তু প্রভাসকুমারকে কথা বাড়াতে দিলেন না স্মৃতিকণা। তিনি শিবনাথকে পরের দিন বিকেলের দিকে আসতে বললেন।

পরের দিন দুপুরে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে বাসায় পাঠিয়ে দিলেন প্রভাসকুমার। সন্ধ্যাবেলা শিবনাথ এসে টাকা নিয়ে গেল। বলে গেল, 'এক মাসের মধ্যে পাসপোর্ট হয়ে যাবে।'

শিবনাথের কথার ওপরে ভরসা করে স্মৃতিকণা আবার গোছগাছ করা আরম্ভ করলেন। বিপিন-উমার ব্যাপারটা তাঁর জানা ছিল। আপত্তির অবকাশ ছিল না। তিনি ইপিনকে লিখলেন, শ্রাবণ মাসের শেষের দিকে বিপিনের বিয়ের তারিরখ ঠিক করতে আর ইপিনকে এও লিখলেন যে সে যেন উমার বাবাকে বলে যে তিনি যেন বিয়ের প্রস্তাব করে প্রভাসকুমারকে একটা চিঠি দেন।

এটা হল বৈশাখ মাসের ঘটনা। শিবনাথ সেই যে টাকা নিয়ে গেল, সে আর এদিকমুখো হল না। প্রভাসকুমার অবশ্য তাকে দুয়েকবার কাছারিতে দেখেছেন। কিন্তু শিবনাথ তাঁকে এড়িয়ে গেছে। এদিক-ওদিকে কেটে পড়েছে কিংবা ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছে।

এদিকে উমার বাবার চিঠি এসে গেছে। সুন্দর ছাপানো প্যাডে ইংরেজিতে টাইপ করা চিঠি :—

ডিয়ার মিস্টার চৌধুরী,

...আপনার পুত্র এবং আমার কন্যা পরস্পরকে বিবাহ করতে উদ্যোগী হয়েছে। এ বিষয়ে আপনার আপত্তি নেই জেনে আপনাকে এই পত্র লিখছি।

আপনি এবং মিসেস চৌধুরী কবে কলকাতায় আসতে পারবেন জানাবেন, আমরা সেই অনুযায়ী বিয়ের দিন ঠিক করব। আমি আপনার বড় ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি।

আপনার চিঠি পেলে সেই অনুযায়ী সব বন্দোবস্ত করা যাবে। বিপিন এবং উমা উভয়েই রেজিস্ট্রি বিবাহে ইচ্ছুক, হয়ত ইতিমধ্যে রেজিস্ট্রি করেও ফেলেছে। আপনি চাইলে আর্যসমাজী বিয়ের বন্দোবস্ত কবা যাবে দয়ানন্দ সরস্বতীর আশ্রমে।

আপনাদের আগমনের এবং আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হবার প্রতীক্ষায় আছি।

আপনি ও মিসেস চৌধুরী আমাদের....

আপনাদের সিনসিয়ারলি

রেজিস্ট্রি করে কিংবা আর্যসমাজী মতে ছেলের বিয়ে হওয়া প্রভাসকুমারের পছন্দ নয়। এদিকে স্মৃতিকণা অনেক বেশি আধুনিক।

সে যা হোক প্রভাসকুমার স্মৃতিকণার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করলেন রেজিস্ট্রি, আর্যসমাজী মেয়েব দিকে যেমনই হোক, তাঁদের দিকে বিপিনের বিয়ে ইপিনের বিয়ের মতই বাঙালিয়ানাভাবে হবে। সেই পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়। লেবু, মাটির ভাঁড়, কলাপাতা, ছ্যাঁচড়া, বেগুনভাজা, মাছের মাথা দিয়ে ডাল, মাছের ঝাল, মাংস। কলকাতার বিখ্যাত প্লাস্টিক চাটনি, পাঁপড়, দই, মিস্টি এবং চমচম।

প্রভাসকুমার ভাবী বেয়াইকে চিঠির উত্তরে লিখেছিলেন, আগস্টের প্রথম দিকে (মানে শ্রাবণ মাসের শেষাশেষি) বিয়ের সামাজিক অনুষ্ঠানটা সেরে ফেলা যেতে পারে। সেই সময়ে তাঁরা কলকাতায় যাবেন।

কিন্তু শিবনাথ আর এল না। তার কোন পাত্তাই নেই। রাস্তাঘাটেও তাঁকে আর দেখা যায় না, ইচ্ছে করেই সে প্রভাসকুমারকে এড়িয়ে চলে।

শিবনাথের বাড়ি চেনেন প্রভাসকুমার। নদীর ওপারে ইনাতপুর গ্রামে। যৌবনে প্রভাসকুমার শিবনাথের এক কাকার সঙ্গে একই ফুটবল টিমে রাইট ব্যাক, লেফট ব্যাক খেলেছেন। শিবনাথের

সেই কাকা রামনাথ বহুদিন হলো ওলাওঠা হয়ে মারা গিয়েছে। পুরনো দিনের লোকেরা এখন ফুটবল খেলার আলোচনা প্রসঙ্গে প্রভাস-রামনাথ জুটির উল্লেখ করে, আক্ষেপ করে বুট ছাড়া খালি পায়ে ওরা কেমন খেলত এ কালের ছেলেদের খেলা তার ধারে কাছেও যায় না।

সে যা হোক। ফর্ম নিয়ে যাওয়ার প্রায় মাস দু'য়েক পর পাড়ার একটি ছেলেকে প্রভাসকুমার শিবনাথের বাড়িতে পাঠালেন। প্রায় মাইল আড়াই পথ। খুব ভোরবেলা উঠে ছেলেটি হেঁটে, তারপর খেয়া পার হয়ে ইনাতপুর গিয়ে শিবনাথকে ধরল। ইতিমধ্যে বর্ষার নদীতে জল এসে গেছে, তার ভাঙা পার দিয়ে সাইকেল চালানো সম্ভব নয়।

নদীর তীরে দো-আঁশলা কাদা রাস্তায় হেঁটে যেতে বেশ সময় লেগেছিল ছেলেটির। কিন্তু শিবনাথকে পেয়ে যায়। শিবনাথ জানায়, 'আজ নিজেই যেতাম, তোমাকে আবার উকিলবাবু পাঠাতে গেলেন ?'

মোটামুটি শিবনাথ যা বলল তা হল ময়মনসিংহ অফিসে পাসপোর্ট যার কাছে জমা দিয়েছে সে লোক বদলি হয়ে গেছে। তার জায়গায় নতুন লোক কেউ আসেনি। সামনের সপ্তাহে শিবনাথ আবার ময়মনসিংহ যাচ্ছে খোঁজখবর নিতে।

এই সংবাদ পেয়ে প্রভাসকুমার খুব আশ্বস্ত হলেন না। স্মৃতিকণা তো রীতিমত অস্থির হয়ে উঠলেন।

অবশেষে প্রভাসকুমার নিজেই একদিন ময়মনসিংহ গেলেন পাসপোর্টের খোঁজখবর নিতে। এটা তাঁর চেনা শহর, এখানে আনন্দমোহন কলেজে তিনি পড়েছিলেন।

পাসপোর্ট অফিসে খোঁজখবর নিয়ে কিছুই হদিশ করতে পারলেন না তিনি। শিবনাথ পাসপোর্ট দুটো নিয়ে কি করেছে, কোথায জমা দিয়েছে, কেউ কোন খবর দিতে পারল না।

পাসপোর্ট অফিসের ও সি রহমত আলি এক সময় টাঙ্গাইলে ছিলেন। তিনি প্রভাসকুমারকে দেখে চিনতে পেরে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। দুটো নতুন পাসপোর্টের ফর্ম দিয়ে বললেন, 'ফটো লাগিয়ে কাবও হাত দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।'

প্রভাসকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুরনো পাসপোর্ট এর সঙ্গে লাগবে না ?'

রহমত আলি বললেন, 'লিখে দেবেন, হারিয়ে গেছে।'

ঊনিশশো ছেষট্টি সাল চোখের সামনে দিয়ে দেখতে দেখতে চলে গেলো।

সারা শীতকাল ধরে আম-জাম-কাঁঠালের ঝরাপাতা উড়লো প্রায় শূন্য পুরনো, আলাভোলা বাড়িটার চার পাশে। কাঁঠচাপা, সজনে, বাতাবি লেবুর ফুল থরে থরে ঝরে পড়লো ভিতর আর বাইরের উঠোনে। একদিন বৈশাখ মাসের শেষ রাতের দমকা ঝড়ে একটা বুড়ো নারকেল গাছ দালানের ছাদের ওপর ভেঙে পড়লো। ছয় ইঁটের, তিরিশ ইঞ্চি গাঁথনির থাম, দেয়াল, পাকাপোক্ত পাকাবাড়ি, পুরুষানুক্রমে বসবাসের জন্যে তৈরি হয়েছিল। এত সহজে এ দালানের বিশেষ কিছু ক্ষতি হওয়ার নয়, তা হল না, কিন্তু ছাদের কার্নিশে যেখানে নারকেল গাছটা মুখ থুবড়ে পড়েছিল সেখানে একটা স্পষ্ট চিড় ধরে গেলো।

সেদিন সকালবেলায় অনেকদিন পরে প্রথমে প্রভাসকুমার এবং তাঁর পেছনে স্মৃতিকণা উঠলেন ছাদের কতটা ক্ষতি হয়েছে সেটা দেখার জন্যে।

ছাদ আজকাল ব্যবহার করাই হয় না। চুন-সুড়কির জলছাদ মাঝে মাঝে ফেটে গেছে। অনেক জায়গায় শ্যাওলা ধরেছে। প্রত্যেক বছর বরষাতেই এখান-ওখান দিয়ে জল পড়ে, সারাতে হয়। পুরো ছাদটাই আর্ধেক ছেঁটে ফেলে দিয়ে একবার ভালোভাবেই সারাই করা দরকার। কিন্তু প্রভাসকুমারের তাতে উৎসাহ নেই। তাঁদের পরে কে থাকবে এই বাড়িতে, কাদের জন্যে খরচ করে বাড়ি সারাবে।

ছাদের উত্তর ধাব ঘেঁষে এক সারি আমগাছ। দুটো তিনটে বেশ পুরনো, কয়েকটা নতুন। সব গাছের একটা করে নাম আছে। অধিকাংশই পুরনো দিনের স্মৃতিকণার শাশুড়ির কিংবা দিদিশাশুড়ির আমলের। কলাবতি, গোলাপি, সিঁদুরে, পানতুয়া রং বা আকাব দেখে সব নামকরণ। স্মৃতিকণার আমলেরও দুটো গাছ আছে। এ অঞ্চলে ভাল আম খুব একটা হয না। কিন্তু এই নতুন গাছ দুটো কলমের চারা থেকে হযেছে, স্মৃতিকণাই বাপের বাড়ি থেকে এনে লাগিয়েছিলেন, বেশ মিস্টি আর সুস্বাদু ফল হয় এই গাছ দুটোয়।

স্মৃতিকণা নিজেই এদের নামকরণ করেছেন মৌটুসি আর মধুছন্দা।

সবগুলো গাছেই ভাল বোল এসেছিল। বৈশাখের শেষে এখন আমের কুচিগুলো বড় হয়ে গুটির আকার ধারণ করেছে। গত বছব প্রায় এই সময়ে ইপিন আর মেনকা এসেছিল।

ছাদে উঠে প্রভাসকুমার আর স্মৃতিকণার দু'জনারই মনটা কেমন হয়ে গেলো। কত ডালের বড়ি, আমসত্ত্ব শুকনো হয়েছে, পৌষ মাসের পার্বনেব চালেব গুড়ো। ইপিন-বিপিনের ছোটবেলার কথা, কবেকার বাড়িভর্তি লোকজন আত্মীয়স্বজনের কথা, বহু স্মৃতিবিজড়িত এই খোলা ছাদ। সামনে কাছারিঘরের ওপাশে পুকুরের জলে হাঁস সাঁতার কাটছে। নিচে বারান্দার থামের আড়ালে কয়েকটা পায়রা অশ্রান্তভাবে বকম বকম ডেকে চলেছে। মনে হয় পৃথিবীতে এমন শান্ত সমাহিত জায়গা আর কোথাও খুঁজে পাওযা যাবে না।

গ্রীষ্মের সকালের রোদ এরই মধ্যে চড়া হয়ে উঠেছে। তবে শরীরে তেমন ঝাঁঝ লাগছে না, পুকুরের দিক থেকে একটা মৃদুমন্দ দক্ষিণা বাতাস বয়ে আসছে।

স্মৃতিকণা এবং প্রভাসকুমার যেখানটায় নারকেল গাছটা এসে পড়েছে সেখানটায় এসে দাঁড়ালেন। বিয়ের পরে বহুবার সন্ধ্যাবেলা ছাদে উঠে এখানে স্মৃতিকণা একাকী দাঁড়িয়ে থেকেছেন। সামনে কাছারির রাস্তা দিয়ে প্রভাসকুমার আদালত থেকে ফিরতেন, স্বামীকে দেখেই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যেতেন। প্রভাসকুমারও টের পেতেন। স্মৃতিকণা তাঁকে ছাদের ওপর থেকে দেখছে, তারপর নিচে নেমে আসে।

মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগের কথা সব। কিন্তু মনে হয় যেন বহু যুগ আগের। দেশ-কাল, প্রতিবেশ-পরিবেশ, ধ্যান-ধরণা সব আমূল বদলিয়ে গেছে।

বুড়ো মুহুরিবাবু ছাদে উঠে এসেছিলেন, প্রভাসকুমারদের পিছে-পিছেই। অনাদিবাবু এ বাড়ির অনেক পুরনো লোক। প্রভাসকুমারের বাবার আমলের। এই দালান তৈরির আমলে তিনি এই সেরেস্তায় এসেছিলেন। এবং এই সেরেস্তার কাজ করেই মুহুরিগিরির আয়ে তিনি নিজের গ্রামেও একটা দালান বানিয়েছিলেন।

অনাদিবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রভাসকুমার বললেন, 'দুটো কামলা লাগবে। গাছটাকে কেটে ফেলতে হবে।'

অনাদিবাবু বললেন, 'কাত হয়ে পড়ে গেছে বটে তবে শিকড় বোধহয় উপরোয়নি। গাছটা

এভাবেও বহুকাল বাঁচবে। দালানের যখন কোনও ক্ষতি হয়নি, গাছটাকে কেটে ফেলে লাভ কি ? ফলবান গাছ।'

অনাদিবাবুর কথা প্রভাসকুমার মেনে নিলেন। পুরনোকালের মানুষ। অনেকে কিছু জানেন বোঝেন।

এই প্রস্তাবে স্মৃতিকণাও খুশি হয়েছিলেন একটা শিশুসুলভ কারণে। তা হলে এ গাছের ডাব-নারকেলগুলো ছাদে উঠে হাতে হাতেই পেড়ে নেওয়া যাবে।

গাছ থেকে নিজের হাতে ফল পাড়ার একটা আনন্দ আছে। ছাদের পাশের, আমগাছগুলো থেকে কাঁচা-পাকা আম অনেক সময়েই স্মৃতিকণা আগে হাত দিয়ে পাড়তেন। আজকাল আর করেন না।

কিন্তু আজ সকালে পড়ে যাওয়া নারকেল গাছের মাথায় ঝুলন্ত ডাবের কাঁদি হাতের নাগালে পেয়ে তিনি চিলেকোঠার ঘর থেকে একটা পুরনো হাতবঁটি এনে গোটা কয়েক ডাব কাঁদি থেকে কেটে ফেললেন। পরে নিচে নেমে ছাদে লোক ডাকিয়ে সেগুলো নামিয়ে আনালেন।

ডাবগাছটা কিন্তু বাঁচেনি। সে বছর অতি দীর্ঘ বর্ষা হয়েছিল। অনেক কাল পর নদীর জল খাল ছাপিয়ে উঠে শহরের রাস্তাঘাট বাড়িঘর প্লাবিত করে দিয়েছিলো। নারকেল গাছটা আর মাটির সঙ্গে জোড়া লাগেনি। ছিঁড়ে যাওয়া শিকড় জলে ডুবে পচে গিয়েছিল।

বর্ষার পরে পুজো নাগাদ নারকেল গাছের ডালপালাগুলো সব হলুদ হয়ে গেলো। তখন লোক ডেকে গাছটাকে কেটে ফেলা হল।

শরৎকালও শেষ হয়ে গেল। এবার অবশ্য দুর্গা পুজোয় বর্ষা ছিল না। কালীবাড়িতে পুজোও হল। তবে সেও প্রায় নম নমো করে। আগে বোঝা যায়নি, পঁয়ষট্টির যুদ্ধে পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুদের মনটা একদম ভেঙে গেছে। দেশের প্রতি টান পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গেই গিয়েছিল, এখন ধর্ম ও সমাজের ওপর টানটাও কমে এল।

হেমন্ত কাল এলো। কার্তিক মাস। আগের বার যুদ্ধবিরতির পরেও এই কার্তিক মাসে আনসাররা এক সন্ধ্যায় প্রভাসকুমারকে আকাশপ্রদীপ জ্বালাতে বাধা দিয়েছিল। এইভাবে নাকি ইণ্ডিয়াকে সিগন্যাল পাঠানো হয়। তুলসীমঞ্চের পাশে আকাশপ্রদীপের লম্বা বাঁশের মাস্তুলটা এখনো রয়েছে। কিন্তু এ বছর আর আকাশপ্রদীপ জ্বালানো হল না। স্মৃতিকণা কিংবা প্রভাসকুমার কেউই কোনও উদ্যোগ নিলেন না। একবার ভিতর বাড়ির ছোট ছেলে হারু এসে বলেছিল, 'দিদি কালীবাড়িতে প্রদীপ তুলেছে। তেল দাও। আমাদেরটা তুলি।'

হারুর আমাদের বাড়ির মধ্যে চৌধুরীবাড়িও পড়ে। সে বলতে গেলে এ বাড়িরই একজন।

কিন্তু স্মৃতিকণা হারুর আগ্রহের অংশীদার হলেন না। তাঁর আর কোনও বিষয়েই কোন আগ্রহ নেই। গত বছর এমন দিনে বিপিন মুক্তাগাছার বন্দিনিবাসে।

একটা বছর কোথা দিয়ে ঝড়ের মত কেটে গেল। উনিশশো ছেষট্টি সাল প্রায়। শেষ বাতাস উত্তরের দিকে ঘুরছে। আবার কাঠচাঁপার ডালে পাতাঝরা শুরু হয়েছে।

স্মৃতিকণা কিংবা প্রভাসকুমার কেউই এখনও পাসপোর্ট পাননি। চেনা জানা, তদ্বির-তদারক, দৌড়াদৌড়ি যথাসাধ্য করা হয়েছে কিন্তু একেবারে দালাল বা টাউট ছাড়া প্রায় কোনও হিন্দুকেই পাকিস্তানে পাসপোর্ট দেওয়া হচ্ছিল না।

সুতরাং স্মৃতিকণা আর প্রভাসকুমারের কলকাতা যাওয়া হল না। তাঁর প্রাণাধিক নাতিদের একবার চোখের দেখা দেখতে পেলেন না। পুজোর সময় তাদের একবছর বয়েস পূর্ণ হয়েছে।

তাদের জন্য কালীবাড়িতে সে সময়ে তিনি পুজো দিয়ে এসেছিলেন।

কয়েকদিন আগে দু'জনের ছবি এসেছে। ইপিনের কোলে একজন, মেনকার কোলে একজন। দু'জন একরকম দেখতে। দু'জনারই মাথায় ঘন কালো চুল। চোখ দুটো ঝকঝকে। অনেকটা বিপিনের চোখের মত। হামাগুড়ি ছেড়ে এখন হাঁটতে শিখেছে। দাঁত উঠেছে।

স্মৃতিকণা বারবার ফটোটা দেখেন। পাড়ার লোকেদের দেখান। কিন্তু তাতে মন ভরে না।

বিপিন দুই ভাইপোর নাম রেখেছে খাতা আর বই। ডাক নাম হিসাবে চলতে পারে। যদিও স্মৃতিকণা কিংবা প্রভাসকুমার কারোরই নাম দুটো পছন্দ নয়।

অবশ্য এর চেয়েও অপছন্দ ওদের দু'ভাইয়ের এদের বাবা ইপিন ভালো নাম যা রাখতে চেয়েছে।

আষাঢ় মাসে কোনওরকমে নিয়মরক্ষা করে কলকাতায় মুখেভাত হয়েছে ইপিনের ছেলেদের। বলা বাহুল্য স্মৃতিকণা, প্রভাসকুমার কেউই যেতে পারেননি। সেই সময় ইপিন জানিয়েছিলেন ছেলেদের নাম রাখছে মোগল আর পাঠান। ব্যতিব্যস্ত হয়ে প্রভাসকুমার জানিয়েছিলেন ওইরকম নামে অন্নপ্রাশন হবে না।

প্রভাসকুমার জানিয়েছিলেন যে তিনি দু'জোড়া নাম বেছে রেখেছেন, 'সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্র,' 'হর্ষবর্ধন-রাজ্যবর্ধন।' সম্ভবত এই 'হর্ষবর্ধন-রাজ্যবর্ধন' থেকেই উৎসাহ পেয়ে আগের চিঠিতে ইপিন জানিয়েছে ছেলেদের ভাল নাম সে অশোক এবং আকবর রাখতে চায়।

অবশ্য আপত্তি জানিয়ে প্রভাসকুমার আবার পত্রাঘাত করেছেন। ইপিনের উত্তর এখনও আসেনি।

মুখেভাত পিছিয়ে দেওয়া যায়নি। কিন্তু বিপিনের বিয়ে ইতিমধ্যে দু'বার পিছনো হয়েছে। এক বছর দেরি হয়ে গেছে। উমার বাবা স্বভাবতই চাপ দিচ্ছেন।

পাসপোর্ট পাওয়া যাবে না। এটা প্রায় ধরেই নিয়েছেন প্রভাসকুমার। তিনি ইপিনের ওপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। সামনের মাঘ মাসে ফেব্রুয়ারির প্রথমে বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে। যদি পাসপোর্ট ততদিনে পাওয়া যায়, স্মৃতিকণা প্রভাসকুমার যাবেন, না হলে যাবেন না।

তিন-চারবার পিছিয়ে দেওয়া হল বিপিনের বিয়ে। কিন্তু প্রভাসকুমার কিংবা স্মৃতিকণা কেউই পাসপোর্ট পেলেন না। পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

আশেপাশে টাঙ্গাইল শহরে কোন হিন্দুই গত দু-আড়াই বছরে পাসপোর্ট পায়নি। প্রভাসকুমার চেষ্টা কিংবা তদ্বির আর করেননি। কোনও লাভ হবে না এই আশঙ্কায়। ছেলের বিয়েতে বাবা-মা উপস্থিত থাকতে পারবেন না, এটা উমার বাবা মেনে নিতে পারছিলেন না। কিন্তু উমার মা ও ঠাকুমা চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। মেয়ে এতো মেলামেশা করছে ভাবী পাত্রের সঙ্গে, অথচ বিয়ে হচ্ছে না। বারবার বিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে।

এদিককার সমস্যাটা তাঁরা বুঝেছিলেন। কিন্তু এই আন্তর্জাতিক জটিলতা বোঝার ক্ষমতা তাদের ছিল না। তাছাড়া এমনিতেই এই আন্তঃরাজ্য বাঙালি-তামিল বিয়েতে তাদের খুব সায় ছিল না। যদিও বিপিনকে তাদের কখনই খারাপ লাগেনি।

কিন্তু একে এই রকম গোলমেলে বিয়ে। পাত্র ভিন্ন সমাজের। দেখতে শুনতে আহামরি কিছু নয়। সহায়-সম্পত্তি বলতে কিছু নেই।

উমার এই রকম বিয়ে না হয়ে ঘর-বর দেখে স্বজাতির মধ্যে বিয়ে হলেই তাঁরা খুশি হবেন, এবং সেটাই স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও এই দুই রক্ষণশীল তামিল মহিলা উমার মনের কথা ভেবে বাধা দেননি। কিন্তু এখন বারবার বিয়ের তারিখ পিছিয়ে যাওয়ায় তাঁরা শোরগোল তুললেন।

বেশ অনেকদিন ঠেকিয়ে রাখাবার পর অবশেষে ইপিন ও উমার বাবা আলোচনা করে সাতষট্টি সালের মে মাসে বিপিন-উমার বিয়ের আয়োজন করলেন। সে বিয়েতে স্মৃতিকণা কিংবা প্রভাসকুমার কারও আসা হয়নি। বিয়ের দিন তোলা এক গোছা ফটো ইপিন বাবা-মাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। খুব মন খারাপ হলে টাঙ্গাইল বাড়িতে শূন্য ঘরে বসে স্মৃতিকণা একা একা কিংবা কাউকে সঙ্গে নিয়ে ছবিগুলো উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে দেখতেন।

ছেলের বউয়ের মুখ দেখা হল না। নাতিদের দেখা হল না। নাতিদের অন্নপ্রাশন, ছেলের বিয়ে দুই-ই তাদের অনুপস্থিতিতে হলো, খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন স্মৃতিকণা এবং প্রভাসকুমার। সেই ঘোরতর পাকিস্তানী আমলেও প্রভাসকুমার তাঁর এই ক্ষোভ গোপন রাখেননি।

প্রভাসকুমার বহুবার বার লাইব্রেরিতে তাঁর জুনিয়র উকিলদের বলেছেন, 'তোমাদের ধর্মরাজ্য পাকিস্তানে সংখ্যালঘুর প্রতি অবিচার কেন?'

প্রভাসকুমারের জুনিয়র মুসলমান উকিলদের অনেকেরই পাসপোর্ট ছিল। তাদের পাসপোর্ট রিনিউ করাতে কোনও অসুবিধে হয়নি। এদের মধ্যে কেউ কেউ নিয়মিতই কলকাতায় যাতায়াত করত। কলকাতায় ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটে অ্যাংলো মেয়েদের তখনও খুব রমরমা। বৎসরান্তে উপরি আয় খরচ করতে কেউ কেউ সেখানেও যায়।

প্রভাসকুমারের কথায় অবশ্য কেউই তেমন রাগ করে না। তাঁর অভিযোগটা ন্যায্য। কিন্তু এদের কারও কিছু করার নেই। স্বৈরতান্ত্রিক মিলিটারি শাসন চলছে, সমস্ত ক্ষমতা প্রশাসনের বিশ্বাসযোগ্য দু-চারজন আমলার হাতে, যার অধিকাংশই অবাঙালি। মিলিটারি শাসন এবং সাম্প্রদায়িকতা সত্ত্বেও প্রভাসকুমারের ওকালতি প্র্যাকটিস তখন তুঙ্গে। সকাল থেকে সন্ধ্যা মক্কেল পরিবৃত হয়ে থাকেন, সঙ্গে একদঙ্গল তরুণ ব্যবহারজীবী। নতুনরা সবাই চায় প্রভাসকুমারের জুনিয়র হতে, তাঁর সেরেস্তায় বসতে। প্রভাসকুমার কাউকে না করেন না। এই নিয়ে তাদের মধ্যে তীব্র রেশারেশি।

এরা যখন কেউ কলকাতায় যায়, ইপিন-বিপিনের সঙ্গে দেখা করে আসে। স্মৃতিকণা কখনও কয়েকটা চমচম, এক সের ঘি কিংবা আচার-আমসত্ত্ব এদের হাত দিয়ে ছেলেদের পাঠান।

এরা ফিরে এসে স্মৃতিকণাকে গল্প করে, 'বুঝলেন কাকীমা, বিপিনের বউ উমা, আপনাদের বৌমা, কেউ বলতে পারবে না মাদ্রাজি। আমাদের থেকেও ভাল বাংলা বলে।'

প্রভাসকুমারকে বলে, 'কাকাবাবু, ইপিনদার ছেলে দুটো ঠিক আপানার মতো দেখতে হয়েছে। কিছু বলার আগে বিলকুল আপনার মতো ওপরের পাটির দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়িয়ে ধরে।'
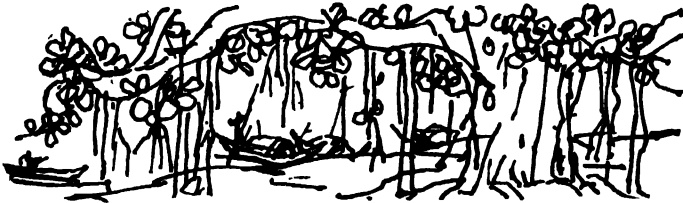
আটষট্টি সালও শেষ হয়ে গেল।

চারদিকে খরবায়ু। ঝোড়ো উত্তাল দিন। মিছিল, মিটিং, হরতাল। মিলিটারি শাসনের বিরুদ্ধে জনতা খেপে উঠেছে। মাঝে মধ্যে গ্রামে-গঞ্জে, এখানে ওখানে প্রশাসনের সঙ্গে সংঘর্ষ হচ্ছে আমজনতার। রাষ্ট্রযন্ত্রব নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে, জনসাধারণ তত অপ্রতিরোধ্য, তত অদম্য হয়ে উঠেছে।

ইস্কুল-কলেজ প্রায় হচ্ছেই না। মাঝে-মাঝে কাছারিও বন্ধ। কোট-প্যান্ট পরে রিকশায় উঠে কালীবাড়ির মোড় পর্যন্ত গিয়ে প্রভাসকুমার আবার বাড়িতে ফিরে যাবেন। মাঝে মধ্যেই স্মৃতিকণাকে বলেন, 'ব্যাপার ভালো বুঝছি না। অথচ চলে যাওয়ারও উপায় নেই। মনে হয় গোলমাল হবে, সাংঘাতিক গোলমাল হবে।'

পাকিস্তান হওয়ার পরে প্রচুর অবাঙালি মুসলমান অফিসার অপশন দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানে এসেছিলেন। প্রচুর পুলিশ কর্মচারীও। প্রথম দিকে এদের খুবই সমাদর ছিল। বাজারে ঘাটে খুব সমীহ করে কথা বলতো স্থানীয় সাধারণ মানুষ।

কিন্তু ঘটনাচক্রে অবস্থা একদম তলিয়ে গেছে। এদের দেখলেই লোকেরা খেপে যায়। মুখ খারাপ করে। আমলা, পুলিশ মুখ বুঝে অপমান সহ্য করে না। ফলে গোলমাল বাঁধে, শুধু রাস্তাঘাটে নয, অফিস কাছারিতেও। প্রায় সর্বত্রই দুটো দল হয়ে গেছে। প্রথম অবাঙালি মুসলমান, সাধারণের কাছে যারা 'বিহারী' আব দ্বিতীয় হলো বাঙালি মুসলমান, যাবা তাদের শোচনীয় অবস্থার জন্যে সর্বতোভাবে ওই বিহারীদের দাযী ভাবছে। এ রকম ভাবার সুবিধে আছে। নিজেদের সামাজিক, চারিত্রিক শৈথিল্যগুলো অবহেলা করা যায়।

এদিকে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুবা মজা দেখছে। বহু বাস্তুত্যাগের পরেও তারা এখনো কম নয়, প্রায় এক কোটি, যার অর্ধেক উচ্চবর্ণের, বাকি অর্ধেক তপসিলী জাতি। ভরা আক্রোশে এতদিনকার পুঞ্জীভূত অপমানের জ্বালায় দু দলের লড়াইটা উপভোগ করছে। সেটা অবশ্য এর পরে আর বেশি দিন সম্ভব হয়নি। প্রকৃত লড়াই, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হতে প্রথম আক্রমণ নেমে আসে মূলত হিন্দুদের ওপবে, তখন আর মুক্তিযুদ্ধে সামিল হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না।

এ সব অবশ্য দু'বছর পরের কথা, একাত্তর সালের কথা, সে তো ইতিহাস হয়ে গেছে। তবে সেই ইতিহাসেরও রকমফের আছে।

সে যা হোক, ইতিমধ্যে ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের বুনিয়াদি গণতন্ত্র সম্পূর্ণ প্রহসনে পরিণত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামে-নগরে হাটে-মাঠে, এক দীর্ঘদেহী, সুগঠিত, মন্দ্র কণ্ঠস্বর নেতার প্রভাব অমোঘ হয়ে উঠেছে। ঝড়ের মত সারা দেশ জুড়ে সঙ্গীসাথীদের নিয়ে শেখ মুজিব গরিব বড়লোক সবাইকে এক সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। পাকিস্তানী ইমারতে ফাটল দেখা দিয়েছে।

হঠাৎই একদিন এরমধ্যে ময়মনসিংহ পাসপোর্ট অফিস থেকে স্মৃতিকণার নামে এক রেজিস্ট্রি খাম এলো। খামের মধ্যে স্মৃতিকণার পাসপোর্ট, দু'বছরের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

প্রভাসকুমারের পাসপোর্ট অবশ্য আসেনি। তিনি তাঁর এক জুনিয়ারকে পাঠিয়ে ময়মনসিংহ থেকে খবর নিয়ে জানলেন, তাঁর পাসপোর্ট পেতে দেরি হবে, এখনো পুলিশ এনকোয়ারি চলছে।

তবে এর মধ্যে একটা সুখবরও পাওয়া গেল। এর পর থেকে এ সব কাজে আর ময়মনসিংহ যেতে হবে না। টাঙ্গাইলের একটা নতুন জেলা হচ্ছে। প্রায় পঞ্চাশ বছরের পুরনো প্রস্তাব এটা, সেই বৃটিশ আমল থেকে চলছিলো, এতদিনে কার্যকরী হলো।

পরে অবশ্য বাংলাদেশ হওয়ার পরে বাংলাদেশে সব মহকুমাকেই জেলা করা হয়েছে, নতুন জেলাও কিছু হয়েছে কিন্তু আগের আমলের জেলার মাহাত্ম্য মর্যাদা আর নেই।

টাঙ্গাইলে জেলা অবশ্য পাকিস্তানী আমলেই হয়েছিলো, পাকিস্তানী আমলের শেষ যুগে।

প্রভাসকুমার স্মৃতিকণাকে বললেন, 'তুমি একাই কলকাতায় গিয়ে ছেলেদের দেখে এসো। পাসপোর্ট অফিস তো টাঙ্গাইল চলে আসছে। এখন এখান থেকে আমার পাসপোর্ট করা কঠিন হবে না। সে সময় না হয় দুজনে আবার একসঙ্গে যাওয়া যাবে।'

এই রকম অবস্থায় শুধুমাত্র স্মৃতিকণার পাসপোর্টটা এসে যাওয়ায় একটু খুশিই হয়েছিলেন প্রভাসকুমার। তিনি যেতে না পারেন, না পারলেন। স্মৃতিকণা অন্তত একবার গিয়ে ছেলে-বৌ-নাতিদের কাছ থেকে ঘুরে আসুক।

পাসপোর্ট হাতে পেলেও তার মধ্যে বাধা-নিষেধ অনেক। ময়মনসিংহ থেকে পাসপোর্ট আসার দুদিনের মধ্যেই স্মৃতিকণার পাসপোর্টখানা ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের অফিসে ভিসার জন্যে পাঠানো হল। কিন্তু সেখানে পাসপোর্ট জমা দিতে গিয়ে জানা গেল শুধু পাসপোর্টের মেয়াদ বাড়ালেই হবে না প্রত্যেকবার যাওয়ার আগে জেলা শাসকের কাছ থেকে যাওয়ার অনুমতি নিতে হবে, সেখানে জেলা শাসক ভারতবাসের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেবেন।

আবার ময়মনসিংহে দৌড়োদৌড়ি। প্রায় মাস দেড়েক বাদে সাতদিনের মেয়াদি ভারত ভ্রমণের অনুমতি পাওয়া গেল।

স্মৃতিকণা একাই কলকাতায় গেলেন। রেলপথ বন্ধ। ঢাকা থেকে প্লেন আছে কিন্তু স্মৃতিকণা প্লেনে যেতে সাহস পেলেন না, এর আগে কখনও বিমানে চড়েননি। অবশেষে কিছুটা স্টিমারে, কিছুটা ট্রেনে, কিছুটা বাসে যশোহর-বেনাপোল হয়ে স্থলপথে বনগাঁ সীমান্ত পৌঁছলেন।

প্রভাসকুমার স্মৃতিকণাকে বনগাঁর সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন। আগে টেলিগ্রাম করা ছিল। ইপিন-বিপিন, মেনকা-উমা সবাই বনগাঁয় এসেছিল, এমনকি ইপিনের শিশু সন্তান দুটি। তারা তখন সাড়ে তিন বছরের প্রায় সাব্যস্ত বালক।

প্রভাসকুমারের আশা ছিল তিনি হয়ত দূর থেকে এদের একটু চোখের দেখা দেখতে পাবেন। কিন্তু সীমান্তচৌকি সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণা ছিল না। বর্ডার থেকে প্রায় আধমাইল দূরে তাঁকে আটকিয়ে দেওয়া হল। ছাড়পত্র ছাড়া এর পরে যাওয়া চলবে না।

যা হোক একজন সেপাইকে কয়েকটা টাকা দিয়ে তিনি খবর আনালেন স্মৃতিকণা সীমান্তচৌকি মোটামুটি নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেছেন। পুলিশ-কাস্টমস নিয়ে তেমন কোনও ঝামেলা হয়নি। অল্প কিছু দক্ষিণা হয়ত দিতে হয়েছে, সেটা স্মৃতিকণাকে বলাই ছিল। ওপারে ছেলে-বৌরা সবাই ছিল এখবরটাও প্রভাসকুমার পেলেন। একটু নিশ্চিন্ত হলেন বটে কিন্তু নিজের সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে এত কাছে এসেও দেখা হল না, খুব মন খারাপ নিয়ে প্রভাসকুমার টাঙ্গাইল ফিরলেন।

এই সাতদিনে স্মৃতিকণার স্নেহব্যাকুল প্রৌঢ় জীবনে সবচেয়ে সুখের সময়। দু'দিন বিপিনের শ্রীরামপুরের বাড়িতে, পাঁচদিন ইপিনের মনোহরপুকুরের বাড়িতে সাতটা দিন আনন্দে আহ্লাদে কেটে গেল।

তবু কত কথা বলার ছিল। ছেলে-বৌদের কত কি রান্না করে খাওয়াবেন ভেবেছিলেন, প্রায় কিছুই হল না।

এক জোড়া ছোট ধুতি এনেছিলেন টাঙ্গাইলের বাজিতপুরের তাঁতের হাট থেকে কিনে। কলকাতায় ওদের গায়ের মাপ নিয়ে দুটো মলমলের পাঞ্জাবি বানিয়ে দিলেন। সেই পাঞ্জাবি গায়ে পরিয়ে, কোঁচা করে ধুতি পরিয়ে স্মৃতিকণা সাধের নাতিদের সাজালেন। কি আশ্চর্য, দুটোই একদম প্রভাসকুমারের মত দেখতে হয়েছে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা দুই নাতি ঘরের মধ্যে ঘুরছে যেন ছোটখাট ডবল প্রভাসকুমার।

সাতদিনের মাথায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে ভাঙা মনে স্মৃতিকণা ফিরে গেলেন। এবার আর বলে গেলেন না, 'শিগগিরই আবার আসছি,' এ ব্যাপারে এখন আর তাঁর নিজের কোনও ভরসা নেই। আবার কবে আসতে পারবেন তা তিনি নিজেও জানেন

না।

বনগাঁ সীমান্তে বেনাপোলে আগের বারের মতই প্রভাসকুমার এসে স্মৃতিকণাকে নিয়ে গেলেন। দু'দিন পরে ইপিনের কাছে তার এল 'এ্যারাইভড সেফলি', নিরাপদে পৌঁছেছি।

এরপরে আর স্মৃতিকণা আর প্রভাসকুমারের পূর্ব পাকিস্তান থেকে কলকাতা আসা হয়নি।

সত্তর সালের বর্ষাকালে উমার মেয়ে হল। স্মৃতিকণা যাওয়ার কথা ভাবেননি। পূর্ব পাকিস্তানের টালমাটাল অবস্থা। উদ্দাম জলস্রোতের মধ্যে দিয়ে মুজিবের আওয়ামি লিগের নৌকো তরতর করে ছুটছে। সবাই ভাবছে, স্বপ্ন দেখছে, সুদিন প্রায় এসে গেল।

মেনকাই দেখাশোনা করল উমার। তাছাড়া উমার মা এসে শ্রীরামপুরের বাসায় মাস দেড়েক ছিলেন। যথাসময়ে বিপিনের কন্যাসন্তান জন্মানোর সুসংবাদ এল। এবার আর টেলিগ্রামে নয় টেলিফানে। টাঙ্গাইলে তখন টেলিফোন এসে গেছে। তবে বাসায় ফোন ছিল না, দুপুরবেলায় কাছারির সময় আদালতের বার লাইব্রেরিতে ইপিন বাবাকে ফোন করেছিল। প্রভাসকুমার তখন কোন একটা কোর্টে সাওয়াল করছিলেন। কলকাতা থেকে ফোন এসেছে শুনে হাকিম কিছুক্ষণের জন্য মামলা মুলতুবি রাখেন, প্রভাসকুমার বার লাইব্রেরিতে এসে সুখবর শুনে লোক পাঠিয়ে বাসায় স্মৃতিকণাকে জানিয়ে দেন। এই খবরটাব জন্যে এই কয়দিন স্মৃতিকণা খুব অস্থির ছিলেন।

ফোন নামিয়ে রেখে আদালতে ফিরে গিয়ে প্রভাসকুমার হাকিমকে বলেছিলেন, 'ইয়োর অনার, আজ আমার খুব আনন্দের দিন। আজ আমার একটি নাতনি হয়েছে। আমাদের বংশে ষাট বছর পরে একটি মেয়ে জন্মালো। ইযোর অনার, আমার মনটা ভরে আছে, আপনি যদি আপত্তি না করেন আমি আজ আর সওয়াল করব না।'

সেদিন প্রভাসকুমারের বহু টাকা ব্যয় হয়েছিল। আদালত শুদ্ধ লোককে উকিল-মুহুরি-মক্কেল, পেয়াদা-হাকিম যাকে যাকে সম্ভব হয়েছে সবাইকে চমচম খাইয়েছিলেন। শুধু আদালতের দুটি দোকানই নয়, বাজারের মধ্যের মিষ্টির দোকানগুলোও খালি হয়ে গিয়েছিল।

সত্তরের দশক মুক্তির দশক।

পাকিস্তানের পূর্বাকাশে বিদ্যুতের ঘনঘটা।

বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয়, মিলিত হিন্দু-মুসলমানের গুলবাগ এই বাংলা।

কেউ আর পাকিস্তান বলে না, পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলার লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন।

বাংলা। বাংলাদেশ। জয় বাংলা। গ্রামে-শহরে-গঞ্জে পঁচিশ বছর আগের শচীন সেনগুপ্তের ভাঙা রেকর্ডে বাজছে সিরাজদৌল্লা।

তোমায় আমি ভুলিনি জাঁহাপনা। স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। নির্বাচন তার প্রথম ধাপ।

সত্তর সালের মাঝামাঝি নাগাদ প্রচণ্ড গণরোষ এবং গণ-আন্দোলনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সরকার চালানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো পাকিস্তানের মিলিটারি কর্তাদের। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে কুখ্যাত, শেখ মুজিব এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী দেশদ্রোহের মামলাটি এর আগেই প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

প্রশাসন ব্যবস্থা অব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। থানা-আদালত, পরিবহণ সব বানচাল হতে চলেছে।

অবশেষে নির্বাচন ঘোষিত হল।

নির্বাচন হল ইংরেজি বছরের শেষে ডিসেম্বর মাসে। সেই শীতের শুকনো খটখটে সমতল পূর্ববঙ্গে শেখ মুজিবের নৌকো বিস্ময়কর ইতিহাস রচনা করল। মুসলিম লীগ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। প্রায় সব কেন্দ্রে আওয়ামি লিগ জিতল। এমনকি পুরো পাকিস্তানের পার্লামেন্টে তিন'শ সিটের মধ্যে শুধু পূর্ব পাকিস্তানের জোরে একশ সাতষট্টি সিট পেল মুজিবের দল।

সুতরাং পাকিস্তানের কেন্দ্রেও আওয়ামি লীগই সরকার গঠন করবে। একথা কখনও ভাবতে পারেনি পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা, তাদের নেতারা, মিলিটারির কর্তারা। নির্বাচনে এভাবে আওয়ামি লীগ জিতে আসবে এ কথা তারা অতি বড় দুঃস্বপ্নেও চিন্তা করেনি।

এই অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা যেন একটু সাহসী হয়ে উঠল। প্রকাশ্যেই তারা শেখ মুজিব এবং আওয়ামি লীগের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ল। ভোটের দিনেও হিন্দুরা দল বেঁধে নৌকো মার্কা আওয়ামি লীগের প্রতীকে ভোট দিয়েছিল। এসব ব্যাপার পাকিস্তানী কর্তাদের নজর এড়ায়নি।

* * *

ওই ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যেও কিন্তু প্রভাসকুমার এবং স্মৃতিকণা যথাসাধ্য অবিচল রইলেন। সেই ছাত্রজীবনে একবার বৃটিশ আমলে দলে পড়ে প্রভাসকুমার মদের দোকানে পিকেটিং করেছিলেন। তাছাড়া জীবনে চিরদিনই রাজনীতি থেকে দূরে সরে থেকেছেন প্রভাসকুমার।

বিশেষ করে তাঁর মধ্য-যৌবনেই তাঁর মাতৃভূমি পাকিস্তান হয়ে গেল। যে স্বাধীনতা প্রকারান্তরে জীবনে এল তা বৃটিশের পরাধীনতার চেয়েও খারাপ।

পাকিস্তানে রাজনীতির সঙ্গে কোনও সংশ্রব রাখাই প্রয়োজন মনে করেননি প্রভাসকুমার। বরং নিরাপদ দূরত্বে থাকার চেষ্টা করেছেন। নিজের ওকালতি ব্যবসা যথাসম্ভব ভালভাবে করে গেছেন। তাতে তাঁর সুনাম ও প্রতিপত্তি বছরের পর বছর বেড়েছে, হিন্দু বলে কোনও অসুবিধে হয়নি।

কিন্তু এবার আর আগুনের আঁচ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারলেন না প্রভাসকুমার।

উনিশশো একাত্তর সাল প্রভাসকুমারের জীবনে এক বিশাল দুঃস্বপ্নের স্মৃতি। ওই একবারই তিনি দেশ ছেড়ে ভারতে উদ্বাস্তু হয়ে চলে না আসার জন্য অনুশোচনা বোধ করেছিলেন।

পঁচিশে মার্চ রাতে পূর্ব পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর হাতে চলে গেল। মানুষের ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের সূচনা হল।

ছাব্বিশে মার্চ দুপুরে টাঙ্গাইল শহরে মিলিটারি ঢুকল। প্রভাসকুমার প্রথমে ব্যাপারটা খুব গুরুত্ব দেননি। পাকিস্তান বাসের কল্যাণে মিলিটারি ব্যাপারটা তাঁর সড়গড় হয়ে গিয়েছিল। সেই জিন্নার মৃত্যু, লিয়াকত আলি হত্যার আমল থেকে কতবার যে মিলিটারি নামলো, কতবার যে মিলিটারি শাসন হল তার ইয়ত্তা নেই।

ইংরেজ আমলের লোক প্রভাসকুমার পাকিস্তানের প্রথম যুগে মিলিটারি নিয়ে এরকম স্বেচ্ছাচারে আতঙ্কিত বোধ করতেন, আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তানি মিলিটারি প্যাক্ট হওয়ায় তিনি গোড়ার দিকে খুশিই হয়েছিলেন, ভেবেছিলেন অন্তত এর পরে পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসনে একটা শৃঙ্খলা আসবে।

তা হয়নি। বরং আরও উচ্ছৃঙ্খল, আরও বেআদপ, আরও অমানবিক হয়ে উঠেছিল। অবশেষে

পিশাচ মূর্তি ধারণ করলো উনিশ'শো একাত্তরে।

মিলিটারি একাত্তরে যখন আসরে নামলো প্রভাসকুমার খুব একটা ঘাবড়ানিনি। ভেবেছিলেন যে প্রত্যেক বারের মত এবারও শেষ পর্যন্ত পার পেয়ে যাবেন।

কিন্তু তা হল না। ঢাকা থেকে সব খারাপ খবর আসতে লাগলো। খুন-খারাবি, লুঠতরাজ চলছে। নেতৃবৃন্দ বন্দি অথবা পলাতক। এদিকে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে এক তরুণ সেনানায়ক জয়বাংলা বলে বাঙালিকে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে ডাক দিচ্ছে। তার গভীর কণ্ঠস্বরে সারাদেশ আলোড়িত। লাঠি, বঁটি, দা, কুড়ুল নিয়ে দলে দলে লোক ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে জয় মুজিব, জয় বাংলা বলে। পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন বাংলাদেশ করবে, পশ্চিমা আর বিহারীদের অত্যাচার থেকে দেশকে মুক্ত করবে।

গণ আন্দোলনের ঢেউ দুয়েকদিনরে মধ্যে প্রভাসকুমারের ছোট শহরেও এসে পৌঁছল, একেবারে উত্তাল হয়ে এসে পৌঁছাল। একদিনেই টাঙ্গাইল স্বাধীন হয়ে গেল। পাকিস্তানী পুলিশ, আনসার ইত্যাদি যারা ছিল সেই সঙ্গে আমলা-কেরানী, অফিসার-পিয়ন সব রকম সরকারি কর্মচারীও মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সামিল হল।

মানুষের মুখে মুখে জয় বাংলা, ঘরে ঘরে গাছে গাছে জয় বাংলার নিশান, অবশেষে উত্তেজনার আগুনে প্রত্যেকের চোখ লাল, চোখ ফোলা। অসুখের নাম 'জয় বাংলা,' দারুন ছোঁয়াচে রোগ, রাতারাতি জয়বাংলা মহামারীতে পরিণত হল।

ইতিমধ্যে মিলিটারি রণাঙ্গনে নেমে গেছে। তারা যথেচ্ছ লুঠতরাজ, খুন, ধর্ষণ শুরু করে দিল। মুক্তিবাহিনী যখন দুর্বার বেগে একটার পর একটা অঞ্চল স্বাধীন ঘোষণা করে যাচ্ছিল, মিলিটারি খুব একটা সামনাসামনি বেবোয়নি, তারা একটু আড়ালে আবডালে সন্তপর্ণে ছিল।

প্রভাসকুমার বুঝেছিলেন মুক্তিবাহিনীর প্রাথমিক উত্তেজনা একটু ঠাণ্ডা হলেই মিলিটারি স্বমূর্তি ধারণ করবে।

গোলমালের পূর্বাভাস পেয়েই প্রভাসকুমার বাড়ির লোকজন সবাইকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন।

শহর থেকে দশ মাইল দূবে ধলেশ্বরী নদীর বাঁকে সেই গ্রামের বাড়িতে একটা গৃহ দেবতার মন্দির আছে, ভিটেয় একটা টিনের চালা আছে। কিছু জমিজমাও আছে। তার আয় থেকে মন্দিরের পুজো হয়। বাড়ির দেখাশোনা হয়।

আগে কখনো প্রভাসকুমার কাজে-কর্মে কিংবা যাতায়াতের পথে এক-আধ দিনের জন্যে গ্রামের বাড়িতে রাত্রিবাস করেছেন কিন্তু গত দশ-বারো বছরে তা সম্ভব হয়নি।

মিলিটারির অত্যাচার শুরু হওয়ার আগেই টাঙ্গাইল থেকে পালিয়ে গিয়ে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন প্রভাসকুমার।

প্রভাসকুমার চলে আসার কয়েকদিন পরেই খুব খারাপ খবর এল সেখান থেকে। মিলিটারিরা জিপে করে সারা শহরের অলিতে গলিতে, পাড়ায়-পাড়ায় হানা দিয়েছে। বহু লোককে তুলে নিয়ে গেছে তাদের আর কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

নিত্যলাল মিত্র বলে একটা ছেলে ইপিনের সহপাঠী ছিল। ছাত্র ভাল ছিল না, একটু ষণ্ডা মতন ছিল, ফুটবল খেলাব মাঠে, টাউন ক্লাবের ইলেকশনে মারামারি করত। পরে ফেল করে সে বিপিনের সঙ্গেও পড়েছিল। ইপিন, বিপিন দুই ভাইয়েরই বন্ধু ছিল নিত্যলাল, তারা বাড়িতে এলে নিত্য দুবেলাই তাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে আসতো। সেই নিত্যলালকে দিনদুপুরে বড় রাস্তর ওপরে মিলিটারি বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে, সর্ব সমক্ষে।

বাজারের রাস্তায় একটা সাইকেল সারাইয়ের দোকান ছিল নিত্যলালের। প্রত্যেক মিলিটারির জিপে একজন বা একাধিক স্থানীয় দালাল, পরে এরাই রাজাকার হয়েছিল, তারাই চিনিয়ে দিচ্ছিলো।

নিত্যলালের দোকানের সামনে এসে মিলিটারির জিপ দাঁড়াতে নিত্যলাল দোকান থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। অল্প বয়েস থেকে নানারকম ছোটখাট গোলমালে জড়িত থাকার সুবাদে খাকি পোশাকের ব্যাপারে তার মনে খুব একটা ভয়ডর থাকার কথা নয়।

কিন্তু সেদিন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলো। সে বেরিয়ে আসতেই একজন বেয়নেটধারী জিপ থেকে নেমে এসে উর্দুতে তার নাম জিজ্ঞাসা করল। নিত্যলাল তার নাম বলতেই সেই সৈন্যটি তার বেয়নেট দিয়ে নিত্যলালের গলা থেকে পেট পর্যন্ত একটানে দু ফালি করে দিল। ওই অবস্থায় বাজারের লোকেরা নিত্যলালকে হাসপাতালে নিয়ে যায়, কিন্তু সে বাঁচেনি। হয়তো এমনিও সে আর বাঁচত না কিন্তু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে হাসপাতালের লোকেরাও নিত্যলালের চিকিৎসা করতে সাহস পায়নি মিলিটারির আতঙ্কে। নির্বিকার চিত্তে খুন করে বেয়নেট থেকে রক্ত মুছে খুনে সেপাইটি জিপে উঠে চলে গিয়েছিল।

কোনও প্রতিকার পাওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ এ সবই ঘটেছিল উচ্চতম মহলের সরকারি নির্দেশে। গ্রামের বাড়িতে বসে যখন প্রভাসকুমার নিত্যলালের হত্যার কাহিনী শুনলেন, তিনি বুঝতে পারলেন নিত্যলালকে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগে খুন করা হয়নি। নিত্যলালের একমাত্র দোষ যে সে বলবান হিন্দু।

খবর আসছে মিলিটারিরা বেছে বেছে শুধু হিন্দুদেরই মারছে তা নয়, বহু মুসলমানও খুন হচ্ছে, মিলিটারিদের বেয়নেটে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

চারদিক থেকে যে সব সংবাদ লোকমুখে এবং গুজবে পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো বিশ্লেষণ করে প্রভাসকুমার দুটো সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন।

প্রথম সিদ্ধান্ত হল মিলিটারিরা একদম গুলি খরচ করতে চায় না। যথাসাধ্য বেয়নেটেই কাজ সারছে। এতবড় একটা গণ অভ্যুত্থানের মোকাবিলা করার মত গুলি বারুদের রসদ এখনও তাদের হাতে নেই। আপাতত যোগানের জন্য অপেক্ষা করছে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসতে যে কয়দিন লাগে।

প্রভাসকুমারের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হল পাকিস্তানী সৈন্যরা হিন্দুদের নির্বিচারে হত্যা করার লাইসেন্স পেয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের বেলা বেছে বেছে সন্দেহভাজনদের হত্যা করছে। পাকিস্তানি বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের এবং মুক্তি সংগ্রামী মুসলমানদের ওপরেই সৈন্যদের আক্রোশ। তবে এর মধ্যে আরও একটা কথা আছে। পাঠান কিংবা পাঞ্জাবি মুসলমান সৈন্যেরা বাঙালি মুসলমানদের মুসলমান বলেই গণ্য করে না, হিন্দুদের মতই তাদেরও 'মালাউন' ভাবে।

গ্রামের বাড়ি গুছিয়ে ঠিকমত করে বসতে তিন চারদিন চলে গেল। খুব হাঙ্গামা গেল স্মৃতিকণার। এই বয়েসে নতুন করে সংসার পাতা। তাছাড়া দুর্ভাবনা। কলকাতায় চলে যেতে পারলে সব

চেয়ে ভাল হত। কিন্তু অতদূরে ছেলেদের আশ্রয়ে যাওয়া, কোন যানবাহন নেই। রেল, স্টিমার, বাস সব বন্ধ। কলকাতা তো আর কাছের পথ নয়।

হাঁটা পথে অবশ্য নানা লোক দৈনিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে পৌঁছাচ্ছে। কিন্তু এতটা পথ হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা স্মৃতিকণার বা প্রভাসকুমাবের নেই। তাছাড়া পথ মোটেই নিরাপদ নয়। সেখানেও মিলিটারি ও রাজাকারদের এবং স্থানীয় গুণ্ডাদের প্রবল অত্যাচার।

তবুও গ্রামে ভালই ছিলেন প্রভাসকুমার স্মৃতিকণা। আমের মুকুলের, সজনে ফুলের গন্ধ। ভরা গ্রীষ্মের জ্যোৎস্না রাতে কোকিল ডাকছে। নিরবচ্ছিন্ন অবসর।

কিন্তু গ্রামেও মিলিটারি এসে ঢুকলো। একদিন হঠাৎ কুমোর পাড়ায় ঢুকে পাল বাড়িগুলো তছনছ করে, দুজন মোড়ল স্থানীয়কে গাড়িতে করে নিয়ে গেল। তাদের আর পাত্তা পাওয়া গেল না।

প্রভাসকুমার ভেবে দেখলেন গ্রামে থাকা শহরের তুলনায় নিরাপদ নয়। শহরে তাঁর একটা সুনাম আছে, প্রভাব আছে, বহুদিন তিনি সরকারি উকিল ছিলেন। সাধারণ প্রশাসনে তাঁব পরিচিত ব্যক্তি অনেক আছেন, তা ছাড়া মৌলবাদী ও পাকিস্তানবাদীদেব মধ্যেও তাঁব বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীর অভাব নেই।

তিনি চিরদিনের নির্বিরোধী মানুষ। আজন্ম টাঙ্গাইলে আছেন। জ্ঞানত কখনো কারও শত্রুতা করেননি। খুব বেকায়দা না হলে কারও সঙ্গে ঝগড়াও কবেননি।

সাহস করে প্রভাসকুমার মে মাসের প্রথমে টাঙ্গাইলে ফিবে গেলেন।

সারা শহরের থমথমে অবস্থা। রাস্তাঘাটে লোকজন নেই। সন্ধ্যার পবে কেউ বাড়ি থেকে বেরোয় না। তবে যাদের মিলিটারির কিংবা রাজাকারের ধরে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তারা কেউ রাতে বাসায় থাকে না। বিকেলের পরেই লুকিয়ে পড়ে। আশ্রয় নিতে যায় আশেপাশেব কোনও গ্রামে, ঝোপে-ঝাড়ে কিংবা পোড়ো বাড়িতে।

সে খবরও মিলিটারি যথাসময়ে পেয়ে যায়, গহণ রাতে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে রাজাকারেরা। হঠাৎ আক্রমণ করে নির্বিচারে হত্যা করে, কিংবা বন্দি করে নিয়ে আসে। পরে তাদের মেরে ফেলা হয়।

জোর করে, সামরিক প্রশাসনের জবরদস্তিতে কিছু কিছু স্কুল-কলেজ খুলে রাখা হয়েছে। কিন্তু সেখানে ছাত্র বা শিক্ষক এরা সবাই অনুপস্থিত। এরই মধ্যে একদিন ঘটা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রহসন হয়ে গেল।

বাজারপাট, দোকানহাট প্রায় সবই বন্ধ। বেলার দিকে দু'একটা দোকান খোলে। দোকানি-ক্রেতা সকলের মুখে কেমন ভয়-ভয়, সন্ত্রস্ত ভাব।

দোকানে জিনিষপত্র প্রায়ই নেই। যা পাওয়া যায় তার দাম অবশ্য দোকানদার প্রকাশ্যে খুব নিতে সাহস পায় না। সেও ওই মিলিটারির ভয়ে।

শহরের বহু বাড়িঘর ফাঁকা। যে যার মত তালাবন্ধ করে যে দিকে পারে পালিয়ে গেছে। কোথায় আর যাবে, সবাই ভারতের দিকে রওনা হয়েছে। জীবিকা, জন্মভূমি সব কিছু পরিত্যাগ করে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে নদীপথে নৌকোয় আর হাঁটা পথে দলে দলে গৃহত্যাগী মানুষ নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে। সেই পথযাত্রাও মোটেই নিরাপদ নয়। ডাকাত এবং রাজাকারের অত্যাচার, ক্ষুধায় ও অসুখে, অনভ্যস্ত জীবনও পথশ্রমের ক্লান্তিতে বহু লোক পথেই প্রাণ দিয়েছে।

যেসব পরিবারে যুবতী মহিলা আছে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, রোগী-শিশু আছে বিপদ তাদেরই সবচেয়ে

বেশি।

শহরে অনেক বাইরের লোক এসেছে। তাদের মধ্যে অনেকে রাস্তাঘাটে উর্দুতে কথা বলে। এরা হঠাৎ কোথা থেকে এসেছে বোঝা যায় না।

যে সব বাড়িঘর ফাঁকা পড়ে রয়েছে, সেগুলো এরা দখল নিচ্ছে। তালা ভেঙে ঢুকে গেলেই হল।

অনেক বাড়িতে রাজাকারেরা আস্তানা গেড়েছে। তারা রাতে-বিরেতে এসে গৃহস্থ বাড়িতে হামলা চালায়। শেষ সম্বল টাকা-পয়সা, সোনা-দানা কেড়ে নেয়, মেয়েদের ওপর অত্যাচার করে।

চারদিকে একটা চরম নিরুপায়, অরাজক অবস্থা। তাঁর জন্মভূমির, তাঁর স্বপ্নের শহরের এমন অবস্থা হবে কে জানত। নিজের ভদ্রাসনে পুরনো দালানের ভিতরের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন প্রভাসকুমার। এই এত বয়েসে, অনেক পোড় খাওয়া জীবনেও তাঁর চোখে একেক সময়ে জল আসে।

পুরনো প্রতিবেশী মুসলমান বাড়ি থেকে কেউ কেউ কখনও আসে। যাঁরা শহরে রয়ে গেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকে পাকিস্তান সরকারের পক্ষে। তাঁরা এসে প্রভাসকুমারকে ভরসা দেন। বলেন, গোলমাল আর বেশি দিন নয়, শিগগিরই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। তাঁরা প্রভাসকুমারকে সাহস দেন, 'প্রভাসদা আপনার কোনও ভয় নেই, আপনাকে কেউ কিছু বলবে না।'

প্রভাসকুমার চুপ করে থাকেন। মুখে কিছু বলেন না। কিন্তু তিনি জানেন এই সব সাহস-ভরসা, এসবই নিতান্ত মুখের কথা। এর ওপর নির্ভর করা যায় না। সামরিক শাসকেরা চাইলে যা ইচ্ছে করবে, এঁদের কারও কথা মানবে না।

কিন্তু এঁরা কেউ ভণ্ড নন। খন্দকার মোক্তার প্রায়ই আসেন। রুহুল ডাক্তার আসেন। বহুদিন ধরে ওদের সঙ্গে পরিচয় প্রভাসকুমারের। খন্দকার তাঁর সেরেস্তা থেকেই মোক্তারি ব্যবসা শুরু করে, ভাল প্র্যাকটিশ করেছে এখন। রুহুল ডাক্তার শুধু তাঁর গৃহচিকিৎসকই নন, তাঁর মক্কেলও। এখনও রুহুলের একটা বৈষয়িক মামলা তাঁর সেরেস্তা থেকে আদালতে ঝুলছে-।

আদালত খোলা আছে এখনও। কিন্তু মামলা-টামলা নেই। কিসের মামলা, কে কার বিরুদ্ধে মামলা করবে। পাড়াগাঁয়ের লোক নিজের এলাকা ছেড়ে হয় পালাচ্ছে না হয় সেই এলাকা ছেড়ে বেরোতে ভয় পাচ্ছে। গ্রামে কখনও কখনও মিলিটারি হানা দিচ্ছে বটে, মুক্তিফৌজের লোকদের খোঁজে যাচ্ছে। তাদের পাচ্ছে না, পাড়ার পর পাড়া জ্বালিয়ে দিচ্ছে, নিরীহ গৃহস্থকে খুন করছে, মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে সৈন্যশিবিরে। মধ্যযুগীয় বর্বরতাও এর কাছে কিছু নয়।

লোকজন শহরে আসছে না। নতুন মামলা-মোকদ্দমার প্রশ্নই আসে না। পুরনো মামলাও কেউ খোঁজখবর নিতে, তদ্বির করতে আসে না।

অনেক দিনের অভ্যাসবশত এখনও নিয়মিত কাছারিতে যান। মুহুরিবাবুরা নেই। দু'একজন জুনিয়র উকিল আসে, তারা না এলে স্মৃতিকণা তাঁকে একা একা বাড়ি থেকে বেরোতে দেন না।

আদালতে গিয়ে বার লাইব্রেরিতে এক প্রান্তে একটা ডেক চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকেন প্রভাসকুমার। বার লাইব্রেরি প্রায় ফাঁকা। কোর্টেও বিশেষ কোনও কাজকর্ম নেই। চারদিকে কেমন একটা ছাড়া ছাড়া ভাব। এপাশে ওপাশে দু'চারজন ছুটছাট মানুষ। মক্কেল-মুহুরি, টাউট আর ফেরিওয়ালায় আদালত প্রাঙ্গণ কিছুদিন আগেও এই সময়টায় গমগম করত, এখন এই ভরদুপুরেও

একদম শূন্য। খর রৌদ্রে বিরাট আদালত বাড়িটা, উঠোন, পাঁচিল, গাছপালা কেমন অবাস্তব মনে হচ্ছে।

মাঝে-মধ্যে মিলিটারির জিপ, ট্রাক এসে দুড়দাড় করে আদালতের মধ্যে ঢুকছে। কাঁধে বেয়নেট, রাইফেল শক্ত-সমর্থ পাঞ্জাবি আর পাঠান সৈন্য গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামছে। যদিও গত কয়েক সপ্তাহে প্রায় গা-সওয়া হয়ে গেছে ব্যাপারটা, তবুও একটু ত্রাসের সঞ্চার হয়।

একটু পরে মিলিটারিরা যেমন এসেছিল তেমনই চলে যায়। শহরের ওদিকটায় নদীর তীরে পুরনো পার্কে মিলিটারিরা ছাউনি করেছে। কিছুদিন বিন্দুবাসিনী স্কুলের মাঠেও ছিল কিন্তু বিদ্যালয় খোলার সরকারি ঘোষণার পর তারা সেখান থেকে সরে গেছে।

বার লাইব্রেরির এক প্রান্তে তাঁর নির্দিষ্ট ডেক চেয়ারে বসে থাকেন প্রভাসকুমার। চুপচাপ।

বার লাইব্রেরির বারান্দার ওপারেই একটা কচি জামগাছ। বছর আট-দশের বেশি বয়েস হবে না গাছটার। কিন্তু এই গ্রীষ্মে গাছটা ফলে ফলে ছেয়ে গিয়েছিল। এখনও ডালে ডালে কিছু জাম রয়েছে সারা উঠোনটা বেগুনি হয়ে আছে পড়ে থাকা পাকা জামফলের রঙে। অন্যবছর হলে একটি ফলও উঠোনে পড়তে পেত না। কিন্তু এই দুর্যোগের দিনে জাম কুড়িয়ে খাওয়ার শখ ক'জনার আছে।

ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে একটু ঝিমুনির মত এসেছিল প্রভাসকুমারের। হঠাৎ ভারি জুতোর শব্দে চমকিয়ে ধড়মড় করে জেগে উঠলেন। চোখ মেলে দেখেন তাঁর সামনে ইউনিফর্ম পরা, বেয়নেট ধারী কয়েকজন মিলিটারির লোক দাঁড়িয়ে। প্রভাসকুমারের আচমকা ঘুম ভেঙে যেতে এদের মধ্যে সবার সামনে যে ছিল, নিতান্ত কচিমুখ। বয়েস কুড়ি-একুশের বেশি হবে না, সেই সৈন্যটি বলল, 'সরি।'

প্রভাসকুমার প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিলেন। একটু দূরে বার লাইব্রেরির ঘরের মধ্য থেকে তাঁর সহকর্মীদের কেউ কেউ শঙ্কিতভাবে মিলিটারির লোকদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল।

কিন্তু দেখা গেল আশঙ্কার কিছু নেই। তারা উঠোনে পড়ে থাকা জামগুলো দেখে আকৃষ্ট হয়েছে। জানতে চাইছে, ফলটা কেমন, 'সুইট হ্যায় ? মিঠা হ্যায় ?'

প্রভাসকুমার এই প্রশ্ন শুনে মৃদু হেসে বললেন, 'ব্ল্যাকবেরি, ভেরি গুড ফ্রুট, গুড ফর হেলথ, পিউরিফাইয়েস ব্লাড।'

এতটা প্রশাংসার প্রয়োজন ছিল না। তার আগেই সৈন্যদল গাছতলা থেকে জাম কুড়িয়ে খেতে আরম্ভ করেছে। এরই মধ্যে একজন পকেট থেকে রুমাল বের করে তার মধ্যে জাম ভরে বেঁধে নিল। সাদা রুমালে জামের বেগুনি ছোপ লেগে গেল। সহজে এ দাগ উঠবে না।

একটু পরে হাসিমুখে প্রভাসকুমারকে 'থ্যাঙ্ক ইউ,' 'বহুত শুকরিয়া' জানিয়ে সৈন্যরা নিজেদের জিপে গিয়ে উঠল। জিপ ছেড়ে যাওয়ার সময় সামনের সিট থেকে একজন হাত বাড়িয়ে টা টা জানাল।

এদের কারোরই বয়েস ইপিন-বিপিনের চেয়ে বেশি হবে না। সরল মন, সাধারণ ঘরের ছেলে সব। এরাই মানুষ খুন করে, লুঠ করে, ধর্ষণ করে ? কারা এদের দিয়ে লুঠ করায়, মানুষ খুন করায় ?

দুপুরের পরে প্রভাসকুমার আদালতে আর বেশি দেরি করেন না। যে কোনও একজন জুনিয়র বা মুহুরিকে সঙ্গী করে রিক্‌শায় উঠে বাসায় ফিরে আসেন।

বার লাইব্রেরির সিঁড়ির নিচে কয়েকটা কুকুর ছিল। প্রত্যেকদিন আদালত থেকে যাওয়ার সময় প্রভাসকুমার সামনের চায়ের স্টলটা থেকে বিস্কুট কিনে এদের দিতেন। চায়ের স্টলটা এখনও বন্ধ হয়নি,, তবে হিন্দু মালিকের জায়গায় নতুন মুসলমান মালিক হয়েছে, আগের লোকটি নিশ্চয় দেশান্তরী হয়েছে।

সে যা হোক কুকুরগলো নেই। শুধু আদালতের উঠোনেই নয়, বাজারের রাস্তায়, গৃহস্থের বাসায় কোথাও কুকুর নেই।

প্রভাসকুমার শুনেছেন, সেগুলো সব গিয়ে জুটেছে শহর থেকে মাইল দুয়েক দূরে পুরনো কবরখানার পাশে নদীর চরে। গভীর রাতে তাদের চিৎকার, কলহের সম্মিলিত শব্দ ভেসে আসে, বিছানায় শুয়ে শুনতে পান প্রভাসকুমার।

বিকেলের পরে সন্ধ্যা আর কাটে না। শুধু দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ।

এখানে সবই এমনকি জীবন পর্যন্ত অনিশ্চিত। কলকাতা থেকে ছেলেদের কোনও খবর নেই।

রাতে খাওয়া দাওয়া কোনও রকমে মিটিয়ে শুয়ে পড়েন প্রভাসকুমার ও স্মৃতিকণা। যখন প্রথম গ্রাম থেকে টাঙ্গাইলে ফিরে এসেছিলেন রাতে ঘুমের ব্যাঘাত হত গুলি আর বোমার শব্দে। প্রতি রাত্রেই কাছাকাছি কোথাও না কোথাও হানাদারদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের সংঘর্ষ হত। এখন আর সেটা হয় না, মুক্তিযোদ্ধারা সরে গিয়েছে, দূরে কোথাও প্রস্তুত এবং সংঘবদ্ধ হচ্ছে।

আর তাছাড়া পাক সৈন্যেরাও গুলি-গোলার ব্যাপারে একটু সতর্ক হয়েছে। গুলি-গোলাব খরচ আছে, গুলি-গোলার শব্দে লোকে ভয় পেয়ে যায়, অনেক কিছু জানাজানি হয়ে যায়। তাই তারা অন্য একটা সহজ পথ বেছে নিয়েছে

পাক সৈন্যরা বিশেষ কাউকে আর তেমন প্রয়োজন না হলে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে না। নিরপরাধ মানুষদের ধরে কয়েদ করে রেখে, কোর্ট মার্শালে বিচার হয়। বিচারে একটিই সাজা মৃত্যুদণ্ড। সেদিনই গভীর রাতে সেই দণ্ড হাসিল করা হয়।

সেই সেখানে নরমাংসের আস্বাদে বিহ্বল হয়ে শহরের সব কুকুর গিয়ে জুটেছে, পুরনো কবরখানার পাশে নদীর চড়ায় এই হতভাগ্যদের জবাই করা হয়।

পাঁচ আনি বাজারের এক বুড়ো কশাইকে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। এই কাজের জন্যে প্রতিটি জবাই পিছু সে পাঁচ টাকা করে পায়।

বধ্যভূমি থেকে কোনওক্রমে পালিয়ে আসা একজন বলেছে, হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই মৃত্যু পথযাত্রীরা জবাইয়ের জন্যে নতজানু হতে না চেয়ে ধস্তাধস্তি করত তখন বৃদ্ধ কশাই তাদের বিনীত অনুরোধ করত ধস্তাধস্তি না করতে, তাতে তারও পরিশ্রম কম হবে নিহত ব্যক্তিরও মৃত্যু-যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব হবে।

দূর কবরখানার বধ্যভূমি থেকে কুকুরের চিৎকার ভেসে আসে। প্রভাসকুমারের চোখে ঘুম আসে না। স্মৃতিকণাও জেগে আছেন।

কিন্তু প্রভাসকুমার এসব কথা স্মৃতিকণাকে কিছু বলেন না।

সেই সব দুঃসহ, মর্মান্তিক দিন। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস। এমন দুঃসময় মানুষের জীবনে বোধহয় সাতজন্মেও একবার আসে না।

কাছারি ঘর প্রায়ই ফাঁকা থাকে। তিনজন মুহুরির মধ্যে একজন মে মাস পর্যন্ত এসেছিল।

জুনের গোড়া থেকে তারও আর খবর নেই। মক্কেলও বিশেষ আসে না।

ডাক বন্ধ। চিঠিপত্র নেই। আশেপাশের বাড়িতে লোকজন কম। প্রভাসকুমারের এক মক্কেল বারণ করে দিয়েছে, স্মৃতিকণা প্রভাসকুমারকে আর বাইরের বারান্দায় বসতে দেয় না। প্রভাসকুমার ভিতরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে থাকেন। গাছের পাতা পড়ে, দুয়েকটা পাখি আসে। কোলের কাছে রেডিও নিয়ে খবর বা গান শুনতে শুনতে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন।

উঠোনের ওপাশে হারাধনরা থাকে। হারাধন হারাধনের মা আর হারাধনের বৌ সৌদামিনী।

সুখ-দুঃখের দুয়েকটা গল্প, টুকটাক কথাবার্তা যা একটু এদের সঙ্গেই হয়। প্রভাসকুমার এবং স্মৃতিকণা, এখন এদের সঙ্গে জড়াজড়ি করেই কোন রকমে আছেন?

উঠোনে একটা নেড়ি কুকুর ছিল। রাতদিন স্মৃতিকণার পায়ে পায়ে ঘুরত স্মৃতিকণা তার নাম দিয়েছিলেন আহ্লাদি।

সেই আহ্লাদিও পাড়ার কুকুরদের সঙ্গে নিরুদ্দেশ। নিশ্চয়ই নদীর ধারে মিলিটারিদের বধ্যভূমিতে মানুষের মাংস খাওয়ার ভোজে শহরের অন্য কুকুরদের সঙ্গে সমবেত হয়েছে।

এপ্রিল মাসের গোড়া থেকেই খবরের কাগজ প্রায় বন্ধ। কলকাতা বা কলকাতার বাইরের কাগজ আসে না। এমনকি পাকিস্তানের লাহোর বা করাচির কাগজ আসে না। ঢাকা থেকে দুয়েকটা কাগজ আসে। কিন্তু সেগুলো পুরোপুরি মিলিটারির ধামাধরা। পাকিস্তান সরকারের দালালি করছে, নিতান্ত নির্লজ্জভাবে।

ঠিক কি করবেন, প্রভাসকুমার বুঝে উঠতে পারেন না। এখান থেকে এই মুহূর্তে চলে যাওয়া খারাপ হবে নাকি থেকে যাওয়া খারাপ হবে, সেটা তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না। উনিশ'শো একাত্তরের মে-জুন দুটো মাস কাটলো নিরুপায় উদ্বেগের মধ্য দিয়ে। সেই চরম অসহায়তায়, নিতান্ত ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে বেঁচে থাকা, প্রকৃত অর্থেই বধ্য-ভূমিতে অপেক্ষমান জন্তুর মত। কসাইখানার খাঁচায় বন্দি মুরগির মত বেঁচে থাকা—দু-চার শতাব্দীর মধ্যে মানুষের এমন দুর্দিন কদাচিৎ আসে।

আর শুধুই তো স্থূল বেঁচে থাকা নয়। প্রভাসকুমারের বিদ্যা-বুদ্ধি, তাঁর মন, তাঁর বিবেক, এই বর্বর ভূখণ্ডে যেখানে তিনি জন্মেছেন, বড় হয়েছেন, প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে লাঞ্ছিত হচ্ছিল।

এত পাপ, এত অন্ধকার। মানুষের প্রাণ, মর্যাদা, সমাজ-সংসার বুট জুতোর নিচে, উদ্যত বেয়নেটের ফলার তলায় নির্বিচারে উৎপীড়ন—কোনও বাধা নেই, প্রতিবাদ নেই। একেকটা খবর প্রভাসকুমারের কাছে এসেছে কখনও কখনও প্রত্যক্ষও করেছেন কিন্তু তাঁর কিছু করার নেই। এই অক্ষমতা তাঁকে এই দু'মাস ভিতরে ভিতরে কুরে কুরে খেয়েছে। মাথার চুল আগেই অনেকটা পাকা ছিল, এখন একেবারে সাদা ধবধবে হয়ে উঠেছে। হাঁটায়-চলনে হঠাৎ যেন একটা বার্ধক্য এসে গেছে।

স্মৃতিকণা তাঁর স্বামীর মনের অবস্থা ভালই বুঝতে পারেন। লক্ষ্য করেন শরীর ভেঙে যাচ্ছে।

কিন্তু কি করবেন? কি করার আছে? এখান থেকে চলে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। ওদিকে ছেলেরা কোনও খবর পাচ্ছে না, তারা হয়তো অস্থির হয়ে আছে।

স্মৃতিকণা একটু শক্ত মানুষ। তিনি চুপচাপ থাকেন। কিন্তু মনে মনে টের পান প্রভাসকুমার ভিতরে ভিতরে গুমরিয়ে মরছেন।

এ দিকে পাক সৈন্যদের অত্যাচার এবং সেই সঙ্গে তাদের সহযোগী রাজাকার, আলবদর, আলশামস নামধারী, সন্ত্রাসবাদী বাহিনীর ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বেড়েই চলেছে। প্রতিদিনই খবর আসে খুন-খারাপি, লুঠ, ধর্ষণের।

মুক্তিযোদ্ধারা কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। তাদের প্রস্তুতি ছিল না, তাদের রসদ নেই। এই শহরেরই বহু ছেলে মুক্তিবাহিনীতে গেছে। আগে ছুটছাট তাদের শহরের মধ্যে দেখা যেত। সময়ে-অসময়ে বাসায় এসে খোঁজ খবর নিয়ে যেত কিন্তু জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি থেকে তাঁদের আর দেখা যাচ্ছে না। তবে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। সে কথা টের পাওয়া যায়, কোনও কোনও দিন গভীর রাতে, গুলি-গোলার শব্দ শোনা যায়। কখনও কখনও আকাশেও গোলার আগুন, ধোঁয়া দেখা যায়। পরের দিন সকালে খবর আসে করাতির হাটের পিছনে কিংবা খারিদার খাল ধারে কাল রাতে লড়াই হয়েছে।

লড়াই ঠিকই চলছে। তবে মুখোমুখি সংঘাত বিশেষ সুবিধা হবেনা বলে মুক্তিযোদ্ধারা চোরাগোপ্তা গোপন আক্রমণের পথ বেছে নিয়েছে। তাদের গেরিলা লড়াই মহাশক্তিমান সৈন্য বাহিনীকে রীতিমত বিব্রত, কোথাও কোথাও যথেষ্ট পঙ্গু করে তুলেছে।

দেখতে দেখতে বর্ষা এসে গেল। জুলাই মাস, ভরা শ্রাবণ। একাত্তর সালের মত দিকদিগন্তপ্লাবী বর্ষা বহুকাল পূর্ববঙ্গে হয়নি।

যথারীতি বর্ষার শুরুতেই ধলেশ্বরী-যমুনা থেকে লৌহজঙ্গ হয়ে টাঙ্গাইল শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া খালে উদ্দাম বেগে জল এসে গেল।

কিন্তু অন্যান্য বৎসর জলের সঙ্গে সঙ্গে খালের মধ্যে কতরকম নৌকো আসে। কতরকম জিনিষ আসে। বরিশাল থেকে নারকেল, দিনাজপুর থেকে চিকন চাল, মধুপুরের গড় থেকে কাঠ, আম, কাঁঠাল। কোনও কোনও দিন সন্ধ্যার দিকে খোল ভর্তি ইলিশ মাছ নিয়ে ধলেশ্বরী থেকে জেলে নৌকো ঢোকে শহরে।

খাল ধারে রীতিমত বাজার বসে যায়, হৈ চৈ মেলার মত। বেদে-বেদেনিরা আসে তাদের নৌকো ভরা সংসার নিয়ে। আসে সাপুড়েরা। একটা ধুম পড়ে যায় শহরে।

এ বছর সেরকম কিছুই হয়নি। এক আধটা গৃহস্থ বাড়ির নৌকো আর ভাড়াটে ঢাকাই নৌকো ছাড়া খালে প্রায় কোনও নৌকো আসেনি। জলপথে ডাকাতের যেমন উৎপাত তেমনই অত্যাচার রাজাকারদের, আর সেই সঙ্গে মিলিটারির। ভয়ে কারবারিরা নিজেদের এলাকা ছেড়ে বেরোয়নি।

প্রত্যেকবার নিয়ম মত খালধারের নৌকোগুলো থেকে বৎসরকার জিনিষ কেনা হতো। চাল, নারকেল, জ্বালানি কাঠ। এটাই শহরের গৃহস্থদের রেওয়াজ। সেই শহর পত্তনের যুগ থেকে, যখন প্রথম খাল কাটা হয়, লৌহজঙ্গের আক্রোশ থেকে শহরকে বাঁচানোর জন্যে।

সেই লৌহজঙ্গ নেই। তার আক্রোশ বহুকাল স্তিমিত হয়ে গেছে। এখন তারই বুকের ওপর গড়ে উঠেছে নতুন জেলা প্রশাসন ভবন, নদী বুজিয়ে দিয়ে। তবে খালে তখনও জল আসতো, একাত্তর সালে তো জলে টইটুম্বুর খাল।

রিকশায় করে আদালতে যাওয়ার পথে হঠাৎ হঠাৎ জলে ভরা খালটাকে দেখে ব্রিজের ওপর থেকে কেমন যেন খটকা লাগতো প্রভাসকুমারের। জলে ভরা অথচ ফাঁকা খাল, জন্মাবধি এই ছয় দশকের জীবনে প্রভাসকুমার দেখেননি।

বর্ষার গোড়ার দিকে কিছুদিন মনে হয়েছিল কেমন যেন ঢিমে বেতালা। মুক্তিযুদ্ধ থেমে গেল নাকি? কোথাও বিশেষ সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ছেলেরা সব গেলো কোথায়?

আদালত থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসে প্রভাসকুমার রবীন্দ্র-রচনাবলীর পাতা হাতড়াতেন। সেই যেখানে লেখা আছে মায়ের এ অশ্রুজল, বীরের এ রক্তধারা, এর যত মূল্য সেকি ধরার ধূলায় হবে হারা। স্বর্গ কি হবে না কেনা?

প্রবল বর্ষা এসে মুক্তিযুদ্ধে নতুন মাত্রা যোগ করল।

ছাব্বিশে মার্চের পর থেকে সদা সর্বদা রেডিওতে কান পেতে রাখতেন। প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তানের বেতার কেন্দ্রগুলো বেশ কয়েকদিন মুক্তি যোদ্ধাদের দখলে ছিল। চট্টগ্রাম থেকে মেজর জিয়ার 'জয় বাংলা' ঘোষণা প্রথম দিনই শুনেছিলেন।

ধীরে ধীরে বেতার কেন্দ্রগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের হাতছাড়া হয়ে গেল। তখন পাকিস্তান সরকার যে সংবাদ প্রচার করতে লাগল তা মোটই বিশ্বাসযোগ্য হতো না।

মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ প্রচারে আকাশবাণী কলকাতার বেশ বাড়াবাড়ি ছিল। সেটা প্রভাসকুমার অনুমান করতে পারতেন। এ ছাড়া সদ্য গঠিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মুক্তিবাহিনীর পরিচালনায়। তারাও আরও বানিয়ে বানিয়ে বলত। তবুও আকাশবাণী এবং স্বাধীন বাংলার সংবাদ শুনে প্রভাসকুমার ঘটনার গতিপ্রকৃতির আঁচ পেতেন।

তবে আকাশবাণীর এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংবাদ শোনা নিরাপদ ছিল না। রাজাকার আর আলবদরেরা গৃহস্থ বাড়ির আনাচে কানাচে কান পেতে থাকত কেউ এ দুটো নিষিদ্ধ বেতারের খবর শুনছে কি না। ধরা পড়লে পরিণতি মারাত্মক হতে পারে।

বি বি সি'র সংবাদ পাক সরকারের খুব একটা পছন্দ ছিল না। কিন্তু একটা সুবিধে ছিল মুর্খ রাজাকাররা ইংরেজি বুঝতো না। তারা বি বি সি নিয়ে মাথা ঘামাতো না।

বর্ষার মধ্যে, যখন মনে হচ্ছিল মুক্তিযুদ্ধ থেমে গেল নাকি, তখন এই বি বি সি-র এক ঘোষক কথাটি বলেছিলেন—

'যারা ভাবছে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। তারা ভুল ভাবছে। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়নি। শিগগিরই প্রবল বেগে শুরু হবে জেনারেল মনসুনের নেতৃত্বে।'

খবরটা শুনে প্রভাসকুমারের মত শিক্ষিত লোকেরা ধাঁধাঁয় পড়েছিলেন। 'মনসুন' নামে কোন বাঙালি সেনাপতির নাম তারা মনে করতে পারলেন না।

অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জেনারেল মনসুনের ব্যাপারটা বেতার ঘোষক ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন। মনসুন মানে বর্ষাকাল। বর্ষা ঋতুর, বিশেষ করে সে বছরের প্রবল বর্ষার নেতৃত্বে এবার সংগঠিত মুক্তিযোদ্ধারা পাল্টা আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়বে পাক সৈন্যের ওপরে। নদী-নালা-খালে-বিলে ভরা এই সমতল জলা-দেশে পাহাড় আর পাথুরে দেশের সৈন্যেরা নাজেহাল হয়ে পড়বে। একদম দিশেহারা হয়ে যাবে।

আরও অসংখ্য সাধারণ মানুষের মত সেই সুদিনের জন্য ব্যাকুল উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করে ছিলেন প্রভাসকুমার।

এমন সময় এল সেই ভয়ঙ্কর খারাপ দিন। হারাধনকে মিলিটারি ধরে নিয়ে গেল। আর সৌদামিনী প্রায় প্রকাশ্যে দরজাখোলা ঘরের মধ্যে ধর্ষিত হল।

সেদিন সারারাত প্রভাসকুমারের চোখের দুপাতা এক হয়নি। স্থির করে ফেললেন এ পাপ ভূমিতে এক দণ্ডও নয়।

বেতারের চেয়েও সূক্ষ্ম আয়োজন আছে মানুষের মনের মধ্যে। তারই সূত্রে যোগাযোগ হয় মানুষের আপনজনের মনের ভিতরে। সুখে-দুঃখে, সুদিনে-দুর্দিনে মনের আকুলতা এ ওর কাছে পৌঁছে যায়।

পরদিন সকালে বিনিদ্র ও অস্থির প্রভাসকুমার দালানের বারান্দায় দ্রুত পায়চারি করছেন, বারান্দায় সিঁড়ির পাশে প্রস্তরীভূত মূর্তির মত বসে আছেন স্মৃতিকণা। তাঁর পায়ের কাছে সিঁড়ির ধাপে হারুর মা আর সৌদামিনী। এমন সময় কলেজপাড়ার একটি মেয়ে, স্বপ্না খাতুন বাড়ির মধ্যে এল।

সুন্দরী, বুদ্ধিমতী মেয়ে। নতুন ভর্তি হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। গত তিন মাস গোলমালের জন্যে এখানে আটকে আছে। ওর ভায়েরাও কেউ টাঙ্গাইলে নেই। তাদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। শোনা যায়, সব মুক্তিবাহিনীতে চলে গেছে। স্বপ্নার এক কাকা ইপিনের সঙ্গে ইস্কুলে পড়ত। আওয়ামি লিগ করে, এখন নাকি ধুবড়িতে রয়েছে।

স্বপ্না বাড়ির মধ্যে ঢুকে একবার হারুর মায়ের দিকে তাকিয়ে তারপর গলা নামিয়ে স্মৃতিকণাকে বলল, 'দিদা বিপিনকাকা এসেছে আপনাদের নিয়ে যেতে। বিকালের দিকে প্রস্তুত থাকবেন। আমি দুপুরে এসে বাকি খবর দিয়ে যাব।'

বিপিন এই শত্রুপুরীর মধ্যে প্রবেশ করেছে? সংবাদ শুনে প্রভাসকুমার ও স্মৃতিকণা দুজনেই চমকে উঠলেন। কিন্তু বিপিনতো চিরদিনই একটু ওই রকম।

বিপিনের শ্রীরামপুর ব্যাঙ্কে বীরেন লাহিড়ী নামে এক ভদ্রলোকের অ্যাকাউন্ট ছিল। ভদ্রলোক আগে এয়ার ফোর্সে কাজ করতেন। পুরনো দিনের লোক। বোধহয় রয়্যাল এয়ার ফোর্সের যুগের শেষ দিকে চাকরিতে ঢুকেছিলেন। ভারতীয় বিমান বাহিনীর গোড়া পত্তনের সময় থেকে তিনি কাজ করে মাত্র কয়েক বছর আগে অবসর গ্রহণ করেছেন।

রিটায়ার করার আগে বীরেনবাবু শ্রীরামপুরে গঙ্গার কাছে একটা পুরনো বাড়ি কিনে যথাসাধ্য সংস্কার করে নিয়েছিলেন। অবসর গ্রহণ করে তিনি সেখানেই বসবাস আরম্ভ করেছেন।

লাহিড়ীমশায় পূর্ববঙ্গের রাজশাহী জেলার লোক। কিন্তু তাঁর বাবার মামার বাড়ি ছিল শ্রীরামপুরের কাছে লিচুপুকুরে। ঠাকুমার সঙ্গে খুব ছোট বয়সে লিচুপুকুরে ঠাকুমার বাপের বাড়িতে তিনি একবার এসেছিলেন। তদুপরি লাহিড়ীমশায়ের মাতামহ পাবনার গোপালকৃষ্ণ রায় শ্রীরামপুরের বিখ্যাত তুলসী গোস্বামীর সঙ্গে আইনসভায় ছিলেন। রাজনৈতিক বন্ধুতা যতটা গভীর হতে পারে তার চেয়েও কিছু বেশি অন্তরঙ্গতা তাঁর তুলসীবাবুর সঙ্গে ছিল।

সে যাই হোক এই সব নানা কারণে বীরেনবাবুর শ্রীরামপুরের ওপরে একটু দুর্বলতা ছিল। অবসর গ্রহণ করে তিনি শ্রীরামপুরেই বসবাস শুরু করলেন।

রং ফরসা, দীর্ঘকায়, মেদহীন ছিপছিপে চাবুকের মত শরীর বীরেন লাহিড়ীকে দেখলেই সমীহ হত। ভদ্রলোক আলাপি এবং মিশুকে ছিলেন।

তখন রিটায়ার্ড সরকারি কর্মচারীরা ব্যাঙ্ক থেকে সরাসরি পেনশন পেতেন না। বীরেনবাবু শ্রীরামপুর ট্রেজারি থেকে পেনশনের টাকা তুলে প্রত্যেক মাসে একবার করে বিপিনদের ব্যাঙ্কে জমা দিতে আসতেন। পরে সংসার খরচের টাকা প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন সোমবার নিয়মিতভাবে তুলে নিয়ে যেতেন।

বিপিন এবং উমা দু'জনের সঙ্গেই বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল বীরেনবাবুর। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় যখনই আসতেন বিপিনকে দেশের খবর জিজ্ঞাসা করতেন, জানতে চাইতেন টাঙ্গাইল

থেকে মা-বাবার খবর এসেছে কিনা। বীরেনবাবুর এক পিসিমার বিয়ে হয়েছিল টাঙ্গাইলে। পিসিমা মারা গেছেন অনেকদিন, কিন্তু বৃদ্ধ পিসেমশায় তখনও ছিলেন দেশের বাড়িতে। তা নিয়েও বীরেনবাবু উদ্বিগ্ন ছিলেন।

বীরেনবাবু ব্যাঙ্কে এলেই বাংলাদেশ যুদ্ধ বিশেষ করে টাঙ্গাইল নিয়ে অনেক রকম আলোচনা করতেন বিপিন। সেই সময়ে টাঙ্গাইল বারবার সংবাদপত্রের শিরোনামে উঠে এসেছে টাইগার বা বাঘা সিদ্দিকি নামে এক অকুতোভয় তরুণ মুক্তিযোদ্ধার দৌলতে।

একদিন কথায় কথায় বিপিন বীরেনবাবুকে বলেছিল, টাইগারের বাবা আমার বাবার পুরনো মক্কেল। তা ছাড়া টাইগার ইস্কুলে আমার থেকে কয়েক ক্লাশ নিচে পড়ত, টাইগারের দাদা পড়ত আমার সঙ্গে।

এই বীরেনবাবুকেই বিপিন বলেছিল, যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি দেখে যা মনে হচ্ছে বাংলাদেশে মা-বাবার থাকা আর নিরাপদ নয় কিন্তু তাদের পক্ষে বাংলাদেশ থেকে নিজের চেষ্টায় বেরিয়ে আসা অসম্ভব। বিপিন আক্ষেপ করে বলেছিল, আমি যদি নিজে যেতে পারতাম।

বিপিনের এই কথা শোনার কিছুদিন পর বীরেনবাবু একটা সুখবর নিয়ে এলেন। যদি এয়ার ফোর্সের বিমানে বিপিন বাংলাদেশের ভিতরে বা সীমান্তের কাছাকাছি যেতে চায়, তার বন্দোবস্ত হতে পারে।

বীরেনবাবুর প্রাক্তন সহকর্মীরা, তাঁদের মধ্যে যাঁদের বয়েস কম, এখনও এয়ারফোর্সে রয়েছে, তাঁদের একজনের সঙ্গে কথা হয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই বিমান সীমান্তবর্তী এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের খবরের কাগজ, বুলেটিন, ওষুধ, তুলো ইত্যাদি সরবরাহ করতে যায়। কিছু বিমান ছাড়ে দমদম বিমানবন্দর থেকে। তারই একটিতে বিপিনের যাওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে।

এই প্রস্তাবে বিপিন সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল। তার ভয়ডর যে অন্যদের চেয়ে কম তা নয় কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক রোমাঞ্চকর কাজে তার সব সময়েই প্রবল উৎসাহ।

ব্যাপারটা সোজা বা ছেলেখেলা নয়। জীবনের ঝুঁকি আছে। যাতায়াত উভয়ত যে কোনও মুহূর্তে ঘোরতর বিপদ হতে পারে, এবং সেই বিপদের মানে একটাই—মৃত্যু।

এই প্রস্তাব শুনে উমা একটু গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু সে আপত্তি করেনি। এই পাঁচ সাত বছরে সে বিপিনকে ভালই চিনেছিল। সে জানত, আপত্তি জানিয়ে কোনও লাভ নেই, বরং সেটা আরও উসকানি হয়ে দাঁড়াবে।

ইপিন ইতস্তত করছিল। তার বক্তব্যটা এই যে আমি বড় ভাই, গেলে আমারই যাওয়া উচিত। বিপিন ইপিনের এই আপত্তিকে হেসে উড়িয়ে দিল রামায়ণী কথা বলে, রামায়ণ-মহাভারতের যুগে এসব চলত।

ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিল মেনকা। পুরো প্রস্তাবটা তার কেমন ভয়াবহ মনে হয়েছিল। তার একটা বিশেষ যুক্তি ছিল, আর কেউ কি এই ঘোর দুর্যোগের দিনে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে গেছে মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনদের উদ্ধার করে নিয়ে আসতে।

তবে ইপিন এবং বিপিন দু'জনেরই পরিচিত অনেক মুক্তিযোদ্ধা এবং সাধারণ লোক কলকাতায় চলে এসেছে। একদিন ইপিন থিয়েটার রোডে জয়বাংলা অফিসে গিয়েছিল সেখানে অনেক চেনাজানা লোকের সঙ্গে দেখা হল।

এদের কাছে অন্তত দু'টো খবর পাওয়া গেল।

এক, প্রভাসকুমার ও স্মৃতিকণা টাঙ্গাইলের বাড়িতেই আছেন এবং নিরাপদেই আছেন। রাজাকারদের বিশ্বাস নেই কিন্তু তবুও তারা হয়তো প্রভাসকুমারের মত নির্বিরোধী লোকের কোনও

শত্রুতা করবে না এবং তারা যদি শত্রুতা না করে মিলিটারি কিছু করবে না।

দুই, এই দুর্যোগের দিনেও দেশে অনেকেরই এখনও যাতায়াত আছে। সঙ্গে মহিলা না থাকলে এবং মালপত্র না থাকলে একবার ঢুকে গেলে টাঙ্গাইল পর্যন্ত চলে যাওয়া যায়। বিশেষ করে এ বছর দুরন্ত বন্যা হয়েছে। পল্লী অঞ্চলে মিলিটাবি এগোতে পারছে না। জলপথে পুরো রাস্তাটা গেলে বিপদের সম্ভাবনা কম।

সবচেয়ে বড় কথা মুক্তিযোদ্ধাদেব গেরিলা আক্রমণ ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠেছে, মিলিটারি ও রাজাকাররা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

টাঙ্গাইলের চৌধুরীবাড়িতে বুধবার দিনটা বহুকাল ধবেই শুভ বলে গণ্য হয়ে আসছে। পরের বুধবার খুব সকালবেলা দমদম থেকে বিপিন নিরুদ্দেশ যাত্রায় রওনা হল।

জীবনে এই প্রথম বিপিনেব এরোপ্লেন চড়া। এবং সত্যিই নিরুদ্দেশ যাত্রা। আগে থেকে বিপিন জানতে পারেনি ঠিক কোথায় যাচ্ছে।

সাধারণ যাত্রীবাহী বিমানেব মত এব মধ্যে চেয়ার-গদি এসব কিছুই নেই। অনেকটা ফেরিলঞ্চের মত কাঠের হেলান দেওয়া আসন। সহযাত্রীবা কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা, কয়েকজন সম্ভবত গুপ্তচরবাহিনীর লোক আব দু'চারজন হল পূর্ব-পাকিস্তানি উচ্চপদস্থ অফিসাব যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে সামিল হয়েছেন। এর মধ্যে একজনের সঙ্গে ভাল আলাপ হল বিপিনের। কি জামান যেন নাম। পুলিশ অফিসার, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পবে সেখানে পুলিশেব আই জি নিযুক্ত হয়েছিলেন।

বিমান এসে থামল রূপসী নামে একটা জায়গায়। জঙ্গল এলাকা। এখান থেকে অল্প দূরে প্রমথেশ বড়ুয়াদের গ্রাম গৌরীপুর। একটা কাঠের গুঁড়ি নিয়ে যাওয়ার ট্রাকে ড্রাইভারের সিটে বসে মাত্র আট আনা খরচে বিপিন গৌরীপুরে চলে এল। বড়ুয়া বাড়িব উঠোনে তখনও বেশ কয়েকটা হাতি বাঁধা ছিল।

সেখান থেকে একটা চায়ের দোকানে চা আর কলা-বিস্কুট খেয়ে আরেকটা ট্রাকে চড়ে ধুবড়ি এল বিপিন। বিপিন প্রথম থেকেই ঠিক করেছিল ধুবড়ি আসবে। ওখান থেকে নৌকো নিয়ে ব্রহ্মপুত্রেব পথে রংপুর, বাহাদুরাবাদ হয়ে সরাসরি যমুনা দিয়ে টাঙ্গাইলে যাবে। যাওয়ার সময়ে স্রোত পক্ষে থাকবে। ফেবার পথে অনেকটা রাস্তা হাওয়া পক্ষে থাকবে।

ধুবড়ি শহরে তখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ত্রাণ-প্রার্থীদের সংখ্যা অনেক। দুপুরে একটা হোটেলে ভাত খেতে গিয়ে একজনের সঙ্গে আলাপ হতে তিনি পরামর্শ দিলেন, 'ব্রহ্মপুত্রের ঘাট থেকে লঞ্চ ধরে মানকার চরে চলে যান। সেখানে নৌকো পাবেন, দু'চারজন টাঙ্গাইলের মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গেও দেখা হয়ে যাবে। ওখানে মুক্তিযোদ্ধারা একটি ঘাঁটি বেঁধেছে।'

সেইদিন রাতেই মানকার চর থেকে যাতায়াতি নৌকো ভাড়া করে ব্রহ্মপুত্র ধরে বিপিন রওনা হল। তার সঙ্গে নৌকোয় পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা উঠল। এখানেই মানকার চরে ছিল।

এদের মধ্যে একজন বিপিনের ক্লাসমেট কলেজ পাড়ার আমজাদ, স্বপ্না খাতুনের কাকা। সে বলল, বাঘা সিদ্দিকি মধুপুর গড়ে রয়েছে। সেখানে তাদের রিপোর্ট করতে বলেছে।

পরের দিন শেষ রাতে বিপিনদের নৌকো এসে ভিড়ল চারাবাড়ির কাছে একটা বটতলা আড়াল করা ঘাটে। পথে বিপদ হয়নি। তাছাড়া মাঝিরা খুব পাকা ও নির্বিকার। এত বড় একটা গৃহযুদ্ধ চলেছে, তা নিয়ে তারা মোটেই ভাবিত নয়।

নৌকোয় বিপিন রইল। আমজাদ গেল বিপিনের খবর পৌঁছাতে। অন্য তিনজন ঘোরা পথে একটা ঢাকাই নৌকো ভাড়া করে মধুপুর গড়ে রওনা হল।

পরের দিন শুক্রবার ভরদুপুর বেলায়, জুম্মার নামাজের সময় বিপিন টাঙ্গাইলের পিছনে

বাজিতপুরের দিক থেকে একটা লুঙ্গি আর নীল পাঞ্জাবি পরে টাঙ্গাইলে এসে ঢুকল। ভাদ্রমাসের খর রৌদ্রের নিচে ঝিম ঝিম করছে শহর। কিন্তু কেমন যেন অবাস্তব। রাস্তাঘাটে কোনও লোকজন নেই। একটা শ্মশান-শ্মশানভাব। তার মনে হল এরকম অবস্থা সে আগে কোথায় দেখেছে, তারপর মনে হল, না দেখেনি, পড়েছে।

...পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল।

গ্রামখানি গৃহময় কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান। হাটে হাটে সারি সারি চালা। পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃন্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ নীচ অট্টালিকা।

আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ। দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে, ঠিকানা নেই।

আজ হাটবার। হাটে হাট লাগে নাই।

ভিক্ষার দিন। ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই।

তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে।

...অধ্যাপক টোল বন্ধ করিয়াছে।

শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না।

রাজপথে লোক দেখি না। সরোবরে স্নাতক দেখি না। গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না। বৃক্ষে পক্ষী দেখি না। গোচরণে গরু দেখি না।

কেবল শ্মশানে শৃগাল ও কুকুর।'...

সাত সকালে স্বপ্না এসে বিপিনের টাঙ্গাইল চলে আসার খবর দিয়ে যাওয়াব পর অসহায় উদ্বেগ ও দুর্ভাবনার মধ্যে রয়েছেন প্রভাসকুমার ও স্মৃতিকণা।

বিপিনের এই অভিযান যে অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং রীতিমত হঠকারিতার পর্যায়ে পড়ে সে বিষয়ে প্রভাসকুমারের মনে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্য দিকে এই অসহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, সেটাও কম কথা নয়। প্রভাসকুমার নিজে থেকে উদ্যোগ নিয়ে কখনও এই শত্রুপুরী থেকে বেরিয়ে যেতে পারতেন না।

স্বপ্না চলে যাওয়ার একটু পর থেকেই খুব উৎকণ্ঠিত, উৎকর্ণ হয়ে আছেন স্মৃতিকণা। গাছেরপাতা পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। বিছানায় তাঁর মাথার বালিশের কাছে একটা বুড়ো বেড়াল শুয়ে আছে, তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন।

সেই যে হারুকে মিলিটারিরা জিপে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, হারু আর বাড়ি ফেরেনি। তার কোনও খবরও পাওয়া যায়নি। বলা বাহুল্য কেউ খবর নেওয়ার চেষ্টাও করেনি। এই অরাজকতার যুগে কারও সেই সাহস ছিল না।

প্রভাসকুমার অবশ্য অনুমান করেছেন হতভাগ্য হারুর কি হওয়া সম্ভব। হারুর বৌ সৌদামিনীর ধর্ষিতা হওয়া নিয়েও তিনি অনেক ভেবেছেন, নিজের বিবেক ও আত্মার কাছে আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হয়েছেন।

কাছারি ঘরের প্রাচীন দেয়াল ঘড়িটা বহুকালের পুরনো। প্রথম মহাযুদ্ধের আগেকার জার্মান গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লক। সেই ঘড়ির পেণ্ডুলামে প্রেতি মুহূর্তে টক্ টক্ করে শব্দ হয়।

এ বিষয়ে প্রভাসকুমারের সেরেস্তার বাবার আমলের মুহুরি সাহেব আফজল মিঞার একটা বাৎসরিক রসিকতা ছিল। তখন কাছারিঘরের জানলার ওপাশে একটা টগবগে টোপাকুল গাছ ছিল, সেটা প্রত্যেক শীতে ফলভারে নুয়ে পড়ত। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হত পাড়া-বেপাড়ার পর বালকদের উৎপাত।

আফজল মিঞা ভাঙা ছাতা নিয়ে সেই ছেলেদের তাড়া করে যেতেন, 'দেখছিস না বিলিতি ঘড়ি বারবার বলছে টক, টক, টক, আর তোরা সেই টক কুল খাচ্ছিস। সর্দিকাশি, জ্বর হয়ে মারা পড়বি যে।'

আজ এই দুর্দিনের দুঃসময়ে দেয়াল-ঘড়িটার টক্ টক্ শব্দ শুনতে শুনতে সেই হাস্যকর স্মৃতি মনে এল প্রভাসকুমারের। আফজল সাহেব মারা গেছেন সেও তিরিশ বছর হয়ে গেল।

এখন এই প্রায় মধ্যদুপুরে পুরনো ঘড়িটার টক্ টক্ শব্দ হৃদপিণ্ডের সঙ্গে তাল দিয়ে হচ্ছে। স্বপ্না আসবে, সে কি খবর নিয়ে আসবে।

এরই মধ্যে একটা খরাপ খবর পাওয়া গেল।

পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে মিলিটারিদের সরকারি জিপে মাইক দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে,

'গতকাল গভীর রাতে ধলাপাড়ায় একটি সংঘর্ষে মুক্তিবাহিনীর নেতা কাদের সিদ্দিকি নিহত হয়েছে।'

টাঙ্গাইল থেকে ধলাপাড়া কাছে নয়। উত্তর দিকে ময়মনসিংহের রাস্তায় মাইল পনেরো গিয়ে তারপর আবার পুবে যেতে হয় অনেকটা। কাল বিনিদ্র রজনীতে অনেক দূরে অনেক গুলিগোলার শব্দ শুনেছেন প্রভাসকুমার, কিন্তু ধলাপাড়া তো বেশ দূরে, অত দূর থেকে নিঝুম রাতে বর্ষার পূবালী বাতাসে গুলিগোলার শব্দ ভেসে এসেছে?

ধলাপাড়া জায়গা প্রভাসকুমারের চেনা। ওখানকার জমিদার চৌধুরীদের এক অংশের তিনি উকিল। একবার আদালতের নির্দেশে চৌধুরী বাড়িতে তিনি গিয়েছিলেন এক শরিকী মামলায় এক পর্দানসীন বৃদ্ধার জবানবন্দী নেওয়ার জন্যে।

কাদের সিদ্দিকি মানে টাইগার তথা বাঘাকেও তিনি তার শিশুকাল থেকে চেনেন। মাইকে খবরটা শুনে একে মানসিক উত্তেজনা, তার ওপরে, একটু দমে গেলেন।

বেলা এগারোটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া সেরে স্মৃতিকণা ও প্রভাসকুমার স্বপ্নার জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

কিছুটা গোছগাছ করতে হয়েছে, দু'জনে দুটো সুটকেসে আর ঝোলা ব্যাগে গয়নাগাঁটি, কিছু জামাকাপড়, অল্প বাসন, সেই সঙ্গে কিছু স্মৃতিচিহ্ন ইপিন-বিপিনের অল্প বয়সের ফটোগ্রাফ, প্রভাসকুমারের বাবার ছবি। মার ছবি ছিল না, সে অনেকদিন আগে নষ্ট হয়ে গেছে।

এছাড়া স্মৃতিকণা সঙ্গে নিয়েছিলেন তাঁর আরাধ্যা দেবী মা কালীর একটা ফ্রেমে বাঁধানো পুরনো ছবি, যার কাঁচের আর ফ্রেমের ওপরে বহুকালের সিঁদুর-চন্দনের ফোঁটা। ছবিটা সাধারণ, হাটে-বাজারে কিনতে পাওয়া যায় কিন্তু স্মৃতিকণার শাশুড়ির আমলের এই প্রতিমার ছবি, কত যুগের সিঁদুর-চন্দন, স্মৃতিকণা কাঁধের ঝোলা ব্যাগে এটাও ভরে নিলেন।

সকালবেলা স্বপ্না চলে যাওয়ার পরেই হারুর মাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন প্রভাসকুমার। স্মৃতিকণা তাকে সব কথা বলতে সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আমি আর সদু আপনাদের সঙ্গে যাব।'

'কিন্তু হারু।' একটু ইতস্তত করে প্রভাসকুমার এই প্রশ্ন করায় হারুর মা বলল, 'সে যদি বেঁচে থাকে, তবে তার সঙ্গে আবার দেখা হবে নিশ্চয়। কিন্তু এখন আর এ দেশে এক দণ্ডও থাকতে পারব না।'

বারোটা বাজল কাছারির ঘড়িতে। একটু আগে জুম্মাবারের বড় নামাজের আজানের শব্দ

পাওয়া গেছে॥

খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন স্মৃতিকণা ও প্রভাসকুমার। কখন স্বপ্না কি খবর নিয়ে আসে। হারুর মাকে বলে দেওয়া হয়েছে কাউকে কিছু না বলতে এবং তৈরি হয়ে নিতে। হারুর মাকে পাঠিয়ে বাজার থেকে পাঁচ সের চিঁড়ে এবং এক সের শুকনো আখের গুড় আনিয়ে পুঁটলি করে রেখেছেন, রাস্তায় খোরাক।

হঠাৎ বাড়ির উঠোনের দিক থেকে একটা খুট করে আওয়াজ আসতে বারান্দা থেকে নেমে স্মৃতিকণা দেখলেন বিপিন, পিছনের খিড়কি দরজার শিকল দরজার ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে খুলে বাড়িতে ঢুকল।

বিপিন সোজা বাড়িতে ঢুকে ওপাশের পুজোর ঘরের মধ্যে চলে গেল। যাতে বাইরের কেউ তাকে দেখতে না পায়। বলা বাহুল্য সেই জন্যেই তার এই সতর্কতা।

স্মৃতিকণা তাড়াতাড়ি পুজোর ঘরে গেলেন। যাওয়া মাত্র বিপিন তাঁকে আশ্বস্ত করল, ভয়ের কিছু নেই। এখন পর্যন্ত কোনও চেনা লোক তাকে দেখতে পায়নি। রাস্তাঘাটে লোকজন প্রায় নেই। যা দু'চারজন ছিল, সবাই নমাজী, এখন বড় মসজিদে নমাজ পড়ছে এখনও ঘণ্টাখানেক সময় হাতে আছে।

কালীবাড়ির কাছে খালধারে একটা ছোট ছই ঢাকা ঢাকাই নৌকো বাখা আছে। সৌদামিনী এবং হারুর মাকে নিয়ে স্মৃতিকণা কালীবাড়ি হয়ে নৌকোয় উঠবে একেবারে ছইয়ের ভিতরে।

কারও যাতে সন্দেহ না হয় সে জন্যে প্রভাসকুমার একটু এগিয়ে শহরের শেষে খালের মুখে অপেক্ষা করবেন, সেখানেই নৌকোয় উঠবেন।

কাছারি ঘর, রান্নাঘর, সব যেমন আছে তেমনিই খোলা থাকবে। যা হয় হবে। দালান ভেতরের দিকে তালা দেওয়া হবে। সবই ভগবানের ভরসায় রেখে যাওয়া।

বিপিন মা-বাবাকে কোনও প্রশ্ন বা আপত্তি করতে দিল না। সব শেষে বিপিন বেরোবে, সেই তালা দিয়ে মালপত্র নিয়ে বেরোবে।

লৌহজং নদী শহরের দক্ষিণ দিক ধরে এসেছে, সেই পথে উজিয়ে কয়েক মাইল গেলে যমুনার বাঁক, ওখান থেকেই ধলেশ্বরী নদীর শুরু। সেই ধলেশ্বরী-যমুনার বাঁকে বড় গহনার নৌকো রাখা আছে, ঢাকাই নৌকো থেকে প্রভাসকুমারেরা সেই নৌকোয় গিয়ে উঠবেন। সেই নৌকোয় আরও অনেক লোক যাবে, কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা থাকবে। বিপিন যথাসময়ে মালপত্র নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হবে, যদি আগে ঢাকাই নৌকোয় না যেতে পারে।

বাবা-মাকে রওনা করে দিয়ে বিপিন একটা দুঃসাহসিক কাজ করল। সে সরাসরি কালীবাড়ির মোড়ে গিয়ে একটা রিক্শা ডেকে এসে তাতে সব মালপত্র তুলে রিক্শার ঢাকনিটা তুলে দিয়ে নিজে উঠে বসল। প্রচণ্ড রোদ্দুরে চারদিক ঝিমঝিম করছে। ভাদ্রের প্রথম সপ্তাহ। ঢাকা রিক্শায় কারও কিছু সন্দেহ হওয়ার কথা নয়। আর রাজাকার বা দালাল ছাড়া কে কাকে সন্দেহ করতে যাচ্ছে। সবাই নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত।

বিপিনকে রিক্শাওয়ালা চেনে না, চেনার কথাও নয়। এরা সব শহরের বাইরের গ্রামাঞ্চলের, চর এলাকার লোক।

বিপিন রিক্শায় উঠে বলল, 'কলেজ পাড়ায় চল।' যেন এই শহরের এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যাচ্ছে।

আসলে কলেজ পাড়ার পিছনেই খাল। কলেজ পাড়ার শেষ বাড়িটা আগে ছিল স্মৃতিকণার এক পিসেমশায়ের, কয়েক বছর আগে তাঁরা বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে কলকাতায় চলে গেছেন।

সে যা হোক, বিপিন জানে বাড়িটার পাশে মিউনিসিপ্যালিটির নালার ধার ধরে একটা বাঁধানো প্যাসেজ আছে। সেই প্যাসেজ ধরে খাল ধার আধ মিনিট।

রিক্শা থেকে নেমে মালপত্র নিয়ে প্যাসেজ দিয়ে খালধারে গিয়ে বিপিন দেখে একটা পুরনো বাদাম গাছের ছায়ায় বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁর পায়ের কাছে একটা নেড়ি কুকুর লেজ নাড়ছে।

এখনও স্মৃতিকণাদের নিয়ে ঢাকাই নৌকোটা আসেনি। তবে চিন্তা করার মত দেরি হয়নি।

বিপিন বাবাকে বলল, 'এই কুকুরটাও আমাদের সঙ্গে যাবে নাকি ?'

প্রভাসকুমার বললেন, 'আমাদের পাড়ার কুকুর। আমাদের উঠোনেই আগে ঘুমত। বেশ কয়েকদিন পাড়ায় দেখিনি। আজ হঠাৎ আমাকে এখানে দেখতে পেয়ে নদীর ধার থেকে দৌড়ে এসে সমানে লেজ নাড়ছে।'

কুকুরটা বুঝতে পেরেছিল, তাকে নিয়ে কথা হচ্ছে। আরও দ্রুতগতিতে সে লেজ নাড়াতে লাগল।

ইতিমধ্যে ঢাকাই নৌকো এখানে এসে গেছে। মালপত্র নিয়ে প্রভাসকুমার আব বিপিন উঠে বসলেন নৌকোয়।। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নৌকো তরতর করে খাল ছেড়ে শহরের বাইরে লৌহজং নদীতে এসে পড়ল।

ওই দেখা যাচ্ছে পার্কের গাছগুলো, সারিসারি অতিকায় বিদেশী মহীরুহ। ওই চাল গুদাম, ওই খেয়াঘাট, ওই মানদায়িনী হল, ওপাশে অনাথ দাসের গোলা।

ছইযের ভেতরের থেকে একটু বেরিয়ে এসে হাত জোড় কবে প্রণাম করলেন প্রভাসকুমার তাঁর জন্ম শহবকে। কি জানি আর যদি কখনও নাই ফেরা হয়? হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন বহু পোড় খাওয়া প্রৌঢ় মানুষটি।

সন্ধ্যার অনেক পরে গহনার নৌকো ছাড়লো যমুনার ঘাট থেকে। প্রবল বর্যায মাঠঘাট, নদী সব একাকার হয়ে গেছে, চারদিকে থই থই করছে জল।

কৃষ্ণপক্ষ শেষ হয়ে সবে শুক্লপক্ষের প্রথম দিক, বড়জোর তৃতীয়া কি চতুর্থী হবে। সন্ধ্যার একটু পরেই ক্ষীণ বাঁকা চাঁদ যমুনার কালো জলে ডুবে গেল।

চারদিকে ঘন অন্ধকার। দূরে দূরে ছোট ছোট গ্রাম কোনও রকমে জলের মধ্যে নিঃশব্দে জেগে রয়েছে, কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। অনেক দূরে ঝিঁঝিঁ ডাকছে, দুয়েকটা জোনাকি জ্বলছে, তাও যেন কেমন সন্ত্রস্ত ভাব। একটু আগে নদীর ওই দিকে কোথায় এখনও জেগে থাকা কোনও শরবনের ভিতরে শেয়ালেরা রাত্রির প্রথম প্রহর ঘোষণা করেছে। দুয়েকটা কুকুরের ডাকও শোনা গেছে। কিন্তু তাতে নিস্তব্ধতা ভাঙেনি, বরং বেড়ে গেছে। নদীর তীরের গ্রামগুলি প্রভাসকুমারের দীর্ঘদিনের চেনা, কিন্তু আজ এই সন্ধ্যায় চিনতে পারছেন না, কেমন যেন প্রেতপুরীর মত দেখাচ্ছে।

নৌকো এগিয়ে চলেছে। রাত্রির অন্ধকারে কালো জল কেটে অনিশ্চয়তার দিকে। বৈঠার

ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে, হৃদপিণ্ডের প্রতিধ্বনির মতো।

মাঝি-মাল্লারা নিপুণ ও বিশ্বস্ত। মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে বিপিনই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিয়ে এসেছে। দশ হাজার টাকায় এদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে নিরাপদে ওপারে পৌঁছে দেবে।

ওপারে মানে রংপুর জেলা পেরিয়ে আসামের ধুবড়ি জেলার সীমান্তে ব্রহ্মপুত্রের চরে। চরটার নাম মানকার চর, মেঘালয় রাজ্যের এলাকায় পড়ে। পৌঁছাতে আটচল্লিশ ঘণ্টা থেকে বাহাত্তর ঘণ্টা লাগবে।

মাল্লারা খুবই সাবধানী কিন্তু ওদের দেখে মনে হয় না তাদের মনে কোনও দুশ্চিন্তা আছে। বর্ষা শুরু হওয়ার পর থেকে যমুনা-ব্রহ্মপুত্র হয়ে শরাণার্থীদের নিয়ে বহুবার গেছে। পাক হানাদারেরা টের পেলেও দেশ মালউন মুক্ত হচ্ছে এই চিন্তায় অতর্কিতে অক্রমণ করতে আসেনি। হয়ত রাজনৈতিক অঙ্ক এমন ছিল যে এই ভাবে যদি সব হিন্দু এবং বিদ্রোহীরা দেশত্যাগ করে তা হলে যারা থেকে যাবে সবাই অনুগত প্রজা, তখন আর গোলমাল, রাজনৈতিক অস্থিরতা, স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবি থাকবে না।

প্রভাসকুমারদের নৌকোয় গাদাগাদি করে প্রায় চল্লিশজন লোক, এর মধ্যে জনা পাঁচেক মুক্তিযোদ্ধা। এরা ভারতে যাচ্ছে রসদ ও অস্ত্র সংগ্রহ করতে।

মুক্তিযোদ্ধাদের কাছেই প্রভাসকুমার জানতে পারলেন, টাইগার সিদ্দিকি মারা যায়নি। টাঙ্গাইল শহরে মিলিটারিরা যে রটনা করেছে সেটা পুরোপুরি মিথ্যে। ওই রাতে ধলাপাড়ায় একটা সংঘর্ষ হয়েছিল বটে কিন্তু তাতে টাইগারের কোনও ক্ষতি হয়নি। বরং হানাদাররা ভীষণ মার খেয়েছে।

এরকম গুজব অনবরতই রটছিল।

মানকার চরে এসে প্রভাসকুমারেরা শুনলেন টাইগারের ডান হাত উড়ে গেছে, সারা জীবনের মত পঙ্গু হয়ে গেছে। আরও শোনা গেল মুজিব নাকি পাকিস্তানের জেলে মুচলেকা দিয়েছেন। কিন্তু কেউ আর এসব বিশ্বাস করছে না।

হাওয়া অনুকুল ছিল। আটচল্লিশ ঘণ্টার একটু আগেই রবিবার সন্ধ্যায় ভারতের মাটিতে প্রভাসকুমারদের নৌকো এসে ভিড়ল। চল্লিশটি প্রাণী এক সঙ্গে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ভারতের বাতাসে। দুঃস্বপ্নের দিন কেটে গেছে। আর কিছু না হোক নিরাপত্তা তো মিলেছে।

গত দুদিনের জলযাত্রা অবশ্য পুরোটা নির্ঝঞ্ঝাট ছিল না। গতকাল দুপুরবেলা একটা মিলিটারি লঞ্চ নদীতে প্রায় কয়েক মাইল দূরের থেকে গয়নার নৌকোটাকে অনুসরণ করে চলেছিল। ছাদের ওপরে খাকি পোষাকপরা রাইফেল কাঁদে সৈন্যরা দূরবীন দিয়ে লক্ষ্য রাখছিল।

মাল্লারা সবাইকে ভয় পেতে বারণ করে বলে, 'সবাই ছইয়ের মধ্যে চলে যান। কেউ যেন দূরবীনের মধ্যে ধরা না পড়েন।' তারপর মাঝিরা পাটাতনের নিচ থেকে একটা পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ বার করে মাস্তুলে টানিয়ে দেয়।

এতেই কাজ হয়েছিল। যদি তা না হত মিলিটারি লঞ্চ যদি এগিয়ে আসত তারও উপায় ওদের ছিল। মিলিটারিদের নজরে আসার পর মাঝিরা নদীর এদিকের তীর ঘেঁষে যাচ্ছিল, হঠাৎ লঞ্চ এদিকে এগিয়ে এলে আশেপাশের খাল ধরে গ্রামের দিকে ঢুকে যাবে। মিলিটারি কখনই নদী ছেড়ে ভিতরে ঢুকবে না। তাছাড়া সামনেই একটা বিরাট বিল রয়েছে, বোধহয় এটাই চলন বিল, তার মধ্যে সেঁধিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়া অসাধ্য।

সে যা হোক এসব প্রয়োজন পড়েনি।

উলটো পথে অন্য কি যেন দেখে লঞ্চ দ্রুত ওই দিকে চলে গিয়েছিল।

তবে আজ খুব ভোরবেলা ডাকাত পড়েছিল নৌকোয়। ডাকাত মানে রাজাকার। দুটো ছিপ

নৌকোয় তারা অতর্কিতে পাশের একটা বাঁক থেকে বেরিয়ে প্রভাসকুমারদের নৌকোটা দুপাশ দিয়ে ঘিরে ধরে। তাদের কাছে একটা গাদা বন্দুক এবং অনেকগুলো বল্লম ও তরোয়াল ছিল।

রাজাকাররা বন্দুক দেখিয়ে মাঝিদের নৌকো থামাতে বলে। নৌকোর ভিতরে তখন শরণার্থীরা প্রায় সবাই ঘুমিয়ে। ছইয়ের ওপরে নদীর ভেজা বাতাসে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল মুক্তিযোদ্ধারা। একজন মাল্লা নৌকো থামানোর সময় একটা লগির মাথা দিয়ে তাদের একজনকে একটা খোঁচা দিয়ে দেয়। সে ধড়মড় করে জেগে উঠে ঘুমের জড়তার মধ্যেও অভিজ্ঞ চোখে পুরো অবস্থাটা অনুমান করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে সে লাথি মেরে সহযোদ্ধাদের জাগিয়ে দিয়ে মাথার কাছে রাখা ঊনত্রিশে মার্চ পুলিশ লাইন থেকে লুট করা টোটা ভর্তি রাইফেলটা নিয়ে ছইয়ের ওপরে দাঁড়িয়ে যায় এবং রাজাকাররা অবস্থার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম না করায় সরাসরি যে রাজাকার গাদা বন্দুক তাক করে নৌকো থামাতে বলেছিল তাকে গুলি করে ফেলে দেয়।

পিছনের গলুইতে জোড়াসন হয়ে বসে প্রভাসকুমার পূর্ব দিগন্তের দিকে চেয়েছিলেন। হাত ঘড়িতে সকাল পৌনে ছয়। পূর্ব দিগন্তে নদীর জল লাল হয়ে উঠেছে। জবাকুসুম সঙ্কাশং চিরদিনের সূর্য জলের ভিতর থেকে উঠে আসছে। বহুকালের অভ্যাস মত কপালে হাত ঠেকিয়ে দিনের প্রথম সূর্য-দর্শনকে প্রণতি জানালেন প্রভাসকুমার, ঠিক সেই মুহূর্তে পিছনে খুব কাছ থেকে দুম করে গুলির শব্দ।

এতক্ষণ এতটা আত্মনিমগ্ন ছিলেন প্রভাসকুমার কিছুই খেয়াল করেননি। গুলির শব্দে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দেখলেন পাশে একটা ছিপ নৌকো, তার থেকে একটা বন্দুকধারী লোক নিচে নদীর জলের ওপর পড়ে গেল। একটু ভেসে তারপর তলিয়ে গেল দেহটা। দুয়েকটা বুদ্বুদ উঠল জলে। দুটো ছিপ নৌকো সামনের বাঁকে একটা অশ্বত্থ গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। গয়নার নৌকোব পাশে নদীর জল রক্তে লাল, অনেক দূরে দিগন্তে সূর্যোদয়ের রঙের মত না হলেও বেশ লাল।

মানকার চরের শরণার্থী শিবিরে প্রবেশের চেয়ে প্রস্থান কঠিন। প্রায় লাখ খানেকের মত লোক, যেন একটা বিরাট বন্দিশিবির। সেখান থেকে এমনি বেরোতে দেবে না কোনও ভারতীয় নাগরিককে, মুচলেকা দিতে হবে। তার জন্যে প্রমাণপত্র চাই।

বিপিন অবশ্য খবরাখবর নিয়ে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। প্রভাসকুমার এবং স্মৃতিকণার অসুবিধে হল না মুক্তিনামা পেতে। হারুর মা এবং সৌদামিনীর ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেছিল। এরা তো আত্মীয় নয়, এদের ক্ষেত্রে বিপিনের মুচলেকার কি দাম। প্রভাসকুমার পারতেন না, কিন্তু দু'পয়সা খরচ করে বিপিন সে বাধাও কাটালো। এখানেও প্রচণ্ড অরাজকতা।

কলেরা মহামারী হয়ে দেখা দিয়েছে। সবাই ত্রাণশিবির ছেড়ে বেরোতে চায়। সবাই কেয়ার অফ পোস্টমাস্টার মানকার চর ঠিকানা দিয়ে স্বজনদের টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে, 'তাড়াতাড়ি এসে নিয়ে যাও।' কারও কারও লোক আসছে, অনেকের আসছে না। টানাটানির সংসারে দায় বাড়াতে অনেকেই চায় না।

এদিকে বন্যায় রেললাইন ভেসে গিয়ে উত্তরবঙ্গে ট্রেন বন্ধ। লঞ্চে করে ধুবড়ি গিয়ে সেখান থেকে ট্রেন। বিপিন যা টাকা-পয়সা এনেছিল সব ফুরিয়ে গেছে, ধুবড়ি সোনপট্টিতে স্মৃতিকণা গলার সোনার বিছে হার বেচলেন। ছেলের মাকে খালি গলায় থাকতে নেই তাই বাজার থেকে একটা রূপোর হার কিনে গলায় পরলেন। জীবনে এই প্রথম কোনও রূপোর গয়না গায়ে দিলেন স্মৃতিকণা।

ধুবড়ি থেকে ট্রেনে ফকিরাগ্রাম। কিন্তু ফকিরাগ্রামের পর উত্তরবঙ্গের রেলপথ বর্ষায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই এর পর গৌহাটি হয়ে বিহার দিয়ে ভাগলপুর। অবশেষে ভাগলপুর থেকে সাবেকি লাইনে কলকাতা।

পুরো আড়াইদিন কাটল ট্রেনে। ট্রেনের কামরায় কামরায় প্রভাসকুমারদের মত অজস্র শরণার্থী। রেল কোম্পানি শরণার্থীদের কাছ থেকে টিকিট নিচ্ছে না, হয়ত কোনও অলিখিত নির্দেশ আছে, টিকিট চেকারকে দেখলে 'জয়বাংলা' বললেই হয়ে যাচ্ছে।

দীর্ঘ ট্রেন যাত্রার ক্লান্তিতে একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন স্মৃতিকণা। তাঁর চিরকাল আফশোস ছিল টাঙ্গাইলে রেললাইন নেই বলে। এবারে এক ধাক্কায় সেই আফশোস তার মিটল।

ট্রেনে ওঠার দুদিন পবে সবরকম সময়সূচী ভঙ্গ করে প্রভাসকুমারদের গাড়ি হাওড়া স্টেশনে এসে প্রবেশ কবল রাত সাড়ে এগাবোটায়।

এবং স্টেশনে ঢুকেই গাড়ি থেকে নামার আগেই জানা গেল, দুদিনের বাংলা বন্ধ। আজকেই রাত বারোটায় শুরু হচ্ছে।

এই কয়দিনেব এত ধকলের পর এখন যদি রেল স্টেশনে দুদিন থাকতে হয় সে আরও সাংঘাতিক কথা।

মোটামুটি ঠিক ছিল প্রভাসকুমাব আপাতত ইপিনেব বাড়িতে উঠবেন। কিন্তু বিপিন যখন দেখল বর্ধমান মেল লাইনের একটা গাড়ি পাশের প্ল্যাটফর্মে ছাড়তে যাচ্ছে। সে দৌড়াদৌড়ি হুড়ো হুড়ি করে সবাইকে নিয়ে সেই গাড়িতে গিয়ে উঠল।

আধঘণ্টা পরে শ্রীরামপুর। একঘণ্টা পরে বিপিনের বাড়ি। স্টেশন থেকে বেশ খানিকটা দূর, যেতে রিকশা লাগে। জি টি রোডের পাশের একটা গলিতে উঠোন আর টিনের চালের বারান্দাওলা একটা দু ঘরের দালান। পুবনো আমলের কোনও জমিদাবেব কাছারি ঘর ছিল বোধহয়।

উমা জেগেই ছিল। বোধহয় তার ঘুম আসছিল না। রিক্শার শব্দ শুনে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে, 'কে?' জিজ্ঞাসা করার আগেই বিপিনের গলা পাওয়া গেল, 'দরজা খোল। আমরা এসে গেছি।'

উমা তাড়াতাড়ি গিযে দরজা খুলে শ্বশুর-শাশুড়িকে প্রণাম করল। স্মৃতিকণা ও প্রভাসকুমার এই প্রথম কনিষ্ঠা পুত্রবধূকে দেখলেন। উমার পেটের দিকে তাকিয়ে স্মৃতিকণা বুঝলেন সে সন্তানসম্ভবা, প্রায় পূর্ণগর্ভা। ছযমাস কোনও খবর পাননি। বিপিনও তাঁকে কিছু বলেনি।

উমার দিকে তাকিয়ে স্মৃতিকণা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৌমাকে এই অবস্থায় একা রেখে তুই আমাদের আনতে গিয়েছিলি?'

পবের দিন সকালেই স্থির করা হল, স্মৃতিকণা উমার এই অবস্থায় এখানেই থাকবেন, সঙ্গে হারুর মা-ও থাকবে। সদুকে নিয়ে প্রভাসকুমার কলকাতায় ইপিনের ওখানে গিয়ে থাকবেন।

আপাতত এই রকম ব্যবস্থা। কিন্তু বিপিন বলল, 'আপাতত টাপাতত কিছু নয়। এই তো কয়দিনের মামলা। বাংলাদেশ স্বাধীন হল বলে। বিজয়ার কোলাকুলি এবার টাঙ্গাইলের বাড়িতে হবে।'

দেখতে দেখতে প্রভাসকুমার ও স্মৃতিকণার চার মাস কেটে গেল ইপিন-বিপিনের বাড়িতে। পাকিস্তান হওয়ার পরে এত ভাল চার মাস তাঁদের আর কখনও কাটেনি। ইপিন-বিপিন দুই

ছেলেই চাকরিজীবী। তাদের কারও আয়ই তেমন ভাল নয়। প্রভাসকুমার চিরদিনই স্বচ্ছল জীবন কাটিয়েছেন। অল্প বয়সে বাপ মাথার ওপরে ছিলেন, ওকালতিতে প্রভাসকুমারের বাবার মাসিক আয় ছিল সেই আমলে চার অঙ্কের টাকায় যখন টাঙ্গাইলে টাকায় দশ সের দুধ। এক ঝুড়ি গলদা চিংড়ি বা বড় চিতল মাছের দাম এক-দেড় টাকা। মাংসের সের বার আনা। পরবর্তীকালে প্রভাসকুমারের ওকালতির আয়ও যথেষ্ট হয়েছিল। বাবার পেশার অনেকটাই তিনি পেয়েছিলেন। তা ছাড়া গত কয়েক বছর টাঙ্গাইল জেলা হওয়ার পর থেকে তাঁর আয় বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। আর শুধু ওকালতির আয় নয়, শহরে কয়েকটা ভাড়াটে বাড়ি, গ্রামে ধান জমি, পুকুর, নারকেল-খেজুর আম-কাঁঠাল গাছ। কোন অভাববোধ করেননি কখনও প্রভাসকুমার।

শুধু পাকিস্তান হওয়ার পরে কয়েকমাস একটা নোংরা ব্যাপার হয়েছিল। মুসলমান মক্কেলদের হিন্দু উকিলদের সেরেস্তায় আসতে বাধা দেওয়া হত। সেই সময় একটু টানাটানি গিয়েছিল। তবে সেটা সাময়িক ব্যাপার।

ইপিন-বিপিনের তেমন টানাটানি নেই কিন্তু স্বচ্ছলতাও নেই। হিসেবের বাইরে কোন খারাপভাল খরচ করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। মাপা দুধ, মাপা মাছ।

প্রভাসকুমার এদের দৈনন্দিন খরচের জন্যে কিছু টাকা সব সময়েই যে ভাবে পারেন পাঠিয়েছেন, কিন্তু এবার শরণার্থী হয়ে এসে ছেলেদের ওপরে আর্থিক নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় তাঁর বারবার সঙ্কোচবোধ হচ্ছিল। ভাবছিলেন, কিছু টাকা সঞ্চয় করে এ পারে জমানো উচিত ছিল।

স্মৃতিকণা ওসব নিয়ে মাথা ঘামাননি। তাঁর টাকা পয়সা না থাকলেও সোনা আছে। পাকিস্তান হওয়ার পরে পরেই গায়ের সোনা ছাড়া আর সব গয়না পিসশ্বশুরের বাড়িতে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্মৃতিকণা আর তাঁর স্বর্গতা শাশুড়ির অলঙ্কার মিলিয়ে প্রায় একশো ভরি হবে। তেমন দরকার পড়লে বেচবেন। গয়নার প্রতি স্মৃতিকণার কোনও মোহ নেই। তবে তিনি মনে করেন এগুলো তাঁর পুত্রবধূদের ন্যায্য প্রাপ্য। খুব বিপদে না পড়লে বেচা উচিত হবে না।

বেচার অবশ্য প্রয়োজন পড়ল না। প্রভাসকুমার রেডক্রস থেকে একটা শরণার্থী অনুদান সংগ্রহ করলেন। তাতে মাস দুয়েক ভালই কাটল।

কিন্তু বিপিনের ভবিষ্যৎবাণী মেলেনি। বিপিন বলেছিল বিজয়ার কোলাকুলি হবে টাঙ্গাইলের কালীবাড়িতে।

তা হয়নি। উনিশ শো একাত্তরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ভয়াবহ অবস্থা। কি হচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে অনুমান করা যাচ্ছে মুক্তিযোদ্ধারা জীবনপণ লড়াই শুরু করে দিয়েছে।

এ দিকে জয়বাংলার উন্মাদনা এসে স্পর্শ করেছে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে। কলকাতা মহানগরী ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠেছে। রাস্তায়-ঘাটে লোকে পরস্পরকে 'জয়বাংলা' বলে সম্বোধন করছে। ট্রামে-বাসে জয়বাংলা বললে ভাড়া থেকে রেহাই। একটা ছোঁয়াচে চোখের অসুখ দেখা দিয়েছে লোকে তাঁর নাম দিয়েছে জয়বাংলা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিড় করে লোকেরা জয়বাংলা বেতারে আর আকাশবাণীতে মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ শুনছে। মুক্তি যুদ্ধের সংবাদ কাড়াকাড়ি করে পড়ছে খবরের কাগজে।

পলাশীর যুদ্ধের পরে সমতল বঙ্গভূমে এমন ঐতিহাসিক লড়াই আর হয়নি। এ সবই ইতিহাসের কথা হয়ে গেছে। এই কাহিনীতে বিস্তারিত করে বলার ব্যাপার নয়।

এই কাহিনী যেখানে শুরু হয়েছিল এবার আমরা সেখানে ফিরে যাব। মুক্তিযুদ্ধের বাইশ বছর বাদে এই ফাল্গুনের দিনে দুদিকে গোল থাম দিয়ে ঘেরা ভাঙাচোরা হলুদ দালান। সামনের পুকুরে কচুরিপানার ফুল। সিঁড়ি আর উঠোন ছেয়ে গেছে ঝরে পড়া আমের মুকুল, হলুদ কাঁঠাল পাতা আর চাঁপা ফুলে।

পলেস্তারা খসা দালানের বারান্দায় একটা বহুকালের পুরান বেতের চেয়ারে শুয়ে আছেন এক বৃদ্ধ। তার গায়ে একটা আরও পুরনো কাশ্মীরী শাল জড়ানো।

ঠাণ্ডা যে খুব একটা আছে তা নয়, থাকলেও গরম শাল গায়ে জড়ানোর মত ঠাণ্ডা নয়। কিন্তু প্রভাসকুমার চিরকালই একটু শীতকাতুরে।

ইজিচেয়ারে বসে শিশুর মত প্রভাসকুমার নিমগ্ন। কখনও ঠোঁটের কোণায় একটু হাসি দেখা যাচ্ছে। কখনও চোখের প্রান্তে একবিন্দু জলের ছোঁয়া।

বারান্দার সামনে পর পর পাঁচটা ঘর। সব ঘর খালি। সেগুলো বন্ধ করা আছে। শুধু সামনের ঘরটা খোলা। তার মধ্যে পাপোশের ওপরে একটা মাথামোটা হুলো বেড়াল শুয়ে আছে।

প্রভাসকুমার হঠাৎ ধড়মড় করে জেগে উঠলেন। কাউকে ডাকবেন কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছেন না কাকে ডাকবেন। প্রথমে পুরান চাকর বাহাদুরের কথা মনে পড়ল। তার পড়ে তার ছেলে ভরতের কথা। কিন্তু তখনই মনে হল, তারা তো নেই আজ প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর। ঝিমুনির মধ্যেই প্রভাসকুমারের খেয়াল হল খুব পিপাসা পেয়েছে। স্মৃতিকণাকে ডেকে এক গেলাস জল চাইতে গিয়ে থেমে গেলেন। স্মৃতিকণা মারা গেছে সেওতো প্রায় দশবছর হয়ে গেল। এই বাড়িতে, ওই সামনের ঘরে।

সেদিন ভাদ্রমাসের অনেক রাতে চাঁদ উঠেছিল। হলুদ রঙের জ্যোৎস্না। দূরে দুটো টিটি পাখি গলায় গলা মিশিয়ে ডাকছে। উঠোনে বসে চাঁদের দিকে মুখ করে শেয়ালরা ডেকে গেল।

শ্মশানযাত্রীরা তখন ফিরছে। প্রভাসকুমার শ্মশানে যাননি। এই ইজিচেয়ারেই সন্ধ্যা থেকে স্থির হয়ে বসেছিলেন। পুত্রবধূরা মোড়া নিয়ে পাশে তাঁকে আগলিয়ে ছিল।

মায়ের অসুখের সংবাদ ইপিন-বিপিনেরা দিন কয়েক আগেই সপরিবারে চলে এসেছিল। ইপিনের দুই ছেলে রথী আর মহারথী দুজনেই তখন প্রায় নাবালক। মহারথী ছোটবেলায় খুব নাদুস-নাদুস ছিল আর রথী ছিল রোগা। এখন অবশ্য উল্টোটা হয়েছে। বাহাত্তর সালের জানুয়ারিতে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যখন প্রভাসকুমার কলকাতায় ছিলেন, তিনিই এই নামকরণ করে স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে এসেছিলেন। ইচ্ছে থাকলেও, ইপিন সাহস পায়নি বাবার দেওয়া নামটা পাল্টাতে।

বাহাত্তর সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি রাস্তাঘাট একটু চালু হওয়ার পরে, আইন শৃঙ্খলা কিছুটা ফিরে এলে প্রভাসকুমার দেশে ফিরে গিয়েছিলেন।

তারপর বাহাত্তর সালে ছেলে-বউ নিয়ে ইপিন, আর চুয়াত্তর সালে সপরিবারে ইপিন আর বিপিন দুজনেই টাঙ্গাইলে এসেছিল। টাঙ্গাইল বাড়ির স্মৃতি তাদের ছেলে মেয়েদের মনে গেঁথে আছে।

সকলেরই খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু মুজিব মরে যাওয়ার পরে ওরা আর আসার সাহস করেনি। তবে বেঁচে থাকা পর্যন্ত প্রত্যেক বছরই স্মৃতিকণা ছেলেদের কাছে গেছেন, দুয়েকবার প্রভাসকুমারের সঙ্গে, বাকি কয়েকবার অন্যদের সঙ্গী হয়ে। বৌদের জন্যে তাঁতের শাড়ি, নাতি-নাতনিদের জন্যে চমচম নিয়ে গেছেন।

শ্মশান যাত্রীরা এই মাত্র ফিরে এসেছে। স্মৃতিকণা খুব ভাগ্যবতী। দুই ছেলে, দুই নাতির কাঁধে চড়ে সিঁথি ভরা সিঁদুর নিয়ে যে বাড়িতে পঞ্চাশবছর আগে নববধূ হয়ে এসেছিলেন সেখান থেকেই পরলোকে গমন করলেন।

স্মৃতিকণার মৃত্যুর পর পাড়ার লোকে ভিড় করে এসেছিল। প্রাচীনা সধবা বিশেষ করে ব্রাহ্মণীর সিঁথির সিঁদুর অতি মহার্ঘ। মেয়েরা মেনকা আর উমার কাছ থেকে সেই সিঁদুর চেয়ে নিল। ঘরের দেওয়ালে ওই সিঁদুরের ফোঁটা দিলে সংসারে শান্তি থাকে। প্রথমে একটু ইতস্তত করে পরে মেনকার কাছ থেকে মুসলমান বাড়ির বৌরাও স্মৃতিকণার সিঁথিতে ছোঁয়ান সিঁদুর চেয়ে নিল।

স্মৃতিকণার শ্রাদ্ধের পর কলকাতায় ফিরে যাওয়ার সময় ইপিন-বিপিনরা জোর করে প্রভাসকুমারকে তাদের সঙ্গে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু প্রভাসকুমার কলকাতায় গিয়ে চৌদ্দ দিনও থাকেননি। শূন্য বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন।

ঠিক শূন্য বাড়ি নয়। কাছারি ঘরে মক্কেল, মুহুরি, জুনিয়ার উকিলেরা আছে।

আর সৌদামিনী আছে। তারই উপরে ইপিন-বিপিন প্রভাসকুমারের সব ভার দিয়ে গেছে। বাবাকে নিয়ে কলকাতায় যাওয়ার সময়ে সৌদামিনীকে বলে গেছে বাবা ফিরে এলে সব দেখাশোনা তুমি করবে, তোমার ওপরে ভার দিয়ে গেলাম। যুদ্ধের সময় ইপিনদের কাছে সৌদামিনী প্রায় ছয়মাস ছিল। এই হতভাগিনী মেয়েটির প্রতি এদের দুজনারই একটু টান আছে।

এই কাহিনীর লতায়-পাতায় সৌদামিনী নামের এই মেয়েটিও জড়িয়ে আছে। তার সামান্য জীবনের তেইশটি বছর কেটে গেল চৌধুরী বাড়ির সঙ্গে।

উনিশশো একাত্তর সালের আগস্ট মাসের সেই দুঃস্বপ্নের দিনে সৌদামিনী ভূতগ্রস্তের মত শাশুড়ির সঙ্গে স্মৃতিকণা ও প্রভাসকুমারের অনুসরণ করেছিল। নৌকায় করে পালিয়ে যাবার পথে কিংবা পরে রেলগাড়িতে কলকাতা যাওয়ার সময় সে একটিও বাক্য উচ্চারণ করেনি। উঠতে বললে উঠেছে, বসতে বললে বসেছে। খেতে দিলে খেয়েছে। কলের পুতুলের মত বোধহীন।

হাওড়ায় নেমে শ্রীরামপুরে বিপিনের বাড়ি থেকে দু'দিন বাংলাবন্ধের পর সৌদামিনী প্রভাসকুমারের সঙ্গে মনোহরপুকুরে ইপিনের বাসায় চলে আসে।

তারপর বহুকাল হয়ে গেল।

সেই থেকে সৌদামিনী, প্রভাসকুমারের সদা, তাঁর সঙ্গে আছে। একদিনের জন্যও ব্যতিক্রম হয়নি।

কলকাতায় যাওয়ার পরে ইপিনের বাসায় থাকার সময়ে ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে ধরা পড়ে যে সৌদামিনী সন্তানসম্ভবা। ব্যাপারটা মেনকার চোখেই প্রথম ধরা পড়ে, সে স্মৃতিকণাকে জানায়।

হারুর মা তখন স্মৃতিকণার সঙ্গে বিপিনের বাসায় শ্রীরামপুরে, হারুর মা পুত্রবধূ অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার এই সংবাদ সহজভাবে নেয়নি। শোনা মাত্র, 'কি ঘেন্না, কি ঘেন্না' বলে মুখ বিকৃত করেছিল। সে দৃঢ় নিশ্চিত যে এই সন্তান রাজাকার রজব আলির যে নির্লজ্জের মত প্রায় প্রকাশ্যে সৌদামিনীকে ধর্ষণ করেছিল।

স্মৃতিকণা হারুর মার মনোভাবকে খুব একটা পাত্তা দিলেন না। তবে সৌদামিনীর সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে তাঁর মনেও একটা সংশয় ছিল।

সৌদামিনীর সন্তানের জন্মানোর আগেই সৌদামিনীকে নিষ্কণ্টক করে দিয়ে হারুর মা মারা যায় দেশে ফিরে যাওয়ার মাসখানেকের মধ্যেই। সেই মুক্তিযুদ্ধের বছরে ও রকম অনেক হয়েছিল, অত্যধিক উত্তেজনা ও দুর্ভাবনার পরে বাড়ি ফিরে এসে স্বস্তিতে লোকেরা মারা গেছে।

সৌদামিনীর ছেলে জন্মালো মে মাসের শেষে। স্মৃতিকণা মনে মনে হিসেব করে দেখলেন রজব আলির অত্যাচারের তারিখের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, খুবই সম্ভাবনা ওই সন্তান রজব আলির।

স্বাধীন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে তখন এই এক সমস্যা। সৌদামিনীর ব্যাপারটা আলাদা কিছু নয়। সাড়ে আটমাসে হানাদারি রাজত্বের বিষফল তখন ফলতে শুরু করেছে।

হারুর মার মৃত্যুর পর থেকে সৌদামিনীর সব দায়িত্ব এসে পড়েছে স্মৃতিকণার ওপর। সৌদামিনীর বাপের বাড়ির লোকেরা সেই যে যুদ্ধের মুখে বাড়ি ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল, তারা আর ফিরে আসেনি, লোক মুখে এবং পরে চিঠিতে জানা গেছে তারা কুচবিহার জেলায় বসবাস করছে, এদিকে আর ফেরার ইচ্ছে নেই।

সুতরাং সৌদামিনী স্মৃতিকণার কাছেই রইল, সে শূন্যবাড়িতে স্মৃতিকণার সর্বক্ষণের সঙ্গিনী, তাঁকে রান্নাবান্নায় সাহায্য করে, তাঁর চুল বেঁধে দেয, পা টিপে দেয।

বলা বাহুল্য দেশে ফিরে এসে হারুর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। মিলিটারিরা নিশ্চিত খুন করেছিল তাকে।

এদিকে রজব আলিব পরিণামও হযেছিল অতি মর্মান্তিক। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরদিন সে মুক্তিফৌজের হাতে ধরা পড়ে। ধলেশ্বরী তীরের হিঙ্গানগর গ্রামে একটা পাটিবনের মধ্যে সে প্রাণের ভয়ে লুকিয়েছিল। ধরা পড়ার পরদিন টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী স্কুলের ছাদে তুলে হাজার হাজার লোকের সামনে মুক্তি ফৌজের লোকেরা তাকে পেট চিরে নাড়িভুড়ি বার করে হত্যা করে।

ব্যাপারটা নৃশংস। কিন্তু রজব আলির পাপের কোন শেষ ছিল না। সামাজিক কোন মূল্যবোধকেই সে মর্যাদা দেয়নি। এই পরিণতি তাঁব অনিবার্য ছিল।

হারুর মা মরে যাওয়ার পর সৌদামিনীর গর্ভের ভ্রূণ তখন প্রায় পাঁচ-ছয় মাসের হয়ে গেছে। স্মৃতিকণা একবার সৌদামিনীর গর্ভপাত করানোর কথা ভেবেছিলেন। সৌদামিনীকে কিছু বলেননি তবে প্রভাসকুমারকে বলতেই তিনি ঘোরতর আপত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন, 'এ মহাপাপ, জীবিত মানুষ খুন করার চেয়েও বড় পাপ অজাত মানুষকে খুন করা।'

তাছাড়া, আর একটা কথা, গর্ভপাত করানোর পক্ষে তখন বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল, যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা ছিল। স্মৃতিকণা সে ঝুঁকি নিতে সাহস করেননি।

জ্যৈষ্ঠ মাসে যথা সময়ে সৌদামিনীর ছেলে হল। বারবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে স্মৃতিকণা হদিশ করার চেষ্টা করেন ছেলেটা কার মত দেখতে হয়েছে, হারাধনের মত না রজব আলির মত।

সৌদামিনী এসব নিয়ে কিছু ভাবছে কি না, তার মুখ দেখে বোঝা যায় না।

প্রভাসকুমারও মোটামুটি নির্বিকার। বাংলাদেশে যুদ্ধের পর তিনি কেমন একটু দার্শনিকের মত হয়ে গেছেন। জীবন-মৃত্যু, পাপ-পুণ্য কোন বিষয়েই তাঁর আর কোন বিকার নেই। আগে ধর্মীয় দুর্বলতা কিছুটা ছিল এখন আর সেটাও নেই।

যুদ্ধের শেষে টাঙ্গাইল ফিরে এসে একটি চমকপ্রদ সংবাদ শুনেছিলেন প্রভাসকুমার। অবশ্য টাঙ্গাইল এসেই শুনেছিলেন তা নয়, কলকাতা থাকতেই কানাঘুষো শুনেছিলেন। ব্যাপারটা গোলমেলে ও হাস্যকর।

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যখন হানাদার ও রাজাকারদের অত্যাচার চরমে ওঠে সেই সময় টাঙ্গাইলে তখনও যেসব হিন্দু পরিবার ছিল তারা সবাই প্রাণের দায়ে মুসলমান ধর্মগ্রহণ করে এবং প্রায় প্রত্যেকেই মসজিদ গিয়ে নিয়মিত নামাজ পড়তে শুরু করে।

এর মধ্যে একটা মজার কথা প্রভাসকুমার শুনতে পেয়েছিলেন, হিন্দুরা মুসলমান হতে যাওয়ার সময় অনেকেই পাঁজি দেখে শুভক্ষণ বার করে কালীবাড়িতে প্রণাম করে মসজিদে মুসলমান হতে গিয়েছিল। কালীবাড়িতে তারা প্রার্থনা করেছিল, 'মা, তুমি চিরদিন আমাদের দেখেছ। এবারও আশীর্বাদ কর যাতে ভালোয় ভালোয় মুসলমান হতে পারি।'

সৌদামিনীর ছেলে জন্মানোর পর প্রভাসকুমার তার নাম রাখলেন বঙ্গলাল। এবার আর নামকরণে কোন দিক থেকে বাধা এল না।

একদিন রাতে বিছানায় শুয়ে স্মৃতিকণা প্রভাসকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নাম তো বঙ্গলাল হল, কিন্তু ছেলের উপাধি কি হবে?'

প্রভাসকুমার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, 'কি হবে?' স্মৃতিকণা বললেন, 'কি উপাধি হবে দাস না আলি?'

প্রশ্নটার মানে বুঝতে অসুবিধে হয়নি প্রভাসকুমারের। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে তিনি বললেন, 'আমাদের উপাধি হবে, বঙ্গলাল চৌধুরী।'

প্রভাসকুমার আর স্মৃতিকণার পাশে সৌদামিনী তার ছেলেকে নিয়ে পাকাপাকিভাবে রয়ে গেল। ধীরে ধীরে বঙ্গলাল বড় হতে লাগল।

স্মৃতিকণা মারা গেলেন উনিশশো তিরাশি সালে। তখন বঙ্গলালের বয়স এগারো।

মায়ের মৃত্যুর সময় এসে ইপিন-বিপিন দেখল বঙ্গলাল সৌদামিনীর ঔদাসীন্যে এবং সম্ভবত পরলোকগত স্মৃতিকণার প্রশ্রয়ে সম্পূর্ণ বয়ে গেছে। লেখাপড়া করে না, স্কুলের খাতায় নাম আছে, তবে সেখানে বিশেষ যায় না।

কিন্তু বঙ্গলাল নির্বোধ নয়। রীতিমত বুদ্ধিমান। তার মাথা বেশ পরিষ্কার।

ফিরে যাওয়ার আগে প্রভাসকুমারের সঙ্গে বসে স্থির হল বঙ্গলাল ইপিন-মেনকার সঙ্গে কলকাতায় যাবে, সেখানেই থাকবে, বড় হবে, লেখাপড়া করবে। সৌদামিনী টাঙ্গাইল বাড়িতে প্রভাসকুমারের কাছে থাকবে, দেখাশোনা করতে।

সেইমত ইপিন-মেনকা বঙ্গলালকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে কলকাতায় ফিরল। দু'দিন পরে বিপিন বাবাকে নিয়ে কলকাতায় এল। টাঙ্গাইল বাসা একা সৌদামিনীর হাতে রইল।

দু সপ্তাহ পরে প্রভাসকুমার কলকাতা থেকে ফিরে এলেন। তখন থেকে সৌদামিনী তাঁর দেখাশোনা করছে।

* * *

এখন টাঙ্গাইলে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বলতে প্রভাসকুমারের বিশেষ কেউ নেই। অথচ একদিন এই শহরের প্রায় প্রত্যেক বাড়িই ছিল তাঁর আপন। রক্তের সম্পর্কের কিংবা আজন্ম চেনাশোনা মানুষেরা থাকত সে সব বাড়িতে।

ভানুমতীর খেলের মত সব হাওয়ায় উবে গেছে। এখন ভিন্ন পৃথিবীর অচেনা মানুষেরা অন্য

ভাষায় কথা বলে।

তবু দুয়েকজন এখনও আছে।

এরশাদ উকিল আছে। আজন্ম চেনা। একই স্কুলে একসাথে পড়েছেন। একই আদালতে এতকাল পাশাপাশি ওকালতি করেছেন।

সাধনা ঔষধালয়ের নবীন কবিরাজ আছেন। নবীন চক্রবর্তীর ব'স প্রায় নব্বই হতে চলল। তাঁর বাড়ি ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। গত ষাট বছর টাঙ্গাইল টাউনে আছেন।

আর আছে লাল মহম্মদ নিকারি।

লাল মহম্মদ বহুকাল ছিল না। হঠাৎ ফিরে এসেছে।

লাল মহম্মদ নিকারিকে ছোটবেলা থেকে চেনেন প্রভাসকুমার। তাঁর প্রায় সমবয়সী একসঙ্গে আদালতের মাঠে জামবুরা দিয়ে ফুটবল খেলেছেন।

লাল মহম্মদ লেখাপড়া বিশেষ করেনি। সমান বয়সী হলেও লাল পড়ত তাঁর ছোটভাই প্রতুলের সঙ্গে। সেও বেশিদিন পড়েনি, ফাইভ-সিক্স পর্যন্ত পড়েছিল।

প্রভাসকুমারের মত লাল মহম্মদ নিকারিও এই শহরের প্রাচীন বাসিন্দা। তারাও এ শহরের গোড়াপত্তন থেকে পুরুষানুক্রমে বাস করছে।

নিকারিরা মৎস্য ব্যবসায়ী। হিন্দু জেলেরা মাছ ধরে, মুসলমান নিকারিরা সেই মাছ কেনাবেচা করে। তবে এই নিকারি উপাধিটার মধ্যে একটা অসৌজন্যের ছোঁয়া আছে, একটু হেয় ভাব আছে। আজকাল নিকারির বদলে ব্যাপারি উপাধি ব্যবহার করা হয়। রেশনকার্ডে বা ভোটার তালিকায় নিকারি লেখা হয় না, লাল মহম্মদ নিকারি না লিখে লেখা হয় লাল মহম্মদ ব্যাপারি।

লাল মহম্মদ নিজে অবশ্য কখনও মাছের ব্যবসা করেনি। প্রথম যৌবন থেকে তার কাজ ছিল সর্দারি করা এবং সেই সঙ্গে অল্পসল্প গুণ্ডামি। কখনও কখনও সে ভাড়াটে গুণ্ডার কাজও করেছে। তবে এ ব্যাপারে তার বাছ-বিচার ছিল, টাকা পেলেও সে সকলের বিরুদ্ধাচরণ করত না। বিশেষ করে শহরের পুরনো বাসিন্দাদের প্রতি তার ছিল অপরিসীম দুর্বলতা। এ ব্যাপারে জাত-ধর্ম নিয়ে সে মাথা ঘামাত না।

পাকিস্তানী আমলের গোড়ায় লাল মহম্মদ আনসার বাহিনীতে নাম লিখিয়েছিল। আনসারের সবুজ ইউনির্ফম আর চাঁদ-তারা লাগানো গোল পশমি টুপি পরে হাতে একটা পাকানো বেতের লাঠি নিয়ে সারা শহরে মাস্তানি করে বেড়াত। পরবর্তীকালে তার কোমরে একটা লম্বা, পুরানো তলোয়ার ঝুলতে দেখা গেছে, সেটা আলোয়ার জমিদার রায়চৌধুরীদের তোষাখানা থেকে লাল মহম্মদ লুট করেছিল।

কিন্তু পাকিস্তানী পুলিশ পরে তলোয়ারটা খুব বেশিদিন ব্যবহার করতে দেয়নি, সেটা কেড়ে নিয়ে বাজেয়াপ্ত করেছিল। পাকিস্তানের প্রথম দিকে অল্প কিছুটা আইনের শাসন ছিল।

অন্যান্য আনসারদের মত লাল মহম্মদ ঠিক সাম্প্রদায়িক ছিল না। বেছে সংখ্যালঘুদের ওপর সে অত্যাচার করত না বরং কখনও কখনও সম্ভব হলে সহকর্মীদের বাধা দিত।

লাল মহম্মদের বিচরণ স্থল ছিল বাসস্ট্যাণ্ড এবং নৌকোর ঘাট। সেখানে নানা অছিলায় সে যাত্রীদের কাছ থেকে তোলা আদায় করত। তবে সব ভাগাভাগি করে তার অংশে খুব কমই থাকত।

আজকাল লাল মহম্মদ এসে চৌধুরী বাড়ির বাইরের বারান্দায় সিঁড়ির ওপরে বসে থাকে। বারান্দায় পুরনো বেতের ইজি চেয়ারে শুয়ে প্রভাসকুমার ঝিমোন।

লাল মহম্মদ মাঝে মধ্যে উল্টোপাল্টা কথা বলে প্রভাসকুমারের ঝিমুনি ভাঙিয়ে দেয়, 'মনে

আছে, ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় টিফিনের সময় ক্লাস ঘরের জানলা দিয়ে পাশের খালের নৌকোর মেয়েদের লুঙ্গি তুলে আমার লিঙ্গ দেখিয়েছিলাম ?'

আধা ঝিমুনির মধ্যেই প্রভাসকুমার টের পান, লুঙ্গি আর লিঙ্গ শব্দদুটির মধ্যে একটা ধ্বনি সামঞ্জস্য আছে, মুখে লাল মহম্মদকে জানান দেন, 'হুঁ।'

প্রভাসকুমারের সাড়া পেয়ে লালল মহম্মদ উৎসাহ পেয়ে বলে, 'সেদিন যোগেন হেডমাস্টার আমারে কি বেতানটা না বেতালো। তুমি ভয়ে ক্লাসের মধ্যে পেচ্ছাপ করে দিলে।'

প্রভাসকুমারের এখন হুঁস ফিরেছে, ঘুম-ঘুম ভাবটা কেটে গেছে, ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললেন, 'লাল, তুই প্রতুলের কথা বলছিস। আমি তো তোর সঙ্গে এক ক্লাসে ছিলাম না, তুই তো প্রতুলের সঙ্গে পড়েছিস।'

লাল মহম্মদ অল্প সময় থমকিয়ে থেকে একটু অপ্রস্তুত মুখে জিজ্ঞেস করে, 'ও তুই প্রতুল নস। তুই প্রভাস। তা ঠিক আছে।' একটু বোকার মত হেসে লাল মহম্মদ বলে, 'প্রতুল আর প্রভাস ওই একই হল।'

লাল মহম্মদের কথাটা কানে যেতে মনে মনে একটু হাসলেন প্রভাসকুমার। প্রতুল আর প্রভাস এক হল। আমার বয়েস তিরাশি হয়ে গেল। প্রতুল মারা গেল সাতাশ বছর বয়সে। মিলিটারি ট্রাক চাপা পড়ে। সাইকেলে কালীহাতি স্কুলে যাচ্ছিল। পথে চাপা পড়ল। আগে বাসেই যেত। কিন্তু যুদ্ধের সময় বাসের যাতায়াত অনিয়মিত হয়ে গেল, সাইকেলেই যেত।

সে কতকাল আগের কথা। বর্ষাকাল, অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। একটা গরুর গাড়িতে করে প্রতুলের মৃতদেহ নিয়ে আসা হল। মাথাটা থেঁতলে গেছে। রক্তমাখা দলা পাকানো শবদেহটাকে প্রতুল বলে চেনা কঠিন।

*　　　　*　　　　*

পৌষ মাস আসতে এখনো কয়েকদিন বাকি। অঘ্রাণ মাসের এলাকায় শীত জোরজার করে ঢুকে গেছে।

উত্তুরে হাওয়া নিচু হয়ে বয়। সামনের পুকুরের জলে হাওয়ার ধাক্কায় ছোট ছোট ঢেউ উঠছে। কাছারি ঘরের পাশে বেল গাছটার ডালে একটা মাছরাঙা পাখি খুব সতর্ক হয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে অসফল ছোঁ দিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে আসছে।

গায়ের শালটা একটু ভাল করে জড়িয়ে নিলেন প্রভাসকুমার। সামনের সিঁড়ির ওপরে লাল মহম্মদ বসে রোদ পোহাচ্ছে।

লাল মহম্মদ অনেক কাল শহরে ছিল না। সম্প্রতি মাস ছয়েক হল ফিরে এসেছে।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় লাল মহম্মদ একটা মহাপাপ করেছিল, সে রাজাকার হয়েছিল। তবে টাঙ্গাইলে ছিল না, মির্জাপুরের দিকে রাজাকারগিরি করেছে।

যুদ্ধে পাকিস্তানী হানাদারেরা আত্মসমর্পণ করার একটু আগেই সে পালিয়ে যায়, না হলে মুক্তি যোদ্ধারা তাকে ধরতে পারলে খুন করে ফেলত।

প্রথমে লাল মহম্মদ কলকাতায় গিয়েছিল, কলকাতা তার পুরনো চেনা জায়গা। কিন্তু আত্মগোপনের পক্ষে তখন মোটেই নিরাপদ ছিল না। পাসপোর্ট-ভিসা ছিল না, কলকাতায় তখন মুক্তিযোদ্ধা গিজ গিজ করছে, লাল মহম্মদ ধরা পড়ে যেত।

লাল মহম্মদ চলে গিয়েছিল আসানসোলে। সেখানে এক ঠিকাদারের কাছে কাজ পায়। একটা বিয়ে করে, স্টেশনের কাছে একটা ঝুপড়িতে গত কুড়ি-বাইশ বছর বাস করেছে। কিন্তু বুড়ো

বয়েসে আর বিদেশে থাকতে ভাল লাগল না।

যা হয় হবে এই রকম মনোভাব নিয়ে লাল মহম্মদ টাঙ্গাইলে ফিরে আসে। একাই ফিরে আসে। বৌ-ছেলেদের আসানসোলে ফেলে রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

এখানে এসে অবশ্য তার কোনও বিপত্তি হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সেই আবেগ ও উত্তেজনা বহুদিন আগেই স্তিমিত হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ, গরীব লোকজন স্বাধীনতার যে স্বাদ পেয়েছে তার মধ্যে তেতো ভাগই বেশি।

এতদিন পরে মুক্তিযোদ্ধাদের সবাই অবিন্যস্ত। অন্যদিকে রাজাকার অলবদরেরা পুনর্বাসন পেয়েছে। টাঙ্গাইল শহরের রাস্তাতেই লাল মহম্মদ পোস্টার দেখেছে,

'পান খাইয়া ঠোঁট
লালে লাল।
ও তোমারে চিনছি,
তুমি না সেই
একাত্তরের দালাল।'

অবশ্য এই পোস্টারের মধ্যে যতটা শ্লেষ আছে ততটা আক্রোশ আর নেই। কালক্রমে সব উত্তাপই শীতল হয়ে যায়।

লাল মহম্মদ এবার ফিরে এসে শহরের কারও সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা করে না। আগের পক্ষের স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েদের ফেলে সে পালিয়েছিল। তারা তাকে এবার আর পাত্তা দেয়নি। নিকারি পাড়ায় পুরনো ভিটের পাশে একটা ছোট দোচালা খড়ের ঘর সে করে নিয়েছে, সেখানেই থাকে। যখন যেখানে পারে খেয়ে নেয়। প্রতিদিন সকালে নিয়মিত হাজিরা দেয় চৌধুরীবাড়িতে। প্রভাসকুমারের ইজিচেয়ারের পাশে সিঁড়ি বা বারান্দার ওপরে বসে থাকে, রোদ পোহায়, হাওয়া খায়। তারপরে বেলা বাড়তে বাজারের দিকে পা বাড়ায়।

বাজারে অনেক রকম ঝগড়া-কলহ হয়। তার মধ্যে সে মাথা গলায়, সালিশির চেষ্টা করে। সালিশির কারবারে কখনও সখনও দু'পয়সা আসে। তাছাড়া আসানসোল থেকে পালিয়ে আসার সময় সে ঠিকাদারের তহবিলটা মেরে চলে আসে। সে টাকার অনেকটাই তার হাতে আছে।

প্রতিদিন নিয়মমতো সৌদামিনী দু'কাপ চা দিয়ে গেছে প্রভাসকুমার আর লাল মহম্মদকে। লাল মহম্মদ অবশ্য এ বাড়ির কাপে চা খায় না। তার নীল পাঞ্জাবির পকেটে একটা এ্যালুমিনিয়ামের গ্লাস আছে, কাপ থেকে চা-টুকু সেই গ্লাসে ঢেলে নেয়। চা খেয়ে লাল মহম্মদ ওঠে। ইজিচেয়ারের দিকে তাকিয়ে দেখে প্রভাসকুমার আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে আর সে বিরক্ত করে না। বাজারের দিকে যাওয়ার পথে রুহুল ডাক্তারের রোগী ভর্তি চেম্বারে একবার উঁকি দিয়ে সে বলে যায়, 'ডাক্তার সাহেব, প্রভাসকে একবার দেখে আসবেন তো। একেক সময় হঠাৎ কেমন ঝিমিয়ে পড়ছে।'

সত্যিই আজ কয়েকদিন হল প্রভাসকুমারের ঝিমঝিম ভাবটা একটু বেড়ে গেছে।

রুহুল ডাক্তার এসে নাড়ি দেখলেন, স্টেথসকোপ দিয়ে বুক-পিঠ দেখলেন। কোনও ত্রুটি নেই কোথাও, হার্ট তো চমৎকার। তবে এই বয়েসে এরকম হয়। সারা জীবনের অপরিসীম ক্লান্তি নেমে আসে শরীরে, এক ধরনের স্লিপিং সিকনেস, বুড়ো হলে এটা অস্বাভাবিক নয়।

রুহুল ডাক্তার সৌদামিনীকে ডেকে বললেন, 'সদা কাকাবাবুকে এক কাপ কড়া করে চা করে দেতো, একটু বেশি আদা দিয়ে।'

সদা বলল, 'কিন্তু কাকাবাবুতো এইমাত্র চা খেলেন আদা দিয়ে।'

কিন্তু রুহুল ডাক্তারের চায়ের প্রস্তাবটা ঘুমন্ত অবস্থাতেও প্রভাসকুমারের কানে গিয়েছে। চায়ের নেশার তিনি পুরনো পাপী। তিনি এই সুযোগ ছাড়বেন কেন?

সৌদামিনীকে প্রভাসকুমার বললেন, 'এই সদা এত কথা বলিস কেন? জানিস না ডাক্তারের কথা শুনতে হয়।'

প্রভাসকুমারের রসবোধে রুহুল ডাক্তার আর সৌদামিনী এক সঙ্গে হেসে উঠল।

রুহুল ডাক্তারের সঙ্গে এক পেয়ালা চা খেতে খেতে কথা বলতে বলতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল প্রভাসকুমারের। ঝিমুনির ধাক্কায় হাতটা একটু আলগা হতেই হাত থেকে কাপ-প্লেট দুটো মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেল।

প্রভাসকুমার চিনেমাটির পেয়ালা ভাঙার শব্দে চমকে জেগে উঠলেন। আরেকবার নাড়ি দেখলেন রুহুল ডাক্তার। নাড়ি ঠিক আছে।

যাওয়ার সময়ে সৌদামিনীকে আড়ালে বলে গেলেন, 'আমি কিছু খারাপ পাচ্ছি না। কিন্তু ঝিমুনিটা একটু গোলমেলে ধরনের। কলকাতায় ছেলেদের একটু খবর দিয়ে রাখো।'

সেই দিন বিকেলে আদালত থেকে ফিরে আসার পর পুরনো মুহুরিবাবুকে সৌদামিনী রুহুল ডাক্তারের কথা বলল।

মুহুরিবাবুও একটু চিন্তান্বিত মুখে বললেন, 'আজ কয়েকদিন হল আমারও ব্যাপারটা সুবিধের মনে হচ্ছে না। উকিলবাবুর কেমন সব সময় ঘুম ঘুম ভাব। আদালতের নথিপত্র দেখাও একেবারে বাদ দিয়েছেন। আগে তবু কথা শুনে পরামর্শ দিতেন। এখন কথাই বলতে চান না।'

মুহুরিবাবু কালব্যয় না করে সেদিনই সন্ধ্যায় টেলিগ্রাম অফিসে গিয়ে ইপিন, বিপিন দুজনকেই তার করলেন, সেই সাবেকি গৎ, 'ফাদার সিরিয়াস, কাম শার্প।'

ইপিনের সরকারি চাকরি। একটা পাশপোর্ট তার আছে বটে তবে বাংলাদেশে আসতে গেলে ভিসা লাগবে, তার জন্যে সরকারি অনুমতি লাগবে। অনুমতি পেতে পেতে, খুব তাড়াতাড়ি করলেও পনেরো-বিশ দিনের আগে হবে না।

বিপিনের ব্যাঙ্কের চাকরিতে একটা বড় মতন প্রমোশন হয়েছে, সে প্রথম শ্রেণীর অফিসার হয়েছে। সে গিয়েছে হায়দরাবাদে, সেখানে তার কি একটা ট্রেনিং না সেমিনার চলছে।

বিপিনের নামে আসা টেলিগ্রামটা নিয়ে, পাওয়ার পরদিনই সন্ধ্যাবেলা, উমা মনোহরপুকুরের বাড়িতে এল। বিপিন একটা ফোন নম্বর দিয়ে গিয়েছিল কিন্তু উমা সেখানে ফোন করে তাকে পায়নি। বিপিন হায়দরাবাদে নেই, সে রয়েছে সেখান থেকে কয়েক মাইল দূরে রাজেন্দ্রনগরে, সেখানেই সেমিনার হচ্ছে। সেখানেই আরও কয়েকদিন থাকবে।

টেলিগ্রাম এসেছে বটে কিন্তু প্রভাসকুমারের শারীরিক অবস্থা কি পর্যায়ে রয়েছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। ইপিন, মেনকা আর উমা অনেকরকম আলোচনা করে ঠিক করল এই অবস্থায় বিপিনকে ব্যতিব্যস্ত করে লাভ নেই। সে তো সপ্তাহ খানেকের মধ্যে এসেই যাচ্ছে। এর মধ্যে ইপিন অফিস থেকে ভিসার জন্যে নো অবজেকশান সার্টিফিকেট পেয়ে গেলে দু'ভাই এক সঙ্গে যাবে।

তবে আপাতত বঙ্গলাল চলে যাক। বঙ্গলালের পাসপোর্ট রয়েছে। টেলিগ্রাম দেখালে বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকে ভিসা পেতে দেরি হবে না।

তাছাড়া বঙ্গলালের যাতায়াত অভ্যেস আছে। সে বছরে দুয়েকবার মায়ের কাছে যাতায়াত করে। ইপিন-বিপিন তার হাতে বাবার জন্যে ওষুধ, টনিক, জিনিষপত্র পাঠিয়ে দেয়। টাঙ্গাইল থেকে আসার সময় ঘি, চমচম নিয়ে আসে।

বঙ্গলাল এখন বড় হয়েছে। সেই বাংলাদেশ যুদ্ধের দিনে মাতৃগর্ভে লালিত অসহায় ভ্রূণ, এখন পূর্ণ সাবালক একুশ বছরের যুবক। বেশ লম্বা-চওড়া দশাসই চেহারা। কলকাতা ময়দানে ফুটবলে দ্বিতীয় ডিভিসনের একটা মাঝারি দলে গোলে খেলে।

স্মৃতিকণার মৃত্যুর পর ইপিন যখন বঙ্গলালকে কলকাতায় নিয়ে আসে সে একটু বেয়াড়া স্বভাবের ছিল। এখন ঘষে মেজে সে ভদ্রস্বভাবের হয়েছে। বাড়ির কাছে আশুতোষ কলেজে বাংলা অনার্স নিয়ে পড়ছে। তার প্রেমিকার সংখ্যা একাধিক।

ইপিনের কথামত বঙ্গলাল পরের দিনই ভিসা করতে গেল। সে যাবে সড়ক পথে। কলকাতা থেকে প্রথমে বনগাঁ। তাপর হরিদাসপুরে চেকপোস্ট পেরিয়ে বেনাপোল-যশোহর হয়ে সন্ধ্যার বাসে ঢাকা। পরের দিন সকালে আবার বাস, দু'ঘণ্টার পথ টাঙ্গাইল।

দুপুর বেলা ভাত খেতে চাননি প্রভাসকুমার। সৌদামিনীও আর জোর করেনি। মাগুর মাছের সুক্তো করেছিল সে, সেখান থেকে একটা টুকরো তুলে কাঁটা ছাড়িয়ে প্লেটে করে দিয়েছিল। সেটাও প্রভাসকুমার অর্ধেকের বেশি খাননি।

তবে আজ কয়েকদিন প্রভাসকুমারের চায়ের ওপরে ঝোঁক খুব বেড়ে গেছে। ইজিচেয়ারে, বিছানায় বারবার ঘুমিয়ে পড়ছেন। আর প্রত্যেকবারই ঘুম ভাঙার পরে চা চেয়েছেন, 'সদা, এক কাপ চা দিয়ে যা।'

রুহুল ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে এসেছে সদা, ডাক্তার বলেছে, 'এত ভাবতে হবে না। যা চায় দিও।'

আজকেই দুপুরবেলা মাগুর মাছ খাওয়ার সময় একটু নতুন বায়না করেছেন প্রভাসকুমার, 'সদা, তুই আমাকে চিকেন করে দিতে পারবি না? আমি কোনওদিন চিকেন খাইনি।'

কথাটা সত্যি। প্রভাসকুমারের বাল্যে ও যৌবনে ব্রাহ্মণবাড়িতে বলতে গেলে মধ্যবিত্ত হিন্দুবাড়িতে চিকেন ছিল নিষিদ্ধ মাংস। তাছাড়া প্রভাসকুমার প্রায় সারা জীবনই সাত্ত্বিকভাবে কাটিয়ে এসেছেন। হোটেলে খেতে হয়নি। অল্প বয়েসে রেস্তোঁরায় গিয়েছেন তবে সেখানে চা ছাড়া কিছু খাননি। এখনও বাড়ির বাইরে কখনও কিছু খেয়ে থাকলে তাহলে সেটা শুধু চা আর চায়ের সঙ্গে হয়ত সামান্য কিছু।

দুপরবেলা অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন প্রভাসকুমার। দু'বার এসে উঁকি দিয়ে দেখে গেছে সৌদামিনী, জামাইবাবু কেমন পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন। লেপটা পায়ের কাছে উঠে গিয়েছিল, পা দুটো ভাল করে ঢেকে দিয়ে সৌদামিনী নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

জামাইবাবুর ডাকে সদার ঘুম ভাঙল। জামাইবাবু চা চাইছেন। খাটের ওপরে হেলান দিয়ে চা খেয়ে জামাইবাবু সামনের বারান্দায় গিয়ে একটু বসলেন। বিকেলের দিকে হাওয়াটা একটু বেড়েছে। চারদিকের সব গাছের ঝরাপাতা হাওয়ায় উড়ে এসে বারান্দায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। উঠোন, সিঁড়ি, বারান্দা ছেয়ে গেছে ঝরে পড়া হলুদ পাতায়।

শীতের বিকেলে বিশেষ করে শীতের মেঘলা বা কুয়াশাঘন বিকেলে আগে কেমন মন খারাপ হয়ে যেত প্রভাসকুমারের। আজ কিন্তু ভালই লাগছে। ছাদের কারনিশে একটা কাক গম্ভীর হয়ে বসে আছে। অকারণে পুকুরঘাট পর্যন্ত গিয়ে হুলো বেড়ালটা আবার দালানে ফিরে এল।

হঠাৎ কি কথা মনে পড়ায় প্রভাসকুমার সৌদামিনীকে বললেন, 'তুই আমাকে একটু পুকুরঘাটের কাছে নিয়ে চল তো।'

খুব সাবধানে ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে প্রভাসকুমারকে নামিয়ে পুকুরঘাটের কাছে নিয়ে গেল

সৌদামিনী। মেঘলা দিন, তার ওপরে প্রভাসকুমার একেবারেই স্পষ্ট দেখেন না। সৌদামিনীকে বাঁধান ঘাটের সব চেয়ে উঁচু ধাপটার মাঝামাঝি জায়গাটা দেখিয়ে বললেন, 'দ্যাখ তো, এখানে চারজোড়া পায়ের ছাপ আছে কি না?'

অনেকদিন ছাপ গুলো ছিল। স্মৃতিকণার মৃত্যুর পরেও দেখেছেন প্রভাসকুমার। আজ কিন্তু সৌদামিনী সেই ছাপ গুলো খুঁজে পেল না। সিমেন্টের চাতাল, জায়গায় জায়গায় ছড়ে গেছে, চটে গেছে। আগের কোনও চিহ্ন সেখানে নেই।

সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লেন প্রভাসকুমার। এরই মধ্যে এক পুরনো মক্কেল মোনদার আলি নথিপত্র নিয়ে এসে গেছে। মোনদার অনেক দিনের লোক, প্রভাস চৌধুরীর সেরেস্তায় আসছে অন্তত তিরিশ বছর। তারও বয়েস সত্তরের কাছে, তবে শক্ত সমর্থ চেহারা।

প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন প্রভাসকুমার। সৌদামিনী ঘরের লাইটটা জ্বালিয়ে দিতে মোনদার আলিকে দেখে চিনতে পারলেন, মোনদার সাহেব।

মোনদার শব্দটা আরবি না পারসি। শব্দটার মানে কি? আগে একবার মোনদারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন প্রভাসকুমার, তিনি বলতে পারেননি। মোনদারকে দেখে একটু চুপ করে রইলেন প্রভাসকুমার। জীবনে কত কিছু জানা হল না।

মোনদারের হাতে মামলার নথিপত্র দেখে প্রভাসকুমার বললেন, 'কাগজপত্র আমি দেখতে পারব না।' মোনদার আলি বললেন, 'আপনাকে দেখাতে আনিনি। আপনি একটু নথিটা পায়ে ছুঁইয়ে দিন, মামলটা কাল এজলাসে উঠবে।'

কাগজে পা ছোঁয়াতে প্রভাসকুমারের পুরনো সংস্কারে লাগছিল কিন্তু মোনদারের কথা ফেলতে পারলেন না। নথিটা নিয়ে যাওয়ার সময়ে মোনদার একটা সবুজ রঙের নোট একশো টাকা প্রভাসকুমারের পায়ের কাছে রেখে নমস্কার জানিয়ে চলে গেলেন।

সন্ধ্যাবেলা রুহুল ডাক্তার আরেকবার একাই এলেন। তিনি কোনও পরীক্ষা করলেন না, একটু কথাবার্তা বলে, সৌদামিনীকে একটু লক্ষ্য রাখতে বলে চলে গেলেন।

রুহুল চলে গেলে প্রভাসকুমার সৌদামিনীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সদা, ডাক্তার দুবার এল কেন? আমার শরীর কি খুব খারাপ?'

সৌদামিনী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আপনার কি কোনও কষ্ট হচ্ছে?'

প্রভাসকুমার বললেন, 'না। আমার কোনও কষ্ট নেই।' তারপর বললেন, 'তুই কি ইপিন-বিপিনকে কিছু জানিয়ছিস?'

সৌদামিনী বলল, 'পরশুদিন তার করেছে।' শুনে প্রভাসকুমার চুপ করে রইলেন। কিছু পরে বললেন, 'আমার ভাগ্নে মোনাকে একটা চিঠি দিস।'

এর মধ্যে টাউন থেকে বাড়ি ফেরার পথে লাল মহম্মদ একবার খোঁজ নিয়ে গেল। বারান্দায় উঠে প্রভাসকুমারের ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'প্রতুল, এ বেলা কেমন আছ?'

তিনি যে প্রতুল নন প্রভাস, সেটা আর প্রতিবাদ করলেন না প্রভাসকুমার, শুধু বললেন, 'ভাল।'

পরদিন ভোরবেলা ভালভাবেই ঘুম থেকে উঠলেন প্রভাসকুমার। শীতের এই সময়টায় নানা

রকম পাখি ডাকে। দূর-দূরান্ত পাহাড়-সমুদ্র পেরিয়ে কোথা থেকে সব পাখি আসে এ দিকটায় বছরের এ সময়ে। বারান্দায় থাম ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর আর ইজিচেয়ারে না বসে আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। সৌদামিনী চা নিয়ে এসে বলল, 'আজ চিকেন হবে।' প্রভাসকুমার খুশি হলেন কিনা বোঝা গেল না।

রান্নাঘরের পিছনে মুরগি কুটতে গিয়েছিল সৌদামিনী। সেখান থেকে শুনতে পেল জামাইবাবু আবার চা চাইছেন। এই মুহূর্তে তার হাত বন্ধ। চা করতে অসুবিধে আছে। জামাইবাবুর জন্যে দুটো ডাব পেড়ে রাখা আছে, তার একটার মাথা কেটে জল ঢেলে পেয়ালায় করে দিয়ে এল। মুখে অবশ্য বলল না যে এটা চা নয়, ডাবের জল। এরকম প্রতারণা সৌদামিনী আজকাল কখনও কখনও জামাইবাবুর সঙ্গে করে থাকে।

তবে এটাই শেষ প্রতারণা। পেয়ালাটা মুখে দিয়ে একটু খেয়ে পেয়ালটা সৌদামিনীকে ফেরত দিয়ে প্রভাসকুমার বললেন, 'একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আবার গরম করে নিয়ে আয়।'

আর উপায় না দেখে মুরগি কোটা ফেলে সৌদামিনী সত্যিকাবের চা করতে গেল। চায়ের পেয়ালা হাতে করে এসে দেখে জামাইবাবুর মাথাটা বালিশের ধারে কেমন এলিয়ে পড়েছে। প্রভাসকুমার মারা গেছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ি লোকে লোকারণ্য। পুরো শহবের লোক এসে গেছে চৌধুবী বাড়িতে। প্রভাসকুমারের জন্যে এত যে দুর্বলতা ছিল এ শহরের মানুষের সেটা কে জানত।

দু'দল ছেলে দুটো মাইক নিয়ে সাবা শহব চযে বেড়াতে লাগল,

'আজ বিকালে প্রভাস চৌধুরীর শবযাত্রায় যোগ দিন। আজ তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধায় স্কুল-কলেজ, কোর্ট-কাছারি, বাজার-দোকান সব বন্ধ।'

কে যে কি আয়োজন করল, ব্যবস্থা কবল সৌদামিনী তার কিছুই জানে না। তার নিজের পক্ষে কিছু করা সম্ভবও ছিল না। সে শুধু নিজে ডাকঘরে গিয়েছিল ইপিন আর বিপিনকে দুটো তার করতে।

ফেরার পথে বাসরাস্তার মুখে দেখে সুটকেশ হাতে বঙ্গলাল আসছে।

বঙ্গলাল এসে যাওয়ায় তার কাছে সবাই জানতে পারল ইপিন-বিপিন দু-চারদিনের মধ্যে আসতে পারবে না।

বিকেলেই শবদাহ করতে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল। বিরাট শবযাত্রা। শব-বাহকেরা অনেকেই ব্রাহ্মণ নয়, এমন কি হিন্দুও নয়।

বঙ্গলাল নিজেও কাঁধ দিল। এবং শেষপর্যন্ত মুখাগ্নি তাকেই করতে হল। কালীবাড়ির পুরোহিত বললেন, 'এ বাড়িতে যখন জন্মেছ, এদের কাছেই আছ, তুমি তো প্রথম থেকেই চৌধুরী। তুমিই মুখে আগুন দাও।'

মাত্র পঁচিশ বছর আগেও এরকম কিছু ভাবা অসম্ভব ছিল। কিন্তু দিনকাল সব সম্ভব ক... দিয়েছে।

সামনে চিতা জ্বলছে। শ্মশানের ভিড় ধীরে ধীরে কমছে। লাল মহম্মদ এক পাশে স্থির হয়ে চিতার দিকে তাকিয়েছিল। তারপর পাশের একজনকে বলল, 'টাউনে প্রাচীন বলতে আর কেউ রইল না। মান্ধাতার আমলের শেষ মানুষটা চলে গেল।

পাশের লোকটি বলল, 'কেন আপনি তো আছেন।'

লাল মহম্মদ বলল, 'আমি আবার মানুষ নাকি।'